বর্ধমান জেলায় কমিউনিস্ট আন্দোলনের অতীত প্রসঙ্গ

সৈয়দ শাহেদুল্লাহ্

নতুন চিঠি প্রকাশনা

৬২ বি. সি. রোড, বর্ধমান ৭১৩১০১

BARDHAMAN JELAI COMMUNIST ANDOLONER ATIT PRASANGA

SYED SHAHEDULLAH

নতুন চিঠি সাপ্তাহিক পত্রিকার শারদ সংখ্যা, ১৯৮৫ থেকে ২.১.৮৮ পর্যন্ত সাধারণ সংখ্যাগুলিতে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত এবং পরবর্তীকালে লেখক কর্তৃক সংশোধিত ও পরিমার্জিত।

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর, ১৯৯১

প্রকাশক :
অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়
নতুন চিঠি প্রকাশনা
৬২, বি. সি. রোড, বর্ধমান ৭১৩১০১

মুদ্রক :
অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়
নতুন চিঠি প্রেস
৬২, বি. সি. রোড, বর্ধমান ৭১৩১০১

গ্রন্থনা ও সম্পাদনা :
জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য

মুখবন্ধ

বর্ধমান জেলা কমিউনিস্ট আন্দোলনের একটি শক্তিশালী কেন্দ্র। শুধু পশ্চিমবঙ্গেই নয় সর্বভারতীয় ভিত্তিতে যে সকল জেলায় কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রভাব সর্বাপেক্ষা বেশী বলে খ্যাত তার মধ্যে বর্ধমান অন্যতম। সদ্যসমাপ্ত বিধানসভা ও লোকসভা নির্বাচনে এই জেলার সব কয়টি আসনেই বামপন্থী প্রার্থীরা জয়লাভ করেছেন। এই জয়লাভের পশ্চাতে মূল শক্তি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)। ১৯৮৭, ১৯৮৯ এবং ১৯৯১ সালের উপর্যুপরি তিনটি নির্বাচনেই এই জেলায় বামপন্থীরা পঞ্চাশ শতাংশের বেশী জনসমর্থন পেয়েছে। জেলায় বর্তমানে ভারতের কমিউ-নিস্ট পার্টির সদস্য-সংখ্যা দশ হাজারের বেশী। এই পার্টির পরিচালিত শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র-যুব-মহিলা-মধ্যবিত্ত কর্মচারীদের বিভিন্ন গণ-সংগঠনের মোট সদস্য-সংখ্যা বাইশ লক্ষের কাছাকাছি। জেলার বর্তমান জনসংখ্যা প্রায় ছাপ্পান্ন লক্ষের মতন। এখানে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর চরিত্রও বৈচিত্র্যময়। ধর্ম-বর্ণ-ভাষা-সংস্কৃতি ইত্যাদির বিচারে ভারতবর্ষের প্রায় সব অংশের মানুষই এই জেলায় খুঁজে পাওয়া যাবে। কমিউনিস্ট পার্টির প্রভাবের মধ্যেও এই বৈচিত্র্য কমবেশী প্রতিফলিত। পার্টির নিজস্ব সংগঠনের অভ্যন্তরে এবং পার্টি নেতৃত্বে পরিচালিত গণ-সংগঠনগুলির সদস্যদের মধ্যেই এই বহুমুখী বৈচিত্র্যের সন্ধান পাওয়া যাবে।

পশ্চিমবাংলা-বিহারের সীমানায় বরাকর-চিত্তরঞ্জন থেকে শুরু করে পূর্ব দিকে হুগলীর সীমানায় অবস্থিত কালনা পর্যন্ত ৭০২৮ বর্গ কিলো-মিটার বিস্তৃত এলাকা নিয়ে এই জেলা। এর একপ্রান্তে কয়লা, বিদ্যুৎ, ভারী ইঞ্জিনিয়ারিং, লোকোমোটিভ প্রভৃতি শিল্প-সমৃদ্ধ দুর্গাপুর-আসানসোল মহকুমা, অন্য অংশে বর্ধমান-কালনা-কাটোয়ার উন্নত কৃষি অঞ্চল। জেলার এই বৈশিষ্ট্যই সংগঠিত শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলন গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। আমাদের জেলার শিল্পের বিকাশের শুরু স্বাধীনতা-পূর্ব কাল হতেই। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই আমাদের দেশে শিল্প বিকাশের হার অপেক্ষাকৃত দ্রুততর হয়। বৃটিশ শাসকগোষ্ঠী পরিস্থিতির চাপে এটা করতে কিছুটা বাধ্য হয়। দেশীয় শিল্পেরও কিছু

বিকাশ হয়। আমাদের জেলাতেও ধীরে ধীরে বিভিন্ন ধরণের শিল্প গড়ে উঠতে থাকে। জেলার আসানসোল-দুর্গাপুর মহকুমায় মাটির নীচে কয়লা, এবং গুরুত্বপূর্ণ রেল ও সড়ক যোগাযোগ শিল্প স্থাপনের অনুকূল পরিবেশ তৈরীতে সাহায্য করে। স্বাধীনতা-পরবর্তী দুই দশকেও এই ধারা অব্যাহত ছিল। কৃষিক্ষেত্রে এই জেলায় সেচ-ব্যবস্থা গড়ে ওঠার শুরু বৃটিশ আমলেই। প্রকৃতিগত কারণেই দামোদর ও অজয় নদের অববাহিকায় অবস্থানের কারণে এই জেলার কৃষি-জমির উর্বরতা অপেক্ষাকৃত বেশী। এরই সাথে সেচ-ব্যবস্থার প্রবর্তন কৃষিকে সমগ্র রাজ্যের অর্থনীতিতে এক গুরুত্বপূর্ণ অবস্থায় নিয়ে যেতে সাহায্য করেছে।

বর্ধমান জেলার অর্থনীতির এই বিশিষ্টতা, আধুনিক শ্রমিকশ্রেণীর উদ্ভব ও বিকাশ, কৃষি উৎপাদনের আপেক্ষিক অগ্রগতির পটভূমিতে কৃষক-সমাজের অগ্রসর চেতনা প্রভৃতি এ জেলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসাবে কাজ করেছে।

কিন্তু বাস্তব উপাদানই কমিউনিস্ট আন্দোলন গড়ে ওঠার একমাত্র শর্ত নয়। শ্রেণী-সংগ্রামের অভ্যন্তরে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের চিন্তাধারাকে বহন করে নিয়ে যেতে হয়। শ্রেণী-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যে অগ্রসর বাহিনী তৈরি হয় তাদের মধ্যে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের চিন্তাধারাকে প্রসারিত করা এবং এই সংগ্রামগুলিকে সেই লক্ষ্যাভিমুখে পরিচালিত করার মধ্য দিয়েই কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিকাশ সম্ভব। আমাদের দেশে কমিউনিস্ট ভাবধারার অনুপ্রবেশ ঘটে বর্তমান শতাব্দীর তৃতীয় দশকে। এই দশকের গোড়াতেই কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হয়, স্বদেশে নয়, বিদেশে। দেশের মুক্তির সংগ্রামে নিয়োজিত তরুণদের একাংশের মধ্যে রুশ বিপ্লবের বার্তা চাঞ্চল্য জাগায়। বিপ্লবের মর্মবস্তু অনুধাবনের ঔৎসুক্য এঁদের মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রতি আকৃষ্ট করে তোলে। অন্যদিকে ঐ সময়ে দেশের অভ্যন্তরে মানুষের জীবনে সংকটও দ্রুত গভীর হতে থাকে। প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধোত্তর সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতির চাপ, ক্রমবর্ধমান নিপীড়ন, একদিকে যেমন সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী মানসিকতাকে তীব্র করে তোলে, অন্যদিকে বিভিন্ন শিল্পে সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলনেরও প্রসার ঘটতে থাকে। বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের ভাবধারার অনুপ্রবেশ ও বিস্তারের পটভূমি তৈরি হয়। কিন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ গোড়া থেকেই কমিউনিস্ট আন্দোলনকে অঙ্কুরেই খতম করার জন্য সব ধরণের আক্রমণ নামিয়ে আনে। এই প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করে ব্যাপক অংশের মধ্যে এই ভাবধারা প্রসারের

সুযোগ ছিল খুবই সীমিত। এতদ্‌সত্ত্বেও জাতীয় আন্দোলনের অভ্যন্তরেই এই ধারা ক্রমেই শক্তি সঞ্চয় করতে থাকে। তিরিশের দশকে দেশের বিভিন্ন প্রান্তেই তা ছড়িয়ে পড়ে। আমাদের জেলাতেও এই সময় থেকেই কমিউনিস্ট আন্দোলন গড়ে ওঠার সূচনা।

দেশের ক্রমবর্ধমান সঙ্কটের পটভূমিতে শ্রেণী-বিরোধও অনিবার্য-ভাবেই বাড়তে থাকে। কিন্তু আমাদের দেশে শ্রমিক-কৃষকের ওপর অর্থ-নৈতিক ও সামাজিক নিপীড়ন-বিরোধী আন্দোলন থেকে স্বাধীনতা আন্দোলনকে সব সময়েই বিচ্ছিন্ন করে রাখার ক্ষেত্রে জাতীয় কংগ্রেসের তৎকালীন সংখ্যাগরিষ্ঠ নেতৃত্বের সযত্ন প্রচেষ্টা কারোরই অজানা নয়। স্বাধীনতা আন্দোলনের ধারার মধ্যে থেকে কমিউনিস্টরা এ দৃষ্টিভঙ্গীর বিরুদ্ধে নিরন্তর সংগ্রাম করে গেছেন। আমাদের জেলায় সেদিন যাঁরা বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের ভাবধারায় ক্রমেই উদ্বুদ্ধ হচ্ছিলেন তাঁরা ছিলেন তৎকালীন সময়ে আমাদের জেলার স্বাধীনতা আন্দোলনের মূলস্রোতের অগ্রগামী সেনানী। এই সংগ্রামের মূল ধারার সঙ্গে নিজেদের ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত রেখে এরই মধ্যে প্রথম পর্বে কৃষক এবং পরবর্তীকালে শ্রমিক-সংগ্রাম সংগঠিত করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তিরিশের দশকের গোড়াতেই গড়ে ওঠে কৃষক সমিতি। পরবর্তী সময়ে শ্রমিক সংগঠনও গড়ে ওঠে। তিরিশ ও চল্লিশের দশক জুড়ে সারা দেশে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী যে সংগ্রাম গড়ে ওঠে তার প্রভাব বর্ধমান জেলাকে আন্দোলিত করে কিন্তু এরই সাথে সাথে ঐ একই সময়ে এই জেলার বিস্তীর্ণ শিল্পাঞ্চল ও কৃষকাঞ্চলে গড়ে ওঠে শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলন। জেলার ক্যানেল কর আন্দোলন এবং প্রায় সমসাময়িক রাণীগঞ্জ কাগজকলের লড়াই এ রাজ্যের শ্রমিক আন্দোলনে বিশিষ্ট স্থান নেয়। এর ফলে জেলায় সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রাম বিশেষ মাত্রা পায়। শুধু তাই নয়, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনের শ্রেষ্ঠ সেনানীদেরকেই জেলার শ্রমিক ও কৃষক সমাজ তাদের দৈনন্দিন সংগ্রামে পাশে পায় নেতৃত্বের ভূমিকায়। শুধু তাই নয়, দুর্ভিক্ষ মহামারী, বন্যা প্রভৃতি প্রতিটি প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলায় জনগণের পাশে যাঁরা দাঁড়িয়েছিলেন, জেলার গণ-আন্দোলন এবং ব্রিটিশ-বিরোধী সংগ্রামে তাঁরাই ছিলেন সামনের সারির যোদ্ধা। তাই এই জেলার গণ-সংগ্রামের বিকাশের কোন পর্যায়েই কমিউনিস্টরা জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়নি। জনগণও কখনো সে কারণে এদের পরিত্যাগ করেনি। সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলন এবং শ্রমজীবী জনগণের দৈনন্দিন রুটিরুজির সংগ্রামের মিলিত

ধারার মধ্য দিয়ে এক প্রসারিত গণভিত্তির ওপরে জেলার কমিউনিস্ট আন্দোলন গড়ে উঠতে থাকে। স্বাধীনতা আন্দোলনের সর্বাপেক্ষা গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার নিয়েই স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে এই জেলায় কমিউনিস্ট পার্টির যাত্রা শুরু হয়।

অগণিত শ্রমজীবী মানুষের শ্রদ্ধা ভালোবাসা এবং শোষণমুক্তির আকাঙ্ক্ষার পরিমণ্ডলে স্বাধীনোত্তরকালেও এই জেলায় গণ-সংগ্রাম বিকশিত হতে শুরু করে। পঞ্চাশ-ষাট-সত্তর দশক জুড়ে সারা দেশে এবং এই রাজ্যে যে আন্দোলন-সংগ্রাম গড়ে ওঠে তার শীর্ষ ভূমিকায় থেকেছে কমিউ-নিস্টরা। মত ও পথ নিয়ে কমিউনিস্ট পার্টির অভ্যন্তরে যে বিতর্ক শুরু হয়, তাতে বর্ধমান জেলায় নেতৃত্বের প্রায় সমগ্র অংশ শ্রেণী-সমঝোতার নীতির বিরোধিতায় এবং বিপ্লবী মতাদর্শ রক্ষায় এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। পার্টি বিভক্ত হয়ে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) গঠিত হয় ষাটের দশকে। জেলায় কমিউনিস্ট আন্দোলন এই বিভাগের কারণে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি নেতৃত্বের মধ্যে মতাদর্শগত ঐক্যের কারণে। জনগণের মধ্যেও এর ইতিবাচক প্রভাব পড়ে। ষাটের দশকে দুর্গাপুর ইস্পাত শ্রমিকদের লড়াই, খাদ্য আন্দোলন এবং এই দশকের শেষ ভাগে যুক্তফ্রণ্ট সরকারকে সামনে রেখে জমির লড়াইয়ে যে উন্মাদনা সৃষ্টি হয় বর্ধমান জেলা সেখানেও অন্যতম শক্তিশালী আন্দোলনের কেন্দ্র হিসাবে কাজ করেছে। তেমনি আবার ৭০ দশকে আধা-ফ্যাসিবাদী সন্ত্রাসের মোকাবিলা, অর্জিত অধিকার রক্ষার প্রশ্নে এই জেলার কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা, আত্মত্যাগ জনমনে গভীর প্রভাব সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছে।

আজ এই জেলার কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র প্রভাব এবং তার কারণ অনুসন্ধান করতে হলে আমাদের এই সমগ্র সময়ের অসংখ্য ছোট-বড় সংগ্রামের ঘটনাবলী বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে যেতে হবে। কমিউনিস্ট আন্দোলনের উদ্ভব ও বিকাশের সঠিক ধারণা তৈরীতে এ সকল অসংখ্য ছোট-বড় সংগ্রামের গুরুত্ব অপরিসীম। কিন্তু একে ধারাবাহিকভাবে লিপিবদ্ধ ও বিশ্লেষণের কোন প্রচেস্টা এতাবৎকাল হয়নি। শ্রদ্ধেয় কমরেড সৈয়দ শাহেদুল্লাহ্‌র বর্তমান গ্রন্থটি সেই প্রচেষ্টার একটি উল্লেখযোগ্য পরিণতি। জেলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রথম চার দশকের সমগ্র সংগ্রামের উত্থান-পতনের প্রতিটি পর্বের সঙ্গে যাঁদের নাড়ীর যোগাযোগ, প্রয়াত কমরেড

সৈয়দ শাহেদুল্লাহ্—আমাদের সকলের প্রিয় মটরদা ছিলেন তাঁদেরই অন্যতম একজন। ১৯৩৫ সালে আমাদের পার্টির প্রথম জেলা কমিটির তিনিই ছিলেন প্রথম সম্পাদক। তাঁর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য, অসাধারণ স্মৃতিশক্তি, প্রতিটি ঘটনার গভীর বিশ্লেষণী ক্ষমতা আমাদের কাছে ছিল অপার বিস্ময়ের। দেশী-বিদেশী সাহিত্য, অর্থনীতি, দর্শন, ইতিহাস, বিজ্ঞান প্রভৃতি এমন কোন বিষয় নেই যেখানে তিনি অবাধে এবং অক্লেশে বিচরণ করতে না পারতেন।

আমরা জেলা কমিটির পক্ষ হতে তাঁকে অনুরোধ করেছিলাম আমাদের জেলার কমিউনিস্ট পার্টির ও আন্দোলনের অতীতের ওপর লেখার জন্য। যাঁরা ব্যক্তিগতভাবে এ আন্দোলন-সংগ্রাম গড়ে তোলার কাজে নিযুক্ত ছিলেন তাঁদের বেশীর ভাগই কালের অনিবার্যতায় প্রয়াত হয়েছেন। শ্রদ্ধেয় মটরদাও আজ আমাদের মধ্যে নেই। কিন্তু তিনি আমাদের অনুরোধ রক্ষা করেছেন। তিনি অনেকদিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন। চোখে দেখা এবং কানে শোনার খুবই অসুবিধা হচ্ছিল। এতদ্‌সত্ত্বেও সমস্ত অসুস্থতা উপেক্ষা করে তিনি বর্ধমানে এসেছেন এবং এ কাজ করেছেন। এ কাজে তাঁর নিষ্ঠা ছিল অসাধারণ। অতীতের যাঁরা আজও বেঁচে আছেন —তাঁদের সঙ্গে দেখা করা, নিজের স্মৃতির সঙ্গে ঘটনাকে মিলিয়ে নেওয়া, তথ্যকে নিখুঁত করার জন্য পুরান পত্রিকার অনুসন্ধান প্রভৃতি কাজে তিনি অক্লান্ত প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। প্রতিটি অংশ বারবার পড়েছেন, প্রয়োজনীয় সংশোধন করেছেন। কিন্তু সর্বাপেক্ষা দুঃখের যে এই বইয়ের প্রকাশ তিনি দেখে যেতে পারলেন না। তিনি বেঁচে থাকলে এই ভূমিকা আমার লেখার প্রয়োজন হ'ত না। কিন্তু তাঁর অবর্তমানে আমাকে এই দায়িত্ব নিতে হয়েছে—যে দায়িত্ব পালনের যোগ্য আমি নই।

আমাদের জেলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের ওপর এটাই বোধকরি প্রথম গ্রন্থ। ইতিমধ্যে অবশ্য এ নিয়ে কিছু গবেষণামূলক কাজ বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে শুরু হয়েছে, যদিও গ্রন্থাকারে তা এখনও প্রকাশিত হয়নি। এই গ্রন্থের সময়সীমা ১৯৬৪ সালে কমিউনিস্ট পার্টি বিভাজনের কাল পর্যন্ত। পরবর্তী সময়কালের ঘটনাবলীর এখানে উল্লেখ নাই। বর্তমান গ্রন্থকে ইতিহাস বলা যুক্তিসঙ্গত হবে না। এই গ্রন্থের একটি সীমাবদ্ধতার বিষয়ও উল্লেখ থাকা প্রয়োজন। ঘটনার বিবরণে জেলার কৃষকাঞ্চল যতটা স্থান পেয়েছে—শিল্পাঞ্চল ততটা পায়নি। এর অন্যতম কারণ কমরেড শাহেদুল্লাহ্-র কর্মক্ষেত্র মূলতঃ জেলার কৃষকাঞ্চল

ঘিরেই ছিল। ভবিষ্যতে যাঁরা ইতিহাস রচনায় ব্রতী হবেন অথবা এই জেলার বা রাজ্যের কমিউনিস্ট আন্দোলন নিয়ে গবেষণা করবেন তাঁদের পক্ষে এই গ্রন্থ যে অমূল্য সম্পদ বলে বিবেচিত হবে এ বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নাই। এই গ্রন্থের বিষয়বস্তুর স্বপক্ষে একটি বিস্তৃত পরিশিষ্ট. বহু দুষ্প্রাপ্য ফটোগ্রাফ ও একটি নাম-নির্দেশিকা সংযোজন করা হয়েছে। আগ্রহী পাঠক ও গবেষকদের তা সাহায্য করবে বলে আমার ধারণা। কমিউনিস্ট আন্দোলনের কর্মীদের কাছে এই বইয়ের গুরুত্ব অপরিসীম। এই জেলায় কমিউনিস্ট আন্দোলনকে জানা ও বোঝাই শুধু নয়, আগামীদিনে একে আরো শক্তিশালী করার কাজে এই বই এক অন্যতম হাতিয়ার হবে বলেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

বইটি প্রকাশনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে নতুন চিঠি। এই প্রকাশনার সকল কর্মীদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এটি এত দ্রুততার সাথে পাঠকদের হাতে তুলে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে। এক্ষেত্রে বিশেষ ধন্যবাদ জানাতে হয় কমরেড জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্যকে, যিনি পার্টি কর্তৃক অন্যান্য গুরু দায়িত্ব পালনের সাথে সাথে অত্যন্ত যত্ন নিয়ে বইটি সম্পাদনার কাজ করেছেন। আমার আশা পাঠকের দরবারে বইটি সানন্দে গৃহীত হবে।

নিরুপম সেন

বর্ধমান — সম্পাদক, বর্ধমান জেলা কমিটি

২০-৮-৯১ — ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)

সূচীপত্র

পরিশিষ্ট

মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ

ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত

বঙ্কিম মুখার্জী

সরোজ মুখার্জী

আবদুল্লাহ্‌ রসুল

বিনয় চৌধুরী

বিজয় পাল

হরেকৃষ্ণ কোঙার (যৌবনে)

হরেকৃষ্ণ কোঙার

সুবোধ চৌধুরী

শিবশঙ্কর চৌধুরী

দাশরথি চৌধুরী

হেলারাম চট্টোপাধ্যায়

বিপদবারণ রায়

শিবপ্রসাদ দত্ত (আলু)

তারাপদ মোদক

জগন্নাথ সেন
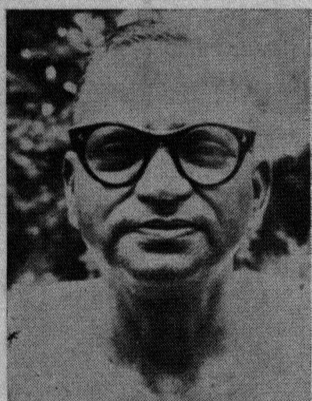
ভুজঙ্গভূষণ সেন

নিত্যানন্দ চৌধুরী

মহানন্দ খাঁ

শচীনন্দন অধিকারী

সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রভাত কুণ্ডু
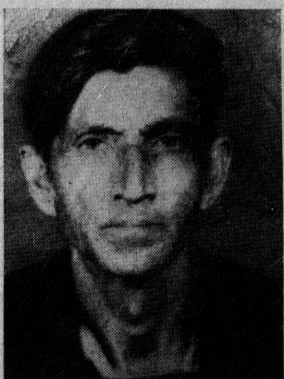
পাঁচু গুহ
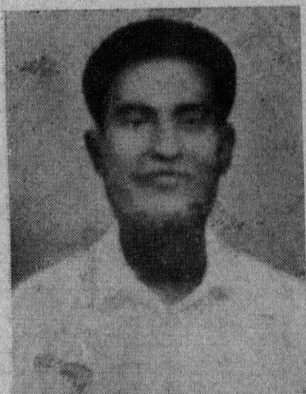
সুমথ চক্রবর্তী

ডাঃ গঙ্গানারায়ণ হালদার
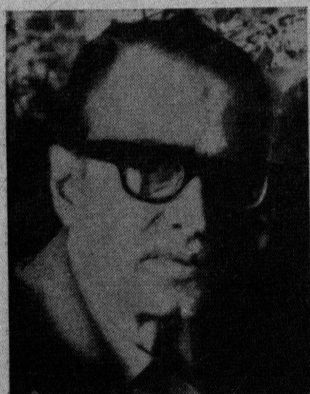
শান্তব্রত চট্টোপাধ্যায়

চন্দ্রশেখর কোঙার

সন্তোষ মণ্ডল

শম্ভু কোঙার
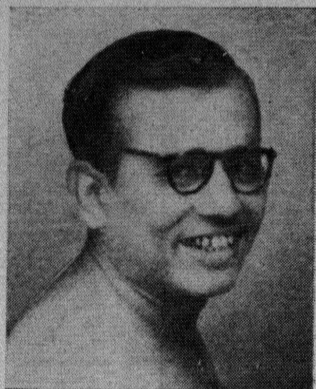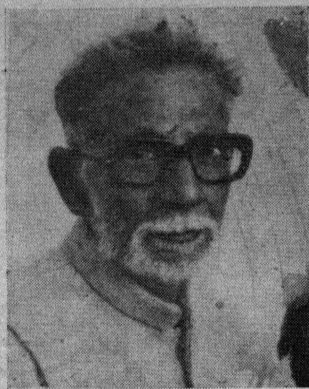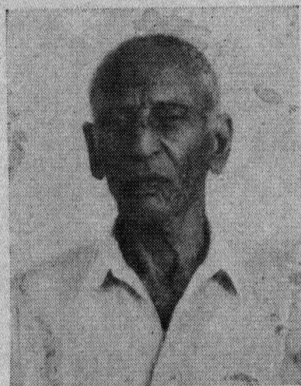
কমল কোঙার

কৃষক আন্দোলনের প্রবীণ নেতাদের অভিনন্দন জানাচ্ছেন
বিনয় কোঙার

বিভা কোঙার
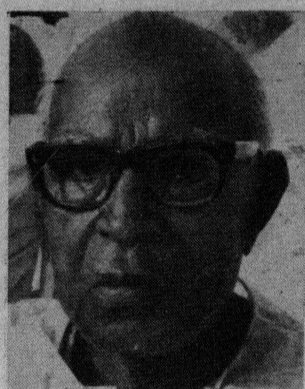
মুকুন্দমাধব সামন্ত
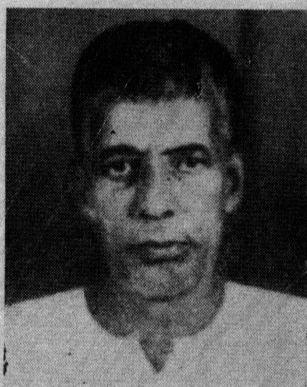
ভোলানাথ কোঙার
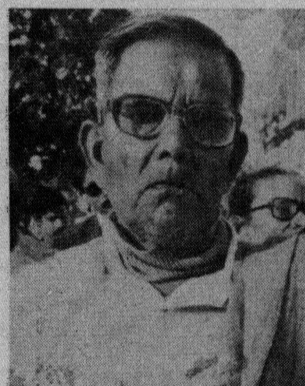
নারায়ণ রায়
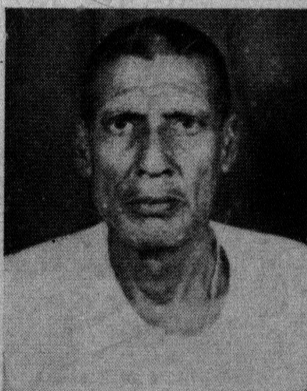
তিনকড়ি কোঙার
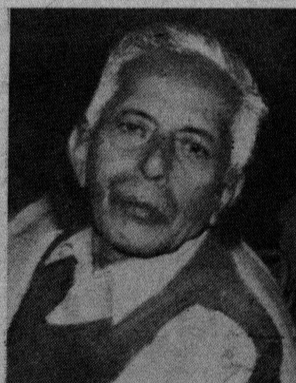
সুশীল দত্ত
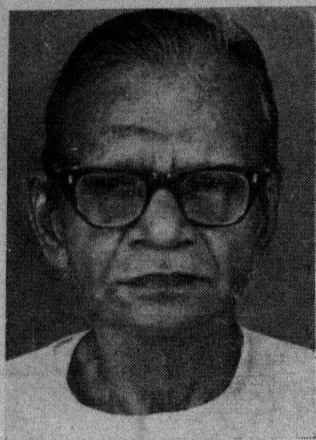
গোপীকৃষ্ণ রায়

ডাঃ অমরেশ রায়

গোপেশ্বর সিংহ

মোক্তাদির

গণেশ দাস

বনোয়ারী ঘোষ

অজিত সেন
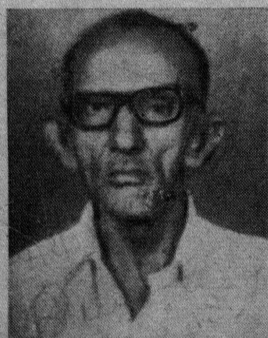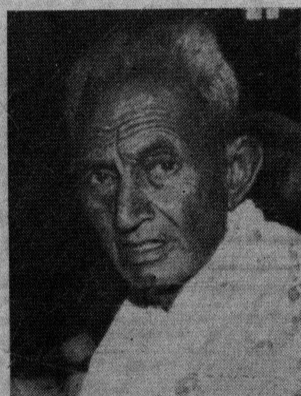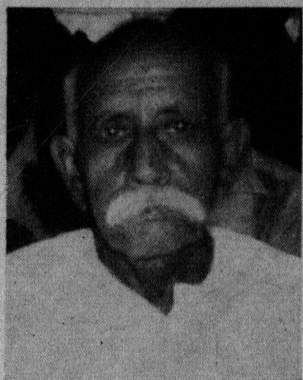
ক্ষুদিরাম মাজি

ধর্মদাস মিশ্র

গঙ্গাধর চক্রবর্তী

'বালক'
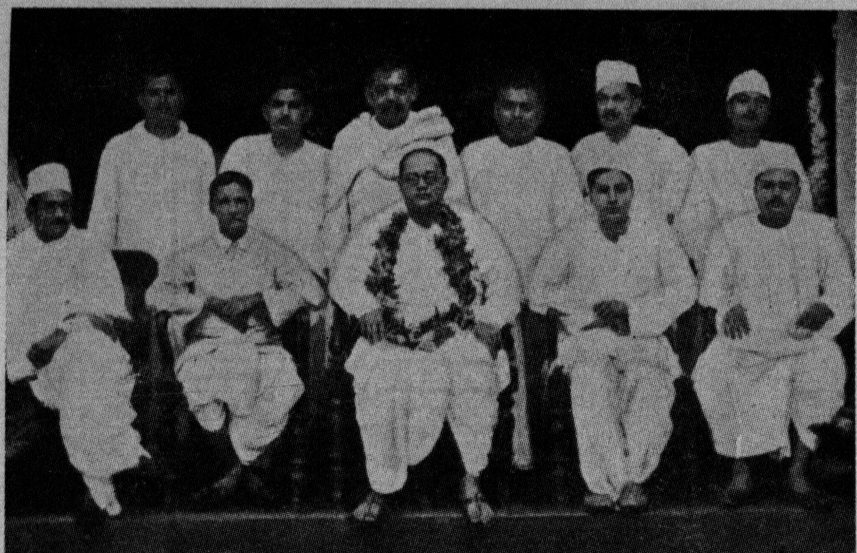
২৮ মে, ১৯৩৮। বর্ধমান পুরসভার সদস্যদের সঙ্গে রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র বসু।
উপবিষ্ট (বাম থেকে)—মহম্মদ আজম, গিরীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, সুভাষচন্দ্র বসু, প্রণবেশ্বর সরকার, ডাঃ রুদ্রনাথ ঘোষ। দণ্ডায়মান (ডান থেকে)—ডাঃ শক্তিপদ পাল, বিনোদীলাল ঘোষ, সুশীলকুমার সেন, রাজকৃষ্ণ দত্ত।
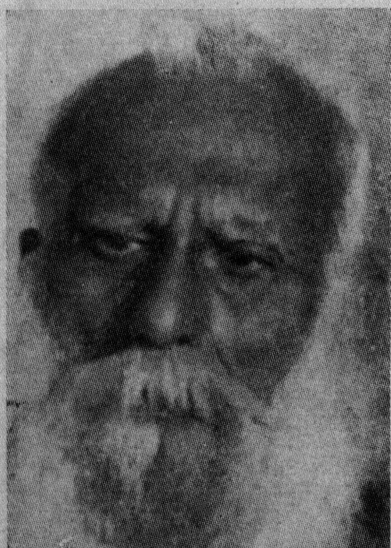
জিতেন্দ্রনাথ মিত্র
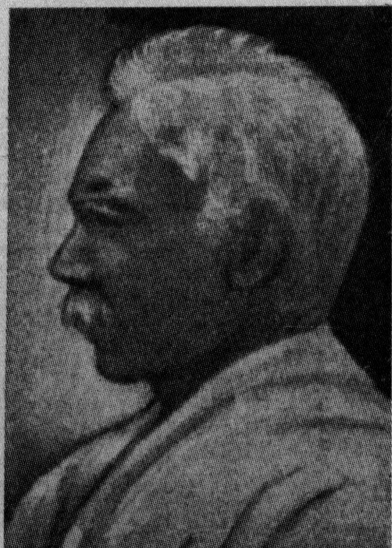
যাদবেন্দ্রনাথ পাঁজা
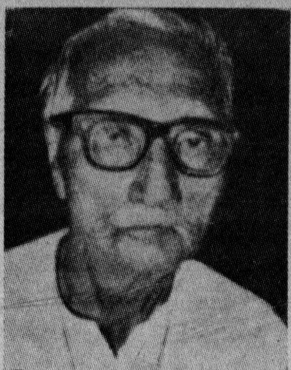
ফকিরচন্দ্র রায়

বিজয়কুমার ভট্টাচার্য

দাশরথি তা
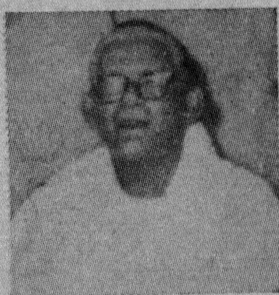
শৈলেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
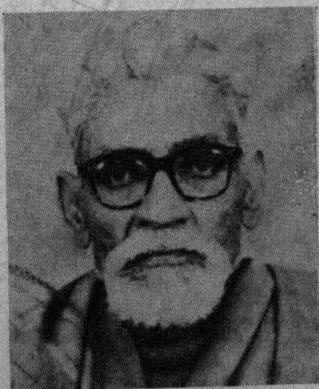
আবুল হায়াত

মথুরানাথ ঘোষ

ডাঃ চন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায়
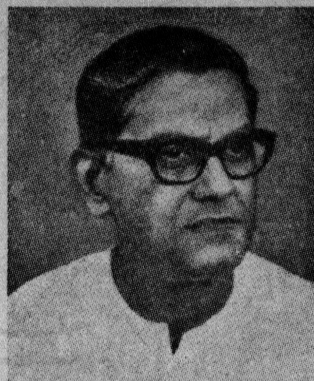
কৃষ্ণচন্দ্র হালদার

প্রণবেশ্বর সরকার

সন্তোষকুমার বসু

বিজয়চাঁদ মহাতাব

উদয়চাঁদ মহাতাব
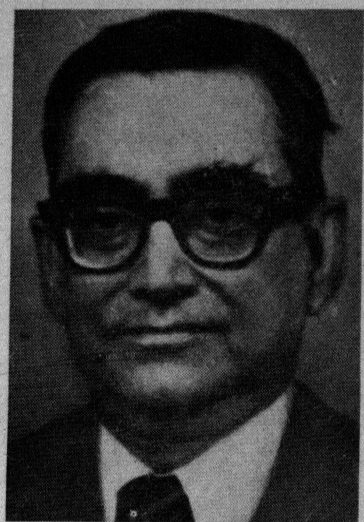
মনসুর হবিবুল্লাহ্
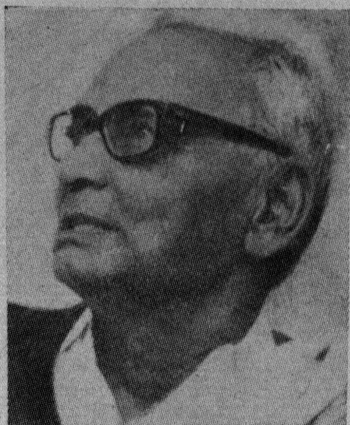
আমোদবিহারী বসু
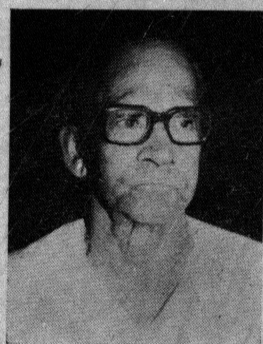
শশাঙ্কশেখর চট্টোপাধ্যায়
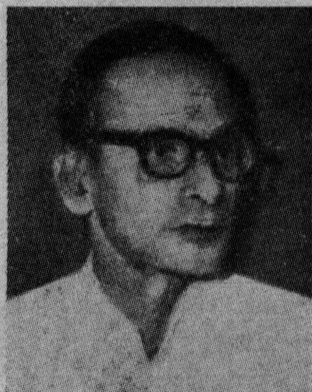
সুশীল ভট্টাচার্য
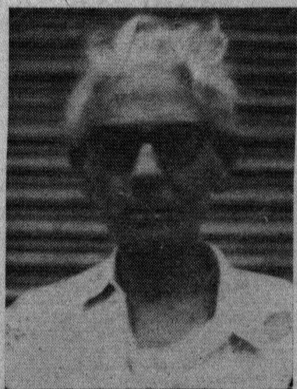
বিশ্বনাথ সেন
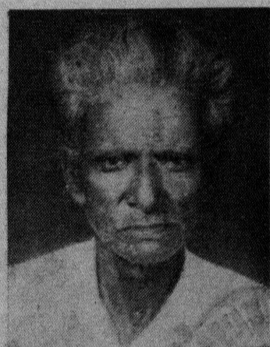
শেখ গুলু
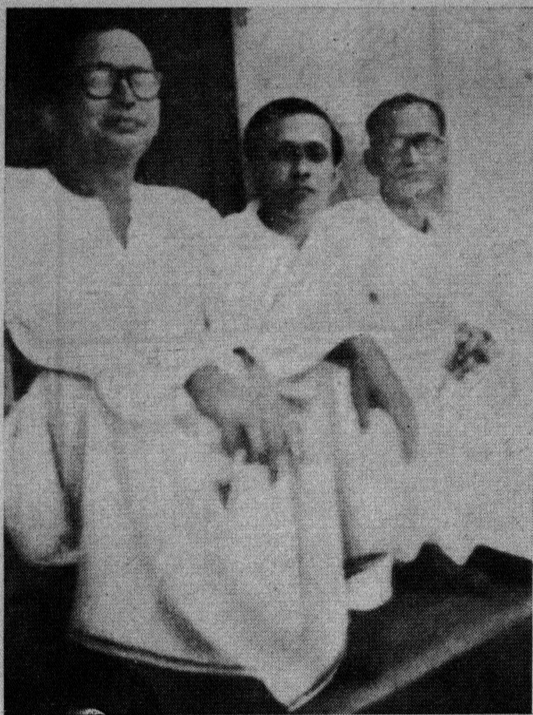
সৈয়দ শাহেদুল্লাহ্‌, জ্যোতি বসু ও বিনয় চৌধুরী
(বর্ধমানের পার্কাস রোডে হরেকৃষ্ণ কোঙারের তোলা ছবি)

সৈয়দ শাহেদুল্লাহ্‌ (যৌবনে)

রাবিয়া শাহেদুল্লাহ্‌

সৈয়দ শাহেদুল্লাহ্

বর্ধমান জেলার মানচিত্র
১ সেন্টিমিটার = ৩·৭ কিলোমিটার
মহকুমা সদর
থানা সদর
স্থান নাম
প্রাগৈতিহাসিক প্রত্নস্থল
প্রসিদ্ধ দেবায়তন
রেল সেতু
সড়ক সেতু
বীরভূম
বর্ধমান
কাটোয়া
আসানসোল
রাণীগঞ্জ
দুর্গাপুর
পুরুলিয়া
হুগলী

পশ্চাৎপট
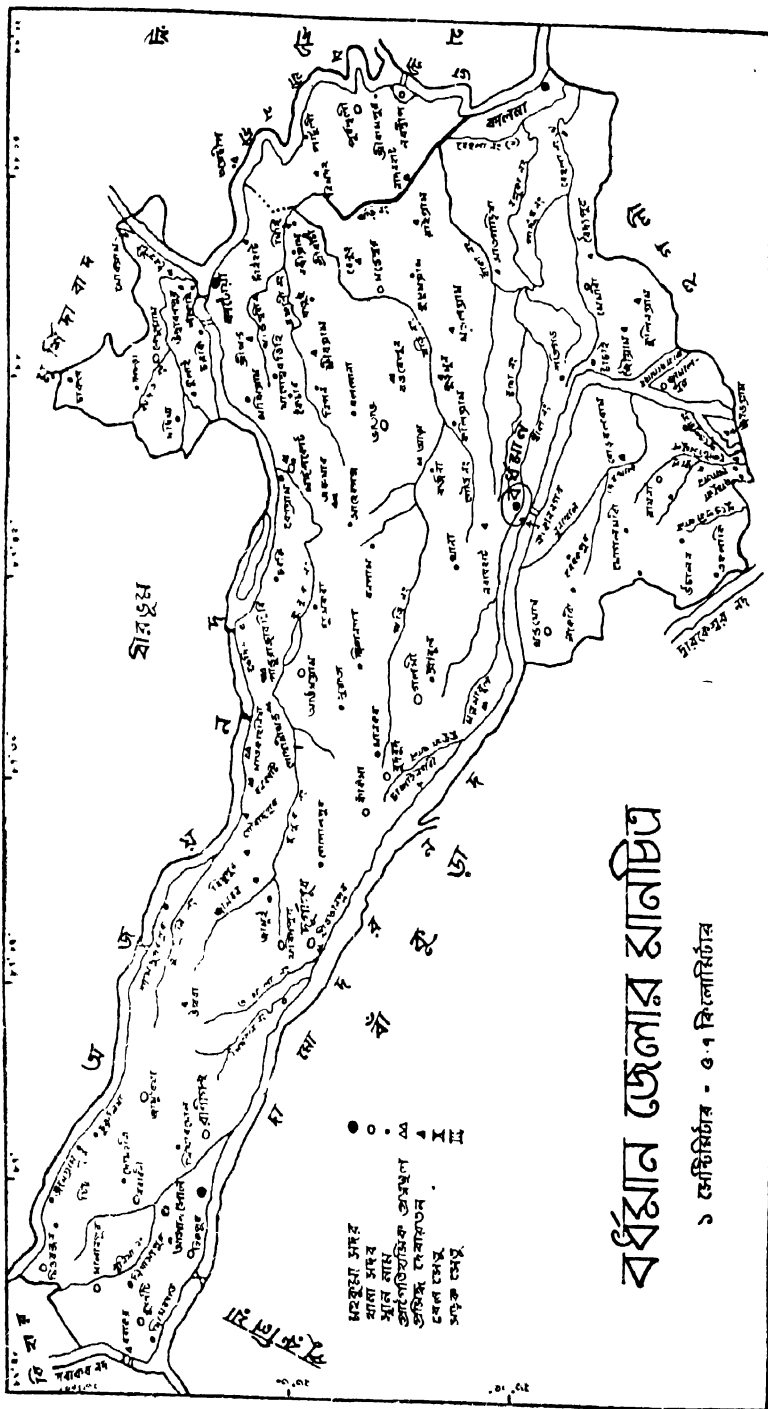
১৯২৬ সালে বাজেট সেসন্-এর পর বাংলার লেজিস্লেটিভ কাউন্সিল্ ডিজল্ভ্ড্ হয়ে গেল। কিন্তু অধিবেশন শেষ হবার আগে দু'টি প্রস্তাব গৃহীত হল। একটি প্রস্তাব অধ্যাপক জীতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়-এর। তাঁর প্রস্তাব ছিল, প্রজাস্বার্থের অনুকূলে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন সংশোধন করতে হবে এবং প্রজার স্বার্থের সম্প্রসারণ ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। দ্বিতীয় প্রস্তাব জনাব রজবউদ্দিন তরফদারের। এই প্রস্তাবের দাবী ছিল, বাঙলার সর্বত্র বিনা বেতনে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। আমার চেতনা এর পূর্ব থেকেই এই দুই প্রস্তাবের ঘোষিত দাবীর অনুকূলে ছিল। এখানে এই 'আমি'টার কিছু পরিচয় প্রয়োজন হয়ে পড়ছে।

আমার জন্ম পুরোপুরিই এক রাজনৈতিক ঘরে। কিন্তু সে রাজনীতি বিপ্লবের নয়, সন্ত্রাসবাদেরও নয়। অবশ্য ইংরেজের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার কামনায় উদ্দীপিত, কিন্তু তার সামনে মডারেট্ কর্মপন্থা ছাড়া অন্য কোন পন্থার আলোড়ন ছিল না। বাড়ির যিনি সর্বপ্রধান, আমার দাদামশাই, তিনি ছিলেন স্বদেশী তথা বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম বিশিষ্ট নেতা। ঐ আন্দোলনের সময় এবং তার পরেও অনেকদিন তিনি ছিলেন বাঙলাদেশের কংগ্রেসের শীর্ষ নেতাদের মধ্যে একজন। এইরূপ ভূমিকায় বর্ধমানে তাঁর জনপ্রিয়তা খুব বেশী ছিল। হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই নিকট তিনি ছিলেন প্রিয়। বিশেষ করে মুসলমানের মধ্যে তিনি ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। মডারেট্ যুগে আর কিছু না হোক ইংরেজ-শাসনের বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ ও চার্জশীট বেশ নির্দিষ্ট করে তুলে ধরা হয়েছিল। আমি বাল্যকাল থেকেই দেশের সাহিত্য, অর্থনীতি ও রাজনীতির চর্চায় আকৃষ্ট। বাড়ীতেই তার যথেষ্ট খোরাক ছিল। বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়ারও অনেক মানুষ প্রায়ই বাড়িতে আনাগোনা করতেন। প্রাদেশিক

স্তরেরও বিভিন্ন নেতা ও কর্মী বাড়িতে আসতেন। আমার জন্মের পূর্বেই স্বদেশী আন্দোলনের সময় ব্যারিস্টার আব্দুর রসুল, সুরেন বাবু, বিপিন পাল প্রমুখ নেতারা বাড়িতে পদধূলি দিয়েছেন বলে শুনতাম। কিন্তু সবচেয়ে যেটা প্রধান কথা, নানান প্রগতিশীল ধ্যানধারণা বাড়িতে নিরন্তর প্রবেশ করতো, বিতর্কের ঢেউ উঠতো এবং বাড়ির আকাশে বাতাসে তা যেন ঘুরে বেড়াতো।

ধর্মের আচার ইত্যাদি সবই ছিল, কিন্তু ধর্মীয় আন্দোলন আমাদের বাড়িতে তখন ছিল না। নিকট-আত্মীয় এক জ্যাঠামশাই ওহাবী হয়েছিলেন। আত্মীয়স্বজন পরিবারের এক অংশকে নিয়ে তিনি হিজরৎ করে মদিনায় যান এবং সেখানেই বসবাস করেন। কিন্তু বাকী আত্মীয়-স্বজনকে তাঁর চিন্তাধারা বিশেষ প্রভাবিত করতে পারেনি। বস্তুতঃ, এমন কি আচারেও বাড়ির কর্তাদের মধ্যে আচার পালনের চেয়ে আচার অ-পালনই বেশী লক্ষণীয় ছিল। মৌলভী, হাফেজ, শিক্ষক ও অন্তঃপুরের মেয়েরা ছাড়া আর কেউ বিশেষ নিয়ম-কানুন পালন করতো না। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রগতির আবহাওয়ার সঙ্গে রাজনৈতিক আলোড়ন মিলে চেতনায় এসব যেন অবান্তর করে দিয়েছিল। বর্ধমান শহরের নামকরা হিন্দু নেতারাও আসতেন। প্রচলিত আচার ইত্যাদিতে তাঁদেরও শিথিলতা দেখা দিয়েছিল। অনেকেই আমাদের বাড়ীতে খাওয়া-দাওয়া করতেন—কেউ প্রকাশ্যে কেউ গোপনে। বিশেষ করে অল্পসংখ্যক যাঁরা নিষিদ্ধ মাংস খেতেন, তাঁরা কিছু গোপনীয়তা রাখতেন। কিন্তু গোপনীয়তা যাই রাখুন, তখনকার দিনে হিন্দু-সমাজে এ ধরনের আচরণ ছিল প্রকাণ্ড পরিবর্তন। মডারেট্ যুগের 'নরমপন্থী' রাজনীতির যা-ই সমালোচনা হোক, তার একটা দিকে ধর্মান্ধতামুক্ত আবহাওয়া, জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে মুক্তবুদ্ধির কিছুটা প্রভাব, বড় একটা স্থান গ্রহণ করে নিয়েছিল। বাড়িতে উর্দু, ফারসী, আরবী এবং ধর্মশিক্ষার জন্য যথারীতি মৌলভী নিযুক্ত ছিলেন। তাঁরা তাঁদের চেষ্টার ত্রুটি করেন নি। উল্লিখিত ভাষাগুলি যে অল্পবিস্তর শিখেছি তা তাঁদেরই দয়ায়। কিন্তু ধর্মের 'গিরে'টা সেই বাল্যকালেই ফসকে গিয়েছিল। মৌলভীরা বার বার গাঁট বাঁধবার চেষ্টা করলেও তা খুলে যেত। বাড়িতে কর্তাদের আচার পালনে মনোযোগের অভাব এবং নানান্ রকমের শিথিলতা, বাড়িতে আগত অতিথিদের অনুরূপ আচরণ, আর মনের অগোচরে মুক্ত বুদ্ধির আবহাওয়া—এসবেরই প্রভাব স্থায়ী থাকতো।

এই রকম যখন অবস্থা চলছে, তাতে একটা বড় ঢেউয়ের মত এল 'খেলাফত' আন্দোলন। শুরু হল গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলন। একটা প্রকাণ্ড ধর্মীয় মাদকতা রাজনৈতিক মাদকতার সঙ্গে মিলে বাড়িকে আচ্ছন্ন করল। রাজনৈতিক উদ্দীপনা বেশ তীব্র রূপ নিল। সভা, শোভাযাত্রা ইত্যাদিতে শহর ও গ্রাম সরগরম হয়ে উঠল। আমার বাড়িতেও প্রবল উত্তেজনা অন্তঃপুরের মধ্যেও। যেসব বাড়িতে বাঙলা সাহিত্য ও কাগজপত্র পড়াশুনা চলে, সেসব বাড়ির অন্তঃপুরেও 'স্মার্নায়' কামাল পাশার বাহিনীর অগ্রগতি আলোচিত হচ্ছে। নজরুল ইসলাম এই মানসিক উৎসাহ ও উদ্দীপনার প্রকাশ করেছেন তাঁর প্রসিদ্ধ কবিতায়ঃ "কামাল তুনে কামাল কিয়া ভাই—"। 'খেলাফত' আন্দোলন দেশের অবহিত অংশের দৃষ্টিকে তড়িৎপ্রবাহের মত পশ্চিমে ইরান, আরব থেকে শুরু করে মরক্কো পর্যন্ত প্রসারিত করলো। অন্যদিকে চীনে, ক্যান্টন-সাংহাই-এর দিকেও সে দৃষ্টি এগিয়ে গেল।

এই সময় মুসলমান সমাজের চিন্তাধারার কিছু পরিচয় লিখে রাখা ভাল। এই শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের গোড়া থেকে, 'বল্‌কান্‌' যুদ্ধের সময় থেকেই একটা ধারা তুর্কীর সঙ্গে সহানুভূতিতে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিল। মৌলানা আজাদের নেতৃত্বে মুসলমানদের মধ্যে তীব্র উত্তেজনা সঞ্চারিত হয়েছিল। তাঁর উর্দু পত্রিকা 'আলহিলাল' ও তাঁর অতুলনীয় সাহিত্য-উত্তীর্ণ ভাষার প্রভাবে উর্দুভাষী মুসলমান বিশেষ করে মথিত হয়েছিলেন। বাঙালী মুসলমানও তার থেকে বাদ যাননি। প্রথমত, বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে অনেকেই উর্দু ভাষা অল্পবিস্তর পড়তে-শুনতে জানতেন। দ্বিতীয়ত, বাঙলায় বা ইংরাজীতে মুসলমান-পরিচালিত পত্র-পত্রিকাগুলিতেও মৌলানা আজাদ ও মৌলানা মহম্মদ আলির প্রচারের প্রতিফলন থাকতো। মৌলানা মহম্মদ আলির প্রসিদ্ধ ইংরাজ-বিরোধী পত্রিকা 'কম্‌রেড' ইংরাজী-জানা মহলে বিশেষ অনুপ্রেরণা যোগাতো। এসব ঘটেছে আমাদের জন্মের পূর্বে। কিন্তু বাল্যে এবং কৈশোরে এসব কাহিনী বড়দের কাছে শুনতাম। এর জন্য 'অসহযোগ' আন্দোলনের পূর্বেই মৌলানা আজাদ, মৌলানা মহম্মদ আলি প্রমুখকে একবার কারানিগ্রহ ভোগ করতে হয়েছিল। বলা বাহুল্য, উপরোক্ত ঐতিহ্য অসহযোগ আন্দোলনে প্রবল শক্তি যোগালো। আন্দোলন দ্রুত সমস্ত জনশ্রেণীর মধ্যে পৌঁছে গেল, এমন কি অন্তঃপুরবাসিনীর মধ্যেও সঞ্চারিত হোল। বাড়ি

পাড়ি ছোট ছোট ছেলেদের মধ্যেও উত্তেজনা—আমরাও তার মধ্যে আছি। আন্দোলনের কাজে আমরাও ছোট ছেলেরা তুচ্ছ বিবেচিত হলাম না। ছোট-খাটো কাজে আমাদেরও নেওয়া হতো। প্রমথদা হারমোনিয়াম কাঁধে স্বদেশী গান গাইতেন। আমরা মুষ্টিভিক্ষা ও চাঁদা সংগ্রহের চাদরখানির খুঁট ধরে তাঁর সঙ্গে তাঁর সামনে এগিয়ে যেতাম। মহিলা-বক্তাদের জন্য আমাদের ছোটদের স্বেচ্ছাসেবক হতে হতো। বর্ধমান জেলা খেলাফত সম্মেলনে হামশীরা সাহেবা বক্তৃতা দিতে এলেন। বোরখা পরেই ঘণ্টা দু'তিন ধরে বক্তৃতা দিলেন। আমরা এর স্বেচ্ছাসেবক ছিলাম। খেলাফত কমিটি আয়োজিত খেলাফত ও কংগ্রেসের মিলিত সভায় আমাদের কখনো কখনো গানও গাইতে হ'ত : 'কিসি দিন দেখ্না শুনসান্ মাহ্ফিল জাগ্ ম্যগা দুঙ্গা'। ইংরেজের তল্পিধরাদের উদ্দেশ্য করে গাওয়া হতো— 'খোদাসে মাঙ্গনেবালে বুতো কি মুহতাজি কিউ হো। যো খুদ মহতাজ্ হ্যাঁয় আগিয়ার কে ও হামকো কিয়া দেঙ্গে'। (খোদার নিকট প্রার্থী পুত্তলিকাদের কাছে প্রত্যাশী কেন হও। তারা নিজেরাই তো পরের উপর নির্ভরশীল। তারা আমাদের কি দেবে)। কিন্তু সবার নির্যাস হিসাবে থাকতো—'মুসলমান হ্যাঁ তো আপনা জজবে ইসলামী দেখা দেঙ্গে।' (আমরা যখন মুসলমান আমাদের মুসলমানী জোস্ দেখিয়ে দেব)। গান্ধীজীর উপদেশ, হিন্দু ভালো হিন্দু হও, মুসলমান ভালো মুসলমান হও— তাহলেই সব উদ্ধার হবে। স্বামীজী ও মৌলানাদের বক্তব্যও তাই। সুতরাং তীব্র সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতা ও স্বাধীনতার অনুপ্রেরণা সত্ত্বেও ভিতে এই ধর্মীয় উন্মাদনা ভবিষ্যতের জন্য শঙ্কা বহন করতো।

চৌরিচরার ঘটনার পর গান্ধীজী আন্দোলন প্রত্যাহার করলেন। নেতৃত্ব প্রথম থেকেই কর্মসূচী জোর করে সীমিত রেখেছিলেন। আন্দোলন যখন নিজের শক্তিতে সীমা অতিক্রম করতে চাইল—জোর করে তাঁরা ভাটার টান দিলেন।

রূপ হতে রূপান্তরে প্রবাহমুখী আন্দোলনের প্রবল স্রোতমুখে তাঁদের নির্দেশিত কর্মপন্থা বাধা দিল। আন্দোলনের তরঙ্গ প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিয়েছিল জেলায় জেলায় প্রধান প্রধান কেন্দ্রে কংগ্রেস ও খেলাফত কর্মীদের কর্মকেন্দ্র, রাজনৈতিক অফিস প্রভৃতি। হতাশার সঞ্চার হ'ল এইসব অফিসে অফিসে। বর্ধমান শহরেও খেলাফত অফিসে সেই অবস্থা। কর্মীরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে জিজ্ঞাসা করছেন, অতঃপর? অতঃ কিম্? ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে স্বরাজ আনার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন নেতা মহাত্মা-

গান্ধী। আন্দোলন চড়ার মুখে তিনি দিলেন তাকে স্তব্ধ করার ঘোষণা। বিভ্রান্ত কর্মীদের মুখে ঐ একটি প্রশ্ন, অতঃপর? খদ্দরের থান, চরকা--এগুলো সব নিজেদের ছাড়িয়ে একটা কী যেন অর্থ ধরে চলছিল এতদিন সবারই কাছে। প্রথমে যখন এর আবির্ভাব হয়েছিল তখন এরাই যেন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে শাণিত তরবারি। সত্যি বটে, সে ধার অনেকটা কমে গিয়েছিল। ব্যাপকভাবে যুবক আর জনসাধারণের মধ্যে সে রোমাঞ্চ আর ছিল না। তাই তাঁরা পথ খুঁজছিলেন। কিন্তু তবুও এতদিন তো ওগুলো একটা অবলম্বন ছিল। আজ ইতস্তত ছড়ানো ঐ পদার্থগুলি অলীক অর্থ হারিয়ে যেন প্রকৃত ব্যঙ্গের প্রশ্ন হয়ে উঠছিল। সবাই তখন ভাবিত। যাঁরা স্বরাজ এনে, জজীরাতুল আরবকে 'আরব অন্তরীক্ষে' ইংরাজের স্পর্শমুক্ত করে পুণ্যভূমি 'বায়েতুল' মোকাদ্দাস 'জেরুজালেম' থেকে ইংরাজকে হঠিয়ে তবে ঘরে ফিরবেন ঠিক করেছিলেন, তাঁরা এখন শূন্য হাতে ঘরে ফিরবেন কোন্ মুখে? গ্রামের ও পাড়ার বাস্তববাদী দু'চারজন মানুষ, যাঁরা বিজ্ঞের মত মাথা দুলিয়ে অবজ্ঞার হাসি হেসে ঘরছাড়া এই মত্ত মানুষগুলোকে ব্যঙ্গ করে বলেছিলেন 'অসম্ভব, অসম্ভব, মিথ্যে মরীচিকার পিছনে ছোটা'--এখন তাঁদের দিকে চোখ তুলে তাকাবেন কি করে? কংগ্রেস ও খেলাফতের সময় স্বল্পবিত্ত বা বিত্তহীন ঘরের মেয়েরা অবিশ্বাসী দু'একজনের নিষেধ সত্ত্বেও সামান্য পুঁজি সোনা-চাঁদি দান করে আভরণহীন হয়েছিলেন। গহনার জন্য না হোক, শুধু উক্ত বা অনুক্ত বিদ্রূপের মুখে সেই নিরাভরণাদের সান্ত্বনা আজ কোথায়? যাঁরা স্কুল-কলেজ ছেড়ে, জীবিকার উপায় চাকরি-বাকরি ছেড়ে কপর্দকহীন হয়ে পথে নেমেছিলেন দেশের সর্বোত্তম মঙ্গলের আদর্শে, তাঁদের আজ ভরসা কোথায়? আদর্শের জন্য ও লক্ষ্যের জন্য মানুষ সব ত্যাগ করতে পারে। কিন্তু সব ত্যাগের পর সেই আদর্শ, সেই লক্ষ্য--সবই যদি তার কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়, তা অসহ্য। আমার সেই কম বয়সে, খেলাফত ও কংগ্রেস অফিসে দাঁড়িয়ে কিংবা নিজ বাড়িতে বা অন্যত্র সবারই আলোচনায় বিষন্নতার আবহাওয়া, আমাকেও ছেয়ে ফেলেছিল। সব ভালোভাবে না বুঝলেও মূল প্রশ্ন 'এরপর?' তীক্ষ্ণভাবে এসে আমার ক্ষুদ্র মগজেও আঘাত করেছিল।

একটি ঘটনা এখানে না উল্লেখ করে পারছি না। গান্ধীজীকে গ্রেপ্তার করা হল আন্দোলন প্রত্যাহারের পর--যখন আন্দোলন নেতৃত্বের দুর্বলতায় হৃতবল। বর্ধমানে সেদিন নেতৃত্বের আহ্বানে গান্ধীজীর গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে জোলুষ বের হয়েছিল। জেলার নেতাদের নির্দেশে কিছু

মানুষ রাজবাড়ির উত্তর ফটকে জড়ো হয়েছিলেন। আমরা ক্ষুদ্র মানুষরাও জমায়েতে এসেছিলাম। জেলুষ ওখান থেকে শহরের পূর্বপ্রান্তে এসে শেষ হবে। কিন্তু দু'পা এগোতে গোড়াতেই সঙ্কট দেখা দিল। জোলুষের সামনে লাঠির ডগায় গান্ধীজীর ছবি বেঁধে ফুল দিয়ে সাজিয়ে একজন নিয়ে যাচ্ছিলেন। পতাকার ফেস্টুনের সারির মধ্যে এটাও ছিল। হঠাৎ একাংশের মধ্যে কিছু গুঞ্জন উঠল। মুহূর্তেই এটা স্পষ্ট হল। বোঝাই গেল, মুসলমানদের মধ্যে একাংশ (সবাই নয়) সামনে ঐ রকম প্রতিকৃতি নেওয়ার প্রতিবাদ করলেন। বললেন, আমরা মূর্তিপূজার বিরোধী, এ ছবি নেব কেন ? বিতর্ক শুরু হল। একটা বেশ গোলমাল হবার উপক্রম। খেলাফত কমিটির ইলিয়াস সাহেব আর কংগ্রেসের প্রমথদা —এ'রা ছিলেন পরিচালক। এ'রা চট্ করে একটা সমাধান বার করলেন —বললেন, কংগ্রস ও খেলাফত কমিটির শোভাযাত্রাদু'টোর মধ্যে একটু ব্যবধান রেখে শোভাযাত্রা চলবে। অর্থাৎ কংগ্রেস ও খেলাফতের জোলুষ, এতদিন যা বর্ধমানের রাস্তায় মিলিতভাবে চলছিল, আজ তা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। সেদিন সে বিচ্ছেদ ভালো লাগেনি। ছোট বুকে ব্যথা লেগেছিল। কংগ্রেসের দু'চারজন বোধহয় অস্বস্তিবোধ করছিলেন। একবার এগিয়ে খেলাফতের শোভাযাত্রায় যোগ দিচ্ছিলেন, আবার পিছিয়ে এসে কংগ্রেসের শোভাযাত্রায় যোগ দিচ্ছিলেন। এইটুকু ছোট্ট ঘটনার মধ্যেই যেন পরবর্তী কালের ইতিহাস রচিত হয়ে গেল। এই কারণেই ষাট বছর আগের সেই ঘটনা এবং বর্ধমানের রাস্তার সেই দৃশ্য এখনও আমার মনে রয়ে গেছে।

আন্দোলনের সময় ধর্মের ধ্বজা তুলে ধরায় খাঁটি, ভেজাল, সবরকমের স্বামীজী-মৌলভী-মৌলানার ভীড় হয়েছিল বেশী। সংগ্রামের মধ্যে অনেক সাধারণ মানুষ আন্দোলনে অংশগ্রহণের মাধ্যমে অসাধারণে পরিণত হয়েছিলেন। পথ-অভাবে লক্ষ্য-অভাবে, এ'রা আবার সংসারের সাধারণ পথে বুদবুদের মত মিলিয়ে যাচ্ছিলেন। ধর্মের ধ্বজাধারীরা আন্দোলনের সময় দেবতা হয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁরা এখন ইংরাজের আশীর্বাদে অপদেবতার রূপে দেখা দিতে লাগলেন। সাধারণ মানুষের ঐক্যের আগ্রহ, আন্দোলনে সঞ্চারিত প্রেরণা এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের প্রকাণ্ড ব্যক্তিত্ব বিভেদের শক্তিকে ঠেকিয়ে রাখল। স্বরাজ দলের লক্ষ্য গঠনতান্ত্রিক হলেও তা ছিল ইংরেজের বিরুদ্ধে একটা 'প্রোগ্রাম'। এক হাতে এই, অন্য হাতে তাঁর রচিত প্রসিদ্ধ হিন্দু-মুসলিম প্যাক্ট—এই দু'টির মাধ্যমে তিনি

জীবিতকালে বিভেদ ঠেকিয়ে রাখতে পারলেন। ১৯২৩ সালের নির্বাচনে স্বরাজদল হিন্দু-মুসলিম উভয় আসনেই অধিক সংখ্যায় জিতে এলো।

কিন্তু বিপরীত ধারাও ক্রমোত্তর বাড়ছিল। অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে সঞ্চারিত ধর্মীয় উন্মাদনা এখন হলাহলে পরিণত হচ্ছিল। সাম্প্রদায়িক ব্যবধান দিনের দিন বাড়তে লাগলো। লক্ষ্যহীন কংগ্রেস-কর্মীদের মধ্যেও বেশ বড় ফাট দেখা দিতে লাগলো। দেশবন্ধুর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই ঐক্যের আদর্শ বর্জিত হতে লাগলো এবং কংগ্রেস ঘোষিত ভাবে দেশবন্ধু-রচিত 'হিন্দু-মুসলিম প্যাক্ট' বাতিল করলো। এই প্যাক্ট আর কিছু না হোক ইংরেজের বিভেদের কৌশলকে কিছুটা ঠেকাতে পেরেছিল। এটা বাতিল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই জনগণের মনে প্রতিক্রিয়া হল। যেন ঐক্যের দুর্গে একটা বড় দেওয়াল ধসে গেল।

গো-হত্যা বিরোধিতা এবং মসজিদের সামনে বাজনার বিরোধিতা এই দুইকে উপলক্ষ করে ছোটোখাটো দাঙ্গা-হাঙ্গামা ঘটতে লাগলো। সংবাদপত্রগুলি কুৎসিত সাম্প্রদায়িকতা প্রচার করতে লাগলো। বুকের তীব্র জ্বালার সঙ্গে নজরুল ইসলাম লিখলেন, 'মাতালদের এই ভাঁটিশালায় নটিনী আজ বীণাপাণি'। সাম্প্রদায়িক বিভেদ ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা চূড়ান্ত পর্যায়ে উঠল ১৯২৬ সালে। কু-ফলও দেখা দিল নির্বাচনে। অনেকগুলি আসনে, বিশেষ করে মুসলিম আসনে, স্বরাজদল পরাজিত হোল।

১৯২০ সাল থেকেই আমি নিয়মিত কাগজ পড়ি। কি জানি কেন মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার আগে 'কমিউনিস্টদের' কাজকর্মের সংবাদ নজরে ফসকে গিয়েছিল। বলা বাহুল্য, বাঙলাদেশের সব কিশোরের মতো আমারও মনে সন্ত্রাসবাদের সংবাদ এবং ঐ সংক্রান্ত মামলা ইত্যাদির বিবরণ সম্বন্ধে বেশী আগ্রহ থাকতো। বুর্জোয়া নেতাদের কথা, আলাপ-আলোচনা—এই সবই সংবাদপত্রে প্রধান অংশ থাকতো, এখনও যেমন থাকে। এছাড়া ১৯২৪ সাল থেকেই এই কাগজগুলোতে থাকতো উৎকট সাম্প্রদায়িকতা, খুব অল্পই প্রগতিশীল সংবাদের ছাপ থাকতো। তাছাড়া আমি যে বাড়িতে বা যে সমাজে থাকতাম, বিশ দশকের গোড়ায় বা মাঝামাঝিও সেখানে 'সোস্যালিজম্' 'কমিউনিজম্' এসবের কোন আলোচনা ছিল না। সোস্যালিজম্-এর কিছু উল্লেখ পাঞ্জাবের একটি সাপ্তাহিক ইংরাজী পত্রিকায় পেয়েছিলাম। ইংরাজী সাহিত্যিকদের পুস্তক বা আলোচনায় এরূপ উল্লেখ দেখেছিলাম. কিন্তু কমিউনিজম্-এর খোঁজ-খবর রাখতাম না। প্রথম কমিউনিজম্-এর কিছু পরিচয় পাই ১৯২৭ সালে প্রকাশিত

জহরলাল নেহরুর সোভিয়েত ভ্রমণের পর লেখা একখানি বইয়েতে। কমিউনিজম্ সম্বন্ধে কী কতটুকু তাতে বুঝেছিলাম তা এখন স্মরণ নেই। সোস্যালিজম্-এর আলোচনা অবশ্য পেতাম ইংরাজী সাহিত্যে বার্ণাড শ, ওয়েল্‌স্, রাসেল্ প্রমুখের লেখায়। কিন্তু এসবের রাজনীতির পরিচয় তত গভীর হয়নি।

বাইরের ধর্মীয় অব্‌স্‌কিউরেণ্টিজম্ ও সাম্প্রদায়িক তিক্ততায় মনটা হাঁপিয়ে উঠেছিল। সোস্যালিজম্ ও কমিউনিজম্-এর সামান্য পরিচয় কেমন যেন একটা খোলা হাওয়ার স্বাদ নিয়ে এসেছিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে হোত, এ-তো একটা সুদূরের স্বপ্ন—এতে আমার কী করার আছে! আশু যে প্রশ্নগুলি সামনে এসেছে সেইগুলিতেই মতস্থির করে আলাপ-আলোচনায় তাই প্রকাশ করতে লাগলাম। অনেকেই অতীত ইতিহাসের কথা লিখেছেন, কিন্তু এই সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদের যে ছায়া দেশের উপর পড়েছিল, অন্ধকার নেমে এসেছিল, তার কথা কাউকে উল্লেখ করতে দেখি না। কিন্তু প্রকৃত ইতিহাস যদি লিখতে হয়, তাহলে এই পরিচ্ছেদ এবং নিজেদের সেই সময়কার মনোভাবকে বাদ দেওয়া নীতিগতভাবে সঠিক নয়। এও স্বীকার করতে হবে, যাঁরা আন্তরিক-ভাবেই সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে ছিলেন তাঁদের মধ্যেও ভিন্ন সম্প্রদায়ের বিদ্বেষ-প্রচারকদের বিরুদ্ধে সমালোচনা থাকলেও তা স্ব-সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে কেমন যেন একটু লঘু হয়ে যেত। অন্যদিকে অন্য সম্প্রদায়ের ঐরূপ প্রচারকদের উষ্মাটা একটু বেশী হত। সবচেয়ে বেদনার বিষয়, দেশের জন্যে প্রাণ দিতে প্রস্তুত এমন কিছু মানুষকেও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষে প্রভাবান্বিত হতে দেখেছিলাম। আবার সুখের বিষয়, হিংসা-দ্বেষ বর্জন করে যাঁরা প্রীতি ও ভালবাসার বারতা নিয়ে মানুষের সামনে দাঁড়িয়ে-ছিলেন, তাঁদেরও দেখেছিলাম। এই সময় মুসলমানদের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় ছিলেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত এবং শ্রদ্ধেয় সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত।

এইখানে একটি পত্রিকা আর তার পুণ্যচরিত্র সম্পাদকের নাম উল্লেখ করব। পত্রিকাটির নাম 'দি মুসলমান'। শতাব্দীর গোড়ায় মুসল-মানদের মধ্যে যাঁরা বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের শীর্ষে ছিলেন তাঁদেরই উদ্যোগে পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। স্বয়ং ব্যারিস্টার আব্দুর রসুল এর প্রতিষ্ঠাতা। (বরিশালের সেই প্রসিদ্ধ প্রাদেশিক সম্মেলন যার উপর ম্যাজিস্ট্রেট 'এমারসন্' সাহেবের নির্দেশে লাঠি চালানো হয়, তার নির্বাচিত

সভাপতি ছিলেন ব্যারিস্টার আব্দুর রসুল। পুলিশের এই ঘৃণ্য আক্রমণ হতে নেতাদেরও রেহাই দেওয়া হয়নি। অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে রসুল সাহেবও প্রহৃত হন। পরে তিনি অল্পদিনের মধ্যেই মারা যান)। দি-মুসলমান পত্রিকার প্রথম সম্পাদক হন আমার দাদামশাই (আবুল কাসেম), কিন্তু তিনি পরিচালনা করতে না পারায় এর পরিচালনাভার গ্রহণ করেন মৌলভী মুজিবর রহমান। স্বদেশী আন্দোলনের সমস্ত নেতারাই তাঁকে উৎসাহ দেন এবং তাঁর সহায়ক হন। আর্থিক সম্বল খুবই কম, তবুও ত্রিশ বৎসর এই পত্রিকা চালানোর পর ১৯৩৭ সালে মুসলিম লীগের একটি গ্রুপ জোর করে এর সম্পাদনা দখল করার আগে পর্যন্ত তিনি এর গুরুভার গ্রহণ করেন। সাহসিকতার সঙ্গে একনিষ্ঠভাবে তিনি এই জাতীয়তাবাদী পত্রিকা চালিয়ে যান এবং সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যান। ১৯৩৭ সালে মুসলীম লীগ কর্তৃক এইরূপ ঘৃণ্য আক্রমণের পর আমরা কয়েকজন—রসুল সাহেব, আমি, প্রয়াত মনোরঞ্জন গুহ ও মহম্মদ ইসমাইল—মুসলিম লীগের এই চ্যালেঞ্জের বিরুদ্ধে মৌলভী সাহেবের পাশে দাঁড়াই এবং অবিলম্বে 'কমরেড' নাম দিয়ে এক পত্রিকা বার করি। 'কমরেড' নামকরণ কমিউনিজম্-এর জন্য করা হয়নি। করা হয়েছিল ১৯১২-১৩ সালের 'বলকান ওয়ারের' সময়কার মৌলানা মহম্মদ আলি-সম্পাদিত সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী পত্রিকার 'কমরেড' নামের স্মৃতিতে। এ হল এক পৃথক কাহিনী। পরে কোনো উপলক্ষে এর বিবরণ দেওয়া যাবে। এখানে উল্লেখ্য, প্রয়াত মৌলভী মুজিবর রহমানের সারাজীবনব্যাপী সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম। ১৯৩৮ সালে তাঁর 'প্যারালিসিস্' হয়ে যায়। তার পরেও আমরা চালিয়েছিলাম। যুদ্ধ আরম্ভের পর গভর্নমেণ্ট দশ হাজার টাকা জামিন চাওয়ায় আমরা পত্রিকা বন্ধ করে দিতে বাধ্য হই। ভারতের এবং বাংলার রাজনীতিতে বুর্জোয়া নেতৃত্বের ব্যর্থতার ইতিহাস যাঁরা গবেষণা করতে চান এই পত্রিকায় প্রকাশিত তথ্যাদি ও সংবাদ তাঁদের নিকট এক ঐশ্বর্যের খনি হতে পারে।

পিছনের কথা লিখতে গিয়ে একটু আগে বেড়ে গিয়েছিলাম। আবার পিছনেই ফিরে যাই। ১৯২৭ সালে একটি "ইউনিটি কনফারেন্স্" হয়—প্রথম দিল্লিতে ও পরে সিমলায় অধিবেশন হয়। এর প্রাথমিক কর্মসূচী ঠিক করা হয়েছিল "খাদ্য ও বাদ্যের ঝগড়া"—অর্থাৎ মসজিদের

সামনে বাজনা আর গো-হত্যার ঝগড়ার সমাধান। লোকের প্রত্যাশা ছিল অন্তত এই আপদের সমাধান হলে রাজনৈতিক কর্মসূচীতে ও ইউনিটি কনফারেন্সে কাজকর্ম সম্প্রসারিত হবে। প্রথম বিঘ্ন এল মহাত্মা গান্ধী এবং কংগ্রেস নেতৃত্বের কাছ থেকে। এতে উদ্যোগী হয়েছিলেন প্রধানত 'সেণ্ট্রাল এসেম্ব্লি'র সদস্যরা। গান্ধীজী বললেন. কংগ্রেস এতে যোগ দেবে না। তিনি যা বললেন তার মর্মার্থ দাঁড়াল. হিন্দুমহাসভাকেই হিন্দুর প্রতিনিধি হিসাবে বিবেচনা করতে হবে। কংগ্রেসের মুসলমান সদস্যরা যোগ দিলেন। জিন্না এবং মুসলিম মডারেটরাও থাকলেন, কিন্তু কংগ্রেসের কোনো হিন্দুনেতা যোগ দিলেন না। (ঐ সময়কার সেণ্ট্রাল এসেম্ব্লির মুসলিম সদস্যদের বিবৃতি দ্রষ্টব্য)। যাই হোক, প্রধান কর্মসূচী খাদ্যের ও বাদ্যের বিষয়ের সমাধানের একটা প্রস্তাব বেশ শক্তি অর্জন করেছিল। এই প্রস্তাবটি ছিল এই যে, নাগরিক অধিকারের ভিত্তিতে এর সমাধান হোক। বাদ্যের অধিকারও স্বীকৃত হোক, খাদ্যের অধিকারও স্বীকৃত হোক। মুসলমান বুদ্ধিজীবীদের অনেককেই দেখেছিলাম এই প্রস্তাবের সমর্থন করতে। বলা বাহুল্য, আমি নিজেও এর সমর্থনকারী ছিলাম। মৌলভী মুজিবর রহমান তাঁর পত্রিকার মাধ্যমে এই প্রস্তাবের পক্ষে জোরদার সমর্থন দিলেন। হঠাৎ আচম্বিতে হিন্দুমহাসভার নেতারা ঘোষণা করে দিলেন, পূর্ণ রাজনৈতিক প্রশ্নের সমাধান না হলে কোনোরূপ সামাজিক সমাধানে তারা রাজি নয়। এর অর্থ দাঁড়াল এই যে. রাজনৈতিক সমাধান না হওয়া পর্যন্ত দাঙ্গা-হাঙ্গামা চলতে থাকবে, সে খাদ্য নিয়েই হোক বা বাদ্য নিয়েই হোক।

কিন্তু দেশের জনগণের মধ্যে ঐক্যের প্রবল আগ্রহ কোনো না কোনোমতে প্রতিফলিত হচ্ছিল। জিন্নার ভূমিকা পরে যাই হোক, বিশ দশকের শেষ পর্যন্ত সমঝোতা-বিরোধী ছিল এমন নয়। ১৯২৭ সালে এই রকম সময়ে তিনি এক বিবৃতি দিলেন। তাঁর চোদ্দ দফায় যে দাবি ছিল তার মধ্যে একটি ছিল--মুসলমানদের জন্যে পৃথক নির্বাচনব্যবস্থা বজায় রাখার দাবি। ১৯১১ সালে মর্লে-মিণ্টো রিফর্মসের সময় মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচন-ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। এই ব্যবস্থার দাবি করেছিলেন আগা খাঁ থেকে শুরু করে নবাব খানবাহাদুর ইংরেজের খয়ের-খা'রা। প্রসঙ্গত এইখানে সমস্যাটা আলোচনা করা উচিত, তা না হলে আজকের তরুণ ও কিশোরদের কাছে বিষয়টি পরিষ্কার হবে না। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড রিফর্মস্‌ প্রবর্তিত হয়। এতে প্রস্তাবিত 'বেঙ্গল

লেজিস্‌লেটিভ কাউন্সিল' ও 'সেন্ট্রাল এসেম্ব্লি' ১৯৩৫-এর ভারত গভর্নমেন্ট আইন প্রবর্তিত হবার আগে পর্যন্ত চালু থাকে। এই অবস্থায় বাংলা-দেশের কাউন্সিলের চরিত্রটি কিরূপ ছিল সেটা একটু বোঝা উচিত। মুসলিম সদস্য ছিলেন আটত্রিশ জন। আর হিন্দু সদস্য (জমিদারদের প্রতিনিধিসহ) চুয়াল্লিশ জন। (আমি স্মৃতি থেকে লিখছি। এসব তথ্য সহজেই বিধানসভার রেকর্ড দেখলে পাওয়া যায়। যদি ভুলও হয় বিশেষ তরি-তফাৎ হবে না। কম-বেশী চেহারা একমতোই থাকবে)। এই নিয়েই সেই অতিপরিচিত শতকরা ৫৫%-এর দাবি। ১৯২১ সালের সেন্সাস রিপোর্টে বাংলাদেশে মুসলমান জনসংখ্যা ছিল শতকরা ৫৫ ভাগ। সাম্প্রদায়িক মুসলিম নেতারা রব তুললেন, যারা সংখ্যাগুরু তাদের প্রতিনিধি হবে সংখ্যালঘু এটা চলতে পারে না। এই বিক্ষোভের সঙ্গে মুসলমানদের দিক থেকে শ্রেণী হিসাবে কৃষকের বিক্ষোভও যুক্ত হয়ে গিয়েছিল। কারণ হিন্দু প্রতিনিধিদের মধ্যে প্রায় সকলেই (তা তিনি যে পার্টিরই হন) হয় প্রত্যক্ষভাবে জমিদার (যেমন নদীয়ায় রঞ্জিৎ পালচৌধুরী, ময়মনসিংহের খোদ মহারাজা প্রমুখ) কিংবা জমিদারদের একান্তভাবে সমর্থক (যেমন বর্ধমানের স্বনামখ্যাত উকিল শরৎচন্দ্র বসু ও প্রভাস বসু প্রমুখ)। প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের বিরুদ্ধে ও প্রজাস্বত্বের দাবির বিরুদ্ধে এ'দের বিরতিহীন প্রয়াস সাম্প্রদায়িক বিতর্কের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়।

প্রসঙ্গত এইখানে এটা বুঝে নেওয়া দরকার, জনসংখ্যার হিন্দু-মুসলমান অনুপাতের প্রতিফলিত ছবি না হয়ে কাউন্সিল-সদস্যের অনুপাত বিপরীত রূপের হল কেন? তা না বুঝলে হিন্দু-মুসলমান বুর্জোয়া নেতৃবৃন্দের প্রকৃত চরিত্র বোঝা যাবে না। আসলে ভোটটাই জনসংখ্যার অনুপাতে ছিল না। ভোটের অধিকার সীমিত ছিল তাঁদেরই মধ্যে যাঁরা শহরে বা গ্রামে স্বায়ত্তশাসনের (অর্থাৎ মিউনিসিপ্যালিটিতে বা ইউনিয়ন বোর্ডে) বাৎসরিক ট্যাক্স দিতেন এক টাকা বা এক টাকার উপরে। তখনকার কালে এক টাকা ছিল অতি উচ্চ হার। আজকে মুদ্রাস্ফীতিতে টাকার মূল্য কমে গেছে। তখন ধানের মূল্য ছিল মণকরা তিন টাকা সাড়ে তিন টাকা। (ত্রিশদশকে তা নেমে দু'টাকা চার আনা বা দু'টাকা ছয় আনায় দাঁড়িয়েছিল)। বড় গ্রামে এক টাকা হারে ট্যাক্স দেওয়ার লোক দাঁড়াত ছ'সাত জন। ছোট গ্রামে খুব জোর দু'তিন জন। এমন ছোট গ্রাম দেখেছি যেখানে একটি ভোটও ছিল না অথচ মানুষ হয়তো একশ' ঘর। জোতজমি ইত্যাদিতে সাধারণ অবস্থায় হিন্দুর অবস্থা মুসলমানের

চেয়ে ভাল ছিল। সুতরাং ভোটারের সংখ্যায় তারতম্য সহজেই বোধ্য। এছাড়া ইংরেজদের বিভেদের কৌশল ছিল নির্বাচন-কেন্দ্র গঠনে। জমিদার সভার, চেম্বার অব্‌ কমার্সের ভাল সংখ্যায় প্রতিনিধিত্ব দেওয়া ছিল। এ ক্ষেত্রে যা সহজ সরল হওয়া উচিত ছিল তা হচ্ছে সমস্ত প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার দান। কিন্তু হিন্দু-মুসলমান কোন নেতারাই এ দাবি তোলেন নি। এটা তাঁরা ভাবতেই পারতেন না। সুতরাং তাঁদের নজর শুধু অনুপাতের উপর। হিন্দু জমিদাররা যেভাবে সমাজের শীর্ষে ছিলেন (কংগ্রেসেও তাই ছিলেন), তাঁদের পক্ষে এরকম দাবি তোলা তো সম্ভব নয়। মুসলমান যাঁরা জনসংখ্যার আঙ্গুল দেখিয়ে চাকরি, ক্ষমতা প্রভৃতির ভাগাভাগি চাইতেন, তাঁরা এই কৃষকের দাবিটা তুললেন না কেন? শুধু দাবি উঠল, কাউন্সিলের হিন্দু-মুসলমান সদস্য সংখ্যা হতে হবে জনসংখ্যার অনুপাতে। আনন্দবাজার পত্রিকা প্রভৃতির প্রচারের ডঙ্কায় মনে হোত হিন্দু-জনমত যেন ঐক্যবদ্ধভাবে যৌথ নির্বাচনের পক্ষে। কিন্তু এখন বিড়লার আত্মজীবনী ও অন্যান্য কিছু রেকর্ড প্রকাশিত হওয়ায় জানা যাচ্ছে, দ্বিতীয় রাউণ্ড টেবিলের সময় বা তার প্রাক্কালে হিন্দু-প্রবক্তাদের একটা বড় সোচ্চার অংশ ভিতরে ভিতরে পৃথক নির্বাচন করার জন্য চেষ্টা করছিলেন। তাঁরা বিড়লার মাধ্যমে গান্ধীজীকে যা জানাচ্ছিলেন তার সারমর্ম তাঁর পুস্তকে রেকর্ড করেছেন। তিনি লিখেছেন—অমৃতবাজার পত্রিকা ছিলেন যৌথ নির্বাচনের পক্ষে কিন্তু আনন্দবাজার পত্রিকা চেয়েছেন পৃথক নির্বাচন। নলিনীরঞ্জন সরকার নিজেকে পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের প্রবক্তা বলে ঘোষণা করে জানিয়েছেন, পূর্ববঙ্গের হিন্দুরা চায় পৃথক নির্বাচন। মোটমাট দাঁড়ায় এই, পূর্ববঙ্গের জমিদারি স্বার্থ যৌথ নির্বাচনের প্রস্তাবে এবং তার ফলে সম্মিলিত কৃষক-বিক্ষোভের শঙ্কায় বিভেদ-বিদ্বেষকে বাঁচিয়ে রাখতে চাইছিলেন। মুসলমান প্রতিক্রিয়াশীলরাও চাকরি-বাকরি ভাগ-বাঁটোয়ারার দাবি নিয়ে পৃথক নির্বাচনই চাইছিলেন।

কিন্তু মুসলমান জনমতেরও একটা বড় অংশ যৌথ নির্বাচনের পক্ষে ছিল। দ্বিতীয় রাউণ্ড টেবিল্‌ কন্‌ফারেন্স-এ ফজলুল হক্‌ যৌথ নির্বাচনের পক্ষে থাকেন। ১৯২৭ সালে জিন্না এক বিবৃতিতে ঘোষণা করেন, তিনি তাঁর চোদ্দ দফা দাবি থেকে পৃথক নির্বাচনের দাবি প্রত্যাহার করতে প্রস্তুত আছেন, যদি জনসংখ্যাকে প্রতিফলিত করে যৌথ নির্বাচনে নির্বাচিত সদস্যসংখ্যা বাঙলাদেশে ও পাঞ্জাবে অন্তত শতকরা ৫১ ভাগ রাখা হয়। কংগ্রেস সভাপতি আয়েঙ্গার এবং তুলসী গোস্বামী প্রমুখ

কংগ্রেস নেতারা আলোচনার ভিত্তি হিসাবে একে অভিনন্দন জানান। কিন্তু হিন্দু-মুসলমান উভয় প্রতিক্রিয়াশীলদের উৎকট চিৎকারে এইসব সুস্থ কণ্ঠ রুদ্ধ হল। আনন্দবাজার শুরু করল তার কলুষ উদগার, আর নতুন উত্থিত মুসলমান কিছু নেতা যেমন প্রয়াত সৈয়দ বদরুদ্দজা প্রমুখ জিন্নার উল্লিখিত বিবৃতির বিরুদ্ধে কলকাতার এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত মুসলমান ছাত্রদের নিয়ে হৈ চৈ করে বেড়াতে লাগলেন। তাঁদের বিশ্বাস ছিল, জিন্না বিশ্বাসঘাতকতা করে মুসলমানদের স্বার্থ বিসর্জন দিয়েছেন। অথচ এই ব্যক্তিই পরে হিন্দু-মহাসভার সঙ্গে মিলে রাজনীতিতে বিশেষ অংশগ্রহণ করেন। হিন্দু-মহাসভার সাহায্যে তিনি কর্পোরেশনের মেয়র হয়েছিলেন। ১৯২৭ সালে ঘটনা কি রকম পর্যায়ে পৌঁছেছিল তা জওহরলালকে লিখিত মতিলাল নেহরুর এক চিঠিতে বোঝা যায়। গৌহাটি কংগ্রেস থেকে মতিলাল নেহরু পুত্রকে লেখেন, বাঙলা-দেশে চরমপন্থী দলগুলির নেতৃত্বের জন্যেই সাম্প্রদায়িক সমঝোতা সম্ভব হচ্ছে না। আসল মূল যে বাঙলাদেশের দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত জমিদারি-প্রথা, সেটাই যেন নির্দিষ্টভাবে বেরিয়ে আসছিল।

গোড়াতেই বলেছি, মৌলভী মুজিবর রহমানের সঙ্গে আমার সংস্রব ছিল। ত্রিশ দশকে সেটা যে ঘনিষ্ঠতায় পর্যবসিত হয়েছিল তা অবশ্য তার আগে হয়নি। কিন্তু তাঁর কাগজকে অবলম্বন করে একটা সংশ্লিষ্টতা বরাবর কৈশোর থেকেই ছিল। বিশ-দশকের আমার দু'একটি চিঠিপত্র ঐ কাগজে বেরিয়েছিল। মোটমাট এই পত্রিকাটি সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী প্রগতিশীল ও গণতন্ত্রবাদী সারা বাঙলায় ছড়িয়ে থাকা মুসলিম বুদ্ধিজীবী-দের মধ্যে যোগাযোগের একটা অবলম্বন ছিল। স্বভাবতই পত্রিকার প্রতিটি বিষয়ে একমত হোতাম তা নয়, গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বিষয় আমাকে আকর্ষণ করেছিল। কারণ স্বতন্ত্রভাবে আমারও বক্তব্য ঐ বিষয়গুলির অনুকূলেই ছিল। প্রথম, প্রজাস্বত্বের আইনে প্রজাস্বত্বের দাবি; দ্বিতীয়, জমিদারদের উপর কর প্রবর্তন করে সার্বিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের দাবি; তৃতীয় ছিল গঠনতন্ত্রের একটি বিষয়ের দাবি। এর একটু ব্যাখ্যা করতে হবে।

আজ যে কেন্দ্র-বনাম-রাজ্য প্রশ্ন গুরুত্ব নিয়ে দাঁড়িয়েছে তা বহু আগেই হওয়া উচিত ছিল। ইংরেজ চারিদিকেই এমন করে দেওয়াল তুলে রেখেছিল যে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের জ্ঞান আমাদের দেশে প্রচারিত

হতে বিলম্ব হয়েই গিয়েছিল। প্রথম দিকে দেশের স্বাধীনতাকামীরা এসব বিষয়ে কোনো মনোযোগই দিতেন না। এমন কি সাম্প্রদায়িক প্রশ্নের আলোচনাতেও পৃথক নির্বাচনের দাবি যেমন করে আসতো, গঠনতন্ত্রের দাবি তেমন গুরুত্ব নিয়ে আসত না। জনসাধারণ তো দূরের কথা, বুদ্ধিজীবীদের মধ্যেও এসবের বিশেষ আলোচনা ছিল না। মুসলিম নেতাদের মধ্যে কিন্তু দলমতনির্বিশেষে সকলেরই রাজ্যের হাতে বেশী ক্ষমতার দাবি ছিল। তখন যে কয়টি বিভাগ কেন্দ্রের হাতে থাকবে তাকে বলা হোত 'রিজার্ভ' বা 'সংরক্ষিত বিভাগ'। কেন্দ্রের এই রিজার্ভ অংশে মাত্র তিন-চারটি বিভাগ রাখার কথা বলা হোত। যথা, দেশরক্ষা, পররাষ্ট্রনীতি, রেল, ডাক-তার প্রভৃতি যোগাযোগ ব্যবস্থা, এবং বহির্বাণিজ্যের শুল্কের ব্যবস্থা—অর্থাৎ এখন যা গঠনতন্ত্র রয়েছে তার বিপরীত চরিত্রের একটা প্রস্তাব ছিল। বাকী সমস্ত ক্ষমতাই রাজ্যের হাতে থাকবে এমন বলা হোত। এদেরই বলা হোত বাকী সমস্ত ক্ষমতা বা রেসিডিউয়্যাল্ পাওয়ার্স্। ১৯২৩ সালে অন্ধ্রের ককোনাদে মৌলানা মহম্মদ আলি ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে তাঁর সভাপতির অভিভাষণে মুসলমানদের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে এর বিস্তৃত আলোচনা করেন। তিনি বলেন, এরূপ ব্যবস্থা হলে মুসলমানরা যেসব রাজ্যে সংখ্যায় বেশী তাতে নিজেদের মনোমত সিদ্ধান্তের দ্বারা রাজ্যের শাসন-ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করতে পারবে। যাই হোক, ১৯২৭ সাল থেকে এই 'রিজার্ভ পাওয়ারস্' বনাম 'রেসিডিউয়্যাল পাওয়ারস্'-এর দাবীকে জিন্নাসাহেব ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক রূপে উপস্থিত করেন। 'দি মুসলমান' পত্রিকা জোর গলায় এই ক্ষমতাবিকেন্দ্রীকরণের পক্ষে প্রচার করেন। আমিও এর পক্ষে ছিলাম।

আমি উপরোক্ত তিনটি বিষয়ে শুধু সমর্থক ছিলাম না, সোচ্চার ছিলাম। বস্তুতঃ উৎকট সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে এই বিষয়গুলি আমার সুস্থ চিন্তা ও কাজের আশ্রয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আমি একটি বিষয়ে মুজিবর রহমানের সাথে একমত হতে পারিনি। তিনি পৃথক নির্বাচন-ব্যবস্থা সাময়িক বজায় রাখার পক্ষে ছিলেন এবং উপরে উল্লিখিত জিন্না-সাহেবের বিবৃতির বিরুদ্ধে অভিমত প্রকাশ করেছিলেন। আমি বরাবরই দৃঢ়ভাবে পৃথক নির্বাচন-প্রথার বিরোধী ছিলাম।

ইতিমধ্যে কৃষকদের দাবির ব্যাপারে একজনের সাহায্য পেলাম। বর্ধমানের সীমানায় জামালপুরের পাশে ধনেখালি থানার মোষগেড়ে বিদ্যেৎপুর গ্রামে কেশব ঘোষ মশাই রিফর্মিস্ট লাইনে এক 'রায়ত

সামাত' প্রাতষ্ঠা করোছলেন। সরকারী বিভিন্ন দপ্তরে সামান্য সামান্য 'রিলিফ্'-এর প্রয়াসে তিনি লেগে থাকতেন। এইসব বিষয়ের সাহায্যের জন্য তিনি আমাদের বাড়িতে দাদামশাইয়ের কাছে আসতেন। এসব বিষয়ে আমার খুব রোমাঞ্চ না থাকলেও সহানুভূতি ছিল। কৃষকের প্রতি তাঁর দরদ আমার ভাল লাগতো। কৃষকের অবস্থা সম্বন্ধে তাঁর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা হোত। অবশ্য তাঁর সমগ্র কাজকর্মের খবর আমি রাখতাম না। যতটুকু বা জানতাম তা স্মৃতির ধারপাশে নেই। কিন্তু একটি বিষয়ে তাঁর কাছে বিশেষ সাহায্য পাই। প্রজাস্বত্বের দাবির পক্ষে এবং প্রাথমিক শিক্ষার দাবির পক্ষে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, অধ্যাপক জীতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ নরেশ সেনগুপ্ত প্রমুখের স্বাক্ষরিত বিবৃতি তিনি আমাকে সরবরাহ করেন। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের একটি একক-স্বাক্ষরিত বিবৃতি খুব কঠোর ভাষায় ছিল। তিনি ভোটারদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, যাঁরা প্রজাস্বার্থের বিপক্ষে (এর মধ্যে কংগ্রেস ও স্বরাজ দল প্রধান) ছিলেন তাঁদের যেন কিছুতেই ভোট না দেন। (এই বিবৃতির কোন কপি সংগ্রহ করতে পারা যায় কিনা দেখার জন্য আমি প্রয়াত কেশব ঘোষ মশায়ের গ্রামেও গিয়েছিলাম। দুঃখের বিষয় পেলাম না। একটা সংবাদ পেলাম, এসব বিবৃতি সঞ্জীবনী পত্রিকায় প্রকাশিত হোত। কিন্তু সঞ্জীবনী পত্রিকার ফাইলও অবলুপ্ত।) এইসব প্রচারপত্র নিয়ে আমি দিনকতক প্রচার ইত্যাদি করেছিলাম।

আমি পূর্বেই বলেছি, দেশের কমিউনিস্ট কাজকর্মের আমি কোনো খবর রাখতাম না। এই কারণে কৃষকের স্বার্থের ব্যাপার ইত্যাদি যে কমিউনিস্টরাই প্রথম তুলেছেন একথা তখন আমার জানা ছিল না। কৃষক আন্দোলনে কমরেড্ মুজফ্ফর আহমদ, কবি নজরুল ইসলাম, প্রখ্যাত উকিল অতুল গুপ্ত, হেমন্ত সরকার প্রমুখের কাজকর্ম যে সাড়া তুলেছিল সে খবর আমার কানে পৌঁছায়নি। প্রমথ চৌধুরী মশায়ের 'রায়তের কথা'ও তখনো পড়িনি। এসবেরই গোড়া ১৯১৭ সালের 'রুশ বিপ্লব'। সেও তো পরে বুঝেছি।

এখানে আমার একটি নিবেদন আমি রাখতে চাই। ১৯২৮ সালের 'প্রজাস্বত্ব আইনে' কংগ্রেস ও স্বরাজ দলের বিরোধিতা সত্ত্বেও প্রজার হিতে কিছু হয়েছিল। এর অর্থনৈতিক মূল্য প্রজার জন্য সামান্যই। এই কারণে অনেকে একে লঘু করে দেখেছেন। বস্তুতঃ, যাঁরা 'রায়ত' ও কৃষকের স্বার্থের পক্ষে ছিলেন তাঁরা কেউই একে সানন্দে গ্রহণ করতে

পারেন নি। আমাদিগকে বিক্ষোভের সঙ্গেই একে মেনে নিতে হয়েছিল। কিন্তু এর সামাজিক মূল্যটা তখনকার এবং পূর্ববর্তী অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সামান্য হলেও খুব অগ্রাহ্য করার মতো নয়। ১৯২৮ সাল থেকে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত রাজনৈতিক পরিবর্তনের ধারা তার দিকে কিছু ইঙ্গিত দেয়। বাস্তুজমি বা কৃষিজমিতে পুকুর করার অধিকার কিংবা উল্টোটা, অর্থাৎ পুকুরটাকে বাস্তু করার অধিকার—এইরূপ যথেচ্ছ কাজে লাগানোর অধিকারকে রূপান্তরের অধিকার বলা হয়। এ অধিকার থাকলো না। কোরফা স্বত্ব ও চাঁদিনা স্বত্বকে স্থিতিবান স্বত্বে রূপায়িত করা গেল না। এসব ১৯৩৮ সালের সংশোধনের জন্য অপেক্ষা করতে হোল। দু'টি ছোট জিনিস আয়ত্ত হোল—তার মধ্যে একটিতে দু' দিকেই বাধ্যবাধকতা থাকল। বিক্রয় ও হস্তান্তরের নামজারির ব্যাপার, অর্থাৎ বিক্রেতার পরিবর্তে স্থলাভিষিক্তের নাম পত্তন, জমিদারের পক্ষে বাধ্যতামূলক হোল। পূর্বে জমিদাররা নামজারির জন্য একটা বাজে আদায় করতো। সেই নাম-জারির বাজে আদায়টা একটি নিয়মে ফেলে আইনসঙ্গত করা হোল এবং প্রজাকর্তৃক রেজিস্ট্রি-অফিসে দেয় ঠিক করে দেওয়া হোল। রেট্‌টাও খুব বেশী ধার্য হোল। এই প্রশ্নেই আমরা সবচেয়ে বেশী বিক্ষুব্ধ হয়েছিলাম। কিন্তু বিক্ষোভ সত্ত্বেও ১৯২৮ সালের আইনকে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীর কারণে একেবারে অগ্রগতিবর্জিত এমন মনে করা সম্ভব হয়নি।

'চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের' গোড়া থেকেই প্রজার যে বাধ্যবাধকতা তা দাসত্বে পরিণত হয়েছিল। ১৮৫৯ সাল পর্যন্ত প্রজাকে তলব করে কাছারিতে আনার অধিকার ছিল। এই অধিকার শুধু আটকে সীমিত থাকত না, অমানুষিক প্রহার, লাঞ্ছনা ছিল এর অংশ, যদিচ আইনে সে অধিকার ছিল না। রেভরৃণ্ড্ লালবিহারী দে তাঁর 'বেঙ্গল পেজেণ্ট লাইফ্' পুস্তকে এই নিদারুণ অত্যাচারের বিবরণ দিয়েছেন। ১৮৫৯ সালের সংশোধনে এই আটক রাখার অধিকার লুপ্ত হলেও এর জের বরাবরই থেকে গেছে। শরৎচন্দ্রের জমিদারের লেঠেলদের তলবের উত্তরে গফুরের বীরত্বব্যঞ্জক উক্তি ছিল, 'মহারানীর রাজত্বে কেউ কারও গোলাম নয়, খাজনা দিয়ে বাস করি, আমি যাব না।' তারপর গফুরের কী হাল হয়েছিল পাঠকমাত্রেই জানেন। অতীতে বাঙলা সাহিত্যে 'নীল দর্পণে' নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের বর্ণনা আছে। কিন্তু অনেকে ভুলে যান, অত্যাচারের বিভিন্ন পদ্ধতি 'শ্যামচাঁদ' প্রভৃতি জমিদাররাই যথেষ্ট প্রবর্তন ও ব্যবহার করেছেন। তার উল্লেখ এক উপরি-উল্লিখিত

লালবিহারী দে'র পুস্তক এবং শরৎচন্দ্রের পুস্তক ছাড়া আর কোথাও নেই। গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ-রেজা খাঁ-র সময় থেকেই প্রজার উপর এইরূপ অত্যাচারের নিদর্শন বাঙলার গ্রামে গ্রামে যথেষ্ট ছিল।

১৯৩৮ সাল পর্যন্ত পর পর প্রজাস্বত্বের আইনের সংশোধনের পূর্বে আইনের এমন অবস্থা ছিল যে প্রজাকে নিজের আবেদন পেশ করতে বাধ্য হয়ে জমিদারের কাছারি ছুটতে হোত। ওয়ারিশ-সূত্রে প্রাপ্তই হোক আর ক্রয়-বিক্রয়ের স্বার্থেই হোক, জমিতে নামজারির জন্য কাছারিতে বারবার ছুটতে হোত। আর্থিক দণ্ড তো দিতে হোতোই ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়কেই, তাছাড়া ক্রেতা অনেক সময় দুস্থ বিক্রেতার ঘাড়েই তার অংশটা চাপিয়ে দিত। ফলে প্রাপ্ত মূল্য হোত অনেক কম। এর উপরে জমিদারের অগ্রাধিকার ছিল। এর ফলে ক্রেতারা স্বভাবতই জমিদারের স্বীকৃতি পাওয়া যাবে—এর নিশ্চয়তা দাবি করতো। এতেও দুস্থ বিক্রেতাকে গচ্চা দিতে হোত। এই অগ্রাধিকার ১৯২৮ সালের আইনে লোপ করা হয়। সুতরাং খুব সামান্য হলেও একেবারে কোনো রিলিফ্ (relief) হয়নি এমন কথা নয়। আমি যা দেখেছি ও তখন শুনেছি, নামজারির জন্য কিংবা জমিদারের অগ্রাধিকার ঠেকাবার জন্য জমিদারের কাছে যে আর যেতে হবে না—এটাকেও রায়ত যৎসামান্য হোলেও রিলিফ্ মনে করেছিল। আংশিক জয়কে তুচ্ছ করলে নিজেদের ক্রেডিট কিছু ক্ষুণ্ণ হয়। রায়তের এসব দাবি-দাওয়া উপস্থিত করার সমস্ত ক্রেডিটই তো 'ওয়ার্কার্স অ্যাণ্ড পিজেণ্টস্ পার্টি'র উদ্যোগে অনুষ্ঠিত কৃষক সম্মেলনের। কৃষক-প্রজা দল প্রভৃতি যাঁরা এসবের ক্রেডিট দাবি করেন তাঁরা বিশ দশকের গোড়ায় কৃষক সম্মেলনগুলির কৃতিত্ব ভুলে যান। হালে দেখলাম বাংলাদেশের একজন সুপরিচিত লেখক, যিনি বামপন্থী বলে দাবি করেন, এমন কি ক্রেডিটটা মুসলিম লীগের পকেটে দিয়ে দিয়েছেন। 'লাঙ্গল' পত্রিকার পৃষ্ঠাগুলি তাঁদের দেখা উচিত।

আমরা অবশ্য ১৯২৮ সালের বিলের সময় এবং তৎপূর্ব থেকেই প্রজাস্বত্বের বিরুদ্ধে কংগ্রেস ও স্বরাজদলের অপকীর্তি প্রচার করতে থাকলাম। ১৯২৯ সালে কংগ্রেস ও স্বরাজদলের বিরোধিতা সত্ত্বেও প্রাথমিক শিক্ষার আইন পাশ হয়ে গেল। কিন্তু ঐ বিরোধিতার ফলে জমিদাররা শিক্ষা-করের বেশীর ভাগ বোঝাটা কৃষকের উপর চাপিয়ে দিতে পারলেন। (বিস্তৃত আলোচনার জন্য আমার লেখা 'শিক্ষা ও শ্রেণী-সম্পর্ক' পুস্তকের প্রথম প্রবন্ধটির প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।)

আমি উপরে তিনটি বিষয়ে আমার মনোযোগ নিযুক্ত ছিল বলেছিলাম। তার মধ্যে প্রজাস্বত্ব ও প্রাথমিক শিক্ষার কথা আলোচনা করলাম। তৃতীয় বিষয়টি হচ্ছে কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে ক্ষমতার বণ্টন। আমাদের দাবি ছিল, 'সেণ্টারের' হাতে সীমিত সংরক্ষিত ক্ষমতা এবং বাকি সব কিছু রাজ্যের হাতে থাকা উচিত। এরকম এক স্বাধীন ভারত আমরা কল্পনা করতাম। বলা বাহুল্য এর ঝোঁকটা এসেছিল সাম্প্রদায়িক সমস্যার মীমাংসা ও সমাধানের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। ১৯২৭ সালে জিন্না সাহেব শর্তসাপেক্ষে পৃথক নির্বাচন-প্রথার দাবি প্রত্যাহার করতে প্রস্তুত এরূপ ঘোষণা করায় আমাদের মনে আশাটা হয়েছিল ঃ যা হোক একটা সমস্যার সমাধান হবে। কিন্তু ইতিমধ্যেই কাগজের স্তম্ভে প্রতিরোধের ঝড় বেশ উঠেছিল। জিন্না সাহেবের অন্য তেরটি দাবির মধ্যে ছিল উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে একটা পৃথক প্রদেশ গঠন, সিন্ধু প্রদেশকে বোম্বে প্রেসিডেন্সি থেকে বিচ্ছিন্ন করে পৃথক করা, এই সব দাবি। হিন্দুমহাসভার নেতারা প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন এবং ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠন—উভয়েরই তীব্র বিরোধিতা করলেন। ডাঃ মুঞ্জে বিবৃতি দিলেন, তাহলে তো অন্ধ্র, কেরালা সবাই বিচ্ছিন্ন হয়ে প্রাদেশিক সত্তার দাবি করবে। (অন্ধ্র ও কেরালা—নিজাম-শাসিত তেলেঙ্গনা বাদ দিয়ে অন্ধ্র, ও দেশীয় রাজ্য-শাসিত অঞ্চল বাদ দিয়ে কেরালা—তখন মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির অন্তর্ভুক্ত ছিল। কংগ্রেসের তীব্র বিরোধিতার বিরুদ্ধে তুমুল সংগ্রাম করে তবে তাঁরা স্বাধীনতার পর আলাদা রাজ্য স্থাপন করতে পেরেছেন।) কত আগে থেকে বুর্জোয়া-শ্রেণী কেন্দ্রের ক্ষমতা সম্বন্ধে দৃঢ়ভাবে সচেতন, তা ডাঃ মুঞ্জের উক্ত বিবৃতি থেকে বুঝতে হবে।

তবু সাম্প্রদায়িক সমস্যা ও কেন্দ্র-রাজ্যের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টনের সমাধানের আশা ছাড়তে পারছিলাম না। ১৯২৮ সালে জিন্না সাহেব ও মুসলিম লীগ 'সাইমন কমিশন' বয়কটের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। এই বয়কট আন্দোলনের আঘাত কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের আলাদা আলাদা হলেও একই আঘাতে পর্যবসিত হল। আমাদের উৎসাহ আরও বাড়লো। ১৯২৮ সালে 'অল্ পার্টিজ্ কন্‌ভেন্‌শন্' এবং 'নেহরু রিপোর্ট' সব আশা ভঙ্গ করলো। অল্ পার্টিজ্ কন্‌ভেন্‌শনে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের ব্যবস্থা গৃহীত হোল না। সাম্প্রদায়িক সমাধানের প্রশ্নের কোনো অগ্রগতি হোল না। অব্যবহিত পরেই মতিলাল নেহরুর সভাপতিত্বে কংগ্রেসের অধিবেশন। নেহরু রিপোর্টের প্রশ্নে বাক্‌বিতণ্ডা বিতর্ক হোলেও জহরলাল নেহরু ও

সুভাষচন্দ্র বসু দক্ষিণপন্থীদের সিদ্ধান্ত মেনে নিলেন। বামপন্থীরা বিক্ষুব্ধ হলেন—এই পর্যন্ত।

কিন্তু পুনরায় সংগ্রামের আহ্বান দেওয়া হোক—এ দাবি নেতৃত্বের পক্ষে এড়ানো সম্ভব হোল না। শুধু ১৯২৯ সালের লাহোর অধিবেশন পর্যন্ত স্থগিত রাখা হোল। দাবি করা হোল, এই এক বৎসরের মধ্যে যদি ভারতবাসীর দাবি ইংরাজ কর্তৃক স্বীকৃত না হয় তাহলে স্বাধীনতার সংগ্রাম শুরু করা হবে।

১৯২৮ সালের কংগ্রেসের অধিবেশনকালে কৈশোরের উৎসাহে প্রধানত দেখার জন্য ও আশপাশ ঘোরার জন্য কলকাতা এসেছিলাম। তবু মনে রাজনৈতিক আলোড়ন ছিল এবং আশা ছিল একটা সমাধান হবে। সমাধান ব্যর্থ হওয়ায় আশাহত হলাম। কিন্তু স্বাধীনতার সংগ্রামের প্রতিশ্রুতি মনে ভরসা উৎসাহ আনলো। ঐ সময়কার সকল কিশোর-যুবকের মতো আমিও ত্রিশের আন্দোলনে উৎসাহিত উদ্দীপিত হয়েছিলাম।

১৯২৮ থেকে ১৯৩১ উত্তেজনা উদ্দীপনা ও সঙ্গে সঙ্গে রাজনীতিক ভাবনা-চিন্তা নিয়ে থাকি। দুই দুইবার ছাত্র সম্মেলনে যোগদান করি ও ছাত্র-সংগঠনের মধ্যে কিছু কাজ করতে থাকি। মনের ভেতরে একটা দ্বন্দ্ব অবশ্য চলতে থাকে। সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধানে বুর্জোয়া নেতৃবৃন্দের ব্যর্থতা, নেহেরু রিপোর্টে কঠোর কেন্দ্রীকরণের প্রস্তাব, কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে গণতান্ত্রিক ক্ষমতা বণ্টন—যা কংগ্রেসের মঞ্চেই অগ্রগণ্য নেতাদের দ্বারা উচ্চারিত হয়েছিল (গয়া কংগ্রেসে দেশবন্ধুর অভিভাষণ এবং ককোনাদা কংগ্রেসে সভাপতি মহম্মদ আলির অভিভাষণ)—এসবের প্রতি নেহেরু রিপোর্টে সম্পূর্ণ অবজ্ঞা—এইসব কারণে মনে ব্যথা ও বিক্ষোভ ছিল। অন্য দিকে ছিল সব দ্বিধা-চিন্ততা ছাড়িয়ে স্বাধীনতা আন্দোলনে গণ-অভিযানের প্রতি বিপুল আগ্রহ, এবং সমালোচনা সত্ত্বেও গান্ধীজী ও নেহেরুর নেতৃত্বের প্রতি ভরসা।

কমিউনিজম্-এর আহ্বান

এল ১৯৩১ সাল। ১৯৩১-এ হোল আমার জীবনের একটা বড় ঘটনা ঃ জেলা কংগ্রেসের রাজনৈতিক সম্মেলন ও তার সঙ্গে সঙ্গে অনুষ্ঠিত যুব-সম্মেলন। সেই সম্মেলনে কমরেড বঙ্কিম মুখার্জীর সভাপতির অভি-ভাষণ, অন্যান্য বক্তাদের বক্তৃতা—সবেতেই সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রামের লক্ষ্যই ছিল, উপরন্তু ছিল নতুন চিন্তাধারা, কমিউনিজম্-এর আহ্বান আর তার অনুপ্রেরণার ভাষা, তার আন্দোলনের ডাক।

তখনকার কংগ্রেসের যুব-নেতৃবৃন্দের মধ্যে ফকিরদা জেলে। বিনয়দা, সরোজদা, জগুদা (বিনয় চৌধুরী, সরোজ মুখার্জী, জগন্নাথ সেন) ব্যক্তি-গতভাবে কমরেড বঙ্কিম মুখার্জীকে চিনতেন এবং তিনি যে চিন্তাধারা, যে আদর্শের প্রতি অনুরক্ত—কমিউনিজমের চিন্তাধারা—তারও কিছু পরিচয় রাখতেন। বাইরের আবহাওয়াও তখন ছিল এই ধরণের চিন্তাধারার পক্ষে অনুকূল।

১৯৩০ সালে গান্ধীজীর নেতৃত্বে দ্বিতীয়বার অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়। কংগ্রেসের আহ্বানে বিপুল সাড়া পাওয়া যায়। ১৯২২ সালে আন্দোলন প্রত্যাহার করার পর থেকেই একদিকে জনগণের মধ্যে ছিল হতাশা আর অন্যদিকে সংগ্রামী কর্মী-সমাজের মধ্যে ছিল নতুন করে আন্দোলনের জন্য আগ্রহ, চাঞ্চল্য এবং অস্থিরতা। তাঁরা অধিকাংশই গান্ধীজীর অহিংসার বাঁধনের মধ্যে কিংবা শুধু সংসদীয় রাজনীতির পন্থার মধ্যে সীমিত থাকতে অনিচ্ছুক। ১৯৩০-এর আগেই এরকম আগ্রহ, চাঞ্চল্য এবং অস্থিরতা বিভিন্ন বড় ছোট দল ও সংগঠনের নামে ও রূপে দানা বাঁধতে শুরু করেছিল। কমিউনিস্ট ভাবধারায় অনুপ্রাণিত কৃষক ও শ্রমিকের আন্দোলন শুরু হয়েছিল। অন্যদিকে বুদ্ধিজীবী থাকে বিপ্লবী গ্রুপ সংগঠিত হচ্ছিল। ১৯৩০-এর আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে এগুলির সংগঠন গভীরে ও ব্যাপ্তিতে বাড়তে থাকে। দুঃখের বিষয়, যেসব বিপ্লবী গ্রুপ সন্ত্রাসবাদকে পন্থা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে চেষ্টা সত্ত্বেও আশানুরূপ একতার

লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল না। তবু তাঁদের আদর্শ-নিষ্ঠা, ইংরেজদের সঙ্গে সর্ব-সম্পর্ক ত্যাগ বিষয়ে ও পূর্ণ-স্বাধীনতার লক্ষ্যে দৃঢ়তা এবং সর্বোপরি অকাতর আত্মত্যাগ ও অদম্য সাহসিকতা, বাংলার জনগণের মধ্যে বেশ প্রভাব সৃষ্টি করেছিল। যাই হোক, গান্ধীজীর আন্দোলনের যা বিশিষ্ট চরিত্র, ১৯৩০ সালের এই দ্বিতীয় দফা অসহযোগ আন্দোলনেও তা দৃষ্ট হোল ঃ বৃটিশ গভর্নমেন্টের সঙ্গে সমঝোতা ও আপস। ফলে ১৯৩১-এ বাংলার যুবসমাজে হোল তার বিরুদ্ধে তীব্র বিক্ষোভ। অন্যদিকে কমিউ-নিজম এবং শ্রমিক ও কৃষক-আন্দোলনের জাগরিত নতুন শক্তির উন্মেষ হচ্ছিল এবং উক্ত যুবসমাজকে নতুন এক পথের নির্দেশ দিচ্ছিল। ব্রিটিশ গভর্ন-মেণ্টের নিষ্পেষণ সত্ত্বেও মীরাট কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্রের মামলা ও তার বিবরণাদি সারা ভারতেই বিপ্লবীদের ও সাধারণভাবে বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে নতুন এক উদ্দীপনা সঞ্চারিত করেছিল। আদালতে কমরেড মুজফ্ফর আহমদের বিবৃতি এক বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল! সবকিছুর মিলিত প্রভাব সারা বাংলাতেই ছড়িয়ে পড়েছিল। বাংলার প্রায় প্রতিটি জেলায় ও স্তরে ১৯৩১ সালে সম্মেলনাদি অনুষ্ঠিত হচ্ছিল—বিশেষ করে কংগ্রেসের রাজনৈতিক সম্মেলন আর তার সঙ্গে সঙ্গে স্বতন্ত্রভাবে ছাত্র ও যুব-সম্মেলন প্রভৃতি।

বর্ধমানেও ঠিক অনুরূপ অনুষ্ঠানাদির প্রস্তুতি হোতে থাকে। ইতিপূর্বে ১৯৩০ সালে বর্ধমান জেলায় সহস্রাধিক মানুষ (অধিকাংশই যুবক ও কিশোর) অসহযোগ আন্দোলনে জেলে গিয়েছিলেন। জনগণের মধ্যেও ব্যাপক রাজনৈতিক চেতনা প্রবাহিত হয়েছিল। গান্ধীজী কর্তৃক আন্দোলন প্রত্যাহারে দেশের মানুষ ও কর্মীরা আশাহত হয়েছিলেন। জনশক্তি কংগ্রেস-সংগঠনে সংহত হওয়ার সম্ভাবনায় প্রতিরুদ্ধ হয়ে শিথিল হয়ে ছড়িয়ে পড়ল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অগ্রগামী কিছু কর্মী নতুন পথ খুঁজতে আরম্ভ করেছিলেন। তাঁদের সংকল্প আরও দৃঢ় হোল।

উপরে যুবকদের ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে দানা-বাঁধা কিছু গ্রুপের উদ্ভবের কথা বলেছি। এই সময়ে বর্ধমানেও অনুরূপ সংগঠন দানা-বেঁধে উঠেছিল। প্রথমে ফকিরদা (শ্রীফকিরচন্দ্র রায়) প্রমুখ এরূপ সংগঠনের চেষ্টা শুরু করেছিলেন। কিন্তু তিনি প্রারম্ভেই ধরা পড়ে যান এবং বাংলার কুখ্যাত ডিটেনশান আইনে (যাতে চরম যথেচ্ছচারিতায় বিনা বিচারে বন্দী করা যেতো) দীর্ঘকালের জন্য বন্দী হয়ে যান। ইতিমধ্যে বিনয়দা এরূপ প্রয়াসে উদ্যোগী হ'ন। বিনয়দা কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবকদের ভারপ্রাপ্ত

ছিলেন। যার ফলে এই সমচিন্তার যুবকদের সঙ্গে যোগাযোগ ও দল-গঠনে তাঁর কিছু সুবিধা হয়। নিষ্পেষণ ও তাঁর কারণে সতর্কতার প্রয়োজনে এসব গ্রুপের বিস্তার বেশী হওয়া সম্ভব ছিল না। কিন্তু প্রভাব কম হোত না। বিনয়দা আর তাঁর সাথীগণ বেশ কিছু যুবকদের মধ্যে প্রভাব সৃষ্টি করতে সক্ষম হন। এঁদের মধ্যে কমরেড হরেকৃষ্ণ কোঙার এবং কমরেড বিপদবরণ রায় প্রমুখের নাম সহজেই মনে পড়ে।

গান্ধীজী ও বড়লাট লর্ড আরউইনের মধ্যে চুক্তির পর ১৯৩০-এর আন্দোলন প্রত্যাহৃত হয়। অগ্রগামী কর্মীদের মধ্যে বিক্ষোভের ঢেউ উঠতে থাকে। উপরে বলেছি, এই সময় বিভিন্ন জেলায় কংগ্রেসের সম্মেলনগুলি হচ্ছিল। বর্ধমানেও জেলা সম্মেলনের প্রস্তুতি চলতে থাকে এবং শেষে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। কংগ্রেসের জেলা সম্মেলনের (যাকে বলা হোত জেলা রাজনৈতিক সম্মেলন) অব্যবহিত পরে একই প্যাণ্ডেলে জেলা যুব সম্মেলন হয়।

যাঁরা গান্ধীজী ও কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির মত ও কাজের সমর্থক তাঁরাই ছিলেন জেলা কংগ্রেসের শীর্ষে, যেমন পাঁজা মশায় (শ্রীযাদবেন্দ্রনাথ পাঁজা), শ্রীবিজয়কুমার ভট্টাচার্য* প্রমুখ। সুতরাং জেলা রাজনৈতিক সম্মেলন তথা জেলা সম্মেলনে মূল সরকারী প্রস্তাব ছিল গান্ধী-আরউইন চুক্তির অনুমোদন এবং আন্দোলন প্রত্যাহার বিষয়ে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির গৃহীত সিদ্ধান্তের প্রতি আনুগত্য। উপরে উল্লিখিত কংগ্রেসের যুবনেতৃবৃন্দ ছিলেন তার বিরোধী। আমোদদা, বিনয়দা, সরোজদা বিরোধী প্রস্তাব উত্থাপন করেন। ইতিপূর্বেই কংগ্রেস-আন্দোলনে সরোজদা সুবক্তা হিসেবে সুপরিচিত হয়েছিলেন। ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে এবং উপরোক্ত বিরোধী প্রস্তাবের পক্ষে সরোজদার জ্বালাময়ী বক্তৃতা প্রতিনিধিদের বিপুল সমর্থন লাভ করে। উপরোক্ত কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্তের প্রতি নিন্দাসূচক প্রস্তাব প্রতিনিধিদের বিপুল সমর্থনে গৃহীত হয়ে যায়। বামপন্থীদের প্রস্তাব জয়ী হলো। কোন পথে তাঁরা ভবিষ্যতে চলতে চান এই বিজয় যেন তারই ইঙ্গিত দিল।

অন্যান্য যুবকের মত আমিও ১৯৩০ সালের আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ হই। (লেখার উদ্দেশ্যের কারণেই ব্যক্তিগত কিছু কাহিনী এসে পড়বে— প্রাসঙ্গিকভাবে যেটুকু প্রয়োজন সেইটুকু।) পাঁজা মশায় (শ্রীযাদবেন্দ্রনাথ পাঁজা) বলায় আমি সম্মেলনের স্বেচ্ছাসেবক হই। বিনয়দার সঙ্গে আমার রাজনীতিক যোগাযোগ হতে বিলম্ব হয়, কিন্তু ব্যক্তিগত পরিচয় ছোট

থেকেই। এক পাড়ায় বাস, এক স্কুলে পড়া, ছোট ভাই ভৈরব নিম্নতম ক্লাস থেকেই বন্ধু। বিনয়দা, মেজদা (রমেন চৌধুরী) ছাড়াও কংগ্রেসের যুবক-নেতৃবৃন্দের মধ্যে অনেকে আমাকে চিনতেন। শহরেই বাড়ী। পরিচিত রাজনীতিক ঘরের ছেলে। আমিও তাঁদের চিনতাম। শহরে তাঁদের সং-স্বভাবের সুনাম ছিল। আমোদদা, সরোজদা, মথুরাদা, মাধুদা (শ্রীমুকুন্দ-মাধব সামন্ত —সেদিনও এই সত্তর দশকের কংগ্রেসী স্বৈরাচারের কালে যাঁকে কমিউনিস্ট সাহচর্যের জন্য দণ্ড দিতে হয়েছে—অজ্ঞাতবাস, কারাবাস সব কিছু) এবং সম-সাথীরাও ছিলেন : শহীদ শিবশঙ্কর, দাশরথি তা, বিষ্টু প্রমুখ।

জেলা কংগ্রেস সম্মেলনের প্রস্তুতি চলাকালেই জেলার যুব সম্মেলনেরও প্রস্তুতি চলছিল। আমিও তাতে যুক্ত হলাম। লক্ষণীয় সংখ্যায় যুব সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভ্য সংগ্রহ করলাম। এইসব নানা কাজের মধ্য দিয়ে যুব-নেতৃবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়েছিল। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হলেন শ্রীবলাই রায়, সম্পাদক শ্রীজগন্নাথ সেন (জগুদা)। বিনয়দা ও জগুদার প্রস্তাবে আমি হলাম যুগ্ম-সম্পাদক।

জেলায় ১৯৩১ সালের এই সম্মেলন হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের ক্ষেত্রেও বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। বোঝার জন্য তৎকালীন অবস্থাটা জানা প্রয়োজন।

১৯০৫ সালের স্বদেশী আন্দোলনের সময় বর্ধমানের মুসলমানরা কংগ্রেস ও বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনকে পূর্ণ সমর্থন দেন। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুগামী আবুল কাসেম ছিলেন কংগ্রেসের নেতা, আবার সম্প্রদায় হিসেবে তাঁদেরও নেতা। তিনি ১৯২০-২১ পর্যন্ত কংগ্রেসে ছিলেন। কিন্তু খেলাফত ও কংগ্রেসের নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হতেই অন্যান্য মডারেট নেতাদের সঙ্গে তিনিও কংগ্রেস ত্যাগ করলেন এবং শেষে কংগ্রেস-বিরোধী হয়ে পড়লেন। তিনি গেলেন, কিন্তু মুসলমান সম্প্রদায়, এমন কি তাঁর নিজ পরিবার ও আত্মীয়-স্বজন কংগ্রেসের সমর্থক থাকলেন এবং অসহযোগ আন্দোলনে প্রত্যক্ষ সহায়তা করলেন। তাঁর ভাই আবুল হায়াত সরকারি চাকরি ত্যাগ করে কংগ্রেসে যোগদান করলেন। বর্ধমান এবং একই বাড়ী থাকলো তাঁরও কর্মকেন্দ্র। খেলাফত ও কংগ্রেসের ডাকে অনেক মুসলমান কর্মী আন্দোলনে যোগদান করলেন। ঐক্যবদ্ধ হিন্দু-মুসলমানের আন্দোলন জোরদার হলো।

কিন্তু একটুকু খিঁচ তখন চাপা ছিল। ১৯২০-২২ সালে যেমন সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তেমনই একথাও সত্য, তত্ত্বের দিক দিয়ে কিছু পশ্চাৎপদতাও সঞ্চারিত হয়েছিল। ঊনবিংশ শতাব্দী হতে বুর্জোয়া-জমিদার নেতৃত্বে যা আন্দোলন হয়েছিল তার চরিত্র ছিল নরমপন্থা—কিছু প্রতিবাদ আর কিছু আর্জি পেশ। ইংরেজ যাতে অসন্তুষ্ট না হয় সেদিকে বিশেষ খেয়াল রাখা হতো। সংস্কারের আবেদন মৃদুস্বর অতিক্রম করতো না। কিন্তু তবু বক্তব্যগুলো ছিল রাজনৈতিক সূত্রে গ্রথিত। মৃদুভাবে অগ্রসর হলেও জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে কিছু কিছু গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর কথা বলা হতো। পুরো স্বাধীনতা বলার সাহস বা কামনা ছিল না, কিন্তু স্বায়ত্তশাসন বা স্বরাজের কথা বলা হতো। রামমোহন রায় ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় একসময় বলেছিলেন, এদেশে দেশপ্রেম (পেট্রিওটিজম্) বলে কিছু নেই। ঊনবিংশ শতাব্দীতে এই ঘাটতি পূরণে স্বতঃই এবং বিশেষ উদ্যোগে গড়ে উঠেছিল দেশপ্রেম। হিন্দুরাজ, ইসলামী-রাজ প্রভৃতি স্লোগানে ব্যাহত হলেও ধর্মনিরপেক্ষ পেট্রিওটিজ্‌মের ধারা ক্রমশ স্পষ্ট হতে স্পষ্টতর হচ্ছিল। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর একটা সংগঠিত রূপ অবলম্বনে এই ধারা আরও সুস্পষ্ট হতে থাকলো। মডারেট নেতৃত্ব কংগ্রেসে যা দাবী করতো তার চেহারা স্লোগান হিসেবে যতই নরম হোক, তা হতো পরিষ্কার অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক। তার মধ্যে ধর্মের কোনও উন্মাদনা থাকতো না। ধরুন, ইংরেজ কর্তৃক শোষণের একটা রূপ, যাকে বলা হতো 'ড্রেন', তার বিরুদ্ধে দাবী-দাওয়া বা প্রচার, কিংবা দেশে বর্তমান যুগের শিল্প প্রতিষ্ঠা ও রক্ষার জন্য সংরক্ষণ শুল্কের দাবী। এসব ছিল নির্দিষ্ট ও পরিষ্কার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দাবী। ১৯২১-২২ সালে সে দাবী অবশ্যই ছিল, কিন্তু উদ্দেশ্য সাধনের উপায় হিসেবে প্রধানত ধর্মের উপর জোর দেওয়া হলো। অহিংসাকে ধর্মের পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হলো এবং এইরূপে অরাজনৈতিক প্রচার ক্রমোত্তর পশুহত্যা-বিরোধিতাকে অবলম্বন করে শেষকালে গোহত্যা-বিরোধিতায় পর্যবসিত হলো। পশ্চিম-এশিয়া থেকে তুর্কী সাম্রাজ্য হাত হঠাও বললে তা হতো একটা সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী রাজনৈতিক দাবী। কিন্তু দাবী তোলা হলো, খেলাফতকে অর্থাৎ মুসলমানদের ধর্মরাজ্যকে প্রতিষ্ঠিত রাখতে হবে। উভয়ক্ষেত্রে প্রচার পর্যবসিত হলো উগ্র ধর্মান্ধতায়। ইংরেজের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সময় তাতে তেমন কিছু এসে গেল না। বরং ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে সাময়িক সাহায্য হলো। কিন্তু সংগ্রাম প্রত্যাহার করার পর এই ধর্মোন্মাদনার বীজ মহীরূহে পরিণত

হলো। ইতিহাস জাতির সামনে যে দায়িত্ব রেখেছিল—ইংরেজদের বিরুদ্ধে জাতীয় ঐক্য বজায় রাখা ও প্রসারিত করা—বুর্জোয়া নেতৃত্ব সেই কাজে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হলো। শুধু ব্যর্থ হলো তাই নয়, তীক্ষ্ণস্বরে বিদ্বেষের প্রচারে লিপ্ত হলো। লেখায় প্রচারে সংবাদপত্রে ইংরেজের বিরুদ্ধে প্রচারের বদলে পরস্পরের বিরুদ্ধে তিক্ত হলাহলের উদগার হতে লাগলো। কবি নজরুল ইসলামের কথাটা আবার মনে পড়ে। তিনি ঠিকই লিখেছিলেন, "মাতালদের এই ভাটিশালায় নটিনী আজ বীণাপাণি।" দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর কংগ্রেসের প্রাদেশিক সম্মেলনে দেশবন্ধুর সময় গৃহীত হিন্দু-মুসলমান প্যাক্ট্‌কে বাতিল করা হলো। আরও জটিলতা হলো জমিদার-প্রজা সম্পর্ককে নিয়ে। পূর্বেও উল্লেখ করেছি, পুনরাবৃত্তিতে দোষ নেই, কংগ্রেস ও স্বরাজ পার্টি প্রজাস্বত্বের দাবীর বিরোধিতা করলো। প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের উদ্দেশ্যে প্রস্তাবিত প্রাথমিক শিক্ষা আইনের বিরোধিতা করলো। বাংলাদেশে জমিদারের মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা ছিল নগণ্য। প্রজার মধ্যে হিন্দু-মুসলমানের বড় পার্থক্য না থাকলেও মুসলমান ছিল অর্ধেকের বেশী। প্রজাস্বত্বের দাবী কিংবা গ্রামের কৃষক-সন্তানের শিক্ষার দাবীতে যাঁরা সোচ্চার ছিলেন তাঁদের মধ্যে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, অধ্যাপক জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও নরেশ সেনগুপ্ত প্রমুখ কয়েকজন হিন্দু থাকলেও প্রজাপক্ষে প্রবক্তারা প্রধানত ছিলেন মুসলমান। ফলে কার্যগতিকে শ্রেণী-দ্বন্দ্বটাকে সাম্প্রদায়িক রূপ দেওয়ার চেষ্টা চলতে লাগলো। বুর্জোয়া-জমিদার নেতারাই এইরূপ শ্রেণীভেদকে সাম্প্রদায়িক ভেদে রূপান্তরিত করতে উদ্যোগী হলেন।

তাছাড়া মুসলমান বুদ্ধিজীবীদের বড় অংশের দাবী ছিল পৃথক নির্বাচন-ব্যবস্থা বজায় রাখা, যা জাতীয়তা বিকাশের অন্তরায়। পূর্ববঙ্গের হিন্দু জনসাধারণ তখন জানতেন না, এখন বিড়লার এই "আণ্ডার দি শ্যাডো অব দি মহাত্মা" পুস্তকে প্রকাশিত হয়েছে, বিড়লার মাধ্যমে কংগ্রেস নেতা নলিনীরঞ্জন সরকার প্রমুখ জমিদার-বুর্জোয়া প্রবক্তারা ও আনন্দবাজার পত্রিকা এই একই দাবী অর্থাৎ পৃথক নির্বাচন-ব্যবস্থা বজায় রাখার দাবী গান্ধীজীর কাছে পেশ করেছিলেন, তার জন্য গান্ধীজীর উপর চাপ দিচ্ছিলেন ; কারণ, মিশ্র নির্বাচনে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে কৃষক-প্রজা-ঐক্যের আন্দোলন শুরু হবে। তাতে জমিদার ও উপর-থাকের মানুষদের অসুবিধা হবে। এই ছিল তাদের ভয়। মুসলমান নেতৃবৃন্দের আরও দাবী ছিল, কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কে রাজ্যের স্বাতন্ত্র্য ও অধিকারের প্রসার এবং এক

ভাষাভাষীদের নিয়ে—যেমন উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে পাঠানদের নিয়ে, ও সিন্ধুতে (সিন্ধু বম্বে প্রেসিডেন্সীর মধ্যে ছিল)—পৃথক রাজ্য গঠন।

উপরে সংক্ষেপে যা লিখলাম তার থেকে সহজেই বোঝা যায় প্রকৃত গণতান্ত্রিক এবং সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জাতীয়তার মনোভাব থাকলে একটা মিলন যে অসম্ভব ছিল তা নয়। কিন্তু সে লক্ষ্যই বুর্জোয়াজীর ছিল না। ছোটখাটো ব্যাপার নিয়ে দাঙ্গার উস্কানী দেওয়া হতো এবং সারা ভারতে গোহত্যা ও মসজিদের সামনে বাজনা এইসব নিয়ে দাঙ্গা-হাঙ্গামা ঘটতে লাগলো। এসবের প্রধান হোতা ছিল বুর্জোয়া-জমিদার নেতৃবৃন্দ এবং সংবাদপত্র।

ভারতে ও বাংলায় এইরকম অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বর্ধমান জেলার আবহাওয়া অপেক্ষাকৃত অনেক ভাল ছিল। অন্যান্য অনেক স্থানে কংগ্রেসের নেতাদের বিরুদ্ধেই সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগ ছিল। বর্ধমানে তা ছিল না। দু-একজন ব্যতিরেক ক্ষেত্র বাদ দিলে তাঁরা সবাই ছিলেন উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে জনপ্রিয়। পাঁজা মশায়, বিজয়দা-ই (শ্রীযাদবেন্দ্র-নাথ পাঁজা ও শ্রীবিজয়কুমার ভট্টাচার্য) হন বা যুব সম্মেলনের নেতৃবৃন্দ-ই হন, সবাই ছিলেন সম্প্রদায়-নির্বিশেষে সকলের কাছে জনপ্রিয়। শত বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও বর্ধমানের মানুষের মধ্যে ধর্ম-নিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্রের ধারা লুপ্ত হয়নি, এমন কি, ঘোরতর বিচ্ছেদ ও বিদ্বেষের সময়ও তার গতিশীলতা সম্পূর্ণ প্রতিরুদ্ধ হয়নি। জেলার মুসলমানরা সম্প্রদায় হিসাবেই বঙ্গভঙ্গের বিরোধী এবং কংগ্রেসের সমর্থক হয়েছিলেন। কংগ্রেস ও খেলাফত আন্দোলনে সর্বশ্রেণীর মুসলমান পুরো উদ্যমে যোগদান করেন। প্রতি অঞ্চলে সুপরিচিত মুসলমান-পরিবার আন্দোলনে কোনও না কোনও ভূমিকায় সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়েন।

অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহারের পর দেশের বিভিন্ন স্থানে সাম্প্র-দায়িক বিভেদ, সামান্য ছোটখাটো ব্যাপার নিয়ে দাঙ্গা-হাঙ্গামা ইত্যাদি ঘটতে থাকে। ১৯২৬-এ তা সবচেয়ে বেশী উৎকট রূপও নেয়। যাঁরা এসবের বিরুদ্ধে কর্মপন্থা নির্ধারণ করতে চান তাঁরাও বিশ দশকেই সক্রিয় হন।

এই সময় মুসলমানদের মধ্যে সুস্থ চিন্তা বজায় রাখা ও সাম্প্রদায়িক কলুষের প্রতিরোধের জন্য কয়েকজন মুসলমান যুবকের চেষ্টায় বর্ধমানে একটি যুব প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। একটি প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে তাঁরা আকৃষ্ট হন। 'ইয়ংমেন্‌স্ ক্রিশ্চান এ্যাসোসিয়েশান' প্রতিষ্ঠানের নামের মধ্যে ধর্ম ও

সম্প্রদায়ের উল্লেখ থাকলেও ধর্ম-নির্বিশেষে সেবার কাজ ছিল তাদের কর্মসূচী। উপরোক্ত যুবকগণ এইরূপ উদ্দেশ্যে তাঁদের সমিতির নাম উপরোক্ত দৃষ্টান্ত অনুকরণে 'ইয়ংমেন্‌স্‌ মুসলিম এ্যাসোসিয়েশান' রাখেন। রাজনীতি-বর্জিত খেলাধুলা, পাঠাগার ও সমাজসেবার উদ্দেশ্যে গঠিত হলো এই প্রতিষ্ঠান। এ'দের গঠনতন্ত্রে ছিল, ধর্মমত-নির্বিশেষে মুসলমান ছাড়া অন্যেরাও এর সভ্য হতে পারবে। অর্থাৎ নামটা বাদ দিয়ে বাকী অন্য সবকিছুতে যতখানি অসাম্প্রদায়িক করা যায় তাই করা হয়েছিল। সমিতি যে রকম সমর্থন পেল তাতেই বোঝা গেল অসাম্প্রদায়িকতার শক্তি যথেষ্ট প্রবল। শুধু বর্ধমান জেলায় নয়, সারা বাংলাতেই এরকম শক্তি যথেষ্ট ছিল। ১৯২৭-এ বর্ধমান শহরে এ দের নিখিলবঙ্গ সম্মেলন হলো। আজীবন জাতীয়তাবাদী মৌলভী মুজিবর রহমান হলেন সভাপতি, বক্তা আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। উল্লিখিত যুব-প্রতিষ্ঠানের অসাম্প্রদায়িকতার দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য এবং সেবাব্রতের আকর্ষণে এ'দের সঙ্গে আমিও যুক্ত ছিলাম।

যাঁরা বুর্জোয়া নেতৃত্বের ব্যর্থতার দরুণ এবং সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের প্রচারের ফলে কংগ্রেস থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলেন, তাঁদের কী করে পুনরায় আকর্ষণ করে নিয়ে আসা যায়, বেশীর ভাগ কংগ্রেস-কর্মীরাই এসব ভাবতেন। ১৯৩১ সালে যুব-সম্মেলনের আহ্বান ঘোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উদ্যোগী নেতৃবৃন্দ এটাও সম্মেলনের একটা লক্ষ্য রেখেছিলেন। স্বভাবতই বিনয়দা প্রমুখ নেতৃবৃন্দ আমার সঙ্গে এ বিষয়ে আলাপ করেন। আলাপে উপরোক্ত যুব-প্রতিষ্ঠানের কথা ওঠে। মথুরাদা এ'দের কাজকর্ম ইত্যাদির খবর রাখতেন। অনেক সময় তাঁরা তাঁর সাহায্য নিয়েছেন। এ'দের গঠনতন্ত্র দেখা হলো। ঠিক করা হলো, সম্মেলনে অন্যান্য যুব-সংঘের মতো এদেরও অ্যাফিলিয়েশন দেওয়া হবে এবং তাঁরা যাতে অংশগ্রহণ করেন তার বিশেষ প্রয়াস করা হবে। এ'দের মধ্যে অনেককেই ব্যাক্তিগত-ভাবে অভ্যার্থনা-সমিতির সভ্য করা হয়েছিল। এখন ও'রা যাতে এতে ভাল সংখ্যায় প্রতিনিধি হন এবং অংশগ্রহণ করেন তার চেষ্টা করা হলো। ফল ভালো হলো।

ঠিক হয়েছিল অভ্যর্থনা-সমিতি সভাপতি মনোনীত করবেন। তিন-জনের নাম প্রস্তাব হলো। দক্ষিণপন্থীরা প্রস্তাব করলেন শরৎচন্দ্রের নাম। বামপন্থীদের প্রার্থী হলেন দুজন, একজন সুভাষচন্দ্র, আর একজন (যদি সম্ভব হয়) বঙ্কিম মুখার্জী। সবারই প্রথম দুজনের নামের প্রতিই

দৃষ্টি। অভ্যর্থনা-সমিতির মুসলমান সভ্যরা একটু মুস্কিলে পড়লেন। শরৎ-চন্দ্র সম্বন্ধে তাঁদের আগ্রহ ছিল। কিন্তু তিনি দক্ষিণপন্থীদের প্রার্থী। দক্ষিণপন্থী রাজনীতির উপর তাঁদের আস্থা ছিল না। তারপর সাম্প্রতিক-কালে তাঁর কিছু লেখা ও বক্তৃতায় তাঁরা ব্যথিত ছিলেন। অন্যদিকে দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর সাধারণত মুসলমানদের শ্রদ্ধা ছিল দেশপ্রিয় যতীন্দ্র-মোহন সেনগুপ্তের উপর। দেশবন্ধুর হিন্দু-মুসলিম প্যাক্ট্‌ কংগ্রেস কর্তৃক বাতিল হওয়ার পর মুসলমানদের বিক্ষোভের অনেকটা সুভাষচন্দ্রের উপর অর্শেছিল। প্রাথমিক শিক্ষা ও প্রজাস্বত্ব আইনের ব্যাপারে স্বরাজদলের অন্যান্যরা ছাড়া তাঁর প্রতিও বিক্ষোভও ছিল। এদিকে বঙ্কিমবাবু সম্বন্ধে তাঁরা কিছুই জানেন না। যখন শুনলেন, কমিউনিস্ট—তাতেও কোনও ফল হলো না। কারণ, কমিউনিস্ট কী ব্যাপার তা শুধু তাঁরা কেন, সাধারণ-ভাবে দেশের রাজনীতিক মানুষদেরও ভালো জানা ছিল না। মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার প্রচারে যেটুকু শুনেছিলেন তাতে বুঝেছিলেন কমিউনিস্টরা সাম্য চায়, মানুষে মানুষে ভেদের তারা বিরোধী। কিন্তু বিরোধী প্রচারে এ-ও শুনেছিলেন, তাঁদের বড় দোষ তাঁরা নাস্তিক। অথচ এই তিনজনের মধ্যেই সিদ্ধান্ত করতে হবে। শেষকালে তাঁদের আলোচনায় দুটো মত হলো। একটা মত দাঁড়ালো, যখন নাস্তিক তখন হিন্দু-মুসলমান-খৃষ্টান কোনও ধর্মই মানে না, সাম্যে বিশ্বাসী। সুতরাং অসাম্প্রদায়িক। আর একটা মত হলো, কমিউনিস্ট তা কি দেখাই যাক না। ফলে তাঁদের মধ্যে বঙ্কিমবাবুর পক্ষেই সমর্থনটা বেশী মনে হলো। এই অবস্থায় নির্বা-চনের একটি পদ্ধতি নির্ণীত হলো: প্রত্যেকেই তিনবার ভোট দিতে পারবেন। এক-একজনের নাম করা হবে এবং পক্ষে ও বিপক্ষে ভোট নেওয়া হবে। পর পর এইভাবে করে যাঁর পক্ষে বেশী ভোট তিনিই সভাপতি নির্বাচিত হবেন। ভাবা হলো, এমনতো হতে পারে, আমাদের ভোট এবং ঐসব পাঁচরকম ভোট মিলে হয়তো বঙ্কিমবাবুই জয়ী হবেন। বামপন্থীদের মধ্যে যাঁরা বঙ্কিমবাবুর পক্ষে তাঁরা সুভাষবাবুর পক্ষেও ভোট দিলেন এবং পরে বঙ্কিমবাবুর পক্ষেও। শেষে দেখা গেল আমাদের ক্যালকুলেশান, আমাদের আন্দাজ ঠিক হয়েছে। বঙ্কিমবাবুর নামই সর্বাপেক্ষা বেশী ভোট পেল। সেদিন কমিউনিস্টদের এইরূপ জয় অপ্রত্যাশিত। সবাই আশ্চর্য হয়েছিলেন।

বঙ্কিমবাবু একটি মুদ্রিত অভিভাষণ এনেছিলেন। সেটি বিতরিত হলো। কিন্তু তিনি সেটাকে ফেলে রেখে চার ঘণ্টা ধরে বক্তৃতা দিলেন।

বিনয়দা বলেছিলেন, এই বক্তৃতা জীবনে তাঁর তিনটি শ্রেষ্ঠ বক্তৃতার অন্যতম। আর দুটির মধ্যে ঝাঁসীতে দেওয়া হিন্দী বক্তৃতা এবং বর্ধমানের ১৯৫২ সালের নির্বাচনে পার্টির প্রার্থীর পক্ষে বক্তৃতা। চল্লিশ দশকে বঙ্কিমবাবু আমাকে একবার বলেছিলেন, ১৯৩১ সালের বর্ধমানের ঐ বক্তৃতাই তাঁর শ্রেষ্ঠ বক্তৃতা।

বক্তৃতার প্রথমেই তিনি কংগ্রেসের আপসনীতি এবং আশুঘটিত এই রকম ঘটনার কিছু আলোচনা করেই ইতিহাসে চলে গেলেন। সিরাজ-উদ্দৌলার পরাজয়, মীরকাশিমের পরাজয়, ১৮৫৭ সালে সিপাহীদের উদ্যোগে স্বাধীনতার যুদ্ধ, প্রত্যেকটিতে আমাদের পরাজয় ঘটল কীরূপে? —এই প্রশ্ন তুলে দেখালেন, এসব আকস্মিক নয়। এইভাবে দৃষ্টান্ত তুলে ভারতের ইতিহাসের মাধ্যমে মার্কসের দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের পরিচয় করালেন। একটা বিষয় থেকে আর একটা বিষয় গড়িয়ে গড়িয়ে মার্কসীয় অর্থনীতি, দর্শন, ইতিহাস কিছুই বাদ দিলেন না। দেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাসও আলোচনা করলেন।

তাঁর বক্তৃতা এমন হৃদয়গ্রাহী হয়েছিল যে সম্মেলনের উদ্যোগী যুবকরা সবাই তা তৎক্ষণাৎ গ্রহণ করলেন। শ্রোতারা বিশেষ আলোড়িত হলেন।

এই বক্তৃতা, পরে প্রস্তাবগুলি (বিশেষ করে রাজনৈতিক প্রস্তাবগুলি) গৃহীত হওয়ায় সাহায্য করলো। মুসলমান প্রতিনিধিদের আমরা কতটা টানতে পেরেছি তার পরীক্ষা এল মিশ্র নির্বাচনের প্রস্তাবে। সম্মেলনে এটা উপস্থিত হওয়ার আগে এ বিষয়ে আলোচনা করবার জন্য আমাদের মুসলমান প্রতিনিধিদের একটা ইন্‌ফরম্যাল সভা করলাম। আমি সেখানে মিশ্র নির্বাচনের পক্ষে সজোরে এক বক্তৃতা দিলাম। পরবর্তীকালে বাংলা-দেশে মুসলিম লীগের সম্পাদক আবুল হাশিম সাহেব একজন প্রতিনিধি ছিলেন এবং এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। তিনিও আমাকে সমর্থন করে মিশ্র নির্বাচনের পক্ষে বক্তৃতা দিলেন। ফলে উক্ত ইন্‌ফরম্যাল সভায় আমার বক্তব্য, মিশ্র নির্বাচন, সর্ববাদিসম্মতিক্রমে গৃহীত হলো। বলা বাহুল্য, প্রতিনিধি সম্মেলনেও তা অনুরূপভাবে গৃহীত হলো।

সুতরাং সম্মেলনের মাধ্যমে বর্ধমানে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের ব্যাপারে ঘটলো এক বড় পদক্ষেপ, এক বড় অগ্রগতি।

যেসব মুসলমানদের সেদিন সম্মেলনে আনতে পেরেছিলাম, তাঁদের সকলকে আমরা পরবর্তীকালে ধরে রাখতে পারিনি। মাত্র কয়েকজন বরাবর সঙ্গে ছিলেন। কিন্তু তবু এমন অবস্থা সৃষ্ট হয়েছিল যে পরবর্তী-

কালে গণ-আন্দোলনে, যেমন ক্যানেল কর-বিরোধী আন্দোলনে, সাধারণ-ভাবে কৃষক আন্দোলনে, তাঁরা মুসলীম লীগের মধ্যে থাকলেও প্রত্যক্ষ-ভাবে আমাদের বিরোধিতা করতে পারতেন না। এমনকি তাঁদের মধ্যে অনেকে প্রগতিশীল গণ-আন্দোলনে আমাদের সমর্থন করতে বাধ্য হতেন। এই রকম প্রভাবে ১৯৪২ সালে জেলা বোর্ড গঠনের সময় আনুষ্ঠানিকভাবে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ মিলিত হয়ে কংগ্রেসের চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান নিয়ে জেলা বোর্ড গঠন করেন—যা ভারতের অন্যত্র কোথাও হয়নি এবং হওয়া ছিল অভাবনীয়। এই জন্যই উপরে লিখেছি, সাম্প্রদায়িক ঐক্য-সমস্যাতেও ১৯৩১ সালের যুব সম্মেলন এক প্রগতির পদক্ষেপ।

সম্মেলন থেকে দুটি অনুপ্রেরণা স্পষ্টভাবে বেরিয়ে এলো। প্রথম কমিউনিজমের প্রতি আকর্ষণ। ধারণা পরিষ্কার না হলেও আমরা সবাই কমিউনিজমকেই লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করলাম। দ্বিতীয়, শ্রমিক-কৃষক আন্দোলন গড়ে তোলার সংকল্প।

এর অব্যবহিত পরেই একই উদ্যোগে বর্ধমান বিভাগীয় সমাজবাদী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো। শ্রদ্ধেয় ডাক্তার ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ছিলেন সভাপতি। এই সম্মেলনেও উপরোক্ত অনুপ্রেরণা আরও সতেজ হয়।

অনতিকাল পরে আমরা পরস্পরের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লাম। সরকারী নিষ্পেষণ তীব্র হতে তীব্রতর হলো। বিনয়দা, হরেকেষ্ট প্রমুখ গ্রেপ্তার হলেন। ডিটেনশান্ আইনে জগুদাও বন্দী হলেন। সরোজদা কলকাতা গেলেন এবং সেখানেই রাজনীতিক কাজ গ্রহণ করলেন। পরে ১৯৩৩ সালে হাটগোবিন্দপুরে অনুষ্ঠিত বর্ধমান জেলা কৃষক সমিতির সম্মেলনে যোগদান করেন ও ভাষণ দেন। ১৯৩১ সালে বর্ধমান ছাড়ার পর ১৯৩৩ সালে কৃষক সম্মেলনে উপস্থিতি ব্যতিরেকে স্বাধীনতা পর্যন্ত তাঁর বর্ধমানের রাজনৈতিক কর্মক্ষেত্রের সঙ্গে কোন যোগ ছিল না। স্বাধীনতার পর নির্বাচনের কয়েকটি প্রচার-সভায় প্রভৃতিতে যোগদান করেন, বক্তা হিসাবে আহূত হন। ১৯৬৭ সালে তাঁকে বর্ধমানের প্রার্থী করায় আমরা আবার তাঁর প্রত্যক্ষ সাহচর্য পাই। অতঃপর কিছুদিনের মধ্যেই তাঁকে জেলে যেতে হয়। পরে জেল থেকে ফিরে কলকাতাতেই শ্রমিক-আন্দোলনে কাজ করেন।

এই সময়ের মধ্যেই হাটগোবিন্দপুরে কমরেড হেলারাম চট্টোপাধ্যায়ের উদ্যোগ ও নেতৃত্বে কৃষক সমিতির কাজকর্ম চলছিল। ইতিপূর্বেই একটি

সাংগঠনিক কমিটি গঠিত হয়েছিল। কমরেড হেলারাম চট্টোপাধ্যায় এবং রমেন চৌধুরী যুগ্ম-সম্পাদক হন। কমরেড হেলারাম ১৯৩৩ সালে তথা ১৯৪০ বঙ্গাব্দে হাটগোবিন্দপুর গ্রামে সমিতির প্রথম আনুষ্ঠানিক সম্মেলনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। ১৩৪০ সালের ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ অভ্যর্থনা সমিতির এক সভায় ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত সভাপতি নির্বাচিত হলেন এবং রক্ত-পতাকা উত্তোলনে কমরেড বঙ্কিম মুখার্জীর নাম গৃহীত হলো। (পরে তিনি অন্যত্র কাজের জন্য যোগদান করতে পারেননি)। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি কমরেড চন্দ্রশেখর কোঙার তাঁর ৭ই জ্যৈষ্ঠের বিবৃতিতে সম্মেলনের কথা উল্লেখ করে বলেন ঃ "জমিদার, মহাজনদের যে অত্যাচার চলিতেছে তাহা বন্ধ করিবার উপায় উদ্ভাবন করিতে হইবে। যাহাতে কৃষকশ্রেণী কংগ্রেস, প্রজা-পার্টি প্রভৃতি বুর্জোয়া প্রতিষ্ঠানের ধাপ্পায় পড়িয়া ভ্রান্ত পথে চালিত না হয় এবং তাহারা যাহাতে প্রকৃত শ্রেণীস্বার্থের সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইতে পারে, এ বিষয়ে কৃষকদের সচেতন করিয়া দেওয়াই সম্মেলনের উদ্দেশ্য।" প্রস্তাবাদিতে কৃষকের তখনকার অবস্থা ও দাবী-দাওয়া বিবৃত হয়। কৃষি-পণ্যের দাম তখন খুব কমে গিয়েছিল। (দৃষ্টান্তস্বরূপ, ধানের দাম ৩০ দশক ধরেই ২˙২৬ টাকা মন থেকে ২˙৩৭ টাকা মন মতো ছিল। কিছুদিনের জন্য ১˙২৫ টাকা মন পর্যন্ত নেমে গিয়েছিল)। অনুপাতে খাজনা হ্রাস এবং তিন বৎসরের জন্য বিনাসুদে খাজনা আদায় স্থগিত করার দাবী করা হয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের উচ্ছেদ এবং মধ্য-স্বত্বের লোপ চাওয়া হয়। বাজে আদায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং তার বিরুদ্ধে সংগ্রামের পরিকল্পনার উল্লেখ হয়। জাতীয়তাবাদী পত্রিকা-গুলি নোয়াখালির কৃষক-আন্দোলনকে সাম্প্রদায়িক আখ্যা দিয়ে তার বিরুদ্ধে প্রচার করছিল। তার প্রতিবাদ করা এবং নোয়াখালির আন্দোলনকে সমর্থন করা হয়। নদীতে বাঁধ দিয়ে পুষ্করিণীতে জল নেওয়ার ব্যবস্থা সরকার কোনও কোনও স্থলে করতো। সঙ্গে সঙ্গে এর জন্য ট্যাক্স্ প্রয়োগ করতো। তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বা বাতিলের দাবী করা হয়। এই প্রস্তাব ভবিষ্যতে ক্যানেল কর-বিরোধী আন্দোলনের ইঙ্গিত বহন করে। সম্মেলন-বিবরণীতে উল্লেখ করা হয় ঃ "ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, আশুতোষ দাস, জগন্নাথ সেন, হেলারাম চট্টোপাধ্যায়, রমেন চৌধুরী, সরোজ মুখার্জী, প্রমুখ বহু কৃষক-কর্মী উপরিউক্ত প্রস্তাব সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন ও বিশদভাবে কৃষক-আন্দোলনের ধারা বুঝাইয়া দেন।" অধিবেশন সমাপ্ত হলে—"নিম্ন-লিখিত ব্যক্তিগণ কার্যকরী সমিতির সভ্য নিযুক্ত হয়েছেন ঃ—জগন্নাথ সেন

(সভাপতি), হেলারাম চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদক), অশ্বিনী মণ্ডল ও চন্দ্রশেখর কোঙার (সহ-সম্পাদক), রমেন চৌধুরী (কোষাধ্যক্ষ), কার্যকরী সমিতির সভ্য ঃ—ভোলানাথ কোঙার, মহানন্দ খাঁ, হৃষীকেশ গুহ, সরোজ মুখার্জী, শাহেদুল্লাহ, তারাপদ মোদক, গদাধর কোঙার, শশীপদ দাঁ, গোপীকৃষ্ণ রায় (নাসিগ্রাম), গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, হেমকেশ হাজরা, বিভূতি দত্ত, মুক্তি চট্টোপাধ্যায়, হীরালাল দে, অতুল সামন্ত প্রভৃতি।" এর মধ্যে যাঁরা পরে সক্রিয় ছিলেন তাঁদের অধিকাংশ পরবর্তীকালে পার্টি গঠিত হলে কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য ও সমর্থক হন।

---

* শ্রদ্ধেয় শ্রীবিজয়কুমার ভট্টাচার্যের বাড়ি বর্ধমান জেলার খণ্ডঘোষ থানার ওয়াড়ি গ্রামে। তিনি দর্শনে এম. এ. পরীক্ষায় ভাল ফল করে শিক্ষাকে ব্রত হিসাবে গ্রহণ করে হুগলী জেলার একটি স্কুলে শিক্ষকতা গ্রহণ করেন। অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাতে যোগদান করেন। এই সময় কংগ্রেস কর্তৃক সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা বর্জিত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এইরূপ পর পর কয়েকটি উদ্যোগে অংশগ্রহণ করে শেষে তাঁকে আশাহত হতে হয়। কারণ প্রায় সর্বক্ষেত্রেই দেখা যায় সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করলেও শেষ পর্যন্ত কলকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যোগসূত্র বজায় রাখায় আগ্রহী। তখন সেকেণ্ডারী বোর্ড ছিল না। তখন কলকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ই ম্যাট্রিকুলেশন্ (তখনকার মাধ্যমিক) পরীক্ষা পরিচালনা করত। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নিজেই ছিল সরকারের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৰ্কিত। সিনেটের শতকরা আশি ভাগ সদস্য হতো গভর্নমেণ্ট (অর্থাৎ তখনকার ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট) মনোনীত। সুতরাং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যোগসূত্র রাখাটাই অসহযোগ আন্দোলনের নীতির বিরোধী। ইতিমধ্যে শিক্ষা সম্বন্ধে গান্ধীবাদের প্রভাবে তাঁর নিজের মনেও কিছু আদর্শ ও লক্ষ্য গড়ে উঠেছিল। তার সঙ্গেও উপরিউক্ত উদ্যোগসমূহ খাপ খাচ্ছিল না। ১৯২২ সালে গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহারের পর এবং উল্লিখিত রূপের কয়েকটি ব্যর্থ প্রয়াসের পর তিনি ১৯৩০ সালে স্থায়ীভাবে বর্ধমানে কাজ করার জন্য চলে আসেন। কংগ্রেস নেতৃত্বের অংশ হিসাবে গণ্য হন। স্বাধীনতার পর তিনি ক্রমোত্তর গঠনমূলক কাজে নিযুক্ত হন। লেখাকালে তিনি এখনও জীবিত এবং বর্ধমান শহরের কাছে কলানবগ্রামে তাঁর নিজের প্রতিষ্ঠিত শিক্ষানিকেতনে আছেন।

বর্ধমানে কমিউনিস্ট পার্টি সংগঠন

হাটগোবিন্দপুরের কৃষক-সমিতির সম্মেলনের পর বিচ্ছিন্ন অবস্থায় আমি যোগাযোগ হারাই। (বিনয়দার সঙ্গে একবার মাত্র আণ্ডারগ্রাউণ্ডে কমরেড গদাইয়ের বাসায় সাক্ষাৎ হয়েছিল।) বর্ধমানে কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের কোনও প্রয়াস তখন হয়নি। কমরেড বিজয় মোদক, কমরেড পাঁচু ভাদুড়ী, কমরেড বিনয় চৌধুরী প্রমুখ আই পি. আর. পি. (ইণ্ডিয়ান প্রলেতারিয়ান রেভলিউশানারী পার্টি) নামে একটি দল গঠন করেছিলেন। আমার জানা মতে বর্ধমান জেলা সদরে এই পার্টিরও কোনও সংগঠনের চেষ্টা হয়নি। উপরিউল্লিখিত বর্ধমান বিভাগীয় সমাজবাদী সম্মেলনে হুগলীর কমরেডদের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল। আমার তখন একান্ত কামনা বর্ধমানে কমিউনিস্ট পার্টি তৈরী হোক এবং আমি তাঁদের সঙ্গে যুক্ত হই। কিন্তু সূত্র ছিন্ন হয়ে গেছে, করি কী! কমিউনিজ্‌মের পুস্তকাদি পড়তে লাগলাম। বৌবাজার-কলেজস্ট্রীটের মোড়ে ২/২ ওয়েলিংটন স্ট্রীটে ননীদার মেসে, তাঁর কামরায় বঙ্কিমবাবুর ক্লাস হতো। সেই ক্লাসে যোগ দিই। ডাঃ দত্তর সঙ্গে তাঁর বাড়ীতে এবং বেশীর ভাগ সময় 'আত্মশক্তি লাইব্রেরী'তে দেখা-সাক্ষাৎ করি। পার্টি গঠনের কথা মাথায় ঘুরতে থাকে। কিন্তু ৪১ নং জ্যাকারিয়া স্ট্রীটে হালিম ভাই-এর (কমরেড আবদুল হালিমের) ওখানেও দু-একদিন গেছি। কিন্তু আমাদের সি. পি আই.-এ রিক্রুট করার উদ্যোগ কারও দেখলাম না। কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের সপ্তম কংগ্রেসে ডিমিট্রভের যে মিলিত ফ্রন্টের নীতি ও কৌশল ঘোষিত হয়, তার বিচারে পরিহার্য কিছু সংকীর্ণতা তাঁদের নীতি ও কৌশলে ছিল বলে ধারণা হতো। অন্যদিকে যাঁরা সদস্য হতে চাইতেন তাঁদের অনেকের মধ্যে সন্ত্রাসবাদে অর্জিত ধ্যান-ধারণার জের ছিল। সি. পি. আই. নেতৃত্বের এরূপ ধারণার হেতু ছিল, তাও অস্বীকার করা যায় না।

যাই হোক, এইসব নানান রকমের ব্যাপারে বর্ধমানে কমিউনিস্ট পার্টির কমিটি গঠনের উদ্যোগ ব্যাহত হচ্ছিল। ১৯৩৫ সালে দামোদরের

বড় বান। দামোদরের উভয় তটে বিস্তৃত অঞ্চল প্লাবিত হলো (উত্তর তট বাঁধ ভেঙে)। বর্ধমান শহরেও বান হলো। জেলায় চতুর্দিক থেকে আমাদের সমসাথী কর্মীরা জড়ো হলেন রিলিফের কাজে। সবাই আমরা নেমে পড়লাম বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে। কয়েক মাস রিলিফের কাজ চললো। এই বিপদে কিন্তু একটা সুফল হলো। আমরা পরস্পরের মধ্যে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করতে পারলাম। ওদিকে ১৯৩৫ সালের আগস্ট মাস নাগাদ সপ্তম আন্তর্জাতিকের প্রস্তাবাদি এবং ডিমিট্রভের থিসিস ভারতে আসে। এইরূপ পরিস্থিতিতে সি. পি. আই.-এর দরজা কিছুটা উন্মোচিত হলো। আই. পি. আর. পি-র কমরেডরা সি পি. আই.-এর সদস্য হলেন। কমরেড হেলারাম চট্টোপাধ্যায় কলকাতায় এসে শ্রমিক-আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন ও সি. পি. আই.-এর সদস্য হয়েছিলেন। তিনি আসায় আমি একটা অবলম্বন পেলাম। তাঁতে-আমাতে বর্ধমান জেলা কমিটি গঠন করার আলোচনা হতে লাগলো এবং উদ্যোগ শুরু করলাম। হুগলীর কমরেডরা আমাকে এ-বিষয়ে খুব উৎসাহ দিতে থাকেন। মনসুরের মাধ্যমে সংবাদ পেলাম, আমাদের সদস্য করা ও বর্ধমানে জেলা কমিটি গঠন করা সি. পি. আই. নেতৃত্বের অনুমোদন লাভ করেছে। (মনসুর ১৯৩১ সালেই কিশোর বয়সে স্বেচ্ছাসেবকের লাল কুর্তা গায়ে চড়িয়েছিলেন। ১৯৩৩ সালে কৃষক সম্মেলনেও আমার সঙ্গে গিয়েছিলেন। আর ইতিমধ্যেই কলকাতার কোনও লেবার ইউনিয়নের কাজে যুক্ত ছিলেন। আমরা যখন বর্ধমানে কমিটি করি সে সময় তিনি কলকাতায় পার্টি-সদস্য হন)।

১৯৩৫ সালের ৫ই অক্টোবর পূর্বসিদ্ধান্ত মতো এবং পূর্বে প্রেরিত কর্মসূচী মতো সি. পি. আই.-এর প্রাদেশিক কমিটির সম্পাদক কমরেড মণি চ্যাটার্জী বর্ধমানে এলেন। কারা সদস্য হবেন পূর্বে জানানো হয়নি। জানানো সম্ভবও ছিল না। সিদ্ধান্ত হয়েছিল, আমরা তাঁদের উক্ত তারিখে সমবেত করবো। তাই হলো। বৈঠকে একে একে নাম প্রস্তাবিত হলো এবং পরিচয় করিয়ে দেওয়া হলো এবং কমরেড মণি চ্যাটার্জী সে নাম লিখে নিলেন। কমরেড হেলারাম চট্টোপাধ্যায়, শাহেদুল্লাহ, অশ্বিনী মণ্ডল, ধীরেন চট্টোপাধ্যায়, শিবপ্রসাদ মুখার্জী—এ'দের নিয়ে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির বর্ধমান জেলা কমিটি গঠিত হলো। আমি সম্পাদক হলাম। বৎসর দুই-এর মধ্যে কমরেড ধীরেন চ্যাটার্জী আমাদের ছেড়ে চলে যান—রাজনীতি ছেড়ে ব্যক্তিগত সাংসারিক জীবনে নিয়োজিত হন।

পরে জেলা কমিটিতে আসেন কমরেড মহানন্দ খান এবং শিবপ্রসাদ দত্ত (ওরফে আলু)।

জেলা কমিটি গঠন হলো। এরপর অর্ধশতাব্দী ধরে কত কী ঘটে গেছে। সমগ্র জেলাব্যাপী কত সংগ্রাম কত আন্দোলন কত সাফল্য। প্রথমে বিদেশী সরকার, তারপর কংগ্রেসী সরকার, কত জুলুম, কত অত্যাচার, শত্রুর নৃশংসতম আক্রমণের সম্মুখীন হতে হয়েছে। কত তাজা প্রাণ চলে গেল শত্রুর আক্রমণে। প্রথম শহীদ সুকুমারকে প্রাণ দিতে হয়েছিল রাণীগঞ্জ কাগজকলের ধর্মঘটে পিকেট লাইনে। ইউরোপীয় অফিসার পরিকল্পিতভাবে লরিতে পিষে দিয়ে গিয়েছিল। তারপর আজ পর্যন্ত শত শত শহীদ শুধু এই জেলাতেই পুলিশের গুলিতে এবং ঘাতকের ছুরিতে প্রাণ দিয়েছে। এই সমগ্র কাহিনী ধরে রাখার উদ্দেশ্যেই এই লেখার অবতারণা। কিন্তু কত কথাই মনে এসে ভিড় করছে। তার কি রূপ দিতে পারবো ? সন্দেহ স্বাভাবিক। কিন্তু তবু এইটুকু সত্য রক্তরঞ্জিত পতাকায় লেখা থাকবে যে, সব আক্রমণকে পরাজিত করে পার্টি এগিয়ে গেছে, প্রসারিত হয়েছে—গ্রাম-গঞ্জে, শহরে, কলে-কারখানায়, মাঠে, স্কুলে ও কলেজে।

জেলা কমিটি গঠনের পর প্রথম সভায় কমিউনিস্ট পার্টির লক্ষ্য ও রীতিনীতি আলোচনা, আন্তর্জাতিকের কিছু বর্ণনা, এতেই শেষ হলো। কৃষক সমিতির সভ্যসংগ্রহ প্রভৃতির কিছু কার্যসূচীও নেওয়া হলো। এরপর সদস্যরা নিজ নিজ অঞ্চলে ফিরে গেলেন। আশু কর্মসূচীর তাগিদ ছাড়া তখন শহরে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থাও আমাদের ছিল না।

মাসাধিক কাল পরেই কলকাতা থেকে খবর এল পার্টির প্রাদেশিক সম্মেলনের। পার্টি বে-আইনী, সুতরাং সম্মেলনও হবে গোপনে। দু'জন প্রতিনিধি নির্বাচন করতে হবে এবং গোপন ব্যবস্থায় যোগদানের জন্য নির্দেশ ইত্যাদি নিতে হবে। আমি ও কমরেড হেলারাম চট্টোপাধ্যায় প্রতিনিধি নির্বাচিত হলাম। কমরেড হেলারাম তখন কালনা-বর্ধমান রুটে বাসে চাকরি নিয়েছেন। তাঁর সঙ্গে অবিলম্বে যোগাযোগ করলাম। বর্ধমান শহরে বনু মসজিদ ছিল এক পরিত্যক্ত জনহীন এলাকা। ওখানে দু'জনে মীট্ করলাম। অনেকক্ষণ ধরে আলাপ-আলোচনা হলো। তাঁর পুরনো অভিজ্ঞতা আছে। তিনি যখন সঙ্গে থাকছেন তখন সুবিধা হবে, মনে এই ভরসাটা ছিল। কিন্তু আশাহত হতে হলো। তিনি চাকরির

অসুবিধার দরুণ অক্ষমতা জানালেন। অবশ্য এই চাকরিই হয়েছিল তাঁর জীবিকার অবলম্বন। ১৯৩৭-এর আগে তাঁর সংসারের নিয়মিত ভার আমরা নিতে পারিনি।

অগত্যা আমাকে একাই যেতে হলো। গোপনীয়তার নির্দেশ অনুসরণ করে নির্দিষ্ট জায়গায় উপস্থিত হলাম। বলা বাহুল্য, ইতিপূর্বে এ ধরণের কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না বলে বেশ কিছুটা রোমাঞ্চ বোধ করছিলাম। দেখলাম একটি খালি বাড়ি নেওয়া হয়েছে। খালি বাড়ির দোতলায় একটি কামরায় সম্মেলনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। গার্ড দেবার জন্য একজন শক্তিশালী স্বেচ্ছাসেবকও ছিলেন। দু'চারজন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। পরে আরও এলেন। সংখ্যায় অবশ্য বেশী নয়, কারণ পার্টি তো তখন ছোট। কলকাতা, চব্বিশ পরগণার ট্রেড ইউনিয়নের কর্মীরা ছাড়া মফঃস্বলের মাত্র তিনটি জেলার জেলা-কমিটির প্রতিনিধি ছিলেন—হুগলী, বর্ধমান এবং যশোর। প্রতিনিধি কমরেড বিশ্বনাথ মুখার্জী এবং আরও কয়েকজন পূর্ব থেকেই পরিচিত। এর মধ্যে ছিলেন স্মৃতীশ ব্যানার্জী, যিনি পরে পার্টির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে কংগ্রেসে চলে যান। নতুন যাঁদের চিনলাম তাঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন যশোরের কৃষ্ণবিনোদ রায়। এ'র নাম শোনা ছিল, কিন্তু পূর্বে দেখিনি। পরবর্তী কালে ইনি সি পি. আই.-এ চলে যান। শেষে সি. পি আই. ছেড়ে ডাঙ্গেপন্থী হন। কিছু দিন আগে মারা গেছেন। পরদিন সকালে সম্মেলন আরম্ভ হওয়ার কথা। সন্ধ্যাবেলায় সম্পাদক কমরেড মণি চ্যাটার্জী বললেন, রিপোর্টের আর একটা কপি থাকা দরকার। কপিটা শেষ হতে কিছু বাকি আছে। এই নিয়ে স্মৃতীশ ব্যানার্জী, কমরেড মণি চ্যাটার্জী ও কমরেড রণেন সেনের সঙ্গে কলহ শুরু করে দিলেন। আমার মনোভাব ছিল ভিন্ন। এই প্রারম্ভিক কালে নেতা বলেই (সমালোচনা যা-ই হোক) পরস্পরকে সাহায্য করে যেতে হবে। আমি ও আরও দু'-একজন একটা কপি করতে লেগে গেলাম। এটা উল্লেখ করছি এই জন্যেই, এই প্রকৃতি ব্যক্তিটিকে শেষ পর্যন্ত বিশ্বাস-ঘাতকে পরিণত করলো। এখানে একটা কথা বলা দরকার। কমরেড মণি চ্যাটার্জীকে দেখতাম বেশ ভাল মানুষ, কিন্তু শেষ পর্যন্ত বুঝলাম আসল ব্যক্তি কমরেড রণেন সেন। কমরেড হালিম তখন জেলে। তখন তিনিই (রণেন সেন) প্রধান হয়েছেন। রিপোর্টের ইম্প্রেশন শুধু এই আছে, বিশ্ব অর্থনৈতিক সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে সোভিয়েতের পঞ্চবার্ষিকী পরি-কল্পনার সাফল্য। আর একটা ইম্প্রেশন ছিল, যাঁরা বাংলাদেশে তখনও

নেতৃত্ব দিচ্ছেন তাঁরা আন্তর্জাতিকের সপ্তম কংগ্রেসে গৃহীত ডিমিট্রভের ইউনাইটেড ফ্রণ্টের মর্ম সম্পূর্ণ গ্রহণ করতে পারেন নি। আনুষ্ঠানিক ভাবে গ্রহণ করলেও মনে বেশ কিছুটা রিজার্ভেশন আছে। অন্যদিকে এ-ও স্বীকার করতে হবে, আমরা যারা নতুন এসেছিলাম তারাও যে সব পুরনো ঝোঁক কাটাতে পেরেছিলাম, তাও নয়। পরে কাজের মধ্যে দিয়ে এসব অনেক কেটে গিয়েছিল এবং সম্মিলিত পার্টির নীতি রূপ নিচ্ছিল। আবার এও সত্য, সেই প্রথম সম্মেলনেই কয়েকটি নির্দিষ্ট ঝোঁকের প্রকৃতি দেখেছিলাম, যা পরে বিকাশ লাভ করেছে। সেই সম্মেলনে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের মধ্যে বোধ হয় শেষ পর্যন্ত সি. পি. আই. (এম)-এ এলাম একা আমি। ১৯৬৪ সালে সি পি. আই. (এম) গঠিত হবার পর যাঁরা বেঁচে ছিলেন বা এখনও আছেন, সম্মেলনে উপস্থিতের মধ্যে আমি ছাড়া কেউই সি পি. আই. (এম)-এ থাকেন নি। সারমর্ম একটা কথা বুঝে নিলাম। কাজ করতে হবে আসল ময়দানে অর্থাৎ আমার ক্ষেত্রে আমার জেলায়। এদের কথার কচ্‌কচি ও তুচ্ছ বিষয়ে বিতর্ক ও তাই নিয়ে দলাদলি, এসব পরিহার করে চলতে হবে।

উপরে তৎকালীন নেতৃত্বের সঙ্কীর্ণতার কথা উল্লেখ করেছি। এর ফলে নবাগত অনেকে অধীর হয়ে উঠেছিলেন। আমি তাত্ত্বিক দিক থে ক সাধারণভাবে সঙ্কীর্ণতা পরিহারের পক্ষে থাকলেও অধীরতা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির বিরুদ্ধে ছিলাম। সেইজন্য সবারই সব কিছু শুনতাম, কিন্তু বুঝতাম বর্ধমানে পার্টি গঠনে এ'রা কেউ চেষ্টা করলেও প্রতিবন্ধক হতে পারবেন না। সুতরাং এসব বাগবিতণ্ডা যা কিছু আমার কাছ থেকেই প্রতিহত হয়ে ফিরে যেতো, জেলার ভিতরে আর যেতো না। যাঁরা নেতৃত্বের বিপক্ষে অভিযোগ আনছিলেন তাঁদের মধ্যে সবাই অসৎ উদ্দেশ্যবিহীন ছিলেন তা নয়। যাঁরা এটা বুঝতেন না এবং অনেক কিছু সাধারণ ত্রুটি বলে ক্ষমা করতেন, তাঁদের কাছে অসৎ উদ্দেশ্যটা পরিষ্কার হয়ে গেল যখন প্রধান বিশৃঙ্খলাকারী মানিক বাড়ুজ্জ্যে ১৯৪৫ সালে কংগ্রেসের দরজায় গিয়ে প্রবেশ করলেন। দঙ্গলে পড়ে কমরেড বিশ্বনাথকে কিছুদিনের জন্য সাস্‌পেন্‌ডেড হতে হলো। প্রধান অভিযোগকারী অবশ্যই কমরেড সেন। কিন্তু যখন কংগ্রেস-প্রেমের আধিক্য ও তন্নিমিত্ত পার্টিতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অভিযোগ, তখন তো কংগ্রেস ও বুর্জোয়াজী ক্ষমতায় আসীন নয়। যখন তাঁরা আসীন হলেন তখন দেখলাম কমরেড রণেন সেন সেই ক্ষমতার পূজায় বিশ্বনাথের চেয়ে কম যান না।

ইতিমধ্যে জেলায় আমরা মুষ্টিমেয় যে কয়জন আছি কাজের মাধ্যমে সংখ্যার স্বল্পতার সীমাকে অতিক্রম করতে খুব সচেষ্ট হয়েছি। শহরে ও গ্রামে কংগ্রেসের সভ্য সংগ্রহের মাধ্যমে উক্ত সংগঠনে আমাদের প্রভাব বৃদ্ধির চেষ্টায় আমাদের প্রোগ্রাম আরম্ভ করলাম। ফেব্রুয়ারী মাসের পর একটা বড় কাজের দায়িত্ব এসে পড়ল। জেলার উত্তরাঞ্চল মঙ্গলকোট, কাটোয়া, মন্তেশ্বর পূর্বস্থলী থানায় (বিশেষ করে শেষের তিনটি থানায়) দারুণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। কংগ্রেসের রিলিফ্ ক্যাম্পের মাধ্যমে রিলিফ্ শুরু হলো। কমরেড অশ্বিনী মণ্ডল এর নেতৃত্ব দিলেন। দাবি-দাওয়ার অভিযোগেও আমরা আন্দোলন আরম্ভ করলাম। মনসুর এ সময়ে কলকাতায় মেম্বার হলেও বর্ধমানের কিছু কিছু কাজে লিপ্ত হয়ে পড়তেন। তিনি প্রায় গোটা মন্তেশ্বর থানা ঘোরাঘুরি করে প্রায় দুই হাজারের উপর দুর্ভিক্ষ-ক্লিষ্ট গ্রামবাসীদের নিয়ে এসে বর্ধমানের ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে গণদাবী পেশ করলেন। এই হল আমাদের প্রথম 'হাঙ্গার মার্চ'। চৈত্রের তৃতীয় সপ্তাহের শেষ। দারুণ রৌদ্রতাপ। মানুষের অসহনীয় ক্লেশ ও কষ্ট। তাও তারা উৎসাহিত। শহরের শিবপ্রসাদ দত্ত প্রমুখ আমাদের কর্মীদের নেতৃত্বে বেশ কিছু মানুষ সক্রিয় হয়ে চাল, ডাল, তরকারী ইত্যাদি খাদ্যসামগ্রী সংগ্রহ করে রান্নাবান্না করে তাদের খাওয়ানোর ব্যবস্থা করলেন। এতে শহরের মানুষও আমাদের অনেক নিকটে এলেন। বৃটিশ শাসনে সরকারী রিলিফ্ পাওয়া ছিল কঠিন। টেস্ট-রিলিফের কঠোর পরীক্ষার মাধ্যমে তা করা হতো। যাই হোক্, আমাদের আন্দোলন এবং রিলিফ্-প্রচেষ্টার ফলে সরকারী যন্ত্রকেও কিছু নড়াচড়া করতে হলো।

ইতিমধ্যে বর্ধমান শহরে আমরা ছাত্রদের মধ্যে আন্দোলন শুরু করার কথা ভাবতে লাগলাম। ১৯৩০-৩২ সালে সুভাষ-কংগ্রেস আর সেনগুপ্ত-কংগ্রেস ভাগাভাগির সঙ্গে ছাত্র-আন্দোলনও বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। সুভাষবাবুর ভক্তরা এ. বি. এস. এ. (অল্ বেঙ্গল স্টুডেন্টস্ এ্যাসোসিয়েশন) থেকে বেরিয়ে বি. পি. এস. এফ. (বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল্ স্টুডেন্টস্ ফ্রন্ট) গঠন করেছিলেন। একদিকে এই অনৈক্য ও বিভেদ, অন্যদিকে ব্যাপক ও প্রচণ্ড সাম্রাজ্যবাদী নিষ্পেষণ, গ্রেপ্তার, ধরপাকড় ইত্যাদি। ফলে এসব সংগঠনের চিহ্ন বিলুপ্ত হয়েছিল। সুতরাং আমরা ঠিক করলাম, নতুন ভাবে সব কিছু আরম্ভ করা যাবে। আমি তখন আর ছাত্র নেই। সুতরাং সামনাসামনি উদ্যোগটা মনসুরকেই নিতে হল। আমরা চিন্তা করে দেখলাম

চারিদিকে ভয়ভীতিটা বেশী। সুতরাং সাধারণ ছাত্রকে টানতে হলে খুব নীচু খাদেই আরম্ভ করতে হবে।

আমরা প্রথমে কিছু ছাত্র যোগাড় করলাম, যাঁরা বছর খানেক আগে বন্যা-রিলিফের কাজে আকৃষ্ট হয়ে ঐ কাজে আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন এবং বন্যা-বিধ্বস্ত এলাকায় কঠোর পরিশ্রমও করেছিলেন। এর মধ্যে প্রথম ছিলেন আমার জ্যাঠতুতো ভাই সৈয়দ আবদুর রসিদ আর তাঁর বন্ধু ও আমার স্নেহভাজন নরেন দত্ত। (রসিদ পরে আর কোন সামাজিক বা রাজনৈতিক কাজে থাকেন নি। ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে মিলিটারীতে যোগ দিয়ে জাপানের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে চলে যান)। ইতিমধ্যে আরো কয়েকজন ছাত্রের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হয়েছিল। বিনয়দার ভাই আমার বন্ধু ভৈরব চৌধুরী বিপ্লবের কিছু বইটই রেখেছিলেন। তিনি ঐসব কিছু ছাত্রকে পড়িয়ে তাদেরকে বিপ্লবের পথে আকর্ষিত করেছিলেন। পরে তিনি এসব প্রচেষ্টা আর করেন নি। কিন্তু সেই প্রাথমিক প্রয়াসেই কিছু আন্তরিক ও সিরিয়াস টাইপের ছাত্র উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। এঁরাও ছাত্র-সম্মেলনের কর্মী হন এবং পরে সকলেই পার্টিতে যোগদান করেন ও পার্টির একনিষ্ঠ কর্মী হন। শহীদ প্রভাত কুণ্ডু (যার নামে সি. পি. আই. (এম)-এর বর্ধমান পার্টি-ভবন হয়েছে), গলসীর বেলগাঁয়ের প্রয়াত ধর্মদাস রায়, নাসের আলি (শহীদ শিবশঙ্কর সেবা-সদনের সাথে যুক্ত), আর রণজিৎ গুহ (এঁকেও শহীদ বলা যায়, আসানসোল খনি-এলাকায় কাজ করার সময় ইরিসিপ্লাস বা জহর মোরায় আক্রান্ত হয়ে যান। খনি-অঞ্চল থেকে আসানসোল নিয়ে আসতেই অনেক সময় লেগে যায়। ডাক্তারদের নির্দেশে অবিলম্বে কলকাতার হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হলো। তখন পেনিসিলিন্ প্রভৃতি ওষুধ ছিল না। কলকাতায় পৌঁছানোর সময় রোগ অনেক এগিয়ে গিয়েছিল। ফলে বাঁচাতে পারা গেল না। মৃত্যু হল।)

এবার সাংগঠনিক রূপ দেওয়ার চেষ্টা হলো। বলেছি, নীচু খাদে শুরু করা হলো। রসিদ সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক অথচ ছাত্র ভাল হিসাবে পরিচিত। বন্যার কাজে কিছু পরিচিত হয়েছেন। তাঁকেই অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক করা হলো। সভাপতি করা হলো তাঁর বন্ধু স্নেহভাজন নরেন দত্তকে। আরম্ভ করতেই দেখা গেল ছাত্রদের মধ্যে বেশ সমর্থন পাওয়া যাচ্ছে। এইবার আমরা যুক্তিবাক্তা করে কন্‌ফারেন্স-এ প্রধান অংশগ্রহণকারী কারা হবেন তাও ঠিক করে ফেললাম। উদ্বোধন করবেন বর্ধমানের মহারাজা বিজয় চাঁদ মাহতাব। সভাপতি হবেন হুমায়ুন কবীর এবং প্রধান অতিথি হবেন

শ্রদ্ধেয় শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। এইবার অ্যাপ্রোচ্ শুরু করলাম। মনসুর এনগেজমেন্টের জন্য চিঠি লিখলেন। চিঠির ড্রাফট্ করলাম আমি। এই সামান্য কথাটা উল্লেখ করছি এই জন্য যে, আমি মনসুরকে বলেছিলাম, চিঠিটা রাজা-মহারাজাকে সন্তুষ্ট করার মত হলো কিন্তু ব্যাকরণ ঠিক থাকলেও আদতে ইংরাজী হলো না। বলা বাহুল্য, মনসুরকে কিছু পারিবারিক ও ব্যক্তিগত পরিচয় দিতে হয়েছিল। মহারাজা ইণ্টারভিউ দিলেন, মনসুর দেখা করতে গেলেন আর মহারাজার সম্মতি নিয়ে ফিরলেন। হুমায়ুন কবীর তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। তিনিও রাজি হলেন। মুশকিল হল শ্রদ্ধেয় শরৎচন্দ্রকে নিয়ে। আমি আর মনসুর একদিন খুব সকালে কলকাতায় তাঁর মনোহরপুকুর রোডের বাড়িতে দেখা করলাম। দেখলাম সকাল সকাল দু'জন যুবক সৎকাজের উদ্দেশ্যে দেখা করতে আশায় খুশী হয়েছেন। ডেকচেয়ারটিতে বসলেন, গৃহকর্মী এসে হুকা-নলচে রেখে গেল। আমাদের চা-টা দিতে বললেন। আমাদের তাজি পেশ করলাম। ও'র তো সব জানাই ছিল, বুঝতে অসুবিধা হলো না (উনি তখন হাওড়া জেলার কংগ্রেসের সভাপতি)। চারিদিকে ভয়-ভীতি অবস্থার কথা তুলে ছেলেদের মধ্যে একটু সাহস ও উৎসাহ সঞ্চার করতে হবে, তিনি গেলে খুব উপকৃত হব, এইসব বললাম। তিনি বললেন, "তোমাদের কথা বুঝেছি, চাটুজ্যে গেলে তোমাদের একটা সুবিধা হবে। চাটুজ্যের মনেও যাবার প্রবল ইচ্ছা। কিন্তু জান তো শরীরে কতগুলি অসুখ জড়ো হয়েছে। আমি তো যেতে পারব না। অক্ষম। তবে একটা বুদ্ধি দিচ্ছি। শরৎ চাটুজ্যে যাচ্ছে বলে তোমরা খুব বিজ্ঞাপন দিয়ে দাও। ব্যস্, কাজ হয়ে যাবে। কিন্তু এখনই আমার কাছ থেকে চিঠি লিখে নিয়ে যাও। লিখে দিচ্ছি। লিখব, কথা দিয়েছিলাম, খুব ইচ্ছাও ছিল, কিন্তু হঠাৎ খুব অসুখে পড়ে গেছি। ডাক্তারের নিষেধ। ...পত্র শেষে ক্ষমা প্রার্থনা ইত্যাদি। সম্মেলন অনুষ্ঠানের দিন-তারিখটা তোমরা বসিয়ে দিও। সভাপতিকে দিয়ে দিও, তিনি পড়ে দেবেন!" আমরা বললাম, "আমরা এটা পারব না।" উনি হাসতে হাসতে বললেন, "এটুকু পারবে না, তো রাজনীতি করবে কী করে!" অনেক বললাম, তবু রাজি করাতে পারলাম না। কিন্তু তা বলে ছাড়ান পেলাম না। ইতিমধ্যে হাওড়ার সুপরিচিত কংগ্রেস-কর্মী কেষ্ট চাটুজ্যে মশায় এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। তারপর চলল কংগ্রেস, টেররিস্ট্ পার্টি প্রভৃতি নানান্ গল্প। উঠতে যাই, উঠতে গেলে আবার চা আনতে বলেন। আমাদের বললেন, "তোমাদের বয়সে

আমরা কত আড্ডা মেরেছি, আর তোমরা আড্ডা মারতে পার না ?” শেষে ঘণ্টা তিনেক বাদে ছাড়ান পেলাম। তখনও বলছেন, “চিঠিটা এসে নিয়ে যেও।” অভিজ্ঞতাটা সরস ছিল বলে এতটা লিখলাম।

সম্মেলনের প্রস্তুতি বেশ উৎসাহ সৃষ্টি করলো। প্রতিনিধিদের অভ্যর্থনার ব্যবস্থা ভালই হয়েছিল। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভি-ভাষণ আমিই লিখেছিলাম। ছাপাতে বিলম্ব হয়ে গিয়েছিল। আমাতে আর রসিদে সম্মেলনের আগের দিন অনেক রাতে বর্ধমানে ফিরলাম। নরেন বেচারা খুব অসুবিধায় পড়লেন। সম্মেলনে ঠিক যাবার মুখে অভিভাষণটি পেলেন। সম্মেলনে পড়ার সময় নরেনের দু'এক জায়গায় ঠেকেছিল। এ ব্যাপারেও একটা রহস্য উল্লেখ করতে হয়। আমার দাদামশাই তখন অত্যন্ত কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত। বস্তুত, পরের দিন তিনি মারা যান। ওদিকে সম্মেলনে, আর বাড়িতে এরূপ অবস্থা, এই দুই নিয়ে আমরা অত্যন্ত বেকায়দায় পড়েছিলাম। সম্মেলনে মহারাজার করণীয় শেষ হলে, মহারাজা মনসুরকে বললেন, “তোমার দাদামশায়ের খুব অসুখ শুনলাম। চল দেখে যাই।” গাড়িতে আসবার সময় মনসুরকে বলেছিলেন, অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতির অভিভাষণটি সভাপতিকে খুব ভাল করে পড়িয়ে নেওয়া উচিত ছিল। আসলে অভিভাষণে যে রাজনৈতিক বক্তব্য তা তিনি ধরতে পেরেছেন এটুকু জানানোই উদ্দেশ্য ছিল। এর জন্যই এই কথাটা উল্লেখ করলাম। সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১০-১১ই অক্টোবর, ১৯৩৬।

সম্মেলনে একটি ছাত্র-সমিতি গঠিত হলো। এই সমিতি পরে ছাত্র ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং ছাত্র-আন্দোলনে এক গৌরবময় ভূমিকা পালন করে।

ইতিমধ্যে ১৯৩৫ সালের ইংরাজের দেওয়া নতুন গঠনতন্ত্র প্রবর্তিত হওয়ার প্রস্তুতি চলছিল। কংগ্রেস এই গঠনতন্ত্র গ্রহণ করবে না বলে ঘোষণা করল। (মুসলিম লীগও তাই বলল, অবশ্য ভিন্ন উদ্দেশ্য, কেন্দ্রীয় আধিপত্যের বিরুদ্ধে)। ১৯৩৬ সালে লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে জওহরলাল নেহরু সভাপতি। এই সভাপতির অভিভাষণে উদাত্ত কণ্ঠে স্বাধীনতার জন্য ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের আহ্বান দিয়ে দেশের মানুষের মনকে মোহিত করলেন। ইংরেজের দেওয়া গঠনতন্ত্রকে অস্বীকার করতে হবে. আহ্বানের মধ্যে এও ছিল।

নির্বাচনের প্রস্তুতি আরম্ভ হল। গঠনতন্ত্রকে ধ্বংস করার জন্য কংগ্রেস নির্বাচনে যোগ দেবে ('টু রেক্ দি কনস্টিটিউশন')। নির্বাচনের কাজে আমরা উৎসাহের সঙ্গেই নেমে পড়লাম। কংগ্রেস তখন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জাতির ঐক্যবদ্ধ স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতীক। বর্ধমান জেলায় প্রথম শ্রদ্ধেয় পাঁজা মশায়কে দাঁড় করানোর কথা ছিল। কিন্তু বিধি ছিল, তিন বৎসরের অধিক যাঁদের জেল হয়েছে তাঁরা প্রতিনিধি হতে পারবেন না। সুতরাং পাঁজামশায়কে দাঁড় করাতে পারা গেল না। অগত্যা শ্রদ্ধেয় বিজয়দা (বিজয়কুমার ভট্টাচার্য্য)-কে দাঁড় করাতে হলো। কংগ্রেসের বিরোধী প্রার্থী মহারাজকুমার উদয়চাঁদ মাহতাব। তাঁর নির্বাচনের পরিচালক স্বয়ং মহারাজা বিজয়চাঁদ। প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি ও নেতৃবৃন্দের তরফ থেকে মহারাজকুমারের বিরুদ্ধে না দাঁড় করানোর জন্য জেলা কংগ্রেস কমিটির উপর প্রচণ্ড চাপ ছিল। জেলা কংগ্রেসের সমস্ত কর্মী ও নেতৃবৃন্দ এই চাপের দৃঢ় প্রতিরোধ করলেন! এই প্রতিরোধের মুখে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিকে বিজয়দাকে প্রার্থী করার জেলা কংগ্রেস কমিটির প্রস্তাব অনুমোদন করতে হল। কিন্তু অনুমোদন করলেও কোনোরূপ সাহায্যে তাঁরা হস্ত প্রসারিত করলেন না। বিজয়দার প্রার্থী হওয়ার প্রধান বিরোধী ছিলেন বিধান রায়, নলিনী সরকার, কিরণশঙ্করের দল। শরৎচন্দ্র বসু তবু বর্ধমান জেলার নির্বাচনী মিটিং ইত্যাদিতে যোগদান করেছিলেন।

প্রাদেশিক কংগ্রেসের এই মনোভাব আমরা সহ জেলা কংগ্রেসের কর্মী ও নেতৃবৃন্দকে আরও দৃঢ়ভাবে ঐক্যবদ্ধ করলো। এদিকে তখন ত্রিশ সালের অর্থনৈতিক সংকট চলছে। সুতরাং চাঁদা সংগ্রহ করা খুবই কঠিন। আর্থিক অস্বচ্ছলতা একটা বড় প্রতিবন্ধক হলো। এর মধ্যেও আবার তফাৎ ছিল। কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যরা একে নানানভাবে সক্রিয়তার দ্বারা অতিক্রম করতে সচেষ্ট ছিলেন। অন্যদের অল্পসংখ্যক কর্মীর মধ্যে অনুরূপ সক্রিয়তা দেখা যায়নি।

মহারাজা তাঁর পত্তনিদার, দরপত্তনিদারদের নিয়ে সামন্ততান্ত্রিক সংগঠন করলেন। তখনকার জমিদারী প্রতাপের কালে এই সংগঠন বেশ শক্তিশালী হলো। অথচ আমাদের অভিজ্ঞতায় ও অন্যান্য কিছু কংগ্রেস-কর্মীদের অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়েছিল, ঐ সংগঠনের সার্থকভাবে মোকাবিলা করা সম্ভব। দৃষ্টান্তস্বরূপ কুড়মুনে জাহেদ আলি সাহেব এবং মাহাতায় মনসুর এবং পার্টির কর্মী প্রয়াত কমরেড সকিত জোর প্রচারে কংগ্রেসের পক্ষে সংখ্যালঘু ভোটকে গরিষ্ঠতায় পরিণত করেন। কিন্তু কংগ্রেসের যেটুকু শক্তি

ছিল তা-ও জেলার কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ সুসংগঠিত করতে পারেননি, প্রধানত প্রাদেশিক নেতৃবৃন্দের বিরোধিতার ফলে। কালনা, কাটোয়া, আসানসোল নিয়ে যে কেন্দ্রটি ছিল তাতে কংগ্রেস প্রার্থী বিজয়ী হন। সমগ্র জেলা হিসাবে যে মুসলিম কেন্দ্রটি ছিল সেটিতে জয়ী হন আবুল হাসেম। তখন তিনি স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসাবে দাঁড়ান এবং কংগ্রেসের সমর্থনও লাভ করেন। মুসলিম লীগ মন্ত্রিত্ব গঠিত হবার পর তিনি স্বাতন্ত্র্যের ভূমিকা ত্যাগ করে মুসলিম লীগে যোগদান করেন। নির্বাচনে তাঁর জয়ে তাঁর প্রধান সহায়ক হয়েছিল তাঁর সদ্য-প্রয়াত পিতার জনপ্রিয়তা এবং তাঁর মৃত্যুতে উত্থিত সহানুভূতি। কিন্তু কংগ্রেসের সমর্থন যথেষ্ট মূল্যবান হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সুতরাং তাঁর বিরুদ্ধে বিশ্বাসহানির অভিযোগও ভিত্তিহীন নয়।

ক্যানেল কর বিরোধী আন্দোলন

বর্ধমান সদরে নির্বাচনের ফল বের হবার সঙ্গে সঙ্গে ক্যানেল কর বিরোধী আন্দোলনের সূত্রপাত হলো বলতে হয়।

১৯৩৬-এর শেষে লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের নির্বাচনে শ্রদ্ধেয় বিজয়দাকে প্রার্থী করে কংগ্রেস নির্বাচনে অবতীর্ণ হয়েছিল। জেলার মধ্যে দক্ষিণ-বাম সব রকমের কংগ্রেসীরা এই নির্বাচনে ঐক্যবদ্ধভাবে কংগ্রেসকে জয়ী করার চেষ্টা করেছিলেন। তবে একথাও সত্য শুধু আন্তরিকতায় তো জয়ী হওয়া যায় না। নির্বাচনের সকল কর্মীর উদ্যোগ ও কৌশল সমস্তরের ছিল না। বামপন্থী কর্মীরা পরিশ্রম, কৌশল ও উদ্যোগে এগিয়ে ছিলেন। অনেক সাধারণ মানুষের শ্রম ও উদ্দীপনাকে সুসংগঠিত প্রয়াসে কাজে লাগানো যায়নি। জেলার অনেক কর্মী বিশেষ করে নেতৃস্থানীয় বামপন্থী কর্মী যেমন শ্রীফকিরচন্দ্র রায়, কমরেড বিনয় চৌধুরী, কমরেড শিবশঙ্কর চৌধুরী, কমরেড হরেকৃষ্ণ কোঙার, কমরেড জগন্নাথ সেন, কমরেড বিপদবরণ রায় তখনও বন্দী জেলে বা অন্তরীণে। এসবের ফলে কংগ্রেসের জয় সম্ভব হল না।

ভোট গণনার দিনে বর্ধমান সদরের অনেক মানুষ উপস্থিত ছিলেন। পরাজয়ের ফলে দুঃখও যেমন হয়েছিল, তেমনি নির্বাচনের সময় জন-জীবনের যেসব সমস্যা নিয়ে প্রচার ও আলোড়ন হয়েছিল, তার সমাধানের জন্য সংগ্রামের সংকল্প শক্তিশালী হয়েছিল। ফল বেরোবার সঙ্গে সঙ্গেই অনেকে কংগ্রেস অফিসে সমবেত হয়েছিলেন। যেমন হাটগোবিন্দপুর, সড্যা, সিঙ্গপাড়া, কুড়মুন ও বণ্ডুল অঞ্চলের মানুষ। তাঁরা স্বতই আওয়াজ তুললেন, ক্যানেল করের অন্যায়ের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে হবে। নির্বাচনের সময় কংগ্রেসের নেতা ও কর্মীরা আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। সুতরাং এখন আন্দোলনের কর্মসূচী গ্রহণ করা উচিত। বস্তুত, নির্বাচনকালেই নির্বাচনের প্রচারে ক্যানেল কর বিরোধিতার প্রশ্ন এসে পড়েছিল। ঘটনাচক্রে নির্বাচন ঘোষণা হবার কিছু পরে ক্যানেল কর প্রয়োগ

ও ক্যানেল কর বৃদ্ধির নোটিশ প্রচারিত হয়। কৃষকের মধ্যে বিক্ষোভের গুঞ্জরন শুরু হয়। কংগ্রেস প্রার্থীর পক্ষে প্রচারকগণ নির্বাচন প্রচারকালে এই বিক্ষোভ বিষয়ে জ্ঞাত হন। আমাদের কমিউনিস্ট ও কৃষক সমিতির কর্মীরা স্বভাবতই প্রচারকে নির্বাচনের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে সীমিত রাখতেন না। স্বাধীনতার পথে আমাদের সমগ্র লক্ষ্য মানুষের সামনে রাখতেন। সঙ্গে সঙ্গে কৃষক ও শ্রমিকদের নানান্ দুঃখের প্রতিকারের জন্যে সংঘবদ্ধ আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তাকে তুলে ধরতেন। সুতরাং ক্যানেল কর বিরোধী যে মনোভাব দেখা দিল তার উত্তরে তাঁরা সহজেই বলতে পারলেন, এর প্রতিকারে সংগঠিত আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। এর বিরোধিতার জন্য কংগ্রেস প্রার্থীকে ভোট দেওয়া উচিত, কিন্তু ভোটেই কাজ উদ্ধার হবে না। ভোটের সাফল্য হোক বা না হোক, গণ আন্দোলন ব্যতীত কৃষকের দাবী আদায় হবে না।

সুতরাং নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই কৃষকের মনে সিদ্ধান্ত হল, আন্দোলন করতেই হবে। পরাজয়ের পর মর্মাহত হয়ে অনেকে কংগ্রেসের অফিসে এসেছিলেন। নির্বাচন সম্বন্ধে কিছু কথাবার্তা হবার পরই ঠিক হলো, যা হয়েছে হোক, এখন দমে না গিয়ে আশু করণীয় ভাবতে হবে। মানুষকে যখন কথা দেওয়া হয়েছে, তখন ক্যানেল করের বিরুদ্ধে কর্মসূচী নিয়ে আশু কাজে নামতে হবে। নির্বাচনের প্রচার এক, আর তাকে কার্যকরী করা আর এক কথা। দক্ষিণপন্থী নেতৃত্ব স্বভাবতই বুঝতে চাইলেন। তাঁরা বললেন, এখনই কী করে সম্ভব? আলাপ-আলোচনা করতে হবে, বুঝতে হবে ইত্যাদি, তবে তো আন্দোলন! সমবেত গ্রামবাসী-দের মধ্যে তীব্র বিক্ষোভের সঞ্চার হলো এবং অনেকে এই আন্দোলন স্থগিত করার চেষ্টার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সরব হলেন। আমাদের কর্মীদের বক্তব্যও গ্রামবাসীদের বক্তব্যের অনুরূপ ছিল এবং সজোরে তা তাঁরা উপস্থাপিত করেছিলেন।

কিন্তু কংগ্রেসী নেতাদের মনে আন্দোলনের গতিমুখ ও নির্দিষ্ট লক্ষ্য সম্বন্ধে দ্বিধাচিত্ততা ছিল। আন্দোলন তীব্র হয়ে একটা সংগ্রামের রূপে দেখা দেয়—তাঁদের কামনা এরূপ ছিল না। মনের অবস্থায় এই রকম একটা পিছটান থাকার ফলে অনমনীয় বিরোধিতার অবস্থান তাঁরা নিতে পারছিলেন না। ফলে তখনই একটা কিছু বলতে অসম্মত হলেন। পাঁজা মশায় ধানাই-পানাই পারতেন না, অস্বীকৃতিটা তীক্ষ্ণ ভাষায় প্রকাশ করলেন।

আন্দোলনের প্রস্তাবকদের মধ্যে কমরেড হেলারাম চট্টোপাধ্যায়, অশ্বিনী মণ্ডল, দাশরথি চৌধুরী, শিবপ্রসাদ দত্ত এ'রাও ছিলেন। পাঁজা মশায়ের জবাব পাওয়ার পর ক্ষুব্ধ মানুষরা যখন উঠে চলে আসছেন এ'রাও তাঁদের সঙ্গে এলেন এবং বললেন, "চলুন বাইরে গিয়ে আলোচনা করা যাক্।" কমরেড হেলারাম উপরে উল্লিখিত গ্রামগুলির সুপরিচিত কংগ্রেস কর্মী ছিলেন। ১৯৩৩ সালে হাটগোবিন্দপুরে কৃষক সম্মেলনের অনুষ্ঠান করে ও কৃষকের সংগ্রামী নেতা হিসাবে এক বিশিষ্ট পরিচয় অর্জন করেছিলেন। ইতিমধ্যে কৃষক সমিতি মহাজনী শোষণ ও জমিদারী স্বেচ্ছাচারিতার কয়েকটি ঘটনায় সফলভাবেই প্রতিরোধ করেও জনপ্রিয় হন। তিনি পথে দাঁড়িয়ে আলোচনার মধ্যেই বললেন, "ক্যানেল করের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাতেই হবে, চলুন কাল ভোরের বাসে আমরাও আপনাদের সঙ্গে যাচ্ছি। সভ্যায় বসে কর্মসূচী স্থির করতে হবে।" তাঁদের সুপরিচিত নেতার আহ্বানে গ্রামবাসী উৎসাহিত হলেন এবং সোৎসাহে তাঁর প্রস্তাব সমর্থন করলেন। এইভাবেই কৃষক সমিতির আর এক কর্মসূচীর, ক্যানেল কর বিরোধী আন্দোলনের, সূচনা হল।

এখানে ক্যানেল কর সমস্যাটার কিছু পরিচয় দেওয়া দরকার। বহু পুরাতন যুগ থেকে বর্ধমান, হুগলী, হাওড়ার এক বিস্তৃত এলাকা দামোদরের জলের সাহায্যে চাষ-আবাদে খুব উন্নত এলাকা বলে পরিচিত ছিল। মুঘল আমলে বর্ধমান এবং তাঞ্জোর জেলার দুটি এলাকা রত্ন-ভাণ্ডার (Jewels of the Mughal Empire) বলে পরিচিত ছিল। দামোদরের দুই ধারে বিশেষ করে বাঁ ধারে অনেক ছোট ছোট শাখানদী ছিল। বর্ষায় নদীর জল স্ফীত হলে এইসব ছোট ছোট নদী দিয়ে সমগ্র বিস্তীর্ণ এলাকায় ছড়িয়ে পড়ত। এখন বনশূন্য উৎসস্থল থেকে আসে বালি। আর তখন বনাকীর্ণ এই এলাকা থেকে আসতো পলি মাটি। জল এসে কৃষকের আবাদে সাহায্য করতো আর পলি মাটি জমিকে উর্বরা করতো। যে কোন রাজ্য বা সাম্রাজ্যের শাসন-ব্যবস্থার স্বার্থ কৃষকের চাষ-আবাদের স্বার্থের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন ছিল। চাষ-আবাদ না হলে তাঁদের খাজনা আদায়ে সঙ্কট হতো। নানান্ রূপ লুণ্ঠন ও আদায় ইত্যাদির মধ্যেও রাজারাজাড়াকে জল ও সেচের ব্যবস্থাটার দিকে নিয়ত দৃষ্টি দিতে হতো। ইংরেজদের প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও জমিদারী ব্যবস্থা পুরাতন ব্যবস্থাকে একেবারে বিনষ্ট করে দিল। জমিদারের সেচ-ব্যবস্থা সম্বন্ধে কোন দায় রইল না। কিন্তু

খাজনা বৃদ্ধি ও আদায়ের কথা পুরো দস্তুর রইল। নীলকর সাহেবদের যেসব অত্যাচার-কাহিনী বাঙলা সাহিত্যে স্থান পেয়েছে, মনে রাখতে হবে সেসব নির্মম অত্যাচারের গোড়াপত্তন হয়েছে জমিদারদের হাতে। রেভারেণ্ড লালবিহারী দে'র 'বেঙ্গল পেজাণ্টস্ লাইফ' এই অত্যাচারের কাহিনী কিছু উদঘাটন করেছে। যাই হোক, সেচের ব্যাপার সম্পূর্ণ অবহেলিত হলো। ১৮৫৬-৫৯-এ রেল লাইন তৈরীর সঙ্গে সঙ্গে রেল লাইন (ইস্টার্ন রেলওয়ে) রক্ষা করার জন্য ডান দিকের কুড়ি মাইল বাঁধ ভেঙ্গে দিয়ে বিস্তৃত এলাকা হাজায় পরিণত করা হলো। বাঁ দিকে উঁচু বাঁধ দিয়ে জলপ্রবাহের সমস্ত শাখানদীগুলোর মুখ বুঁজিয়ে দেওয়া হলো। সেগুলি ধীরে ধীরে মজে গেল। মশা ও ম্যালেরিয়া গোটা এলাকাকে গ্রাস করলো। ডাক্তার বেণ্টলী হুগলী-বর্ধমানের ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত অঞ্চল পরিদর্শনকালে নাকি বলেছিলেন, বিশ বৎসর পরে এদেশে ম্যালেরিয়া থাকবে না, এবং পরে আশ্চর্য্যান্বিত জিজ্ঞাসু নেত্রের উত্তরে বলেছিলেন, শেয়ালের তো আর ম্যালেরিয়া হয় না, মানুষ থাকলে তো ম্যালেরিয়া হবে!

ম্যালেরিয়ার কারণ মশা ও সেই মশার জন্ম ও বৃদ্ধি বদ্ধ জলা ও জঙ্গলা থেকে। এসব আবিষ্কারের পূর্বে ও নির্দিষ্ট কারণটা মানুষ না জানলেও, ঐ বদ্ধ জলা ও জঙ্গলা যে স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর, মানুষ তা জানতো। যেমন দৃষ্টান্তস্বরূপ পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রসিদ্ধ শিল্পী লিওনার্দো দা ভিঞ্চি (১৪৫২-১৫১৯) বলেছিলেন, "...পাহাড় থেকে পলি নিয়ে প্রবহমান জলকে উপত্যকার গ্রাম ধরে বইয়ে দিতে হবে যাতে জমি উর্বর হয়, আর আবহাওয়াও স্বাস্থ্যকর থাকে।..." এর প্রতিকার ছিল বাংলা দেশের প্রাচীন সেচ ও জল নিষ্কাষণ ব্যবস্থায়। ইংরেজ আমলে এই সেচ-ব্যবস্থা ভেঙ্গে গেল, নদী-নালা-পুকুর বুজে গেল। তার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হলো মহামারী কলেরা ও ম্যালেরিয়া। এই অকল্যাণের যোগাযোগ মানুষ বুঝছিল। মশার তত্ত্ব আবিষ্কারের পর সে উপলব্ধি আরও তীক্ষ্ণ হলো। ১৯১৩ সালের দামোদরের বন্যার পর সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং গ্রামের অস্বাস্থ্যকর অবস্থা সম্বন্ধে জনমত সচেতন হয়। বলা বাহুল্য, এর মধ্যেও স্বদেশী আমলের দেশহিতৈষণার প্রেরণা কাজ করে।

১৮৪০ থেকে ১৮৫০-এর মধ্যে ইংরেজের এক তরফা শোষণের মুখ শুকিয়ে গেল। দেশের তাঁত শিল্প ধ্বংস করে তাদের কলকারখানায় তৈরী কাপড় চালান দিয়ে শোষণ করছিলো। কিন্তু চালানের বদলে তারা সস্তায় কৃষিপণ্য নিত এবং এইভাবে কেনা ও বেচায় দুই দিকে লাভ

করতো। আগেকার রাজা-রাজড়ারা সেচ ব্যবস্থায় নজর দিত। দীর্ঘ দিনের অবহেলার ফলে হাজা মজা হয়ে চাষ-আবাদ নষ্ট হয়ে যেতে লাগলো। ফলে রপ্তানি চালানের বদলে আমদানির পথ ক্রমোত্তর বন্ধ হতে লাগলো। সুতরাং শোষণ ও লাভ হবে কোত্থেকে? ১৮৪৭-৪৮-এ ইংল্যাণ্ডে ব্যাপক অর্থ-সঙ্কট দেখা দিয়েছিল। ফলে কিভাবে কৃষিপণ্য উৎপাদন সঞ্জীবিত করা যায়, পথ ঘাট, রেল লাইন খুলে কি করে তা সস্তায় আমদানি করা যায়, এই সব কথা ইংরেজকে ভাবতে হলো। মার্কস এই দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

ইংরেজের নীতির কিছু পরিবর্তন হল। ভারত থেকে আমদানি করা পণ্যের উৎপাদন যাতে বৃদ্ধি হয়, রেল আর রাস্তায় যাতে এসব সস্তায় বন্দরে আনা যায়, আবার ইংরেজের রপ্তানি করা মাল যাতে বন্দর থেকে দেশের ভিতরে গ্রামাঞ্চলে সহজে পৌঁছে দেওয়া যায়, এইভাবে দুই মুখে আমদানি ও রপ্তানিতে ইংরেজের শোষণের উপায় যাতে অব্যাহত থাকে আর প্রশস্ত থেকে প্রশস্ততর হতে থাকে, ইংরেজের সেদিকে নজর পড়ে। দক্ষিণ ভারতে 'রায়তওয়ারি' এলাকায় রায়তের খাজনা বৃদ্ধি করে ক্যানেল খননের খরচ বহন করিয়ে সেচব্যবস্থা প্রবর্তন ও প্রসার শুরু হল। কিন্তু বাংলাদেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের জন্য জমিদার খাজনা বাড়িয়ে গেলেও সরকারী খাতে কিছু আমদানি হত না। খাজনা বৃদ্ধি হয়ে হয়ে পত্তনিদার, দরপত্তনিদার, সেপত্তনিদার, ইজারাদার প্রভৃতি থাকের পর থাক জমিদারী স্বার্থ সৃষ্টি হয়েছিল। প্রজারা শোষণে জীর্ণ হয়েছিল। কৃষকের এই অবস্থায় এই বিপুল বোঝার উপরে নতুন বোঝা চাপানো, নতুন কর প্রয়োগে স্বভাবতই একটা প্রতিবন্ধক ছিল। অথচ জমিদাররা তাদের লাভের অংশ থেকে সেচের ব্যবস্থার জন্য এক পয়সা ছাড়তে নারাজ। ফলে অন্ধ্রতে উচ্চ হারে খাজনা বৃদ্ধি করে সেচের ব্যবস্থা প্রবর্তিত করা সম্ভব হল, অথচ জমিদারী এলাকায় তা সহজে সম্ভব হচ্ছিল না।

১৮৮১ সালে বর্ধমানে 'ইডেন ক্যানেল' খনন করা হল। ক্যানেল কর বহন করে প্রজারা চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর দিয়ে জল নেবে এইরূপ ব্যবস্থা প্রবর্তিত হল। কিন্তু সে খুব স্বল্প পরিমাণ এলাকা। বিস্তৃততর এলাকায় এইভাবে ক্যানেল-ব্যবস্থা প্রসারিত করা হবে, এই উদ্দেশ্যে ১৯২০ দশকের মাঝামাঝি নতুন দামোদর ক্যানেল পরিকল্পনা আরম্ভ করা হল। ১৯২৬-২৭ সালে ক্যানেল খনন শুরু হল। ১৯৩২ সালে মে মাসে জল দেওয়া আরম্ভ করা হল। কিন্তু গভর্নর কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে ক্যানেল

খোলা হল ১৯৩৩ সালের ২২শে সেপ্টেম্বরে। প্রকৃতপক্ষে ক্যানেল অবশ্য সম্পূর্ণ হতে ১৯৩৫ সাল লেগে গিয়েছিল। ইতিমধ্যে মোট খরচ যা হয়েছিল তা ক্যানেল এলাকার অধিবাসীদের কাছ থেকে কি করে উসুল করে নেওয়া যায় গভর্নমেণ্ট তার পদ্ধতি ভাবতে লাগল। প্রথমে তারা ঠিক করল উচ্চহারে এক লীজের রেট। লীজের এক চুক্তিপত্রে সই করে তবে জল পাওয়া যাবে। এতে কোন ফল হল না। লোকে লীজ নিতে সম্মত হল না। তখন মতলব ভাঁজা হল কি করে সমস্ত এলাকা জুড়ে একটা বাধ্যতামূলক বাঁধা রেট চাপিয়ে টাকাটা আদায় করা যায়। সেচ বিভাগের মন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন ১৯৩৫ সালে উক্ত উদ্দেশ্যে 'বেঙ্গল ডেভলপ্‌মেণ্ট বিল' উপস্থিত করলেন। উপস্থিত করা মাত্রই কিছু কিছু আপত্তি প্রকাশিত হতে লাগল। উকিলদের মধ্যে যাঁদের ক্যানেল এলাকায় জমি-জায়গা ছিল তাঁরা এক 'রায়ত সমিতি' করে প্রতিবাদ ধ্বনিত করলেন। কিন্তু শুরু থেকেই এ'দের বক্তব্য আবেদন-নিবেদনে সীমিত ছিল। হালে হালে কংগ্রেসের আন্দোলন হয়েছে এবং ইংরেজ গভর্নমেণ্ট দেশ জুড়ে সন্ত্রাসের চাপ দিয়েছে। সুতরাং রাজনীতির কোন গন্ধ যাতে না থাকে সেদিকে 'রায়ত সমিতি'র উকিল মহাশয়রা খুব সজাগ ছিলেন এবং খুব সন্ত্রস্ত হয়েই বক্তব্য উপস্থিত করছিলেন। কিন্তু ট্যাক্সের কথা যত প্রচার হতে লাগল কৃষক-প্রজার ক্ষোভ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে লাগল। তখনও রাজনৈতিক কর্মীরা জেলে ও অন্তরীণে আবদ্ধ ছিলেন। ইতিমধ্যে নতুন গঠনতন্ত্র অনুযায়ী নির্বাচনের প্রস্তুতি আরম্ভ হল। নির্বাচন আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্যানেল করের বিরুদ্ধে আলোচনা বেশ ভালভাবে শুরু হল। এই আলোচনা যুগপৎ ব্যাপক ও গভীর আগ্রহ সৃষ্টি করল। 'কংগ্রেস কর্মী যাঁরা নির্বাচনে নামলেন এইসব আলোচনায় স্বভাবতই যুক্ত হয়ে পড়লেন। তাছাড়া এ'দের মধ্যে অনেকে নিজেরাই ক্যানেল এলাকার কৃষক হিসাবে ক্যানেল করের পীড়নের ভুক্তভোগী হলেন বা তাঁদের ভুক্তভোগী হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিল। এইভাবে জনগণের বিক্ষোভ সংগঠিত বিক্ষোভের দিকে ধাবিত হল। আন্দোলন করতে হবে. সরকারের করের দাবি বাতিল করাতে হবে, এই আওয়াজ ক্রমোত্তর জোর পেতে লাগল। আন্দোলন ও সংগ্রামে সংকল্প বেশ দৃঢ় হয়ে উঠল। কংগ্রেস কর্মীরা সর্বত্রই নির্বাচনের সঙ্গে এইরূপ প্রচারের আন্দোলনও করেছিলেন। একটা সিদ্ধান্ত গড়ে উঠেছিল, নির্বাচনের ফল যাই হোক ক্যানেল করের বিরুদ্ধে সংগঠিত সংগ্রাম গড়ে তুলতেই হবে। প্রসঙ্গত, ১৯৩৩ সালে জেলা কৃষক

সম্মেলনে ট্যাঙ্ক ইমপ্রুভমেন্ট এ্যাক্ট অনুযায়ী ধার্য ট্যাক্স কমাবার জন্য সম্মেলন দাবী করেছিল। সুতরাং জলকরের ব্যাপারে কৃষকের মন স্পর্শকাতর হয়ে উঠেছিল। এটা সহজেই বোঝা যায়।

এইরূপ অবস্থায় উপরে বর্ণিত নির্বাচনের ফল বেরোবার দিন কংগ্রেস অফিসে যা ঘটল তাতে অবিলম্বে আন্দোলন শুরু করার দিকে জোর বেড়ে গেল। উপরে বলেছি, কমরেড হেলারাম চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে আমাদের কর্মীরা বর্ধমান সদর থানার হাটগোবিন্দপুর ও সড্যায় আলোচনা করার জন্য যাত্রা করলেন। লক্ষ্য, ক্যানেল কর প্রতিকারের উদ্দেশ্যে স্বতন্ত্র সমিতি করে ব্যাপকতম মানুষের সমাবেশ করতে হবে।

কমিউনিস্ট পার্টির বর্ধমান জেলা কমিটির সভায় স্থির হল, যেখানেই আমরা প্রচারকে সাংগঠনিক রূপে তুলতে পারব, 'ক্যানেল কর প্রতিকার সমিতি' গঠন করে আন্দোলনকে সংগঠিত রূপ দেওয়ার প্রয়াস করব। অবিলম্বে হাটগোবিন্দপুর, সড্যাকে ভিত্তি করে এই কাজ শুরু করে দেওয়া হল।

জেলার কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ, কংগ্রেসকে ছাড়িয়ে 'ক্যানেল কর প্রতিকার সমিতি' গঠনকে আমরা যে নজরে দেখছিলাম তার উল্টো নজরে দেখছিলেন। পূর্বেই বলেছি, বর্ধমানের মহারাজার বিরুদ্ধে এবং কংগ্রেস প্রার্থীর পক্ষে সমস্ত কংগ্রেস কর্মী ঐক্যবদ্ধ হয়ে সংগ্রাম করেছিলাম। পরাজয়ের পরে আমরা বুঝলাম আরও ব্যাপকতর সংখ্যায় মানুষকে প্রত্যক্ষভাবে সংগ্রামের পথে টানতে হবে। সুতরাং ক্যানেল করের কর্মসূচী সামনে রেখে ব্যাপক ফ্রন্ট গড়ে তুললে কংগ্রেস দুর্বল হবে না, আরও শক্তিশালী হবে। সংগ্রামের তীক্ষ্ণতা মানুষের চেতনাকে আরও বাড়িয়ে দেবে। কিন্তু তখনকার কংগ্রেস নেতৃত্ব, শ্রীযাদবেন্দ্রনাথ পাঁজা প্রমুখ 'ক্যানেল কর প্রতিকার সমিতি'কে কংগ্রেসের পাল্টা প্রতিষ্ঠান ধরলেন এবং আমরা যারা কৃষক সমিতি করি, কংগ্রেসের শৃঙ্খলা ও ঐক্য ভঙ্গ করছি এরূপ অভিযোগ তুলতে লাগলেন। আমরা প্রায় সকলে মিলে কংগ্রেস অফিসে পাঁজা মশায়ের সঙ্গে আলাপ করতে গেলাম। আমাদের মধ্যে ছিলেন কমরেড হেলারাম চট্টোপাধ্যায়, আমি নিজে, কমরেড মহানন্দ খাঁ, কমরেড অশ্বিনী মণ্ডল, কমরেড দাশরথি চৌধুরী, কমরেড তারাপদ মোদক, কমরেড শম্ভু কোঙার, কমরেড শিবপ্রসাদ দত্ত (আলু বাবু) প্রমুখ। প্রধানতঃ আমিই পাঁজা মশায়ের সঙ্গে কথা বললাম। আমি 'ক্যানেল কর প্রতিকার সমিতি'কে কেন কংগ্রেসের পাল্টা

সংগঠন হিসাবে বিচার করা উচিত নয়, বরং শক্তিশালী সহায়ক ফ্রন্ট হিসাবে বিচার করা উচিত, তাই বললাম। অর্থাৎ আমরা ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করে প্রশ্নটিকে যেভাবে দেখছি তা ব্যাখ্যা করার ও নিবেদন করার চেষ্টা করলাম। পাঁজা মশায় এবং তার সমর্থকরা কিছুতেই আমাদের প্রস্তাব গ্রহণ করলেন না। পাঁজা মশায় উত্তেজিতভাবে আমাকে বললেন, এমন কি দু'টো ইংরেজী শব্দও বলে ফেললেন, যা তিনি সচরাচর করতেন না। বললেন, "ওসব মিল্ক অ্যাণ্ড ওয়াটার পলিসি চলবে না বাপু, হয় মিল্ক না হয় ওয়াটার।" অর্থ দাঁড়াল কংগ্রেস হচ্ছে দুধ, 'ক্যানেল কর প্রতিকার সমিতি' কংগ্রেস ছাড়িয়ে করলে দুধের সাথে জল মিশে যাবে, রাজনৈতিক আভিজাত্য নষ্ট হবে। 'ক্যানেল কর প্রতিকার সমিতি'র গঠনে আরও ব্যাপকতর জনসাধারণকে আকর্ষণ করার সুযোগ হবে একথা স্বীকার করলেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বললেন, এই সমিতিকে কংগ্রেসের সাব-কমিটি হিসাবে গড়তে হবে এবং গ্রামে গ্রামে যেগুলি হবে তারই শাখা হিসাবে বিবেচিত হবে। এটাই হল তাঁর বিকল্প প্রস্তাব। (তখন কংগ্রেস অফিস ছিল এখন যেখানে বি. সি. রোডে 'প্রয়োজনী' নামে দোকান আছে সেখানে, অর্থাৎ 'তা' মশায়দের বাড়িতে।) পাঁজা মশায়ের সঙ্গে আমাদের কথাবার্তা হচ্ছিল রাস্তার ধারে নীচের তলার ঘরে। আমরা কৃষক সমিতির কর্মীরা পাঁজা মশায়কে বললাম, "আমরা উপর তলায় একটু মীট্ করে আসি, এসে আমাদের বক্তব্য আপনাকে বলব।" সাত্তার সাহেব তখনও কৃষক সমিতির সদস্য ছিলেন। আমরা তে-তলার ছাদে গেলাম। সাত্তার সাহেবও আমাদের সঙ্গে গেলেন।

কমরেড হেলারাম চট্টোপাধ্যায় পাঁজা মশায়ের ব্যাপকতর 'ইউনাইটেড ফ্রণ্ট' গঠন প্রয়াসের বিরোধিতার প্রতিবাদ করলেন। যাই হোক, আমাদের সকলেরই যুক্তি হল, তখনও সকল কংগ্রেস কর্মী এবং কংগ্রেস ভক্ত আমাদের সঙ্গে ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠতা সত্ত্বেও আমাদের রাজনৈতিক বক্তব্য ভালভাবে বোঝেন নি। সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামে এ'দের সঙ্গে বিচ্ছেদও অবাঞ্ছনীয়। সুতরাং পাঁজা মশায়ের যুক্তি ভ্রান্তিপূর্ণ হলেও মেনে নিতে হবে। আমরা তাই সিদ্ধান্ত করলাম। সাত্তার সাহেব একটি নিবেদন রাখলেন, বললেন, ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠতা ও প্রীতি সত্ত্বেও এবং আপাতত কিছু সিরিয়াস প্রশ্নে বিচ্ছেদ না হলেও, যেভাবে কংগ্রেস নেতৃত্বের সঙ্গে আমাদের মতান্তর ঘটছে তাতে তিনি আমাদের সঙ্গে চলতে পারবেন না। তিনি কৃষক সমিতি থেকে পদত্যাগ করবেন। আমরা বোঝালাম, কিন্তু সে

বোঝানো ব্যর্থ হল। তিনি তখন তাঁর ব্যক্তিগত লাইন ঠিক করে ফেলেছেন।

আমি নীচে এসে পাঁজা মশায়কে মোটামুটি আমাদের স্বীকৃতি দিলাম। কয়েকটি প্রস্তাব করলাম, তিনিও রাজী হয়ে গেলেন। বললাম, যে কয়েকটি 'ক্যানেল কর প্রতিকার সমিতি' আমরা করে ফেলেছি তাদেরকে প্রস্তাবিত কংগ্রেসের সাব-কমিটির শাখা বলে গ্রহণ করতে হবে। তাছাড়া, যেহেতু আমরা অনেকখানা এগিয়ে গিয়েছি, যে নতুন 'ক্যানেল কর প্রতিকার সমিতি'গুলি গঠন করব, বিনা ঝঞ্ঝাটে তাদেরও অ্যাফিলিয়েশন্ দিতে হবে।

আমাদের কাজ খুব দ্রুত এগিয়ে গেল, প্রসার লাভ করল। পশ্চিমে গলসী থেকে শুরু করে পূর্ব ও উত্তরে মেমারী, মন্তেশ্বর ও ভাতাড় পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল। আমাদের গঠিত 'ক্যানেল কর প্রতিকার সমিতি' হল ১৫টি। আর যাঁরা আমাদের সঙ্গে ভিন্নমত পোষণ করতেন, কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থীদের হল মাত্র তিনটি।

'ক্যানেল কর প্রতিকার সমিতি' পদ্ধতি গ্রহণ করার মধ্যে আর একটি উদ্দেশ্য ছিল। নির্বাচনের পর ধীরে ধীরে সাম্প্রদায়িক সংগঠনের প্রভাব বিস্তার লাভের দিকে এগোচ্ছিল। মন্ত্রিত্ব গ্রহণের প্রশ্নে বাংলাদেশের জনমত কংগ্রেস কর্তৃক মন্ত্রিত্ব গ্রহণের বিরুদ্ধে ছিল। কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থীদের মনোভাব অবশ্য ঠিক তা ছিল না। কিন্তু অবস্থাগতিকে তাঁরাও মন্ত্রিত্ব গ্রহণের বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন। (প্রসঙ্গত, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি মন্ত্রিত্ব গ্রহণের প্রশ্ন সম্বন্ধে সারা ভারত জুড়ে প্রাদেশিক কমিটি ও জেলা কমিটিগুলির বিচার ও সিদ্ধান্ত চেয়েছিল। বর্ধমান জেলা কংগ্রেস কমিটি দক্ষিণপন্থীদের নেতৃত্বের নির্দেশে মন্ত্রিত্ব গ্রহণের পক্ষে রায় দিয়েছিল।) তাঁরা দেখলেন, মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করলে শরৎ বোসের নেতৃত্বে শরৎ বোস-সুভাষ বোসের দলের প্রাধান্যকে ঠেকানো যাবে না। এদিকে শরৎ বোসের দলের অধিকাংশ সমর্থক বামপন্থী মনোভাবের এবং মন্ত্রিত্ব বর্জনের পক্ষপাতী। দক্ষিণপন্থীরা গোপনে মুসলিম লীগের সঙ্গে যুক্তি করে নলিনীরঞ্জন সরকারকে তাদের মন্ত্রিসভায় ঢুকিয়ে দিলেন। প্রকাশ্যে অবশ্য কংগ্রেস নলিনী সরকারকে ২০ বৎসরের জন্য কংগ্রেস থেকে বহিষ্কার করলে তার বিরোধিতা করবেন না। বুর্জোয়া-জমিদার স্বার্থ যাতে সুরক্ষিত হয় সেই উদ্দেশ্যেই নলিনী সরকারকে ঢোকানো হয়েছিল। এই উদ্দেশ্য অবশ্য গৃহীত অবস্থায় সীমিত হলেও বেশ কিছুটা সফল হয়েছিল।

ক্যানেল কর থেকে জমিদারদের রেহাই দেওয়া হয়েছিল। এটা লক্ষণীয়, প্রয়োগ হচ্ছিল শুধু ক্ষেত-খামারের মালিকদের উপর। ফলতঃ জোতের মালিক, ভাগচাষীদের স্কন্ধেও আংশিক পড়ছিল। কৃষক-প্রজার স্বত্বের ব্যাপারে স্বত্ব দৃঢ় হলো কৃষক-প্রজা দলের সদস্যদের চাপে। মুসলিম লীগ মন্ত্রিত্বের অন্যতম বিজয় সিংহরায় ও নলিনী সরকার তা ঠেকাতে পারেন নি, কিন্তু অগ্রগতিও কিছু করতে দেন নি। এই পশ্চাৎমুখী চাপ ক্যানেল করের ক্ষেত্রেও পড়ল। প্রজাদের উপর চাপ পড়ে, এই উদ্দেশ্য বরাবর বজায় ছিল।

যাই হোক, কৃষক সমিতির কর্মীরা পুরো শক্তি নিয়ে আন্দোলনে নেমে পড়লেন। দুই দল কংগ্রেস কর্মী—একদল যাঁরা কৃষক সমিতির নেতৃত্বে (তথা কমিউনিস্টদের প্রভাবে) চলছিলেন এবং অন্য দল যাঁরা গান্ধীবাদীদের নেতৃত্বে চলছিলেন। দুই দলের মত ও পথের পার্থক্য স্পষ্ট হতে স্পষ্টতর হতে লাগলো। সংখ্যায় গান্ধীবাদী মনোভাবের কর্মী গোড়া থেকেই কম। আন্দোলনের অগ্রগতি ও প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে কৃষক সমিতির প্রভাব অপেক্ষাকৃত অনেক গুণ বেশী বেড়ে গেল।

'ক্যানেল কর প্রতিকার সমিতি'র নাম ও সংগঠন সম্বন্ধে দক্ষিণ-পন্থীদের আগ্রহ ছিল না। প্রথম দিকে তো বিরোধিতাই ছিল। বামপন্থী তথা কৃষক সমিতির কর্মকর্তারা 'ক্যানেল কর প্রতিকার সমিতি'র প্রচার করছিলেন। স্বভাবতই কৃষক সমিতির প্রচার ও সভ্যসংগ্রহ চলছিল। ক্রমোত্তর কৃষক সমিতির প্রভাব বাড়লো। এক বৎসরের মধ্যে কৃষক সমিতির সভ্য সংখ্যা দাঁড়ালো ১০ হাজার। কংগ্রেসের নেতৃত্ব বুর্জোয়া-জমিদার নেতৃত্ব। মতপার্থক্য অনেক ছিল, কিন্তু সে পার্থক্য শ্রেণী-স্বার্থকে অতিক্রম করে নয়। নেতৃত্ব তাঁদের বিশিষ্ট পদ্ধতিতে গান্ধীজীর নেতৃত্বে পরিচালিত গণ-আন্দোলন ব্যতিরেকে আড়ষ্ট হয়ে যেতেন। যাঁরা গান্ধীবাদী মতাদর্শকে খুব আঁকড়ে থাকতেন না এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নির্বাচন, বিধানসভা, পৌরসভা এসব নিয়ে থাকতেন—তাঁরাও গণ-আন্দোলনে অগ্রগামীদের সঙ্গে সহজেই সম্মিলিত হতেন না, সমর্থনের হারের উপরে নির্ভর করতেন। ফলে সক্রিয় ভূমিকায় না হলেও এঁদের অনেককে সমর্থকের লাইনের মধ্যে পাওয়া যেত। কিন্তু নিছক গান্ধীবাদী মতাদর্শে বিশ্বাসী এবং কর্মীর সংখ্যা ছিল খুব কম। আর তাঁরাই ছিলেন বর্ধমানের কংগ্রেস নেতৃত্ব তথা দক্ষিণপন্থী নেতৃত্বের অনুগত কর্মী। শুধু এঁদের যদি ধরা যায়, এঁদের সংখ্যা ছিল, যেমন বলেছি, কম। যাই হোক,

কংগ্রেস নেতৃত্বের সংগ্রাম-বিমুখতা ও নিষ্ক্রিয়তা, অন্যদিকে কৃষক সমিতির সদা সক্রিয়তার কারণে ক্যানেল কর বিরোধী আন্দোলনে কৃষক সমিতির প্রভাব বেশ বেড়ে গেল এবং শক্তিশালী হলো।

১৯৩৭ সালের ফেব্রুয়ারীতে বর্ধমান বংশগোপাল টাউন হল ময়দানে 'ক্যানেল কর প্রতিকার সমিতি'র সম্মেলন হয়। এই সম্মেলন উপলক্ষে ক্যানেল কর এলাকার হাজার হাজার চাষীদের বিরাট সমাবেশ ও সভা হয়। এই সভা আহ্বানে ও পরিচালনায় নেতৃত্ব ছিল কৃষক সমিতির ও কৃষক সমিতির কর্মীদের। সভায় ক্যানেল কর ও সরকারী নীতির বিরুদ্ধে কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং জনগণকে আন্দোলনকে ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী করার আহ্বান করা হয়। প্রস্তাবে বলা হয়, 'বেঙ্গল ডেভেলপ্‌মেণ্ট এ্যাক্ট' ভুল তত্ত্ব ও তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই আইনে প্রযুক্ত কর স্বেচ্ছাচারী ও নিপীড়নমূলক। আদালতের বিচারের বাইরে রেখে এক চরম স্বৈরাচারী ক্ষমতা সরকার ও আমলাতন্ত্রের হাতে রাখা হয়েছে। প্রস্তাবে আরও বলা হয়, সেচ বিভাগের প্রদত্ত তথ্য সবই ভুল। সেচ বিভাগ ক্যানেলের দ্বারা বাড়তি ফসলের যে দাবি করেছেন তা একেবারে ভিত্তিহীন। ক্যানেল এলাকার জমির উৎপন্ন ফসলের দাম থেকে জমিদারের খাজনা ও চাষের খরচ বাদ দিলে ক্যানেল কর বহন করার মত উদ্বৃত্ত কিছু থাকে না। যাই হোক, কৃষক সমিতির আন্দোলন সার্থক হচ্ছে এটা পরিষ্কার বোঝা যেতে লাগল। ফেব্রুয়ারীর শেষে নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেল, ট্যাক্স আদায়ের উদ্দেশ্যে চল্লিশ হাজার সার্টিফিকেট করার কাগজপত্র তৈরী করা হয়েছে। ৩রা মার্চ তারিখে একটি বড় জনসভা হয়। সেই জনসভায় আইনসভার সদস্য হিসাবে বর্ধমানের মহারাজা সহ নরমপন্থী বক্তারা সরকারকে ট্যাক্স কমানোর অনুরোধ করার সঙ্গে সঙ্গে বে-আইনী আন্দোলন কিছু করা হবে না—এর উপর জোর দেন। সেই সভাতেই কমিউনিস্ট নেতা বঙ্কিম মুখার্জী পরিষ্কার করে বলে দেন, বে-আইনী কিছু করার ইচ্ছা জনগণের নেই, কিন্তু গভর্নমেণ্টকেও আইনসঙ্গত ভাবে যেতে হবে। গভর্নমেণ্ট যদি তাঁদের জেদ বজায় রাখবার চেষ্টা করেন এবং জনগণের ন্যায্য দাবি অস্বীকার করেন, তবে জনগণকেও শক্তিশালী ও কড়া সংগ্রামের জন্য তৈরী হতে হবে। সভায় জনগণের রায় পুনরায় ঘোষিত হল। প্রস্তাবে বলা হল, যেহেতু জমির কোন উন্নয়ন হয়নি, 'বেটারমেণ্ট লেভি' হতে পারে না। ১৯৩৫ সালের 'বেঙ্গল ডেভেলপ্‌মেণ্ট এ্যাক্ট'-এর স্বৈরাচারী চরিত্রের উদ্‌ঘাটন করা হয়। করের নিধারণ সম্পর্কে আপত্তি

থাকলে প্রদর্শন ও তার বিচারের কোন ব্যবস্থাই নেই। এমন কি সরকারের সমস্ত কাজকর্ম এই আইনের বলে দেওয়ানী আদালতের হস্তক্ষেপের বাইরে করে দেওয়া হয়।

১৩৪৪ সালের পৌষ মাসে (খৃঃ ১৯৩৭-৩৮) কুড়মুনে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সমিতির কার্যকরী কমিটির অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে তৎকালীন কৃষক সমিতির স্থানীয় যেসব আন্দোলন হচ্ছিল এবং কৃষক আন্দোলনের বিশেষ বিশেষ সমস্যা ও কার্যসূচী আলোচিত হয়। এই অধিবেশনে প্রদেশের বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে কর্মীরা উপস্থিত হন। অভ্যর্থনা, খাওয়া-দাওয়া প্রভৃতির ভার বর্ধমান জেলার সংগঠনকে নিতে হয়েছিল। গ্রামের সুপরিচিত রাজনৈতিক নেতা প্রয়াত কমরেড জাহেদ আলি এর নেতৃত্বে ছিলেন। তাঁর পরিচালনায় এবং গ্রামবাসীর অকুণ্ঠ সমর্থনে অভ্যর্থনা আয়োজন সুচারুভাবেই করা হয়েছিল। বলা বাহুল্য, সেই সময়ে কৃষকসভার কার্যসূচীতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল বর্ধমানের ক্যানেল কর বিরোধী আন্দোলন। সুতরাং এই আন্দোলন সংক্রান্ত বিষয়ের সমস্যা-সমূহ বিশেষভাবে আলোচিত হয় এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবাদি গৃহীত হয়। সভায় সারা প্রদেশের কৃষক নেতাদের উপস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করে কুড়মুনে এক ক্যানেল কর বিরোধী সমাবেশ সংগঠিত হয়। প্রয়াত কমরেড বঙ্কিম মুখার্জী তাঁর উদ্দীপনাময় ভাষণে ক্যানেল করের বিরুদ্ধে কৃষকের দৃঢ় সংকল্প ব্যাখ্যা করেন। এই সভা আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য শক্তি সঞ্চার করে।

এরপর কৃষক সমিতির জেলা সম্মেলন হয় গুসকরার নিকটে আলুটে, ক্যানেল এলাকার বাইরে। জেলা সম্মেলন ছিল গুরুত্বপূর্ণ কর্মী সমাবেশ। ফলে এখানেও ক্যানেল করের বিষয় ভাল করে আলোচনা করা হয়। কিছুদিন পর সড্যা গ্রামে নীহারেন্দু দত্ত মজুমদারের সভাপতিত্বে সদর মহকুমার কৃষক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলন বস্তুতঃ ক্যানেল কর বিরোধী আন্দোলনের অভিযানে এক বড় পদক্ষেপ। এই সম্মেলন অনুষ্ঠানের কর্মোদ্যোগে ক্যানেল কর প্রপীড়িত এলাকার বহু গ্রাম ও কর্মীকে ব্যাপৃত করা সম্ভব হয়েছিল।

এইভাবে কৃষক সমিতির প্রচার অভিযান যখন চলতে থাকে, সেই সময় কুড়মুন বুড়ি গাছতলায় এক সভা হয়। উপস্থিত ছিলেন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ। সভাপতিত্ব করেন প্রয়াত কমরেড মোল্লা জাহেদ আলি*। উক্ত সভায় প্রফুল্ল ঘোষ একরে জলকর বাবদ ১ মন ধান

এবং ১ পন খড় চাষীদের দেওয়ার জন্য প্রস্তাব করেন। কিন্তু কৃষকসভা ১ টাকা ৫০ পয়সার বেশী দিতে রাজী ছিল না।

কৃষক সমিতির কর্মীদের প্রচার সজোরে চলতে থাকে। ১৯৩৮ সালের জানুয়ারী মাসের শেষে সরকারী কমিটির মেম্বারগণ সহ মন্ত্রী বিজয়প্রসাদ সিংহরায় ও শ্রীশচন্দ্র নন্দী প্রথমে খানা জংশন ও পরে কুড়মুন ইউনিয়নের বলগনা গ্রামে যান। জেলা কৃষক সমিতির অন্যতম নেতা কমরেড চন্দ্রশেখর কোঙারের নেতৃত্বে দু' হাজার কৃষক একটি স্মারক-লিপি নিয়ে কমিটির সামনে উপস্থিত হন। স্মারকলিপির বক্তব্য মোটামুটি এই রকম ছিল ঃ "ফসলের পরিমাণ কিছু বৃদ্ধি হয়নি। যে ক্রপ কাটিং এক্সপেরিমেন্টের উপর সরকারী দাবি দাঁড় করানোর চেষ্টা করা হচ্ছে তা মোটেই নির্ভরযোগ্য নয়। ক্রপ কাটিং-এর জন্য প্লট গ্রামের মানুষের সামনে নির্বাচন করা হয়নি। জমির মালিককে বা গ্রামবাসীকে না জানিয়ে ক্রপ কাটিং করা হয়। স্থিরীকৃত যে-মাপের জমির ধান কেটে মাপতে হবে (১১ ফুট × ৯ ফুট), তার চেয়ে বেশি পরিমাণ জমির ধানকে ধরা হয়েছে। এই ভাবে বাড়তি দেখানোর চেষ্টা হয়েছে। তাছাড়া ফসল ঝরাপড়ায় যা নষ্ট হয় তা ধরা হয়নি। প্রাদেশিক অটোনমি প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যে রাজস্ব বিভাগের ব্যবস্থা হয় তাতে ক্যানেল খননের খরচ থেকে বাংলা গভর্নমেণ্টকে রেহাই দেওয়া হয়। প্রাদেশিক গভর্নমেণ্টের দেয় কিছুই নেই। সুতরাং এই অজুহাতে চাষীর কাছে আদায় করাও ন্যায়সঙ্গত নয়।" জেলা কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীযাদবেন্দ্রনাথ পাঁজাও সমঝোতার সুর রাখলেও এই ধরণের স্মারকলিপি খানা জংশনে দিয়েছিলেন।

সরকারের নানারূপ বিভ্রান্তিমূলক প্রচারের বিরুদ্ধে জেলা কৃষক সমিতির আহ্বানে বর্ধমান শহরের টাউন হলে ১৪ই ফেব্রুয়ারী বিরাট কৃষক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতি হন কমরেড উমাপদ রায়, কমরেড সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (পরে রাণীগঞ্জের ধর্মঘটে ১৫ নভেম্বর শহীদ হন)। এই সভায় বক্তৃতা দেন জেলা কৃষক সমিতির এবং (তখনকার দিনে বে-আইনী) কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃবৃন্দ, যেমন কমরেড অশ্বিনী মণ্ডল, কমরেড শম্ভু কোঙার, কমরেড চন্দ্রশেখর কোঙার প্রমুখ।

আন্দোলনের প্রচার ইত্যাদির ব্যাপারে আমরা সব সময় ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে বা আগে বেড়ে আমাদের দিক থেকে যা করণীয় সেইরূপ স্টেপ নেওয়ার চেষ্টা করতাম। ১৯৩৮ সালের গোড়ার দিকে মুখ্যমন্ত্রী ফজলুল হক সাহেব মন্ত্রিমণ্ডলীর আরও কয়েকজন সদস্য সহ স্থানীয় মুসলিম লীগ

এম. এল. এ. ও মুসলিম লীগের প্রেসিডেন্ট আবুল হাসেম সাহেবের আমন্ত্রণে তাঁর গ্রাম কাশিয়াড়ায় (কাশেম নগর) আসেন। বিরোধী পক্ষ হিসাবে তখন ঐ গ্রাম ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় আমরা ছাড়া আর কেউ ছিল না। অথচ আমাদের শক্তি তখন সোজাসুজি সামনাসামনি বিরোধিতা করে মিটিং বানচাল করার মতো নয়। আমরা ঠিক করলাম, এলাকায় মুদ্রিত হ্যাণ্ডবিল বিলি করে সরকারী প্রচারের বিরুদ্ধে আমাদের বক্তব্য রাখবো। কলকাতায় একজন পার্টি-দরদীর সামনে প্রস্তাবটি রাখায় তিনি সমস্ত খরচ বহন করতে রাজী বলে জানিয়ে দিলেন। আমি তখন কাজটি সম্পাদন করতে নেমে পড়লাম। বেশ বড় সংখ্যায় হ্যাণ্ডবিল ছাপানোর ব্যবস্থা করলাম। হাতে সময় ছিল না। সুতরাং প্রেস থেকে হ্যাণ্ডবিল পেয়েই তার বোঝা নিয়ে বর্ধমান ছুটলাম। সৌভাগ্যবশতঃ কমরেড নারায়ণ রায়কে পেয়ে গেলাম। বেশীর ভাগ অংশই তাঁকে দিলাম। গতিষ্ঠা, চাণক, পালিগ্রাম ও লাকুড়িয়া—এই চারটি অঞ্চলের রাজনীতিকভাবে কেন্দ্রস্থল ছিল কাশিয়াড়া, যা এখন কাশেম নগর নামে পরিচিত। কথা হল, কাশিয়াড়ার বা কেশেড়ার চতুর্দিকে বেশ ব্যাপ্তিতে হ্যাণ্ডবিল বিলি করা দরকার। কমরেড নারায়ণ রায় দায়িত্ব নিলেন। তিনি দ্রুতগতিতে হেঁটে ব্যাপকভাবে বিলি করে আমাদের সবাইকে আশ্চর্য করে দিয়েছিলেন। কমরেড শিবপ্রসাদ দত্ত (ওরফে আলু) স্থানীয় কংগ্রেস, কমিউনিস্ট, মুসলিম লীগ সব মহলেই সুপরিচিত। তাঁকে ঐ হ্যাণ্ডবিলের একাংশ দিয়ে সোজা সভাস্থলেই পাঠিয়ে দিলাম। তিনিও যথারীতি কাজ সম্পাদন করলেন। উভয় কমরেডই সর্বত্র যেখানেই সুযোগ পেলেন, মৌখিক বক্তৃতা ও প্রচার মাধ্যমেও প্রচার করলেন। তাঁদের এই তৎপরতা সকল সহকর্মীর কাছেই প্রশংসা পেয়েছিল। স্থানীয় কংগ্রেস ও কমিউনিস্ট কর্মীরা তাঁদের যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন। এই সূত্রে আহাদ সাহেব ও কমরেড সামী ও মকিতের নাম উল্লেখযোগ্য।

ইতিমধ্যে ১৯৩৮ সালের ফেব্রুয়ারীর শেষে কংগ্রেসের নিয়োজিত তদন্ত কমিটির রিপোর্ট বেরোল। নানান নথিপত্র পুরনো রেকর্ড প্রভৃতি ঘেঁটে তাঁরাও প্রমাণ করলেন যে, ফসল উৎপাদনে উন্নয়ন কিছু হয়নি। তাঁরা বললেন, 'শুকোর' বছরে ক্যানেল কিছু কাজে লাগবে। তাঁরা এই হিসাবে একর প্রতি এক মন ধান ও এক পন খড়ের দাম কর হিসেবে অনুমোদন করেন। কৃষক সমিতির বক্তব্য ছিল, যেহেতু সেচের ব্যবস্থা গভর্নমেণ্টের অবশ্য করণীয়, সেই হেতু কোনরূপ আদায়ের দাবি তোলা ন্যায্য

নয়। অবশ্য কৃষক সমিতি গৃহীত অবস্থায় ক্যানেল রক্ষণাবেক্ষণ ও তার দৈনন্দিন খরচের জন্য একর প্রতি দেড় টাকা দিতে সম্মত হয়। কংগ্রেস ও কৃষক সমিতির দৃষ্টিভঙ্গীতে এইরূপ কিছু পার্থক্য থেকে যায়। তখন তীব্র অর্থ-সঙ্কট চলছে। ধানের দাম খুব পড়ে গেছে। খাজনা মেটানোই দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছে। জনমত কৃষক সমিতির বক্তব্যেরই সমর্থক ছিল।

১৯৩৮ সালের মে মাসের মাঝামাঝি বা বাংলা ১৩৪৫ সনের বৈশাখ মাসের শেষাশেষি গভর্নমেণ্ট এক ঘোষণা করে। এই ঘোষণায় গভর্নমেণ্ট তার দাবিকে একর প্রতি ২ টাকা ৯ আনায় নামাতে বাধ্য হয়। অর্থাৎ আন্দোলনের ফলে রপ্তায় রপ্তায় একর প্রতি ৫ টাকা ৮ আনা থেকে ৪ টাকা ২ আনা, ৪ টাকা ২ আনা থেকে ৩ টাকা, শেষে ২ টাকা ৯ আনায় গভর্নমেণ্ট নামতে বাধ্য হয়। সরকারকে সাড়ে পাঁচ টাকা থেকে ২ টাকা ৯ আনায় নামানো কৃষকের বড় জয়। কিন্তু ফসলের দামের ক্রমনিম্ন হার এবং তার জন্য ঋণের চাপের বৃদ্ধি, এসবের ফলে এই ২ টাকা ৯ আনাও সাধারণ গরীব মাঝারি কৃষকের কাছে সহনীয় মনে হচ্ছিল না। তাই কৃষক সমিতিকে তার দাবিতে অনড় থাকতে হয়েছিল। 'রায়ত সমিতি' এবং কংগ্রেস বিচার-সাপেক্ষে কর আংশিক মিটিয়ে দেওয়ার পক্ষে ছিলেন। তাঁরা সেইরূপ প্রচারও করে যাচ্ছিলেন। কিন্তু জেলা কৃষক সমিতি কর আদায় বন্ধ করার ডাক দিয়েছিলেন। জনগণ সেই ডাকেই সাড়া দিয়েছিলেন। ক্যানেল কর আদায় বন্ধ হয়েই রয়ে গিয়েছিল।

রেট্ কমানো ছাড়া গভর্নমেণ্ট আর একটি বিষয়েও নতি স্বীকার করেছিলেন। নতুন 'বেঙ্গল ডেভেলপ্‌মেণ্ট এ্যাক্ট'-এ প্রযুক্ত বাধ্যবাধকতা থেকে পুরানো 'ইরিগেশন্ এ্যাক্ট'-এর স্বেচ্ছামূলক এগ্রিমেণ্টের ব্যবস্থায় ফিরে গেলেন।

কৃষক সমিতি ও তার নেতৃবৃন্দ সমগ্র ক্যানেল এলাকা ধরে ব্যাপক হারে প্রচারে রত ছিলেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ হাটগোবিন্দপুর, গলসী, মণ্ডলগ্রাম, কবুড়ী, কুলজোড়া, কুচুট, ধর্মরাজতলা, বেলগ্রাম, বুড়োর, উরো প্রভৃতি গ্রামে এই সময় কৃষকের সভা হল। কৃষক সমিতির বক্তারা সরকারি এগ্রিমেণ্টে সই-স্বাক্ষর না দিতে ডাক দিলেন। এইসব সভায় বক্তাদের নামের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বঙ্কিম মুখোপাধ্যায়, আবদুল্লাহ্ রসুল, শচী অধিকারী, চন্দ্রশেখর কোঙার, হেলারাম চট্টোপাধ্যায়, মহানন্দ খাঁ, জাহেদ আলি, রাধাগোবিন্দ দত্ত, মহাপ্রসাদ কোঙার, গোলাম মহবুল, অজ কেশ প্রমুখ ছিলেন। যাদবেন্দ্রনাথ পাঁজা, আব্দুস্ সাত্তার প্রমুখ কংগ্রেসের প্রবক্তারাও

কংগ্রেসের দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী সমঝোতামূলক বক্তব্য রাখলেন এবং আংশিক কর দিয়ে দিতে বললেন।

গোড়া থেকেই দু'টি দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বন্দ্ব ক্রমোত্তর স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হচ্ছিল।

বর্ধমান জেলার কৃষক সমিতির দাবি, কর যতক্ষণ পর্যন্ত দেড় টাকায় নামানো না হচ্ছে সত্যাগ্রহ চলতে থাকবে এবং ক্যানেল কর দেওয়া সম্পূর্ণ বন্ধ থাকবে। জনমত কৃষক সমিতির রায়ের পক্ষে থাকল। কংগ্রেসের আংশিক কর দেওয়ার ডাক জনমত অগ্রাহ্য করল এবং দেড় টাকা দাবির উপর দৃঢ় থাকল। কংগ্রেসের আংশিক দাবি দেওয়ার ডাককে আন্দোলন স্তিমিত করার কৌশল হিসাবে দেখা হচ্ছিল। কংগ্রেস কর্তৃক আংশিক দেওয়ার ডাক জেলা কৃষক সমিতির ডাকে গণ-আন্দোলন কর্তৃক গৃহীত ও পরিচালিত সত্যাগ্রহের বিরোধিতায় পর্যবসিত হল এবং জনগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত হল। বর্ধমান শহর ও গ্রামাঞ্চলে জেলা কৃষক সমিতির নেতৃত্বে নিরন্তর সভা ও শোভাযাত্রা চলতে লাগল। শ্লোগান চলতে লাগল, ক্যানেল কর দেড় টাকার বেশী চলবে না। গভর্নমেণ্ট দমনমূলক নীতি গ্রহণ করল। বিভিন্ন অঞ্চলে নেতৃবৃন্দ সহ সত্যাগ্রহের স্বেচ্ছাসেবকগণ গ্রেপ্তার হয়ে বর্ধমান জেলে নীত হচ্ছিলেন।

সরকার অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোকের নীতি গ্রহণ করল। দমনমূলক ব্যবস্থার জন্য পুলিশের সশস্ত্রবাহিনী নামাল। ভাতাড় থানায় একজন রবি দাসের গাই পুলিশ ক্রোক করে। কৃষক সমিতির নেতৃত্বে হাজার হাজার কৃষক জমায়েত হয়ে ক্রোক করা সম্পত্তি গ্রাম থেকে বেরোতে দিলেন না। সরকারী কর্মচারীদের ঘিরে রাখলেন। বর্ধমান সদর থানার কাদরা গ্রামে এক ব্রাহ্মণের অনীন্দ্রমোহন মুখার্জীর নয়টি গরু পুলিশ ও ক্যানেল কর বিভাগের অফিসাররা ক্রোক করে। গরুগুলিকে মেমারী থানার নবস্থার ইউনিয়নের আউশা গ্রামের খোঁয়াড়ে নিয়ে আসে। জেলা কৃষক সমিতির নেতৃত্বে হাজার হাজার কৃষক জমায়েত হয়ে ঐ গরু কোথাও নিয়ে যেতে বা নিলাম করতে দেবেন না এরূপ ঘোষণা করেন। সত্যাগ্রহী স্বেচ্ছাসেবকগণ শান্তিপূর্ণ ও শৃঙ্খলার সঙ্গে ঘেরাও করে রাখেন। সড্যা গ্রামে শ্রীমতী নলিনী সামন্তের নেতৃত্বে মহিলা সত্যাগ্রহীরাও এই সংঘবদ্ধ প্রতিরোধে উপস্থিত থাকেন। সরকার ১৪৪ ধারা জারি করে। শেষে সরকারী সশস্ত্রবাহিনী জোর করে এই গরু শহরে নিয়ে আসে। সত্যাগ্রহীদের অনেককে আউশা ক্যাম্প থেকে গ্রেপ্তার করে জেলে নিয়ে যাওয়া হয়। হাটগোবিন্দপুর অঞ্চলের

সন্তোষ মণ্ডল, সড্যার ভোলানাথ কোঙার, নবস্থার নিত্যগোপাল কোঙার প্রমুখ স্বেচ্ছাসেবকগণ এখানে গ্রেপ্তার হন। ঐ সময় মহানন্দ খাঁও গ্রেপ্তার হন। গরুগুলিকে সরকার শহরে নিয়ে আসে। সঙ্গে সঙ্গে কৃষক সমিতির স্বেচ্ছাসেবকগণ সমবেত হন। পুলিশ ও সরকারী কর্মচারীরা গরুগুলিকে নিলামের চেষ্টা করে। স্বেচ্ছাসেবকগণ নিলামের ডাকে সাড়া না দিতে জনসাধারণকে অনুরোধ করেন। শেষে লাঞ্ছিত পুলিশবাহিনী নিজেদের সাদা পোশাকের কর্মচারী দিয়ে সামান্য টাকায় নিলামের ডাক দেওয়ায়। নিলামের স্থানে প্রত্যক্ষভাবে বাধা দেওয়ার ফলে সড্যা গ্রামের প্রয়াত দুর্গাপদ কোঙার গ্রেপ্তার হন।

এইভাবে সমস্ত ক্যানেল এলাকায় ক্রোক ও নিলামের প্রতিরোধ চলতে থাকে।

পুলিশ সশস্ত্রবাহিনী নিয়ে সড্যা গ্রামে আক্রমণ চালায়। হিংস্রভাবে মারধোর ধর-পাকড় করতে থাকে। হাটগোবিন্দপুরের কমরেড তারাপদ মোদক সড্যায় এদের মোকাবিলা করলে প্রচণ্ডভাবে প্রহৃত হন। তাঁকে ও গ্রামের আরও অনেককে গ্রেপ্তার করা হয়। এইভাবে আক্রমণ ও গ্রেপ্তার অন্যান্য গ্রামেও চলতে থাকে। কৃষক সমিতির অগ্রগণ্য কর্মী কমরেড বিপদবারণ রায় এবং কমরেড দাশরথি চৌধুরী এই সূত্রে গ্রেপ্তার হন। প্রায় আশিজন গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। বিনয়দা এই সময় কৃষক সমিতির অফিসে যোগাযোগ ও পরিচালনার ভার নেন। একই সঙ্গে আমিও সেই কর্মভারে নিযুক্ত হই। এর মধ্যে ধনী ও জমিদার শ্রেণীর দু'-তিন জন বণ্ড্ দিয়ে আসেন। যাঁরা জেলে ছিলেন তাঁদের পূর্ণ তালিকা সংগ্রহ করতে পারিনি। যা সংগ্রহ করতে পেরেছি তার পূর্ণ তালিকা নিয়ে দিলাম। এর মধ্যে কমরেড় তারাপদ মোদক সহ কয়েকজনের ৩ মাস জেল হয়। বাকী সকলের ৬ মাস করে জেল হয়।

বাংলা সন্ ১৩৪৫ সালের ক্যানেল আন্দোলনে সড্যা গ্রামের কারাবরণকারীদের নাম ঃ ১১-১২ ফাল্গুন এবং তারপর— (১) জীবানন্দ চট্টোপাধ্যায়, (২) হরেরাম রায়, (৩) তারকনাথ কোঙার, (৪) বিবেকানন্দ রায়, (৫) মহানন্দ খাঁ, (৬) দুর্গাপদ কোঙার (জহরলাল), (৭) মহাদেব রায়, (৮) দ্বিজপদ চন্দ্র, (৯) কার্তিকচন্দ্র চন্দ্র, (১০) সুদর্শন মাজিল্যা, (১১) শিবদাস চন্দ্র, (১২) ভোলানাথ কোঙার, (১৩) জগন্নাথ কোঙার, (১৪) তিনকড়ি কোঙার, (১৫) নির্মলচন্দ্র খাঁ (জামিনে মুক্ত), (১৬) শ্যামাপদ সামন্ত (জামিনে মুক্ত)। সিংহপাড়া, (১৭) পঙ্কজ

বিহারী পাল, (১৮) অমৃতলাল রক্ষিত, (১৯) রামপদ রক্ষিত (করোরী গ্রাম), (২০) গঙ্গাধর কোঙার, (২১) শ্যামাপদ চক্রবর্তী (মূল্যে), (২২) অমিয় রায় (নেরাগোয়ালিয়া), (২৩) নিত্যগোপাল কোঙার (নবস্থা), (২৪) তারকনাথ সোম (নবস্থা), (২৫) রাজারাম বন্দ্যোপাধ্যায় (শালিগ্রাম), (২৬) তারাপদ মোদক (হাটগোবিন্দপুর)।

নারায়ণ রায়ের সংযোজন ঃ— (১) কমলাকান্ত রক্ষিত (সিংহপাড়া), (২) দ্বিজপদ চন্দ্র (সিংহপাড়া), (৩) চন্দ্রশেখর কোঙার (বোড়শো), (৪) বিমলাকান্ত কোঙার (বোড়শো), (৫) ভোলানাথ কোঙার (বোড়শো), (৬) ভোলানাথ সামন্ত (করন্দা—মন্তেশ্বর), (৭) পঞ্চানন দে (করন্দা), (৮) নারায়ণচন্দ্র রায় (সাতগেছিয়া), (৯) অজিতকুমার সেন (সিমডাল), (১০) গণেশচন্দ্র রায় (জিয়ারা), (১১) অনিল রায় (মাহাচান্দা), (১২) সন্তোষ মণ্ডল (রামনগর), (১৩) অবনী মণ্ডল (কুসুমগ্রাম), (১৪) দাশরথি চৌধুরী (ক্ষীরগ্রাম), (১৫) বিপদবারণ রায় (জবুল), (১৬) মৃত্যুঞ্জয় কোঙার (সড্যা), (১৭) হরিসত্য ভট্টাচার্য (সিংহপাড়া), (১৮) সরাইটিকর গ্রামের এক মুসলমান ভদ্রলোক এ'র সঙ্গে ছিলেন, (১৯) হীনাঙ্কশশী রায় (করন্দা), (২০) ধর্মদাস চৌধুরী (করন্দা)।

ক্যানেল আন্দোলনের সাজাপ্রাপ্ত বন্দীদের উপর ডাণ্ডাবার, স্ট্যাণ্ডিং হ্যাণ্ডকাপ, নাইট্ হ্যাণ্ডকাপ্, পেনাল ডায়েট প্রভৃতি উপায়ে জেলের মধ্যে অত্যাচার চলে। পানীয় জল, ঘরে আলো এবং খেলাধূলার দাবিতে বন্দীরা আন্দোলন করলে সেই আন্দোলনকে দমন করার জন্য উক্ত উপায়ে অত্যাচার করা হতো। এইভাবে অত্যাচারের পরেও বন্দীদের কোন সুযোগ-সুবিধা না দেওয়ার ফলে বন্দীরা ১২ দিন অনশন করেন। ১৩৪৬ সালের ৪ঠা আষাঢ় নাজিমুদ্দীন সাহেব, কমরেড মুজফ্ফর আহমদ, কমরেড বঙ্কিম মুখার্জী অনশন ভাঙ্গার জন্য প্রত্যেক বন্দীকে তারবার্তা পাঠান এবং বন্দীরা অনশন ভঙ্গ করেন। পরবর্তীকালে বন্দীদের বিভিন্ন জেলে স্থানান্তর করা হয়। কৃষক-কর্মীদের ছাড়াও সাধারণ গ্রামবাসীদের উপর পুলিশ জঘন্য অত্যাচার করে।

শেষে কৃষক সমিতির আহ্বানে, সভা সমাবেশ প্রভৃতির বিরুদ্ধে সরকারী ঘোষণাকে অগ্রাহ্য করে হাজার হাজার কৃষক বিভিন্ন পথে শহরে জমায়েত হবার জন্য প্রস্তুত হয়ে আসেন। কৃষক সমিতির নির্দেশে এ'রা ছিলেন সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ। শুধু আওয়াজ উঠছিল, 'একর প্রতি দেড় টাকার বেশী

ক্যানেল কর চলবে না', 'সরকারী জুলুম চলবে না', 'কৃষকের সম্পত্তি নিলাম করা চলবে না'।

অন্যদিকে সরকারের আচরণ ছিল অত্যন্ত প্ররোচনামূলক। কোন রকমে প্ররোচনা ঘটিয়ে উত্তেজনা সৃষ্টি করে সমবেত কৃষকদের দ্বারা বে-আইনী বিশৃঙ্খলা কিছু করাবার জন্য তারা চেষ্টা করছিল। তারা একটা প্ররোচনা দিয়ে একটা অজুহাত সৃষ্টি করে সমবেত কৃষকের উপর গুলি চালনা করে একটা চক্রান্তের চেষ্টায় ছিল। জেলা কৃষক সমিতির নেতৃত্ব তাদের অসৎ উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে কৃষকদের বোঝান, তাঁদের এই সমাবেশের শক্তি দেখিয়ে সরকারকে তাঁদের দৃঢ় মনোবলের পরিচয় দিয়েছেন. এখন সরকারী বাহিনীকে হস্তক্ষেপ করার অছিলা না দিয়ে শান্তিপূর্ণভাবে ফিরে গেলে আন্দোলনকে জোরদার রাখা হবে। সমাবেশের নির্ধারিত দিনে সারা ভারত কমিউনিস্ট পার্টির নেতা কমরেড অজয় ঘোষ ও প্রাদেশিক কৃষক সমিতির নেতা কমরেড আবদুল্লাহ্ রসুল প্রমুখ উপস্থিত হন। তাঁরা জেলার ক্যানেল আন্দোলনের নেতৃস্থানীয় কর্মীদের নিয়ে ইছলাবাজারে ওয়াকফ্ এস্টেটের মোতোয়াল্লী ও কৃষক সমিতির বিশিষ্ট পদাধিকারী আবদুল আহাদ সাহেবের বাসভবনে সভা করেন। খণ্ড খণ্ড কৃষক সমাবেশে তাঁরা উপরোক্ত কৌশল আলোচনা করেন। আসলে কংগ্রেসের বিভেদ ও প্রতিরোধের কারণেই কৃষক সমিতিকে বাধ্য হয়েই আন্দোলনের গতিকে শান্তিপূর্ণভাবে রোধ করতে হয়। কংগ্রেস গোড়া থেকেই সত্যাগ্রহের বিরোধিতা করে যাচ্ছিলেন। সম্পূর্ণ বয়কটের বদলে তাঁদের প্রচার ছিল ট্যাক্সের একটা অংশ দিয়ে দিতে হবে। এতেও আন্দোলনের গতিমুখকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করা হচ্ছিল। জেলা কৃষক সমিতির আহ্বানে জনমতের বৃহত্তর অংশের প্রবল সমর্থন থাকলেও বেশ কিছু ধনী ও মধ্যবিত্ত কৃষকের মধ্যে দ্বিধাচিত্ততা ও আড়ষ্টতা এনে দিচ্ছিল এবং কিছু ব্যাপকতর অংশে সক্রিয় প্রতিরোধের সংকল্প শক্তিশালী থাকতে দিচ্ছিল না। একদিকে সরকারী অত্যাচার ও দমনমূলক ব্যবস্থাদি, অন্যদিকে প্রতিরোধের শিবিরে কংগ্রেসের পিছুটান, কৃষক সমিতিকেও কৌশল নমনীয় করতে বাধ্য করল।

কংগ্রেস প্রতিনিধি, কৃষক সমিতির প্রতিনিধি ও শাসকদলের পক্ষে মুসলিম লীগের প্রতিনিধি আবুল হাসেম এক বোঝাপড়া করেন। এই বোঝাপড়ায় ঠিক হয় সরকার সমস্ত দমনমূলক ব্যবস্থা প্রত্যাহার করবে, সমস্ত বন্দীদের মুক্তি দেবে এবং বরাবরকার জন্য ২ টাকা ৯ আনা কর স্থায়ী করে দেবে।

এখানে এই সূত্রে সেদিনকার এক ইন্টারেস্টিং ঘটনার বিবরণ দেব। উপরে বর্ণিত বোঝাপড়ায় ঠিক হয় কলকাতায় পাঁজা মশায় এসে আবুল হাসেম সাহেবকে সিদ্ধান্তগুলি বলবেন এবং আবুল হাসেম সাহেব মন্ত্রিমণ্ডলীকে দিয়ে ঐসব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়ে নেবেন। পাঁজা মশায় উক্ত উদ্দেশ্যে আমাদের বাসায় কলকাতার ১১১-এ নং করাইয়া রোডে একদিন সকালে উপস্থিত হলেন। আমাকে বললেন, "চলো গো, হাসেম সাহেবের কাছে যাই।" রাজনীতি আলাদা হলেও হাসেম সাহেব আমার মামা। থাকেন খুব কাছেই, খয়রাত লেনে। লেজিস্‌লেটিভ কাউন্সিলের অধিবেশন তখন চলছে। সুতরাং সদস্য হাসেম সাহেব কলকাতাতে তাঁর বাসাতেই আছেন। পাঁজা মশায় ও আমাতে দু'জনে গেলাম। প্রাথমিক সৌজন্যের পর হাসেম সাহেব বললেন, "তাহলে যা যা এগ্রিড্‌ হয়েছে, একটা কাগজে লিখে দেন।" পাঁজা মশায়ের পয়েন্টগুলো লেখা ছিল। সেটা তাঁর কাছে রাখতে হবে। সুতরাং একটা নকল করে দেওয়া দরকার। হাসেম সাহেবের কাছে বর্ধমানের এক পরিচিত যুবক বসে ছিল। আমি হাসেম সাহেবের নামাঙ্কিত একটা প্যাড ছেলেটার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললাম, "পাঁজা মশায় বলছেন, তুমি লিখে নাও তো।" পাঁজা মশায় বললেন, "থাক, আমিই লিখে দিচ্ছি।" আমি ছেলেটার হাত থেকে প্যাডটা নিয়ে পাঁজা মশায়ের দিকে বাড়িয়ে দিলাম। প্যাডটা ছিল নরওয়েজিয়ান বণ্ডের। এ কাগজ তখন দামী বলে বিবেচিত হতো। পাঁজা মশায় বললেন, "থাক, এতো দামী কাগজ, আমি ফুল্‌স্কেপেই লিখে দিচ্ছি।" বলে, নিজের থলি থেকে কাগজ বার করে তাতেই লিখে দিলেন। এরপর দু'জনে ফিরলাম। পথে বেরিয়ে পাঁজা মশায়কে বললাম, "আমি চেয়েছিলাম ছেলেটাই লিখুক, আমাদের কারোর হস্তলিপি থাকবে না। অন্ততঃ হাসেম সাহেবের প্যাডটাতে যদি লিখতেন তবে তাঁরও সংশ্লিষ্টতার কিছু সাক্ষ্য থাকতো। যতক্ষণ না ফয়সালা হচ্ছে ততক্ষণ তো গোপন ব্যাপার।" পাঁজা মশায় বললেন, "এ তো হাসুকে দিলাম।" আমি বললাম, "সেই জন্যই তো বলছি। উনিঃ তো মুসলিম লীগের সদস্য গভর্নমেণ্ট পক্ষের লোক।" পাঁজা মশায় তখন বললেন, "তোমরা বাপু বড় সন্দিগ্ধ প্রকৃতির।" মীমাংসার কথাবার্তা চললেও কংগ্রেস তখন সরকারী ভাবে গভর্নমেণ্টের প্রস্তাবের বিরোধী। কাউন্সিলে কংগ্রেস সদস্যরা সেইজন্য সরকারী নীতির সোজাসুজি বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিলেন। হাসেম সাহেব বললেন, "এই তো পাঁজা মশায় প্রস্তাব আমাকে দিয়ে গেছেন। সুতরাং কংগ্রেস সদস্যরা পুনরায় এসব কথা কী

বলছেন !” বলা বাহুল্য, পাঁজা মশায়ের লেখায় সরকারের প্রস্তাবের ২ টাকা ৯ আনা মেনে নেওয়ার কথা ছিল।

কয়েকদিন বাদে বর্ধমানে পাঁজা সাহেবের সাথে দেখা। আমাকে বললেন, “তুমি বাপু সেদিন ঠিকই বলেছিলে। শরৎবাবু আমাকে খুবই বকেছেন। কিন্তু কি করে বুঝবো বলো? নেগোশিয়েশন শেষ না হওয়া পর্যন্ত তো গোপন রাখার কথা। হাসু যে এ রকম করবে তা কি করে জানবো?”

যাই হোক শেষ পর্যন্ত ২ টাকা ৯ আনা করটাই প্রতিষ্ঠিত হল। সরকার বন্দীদের মুক্তির দাবি গ্রহণ করল না এবং যেসব দমনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল তা প্রত্যাহার করল না। সরকার দেড় টাকা মানল না বটে, কিন্তু সাড়ে পাঁচ টাকা থেকে ২ টাকা ৯ আনায় নামানো—এও একটা কম জয় নয়।

দক্ষিণপন্থী দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা পরিচালিত জেলা কংগ্রেস কমিটি সংগ্রামের পক্ষে ছিলেন না। অন্যদিকে জনগণের মনে, বিশেষ করে ভুক্তভোগী মধ্যবিত্ত ও গরীব কৃষকের মধ্যে, বিক্ষোভ ছিল খুব বেশী এবং আন্দোলন-সংগ্রামের মাধ্যমে সুরাহা করার আকাঙ্ক্ষা ছিল প্রবল। জেলা কৃষক সমিতির নেতৃত্ব ও তৎকালের বে-আইনী ও গোপন কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ও সমর্থকগণ এই সংগ্রামমুখী জনতার সঙ্গে ছিলেন এবং তাঁদের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন।

আন্দোলনের গতিমুখে কংগ্রেসের নেতৃত্ব সোজাসুজি বিরোধিতা করতে পারছিলেন না। সরকারের উচ্চ হারে ক্যানেল করের দাবির পক্ষে যৌক্তিকতা ছিল না। ফলে সরকারকে নতিস্বীকার করানোর দিকে জনমত ছিল প্রবল। কংগ্রেস নেতৃত্ব সোজাসুজি এর বিরোধিতা করে জনগণ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হতে চাচ্ছিলেন না। আবার জেলা কৃষক সমিতির পরিচালিত সত্যাগ্রহীদের সঙ্গে কংগ্রেস সাথও দিতে পারছিলেন না। জেলা কৃষক সমিতি ও সংগ্রামী জনতা সত্যাগ্রহ করে সম্পূর্ণ ট্যাক্স আদায় দেওয়া বন্ধ রেখে ছিলেন। কংগ্রেস নেতৃত্ব ট্যাক্স আংশিক দেওয়ার পক্ষে প্রচার করছিলেন এবং স্থানে স্থানে যেখানে সম্ভব হচ্ছিল আংশিক কর দেওয়ার ব্যবস্থা করছিলেন। তাঁদের এই সমঝোতার কৌশল জনগণের কাছে নতিস্বীকার হিসাবেই পর্যবসিত হচ্ছিল। এর ফলে সরাসরি আদায়ের পরিমাণ বেশী না হলেও সংগ্রামমুখী জনতার মধ্যে কিছু বিভেদ এনে দিচ্ছিল। ধনী

কৃষকদের মোট পরিমাণ ট্যাক্স বেশী। দোদুল্যমানতা তাঁদেরই বেশি। কংগ্রেসের প্রভাব তাঁদের আরও বিচলিত করছিল।

* এই প্রসঙ্গে প্রয়াত শ্রদ্ধেয় কর্মীর পরিচয় দেওয়া সঙ্গত হবে।

জনাব মোল্লা জাহেদ আলীর পরিবার কুড়মুন গ্রামে সুপরিচিত। ১৯২০-২২ সালে অসহযোগ ও খিলাফৎ আন্দোলনে তিনি অংশগ্রহণ করেন। কলকাতায় তাঁর ব্যবসা। কিন্তু ব্যবসা বজায় রাখলেও রাজনীতিতে অংশগ্রহণের দরুন তিনি বিরতিহীনভাবে লেগে থাকতে পারতেন না। তিনি কলকাতাতেই এক জনসভায় যোগদানকালে গ্রেপ্তার হন। কংগ্রেসের আন্দোলন স্থগিত হওয়ার পর তিনি ব্যবসার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের নানা জনহিতকর কাজে যুক্ত হন। ১৯৩০-এ আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে তিনি কংগ্রেসের আন্দোলনে যুক্ত হতে থাকেন। ১৯৩১ সালে যখন দ্বিতীয়বার সত্যাগ্রহের আহ্বান হয় তখন তিনি শ্রদ্ধেয় শ্রীযাদবেন্দ্র নাথ পাঁজা মহাশয়ের, শ্রদ্ধেয় বিজয়কুমার ভট্টাচার্য, জনাব আবুল হায়াত প্রমুখের সঙ্গে সত্যাগ্রহ করে কারাবরণ করেন। বিচারে শাস্তি ছাড়াও জরিমানা হয়। ও'র জরিমানা আদায়ের জন্য বাড়ি তল্লাসি করে ধান ক্রোক করা হয় এবং কিছু গহনাও জরিমানা বাবদ নেওয়া হয়। তিন বৎসর বাদে জেল থেকে মুক্ত হওয়ার পর তিনি পুনরুদ্যমে কংগ্রেসের কাজে যুক্ত হন। ইতিমধ্যে ১৯৩৬ সালের নির্বাচন এসে পড়ে, সেই সূত্রে তিনি কংগ্রেসের হোমড়া-চোমড়াদের সামনাসামনি জন-জমায়েত করে বিরোধিতা করেন। নির্বাচনে মহারাজার পক্ষপাতী কুড়মুন গ্রামের জমিদারদের প্রয়াস ব্যর্থ করে কুড়মুন গ্রামে কংগ্রেসের সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেন। এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য, জাহেদ আলী সাহেব পাঁজা মশায়ের খুবই ভক্ত ছিলেন। দক্ষিণপন্থীদের সমালোচনার সময় পাঁজা মশায়ের কোন সমালোচনা করলে তিনি ক্ষুণ্ন হতেন। সে সময় কংগ্রেসের বিপক্ষে ছিলেন বর্ধমানের মহারাজকুমার এবং পৃথক মুসলমান আসনে প্রার্থী ছিলেন পূর্বের স্বরাজ দলের ১৯২৩ সালে নির্বাচিত ইয়াসিন সাহেব। তাঁর বিরুদ্ধে ছিলেন আবুল হাসেম। যেহেতু ইয়াসিন সাহেব মহারাজাকে সমর্থন আরম্ভ করলেন, কংগ্রেস হাসেম সাহেবকে সমর্থন করার সিদ্ধান্ত নিলো। জাহেদ আলী সাহেব কুড়মুনে কংগ্রেসের নির্বাচন-সংগ্রামের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। তখন কুড়মুন গ্রামে মুসলমান মাত্র ৮-১০ ঘর হবে।

জাহেদ আলী সাহেব জেলা কংগ্রেস থেকে যথেষ্ট সহযোগিতা পাচ্ছিলেন না বলে কংগ্রেস অফিসে এসে পাঁজা মশায়কে তাগিদ দেন। পাঁজা মশায় অনেক সময় বিরক্ত হয়ে বেকায়দায় কথা বলে ফেলতেন। তিনি বললেন, "আপনি যান হাসেম সাহেবের ক্যানভাস্ করুনগে।" তো ব্যস, জাহেদ আলী খুবই ক্ষুণ্ণ হয়ে যান। এবং এরপর থেকেই পাঁজা মশায়ের প্রতি তাঁর ভক্তি নষ্ট হয়ে যায় এবং তিনি আমাদের কথা ধীর-স্থির ভাবে শোনেন। ক্যানেল কর আন্দোলনে তিনি আমাদের সঙ্গে পুরোপুরি যোগদান করেন ও জেলা কৃষক সমিতির সভ্য হন। বরাবর গ্রামাঞ্চলের আন্দোলনে তিনি কমিউনিস্ট কর্মীদের সঙ্গে যুক্ত থাকেন এবং পরবর্তী কালে পার্টি-সদস্যও হন। মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি পার্টির সমস্ত নির্দেশ পালন করে যান।

'দি মুসলমান' ও 'কমরেড'

পূর্বে উল্লেখ করেছি 'দি মুসলমান' কাগজ এবং মৌলভী মুজিবর রহমানের কথা। রসুল সাহেব তখন এই কাগজেই চাকরি করতেন। এছাড়াও অগ্রজ-প্রতিম বন্ধু মনোরঞ্জন গুহ নিয়মিতভাবে কাগজে লিখতেন। আমার প্রথম চাকরি ছিল. যে প্রেসে ঐ কাগজ ছাপা হত সেই প্রেসের ম্যানেজারের পদ। নিকট আত্মীয় গুরুজন ছিলেন ঐ প্রেসের অংশীদার (তিনি 'দি মুসলমান' কাগজেরও অংশীদার ছিলেন।)। ১৯৩৫ সালের আইন অনুযায়ী নির্বাচনের গুঞ্জরন শুরু হয়েছিল। ব্যাঙের ছাতার মত কিছু গ্রুপ গজিয়ে ওঠে। 'নিউ মুসলিম মজলিস্' এই রকম একটি গ্রুপ। আব্দুর রহমান সিদ্দিকি (পাকিস্তানী কালে এক সময় পূর্ব বাঙলার গভর্নর), মহামেডান স্পোর্টিং-এর সেক্রেটারী এবং নাজিমুদ্দিনের কাজিন্ ও শ্যালক খাজা নূরউদ্দিন প্রমুখ ছিলেন সদস্য। এ'রা কিছু প্রগতিশীল চেহারা দেখান এবং 'দি মুসলমান' কাগজের অংশীদার হন। এইভাবে 'দি মুসলমান' কাগজের মালিকানাস্বত্বের বেশির ভাগ অংশ ওদের হাতে চলে যায়। ১৯৩৬ সালে এ'রা ধীরে ধীরে মুসলিম লীগের সঙ্গে এক হয়ে যান। এইভাবে দ্বন্দ্ব ও সংকট শুরু হয়ে যায়। মালিকের ভারি দল ঘোরতর সাম্প্রদায়িক দলের সাথী। আর সম্পাদক মৌলভী মুজিবর রহমান সহ অন্যান্য কর্মিগণ সকলেই প্রগতিশীল, জাতীয়তাবাদী এবং সাম্প্রদায়িকতার ঘোরতর বিরোধী।

আমি, আগেও বলেছি. ছোটবেলা থেকেই 'দি মুসলমান' কাগজের মধ্যে সংশ্লিষ্ট। মায়ের চাচা আবুল হায়াত সাহেব (যিনি চাকরি ছেড়ে অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেছিলেন বলে পূর্বে উল্লেখ করেছি) 'দি মুসলমান' কাগজের অন্যতম কর্মী ছিলেন। স্কুলে পড়ার সময় থেকেই আমার দু'একটা চিঠিপত্র এই পত্রিকায় বের হয়েছিল। যে সময়ের কথা বলছি সেই সময় ঐ প্রেসের আমি ছিলাম ম্যানেজার।

সময়টা বোধ হয় ১৯৩৬ সালের শরৎকাল। একদিকে প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদী সম্পাদক ও তার সহকর্মী আবদুল্লাহ্ রসুল, মনোরঞ্জন গুহ

প্রমুখ (জুনিয়ারদের মধ্যে প্রয়াত মহঃ ইসমাইল এবং আমিও ছিলাম))। অন্যদিকে প্রতিক্রিয়াশীল মালিকগোষ্ঠী। এই দুইয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব চূড়ান্ত পর্যায়ে উপস্থিত হল। তখনকার ইসলামিয়া কলেজে অত্যন্ত সাম্প্রদায়িক এবং প্রতিক্রিয়াশীল একজন অধ্যাপক ছিলেন। (পরবর্তীকালে পাকিস্তানের 'ডন' কাগজের সম্পাদক হয়েছিলেন।) এইবারে 'দি মুসলমান'-এর পৃষ্ঠায় মালিকদের উদ্যোগে তাঁর বিষে ভরা লেখা 'স্পেশাল আর্টিকল'-এর আবির্ভাব হল। অবস্থা এমন ডেলিকেট্ হয়েছিল যে এডিটরের মঞ্জুরী না থাকা সত্ত্বেও মালিকদের নির্দেশে তা সোজাসুজি প্রেসে চলে আসতো এবং ছাপতে হতো। এর জবাব এবং প্রতিবাদ আমি লিখতাম চিঠিপত্র কলমে। ইতিবাচক অংশে আমার মোটামুটি সুর ছিল যে 'দি মুসলমান'-এর দীর্ঘদিনের (ত্রিশ বৎসরের) পাঠক সম্পাদকের প্রগতিশীল মতেই অভ্যস্ত। প্রতিক্রিয়া-শীল 'স্পেশাল আর্টিকল' তাঁদের রুচি-বিগর্হিত। সম্পাদক যেন এ বিষয়ে সুনিশ্চিত থাকেন।

বোঝা যাচ্ছিল, এ অবস্থা বেশী দিন চলতে পারে না। ন্যায়পরায়ণ ও নিষ্ঠাবান সুযোগ্য সম্পাদকের প্রতি বাঙালী মুসলমান বুদ্ধিজীবী সমাজের অত্যন্ত শ্রদ্ধা। সুতরাং মালিকপক্ষ সোজাসুজি প্রস্তাব পাশ করে তাঁকে বিতাড়িত করতে পারছিলেন না। অন্য বাধাও ছিল। কিছু অংশীদার ছিলেন যাঁরা মালিকপক্ষের এতটা হঠকারিতা হজম করতে পারছিলেন না। এইসব দেখে মালিকপক্ষের মধ্যে যাঁদের জোর বেশী—আবদুর রহমান সিদ্দিকি, নূরউদ্দিন প্রমুখ আইন কানুন ও প্রচলিত রীতিনীতির ধার না রেখে আচম্বিতে এক স্বৈরাচারী আঘাত করলেন।

মৌলভী মুজিবর রহমান ব্যয়-সঙ্কোচের কারণে তখন দেশে থাকতেন। কাগজ বেরোবার দু'দিন আগে তিনি আসতেন, সম্পাদকীয় দিতেন ও অন্যান্য বিষয় সহকর্মীদের সঙ্গে আলোচনা করতেন। তাঁর আসার দিন আমিও একটু সকাল করে প্রেসে আসতাম। আলোচ্য ঘটনার দিন আমি প্রেসে পৌঁছে দেখি এক অপরিচিত ভদ্রলোক এসে কাজ করছেন। প্রেসের অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার বললেন. ইনি 'দি মুসলমান'-এর নতুন এডিটর. নূরউদ্দিন সাহেব পাঠিয়ে দিয়েছেন। তিনি টেলিফোনে জানিয়ে দিয়েছেন এ'কেই এডিটর বলে গণ্য করতে হবে। এদিকে যে-কোন মুহূর্তে শ্রদ্ধেয় মৌলভী মুজিবর রহমান এসে পড়তে পারেন। একটা অস্বস্তিকর এমব্যারাসিং অবস্থায় তাঁকে পড়তে হবে। অপমানকরও বটে। আমি অবিলম্বে প্রেসের কয়েকজন সহানুভূতিশীল সহকর্মীকে রাস্তার মোড়ে মোড়ে

দাঁড় করিয়ে রাখলাম। প্রেসের বিপরীত দিকে, এখন যেখানে চটকল মজদুর ইউনিয়ন এবং পিপলস্ রিলিফ কমিটির অফিস, সেই সুপরিচিত বিল্ডিং ২৪৯ নং বৌবাজার স্ট্রীট। দোতলায় প্রয়াত মৃণালকান্তি বসুর পরিচালিত প্রেস এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের অফিস। ইন্দুদা দেখাশুনা করেন। তাঁর ওখানে কিছু সময়ের জন্য শ্রদ্ধেয় মৌলভী সাহেবকে বসিয়ে রেখে দেবার ব্যবস্থা করে রেখে দিলাম। মনোরঞ্জনদাকে ও রসুল সাহেবকে টেলিফোনে খবর দিলাম। রসুল সাহেব বুদ্ধি করে ছাপা গ্রাহক-তালিকার একখানি নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। মনোরঞ্জনদা ও তিনি এসে উপস্থিত হলেন। মৌলভী সাহেব যথাসময়ে এসেছিলেন ও ইন্দুদার ওখানে নীত হয়েছিলেন। আমিও যোগ দিলাম। এবার কি করণীয় তা ভাবতে হবে ও আলোচনা করতে হবে। মৌলভী সাহেব বেলগাছিয়ায় তাঁর খুড়তুতো ভাই ও ভাইপো প্রয়াত মহঃ ইসমাইলের বাসায় উঠতেন (ইসমাইল সুপরিচিত রাজনৈতিক কর্মী, আইন অমান্য আন্দোলনে জেলও খেটেছিলেন)। তখনই ইন্দুদার ওখানে বসে আলোচনার অবকাশ ছিল না। আমরা ঠিক করলাম সন্ধ্যাবেলা বেলগাছিয়ায় মৌলভী সাহেব যেখানে উঠতেন অর্থাৎ ইসমাইলদের বাসায় মীট করব। এই সিদ্ধান্ত করে তখনকার মত আমরা নিজ নিজ কাজে চলে গেলাম।

বেলগাছিয়ায় আমরা পাঁচজন—শ্রদ্ধেয় মৌলভী সাহেব, মনোরঞ্জন গুহ, আবদুল্লাহ্ রসুল, আমি ও ইসমাইল বসে আলোচনা করলাম। আমাদের সিদ্ধান্ত হলো, আমরা অবিলম্বে আর একটি কাগজ বার করবো। নামও ঠিক হয়ে গেল। বল্‌কান লড়াইয়ের সময় মৌলানা মহম্মদ আলির প্রসিদ্ধ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী পত্রিকার নাম ছিল 'কমরেড'। (পূর্বেও এর কথা উল্লেখ করেছি, পুনরায় বিবৃত হলে ক্ষতি নেই)। গ্রীসকে উসকানি দিয়ে ও সাহায্য করে ইংরেজ তুর্কীর বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক অভিযান চালায়। ভারতে ঐ যুদ্ধের সমর্থনে ইংরেজ প্রচার চালায়। ইংরেজদের এই প্রচারকে ব্যঙ্গের তীব্র কষাঘাত দিয়ে তিনি এক প্রবন্ধ লেখেন। মন্তব্য ছিল ঃ "হোয়াট ইজ স্যালোনিকা (তুর্কী অধীনে একটি প্রদেশ) টু বৃটেন, এ্যাণ্ড বৃটেন টু স্যালোনিকা বাট দি মডার্ণ থিওরি ইজ লাভ মি লাভ মাই ডগ্‌স।" এই প্রবন্ধের জন্য মৌলানা মহম্মদ আলির জেল হয়। উক্ত পত্রিকার স্মৃতি অর্থমূলক হবে এই ভেবে 'কমরেড' নাম দেওয়া ঠিক হয়েছিল।

কিন্তু আশু এক বিবৃতি দেওয়া বোধ করা গেল। এইরূপে সম্পাদককে নোটিশ না দিয়ে তাঁর স্থলে অন্য লোককে বসিয়ে দেওয়া! এই অন্যায়ের

বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করে বিবৃতি দিতে হবে এই ঠিক হল। মৌলভী সাহেব আমাকেই সেই বিবৃতি রচনার ভার দিলেন। পরের দিন সন্ধ্যায় আবার সেই বিবৃতির খসড়া নিয়ে আলোচনা করা হবে ঠিক হল। কয়েক মাস ধরে যে দ্বন্দ্ব চলছিল তার বিবরণ দিতে হয়েছিল। সুতরাং বিবৃতিটি কিছু দীর্ঘ হয়েছিল। আমার রচিত বিবৃতিটি মৌলভী সাহেব সহ সকলেই অনুমোদন করলেন। মনোরঞ্জনদা কেবল একটি বাক্য (সেন্টেন্স্) যোগ দিলেন। তার মর্মার্থ ছিল ঃ বাংলাদেশের প্রগতিশীল জনমতের বিরুদ্ধে যে চক্রান্ত চলছে এই আক্রমণও তারই অংশ। বিবৃতিটি 'স্টেটস্‌ম্যান' আর 'স্টার অব্ ইণ্ডিয়া' ছাড়া ইংরাজী, বাংলা, উর্দু ও হিন্দী সমস্ত দৈনিক পত্রিকাতেই প্রকাশিত হল। প্রায় প্রতিটি পত্রিকাতেই মালিকদের নিন্দা করে সম্পাদকীয় মন্তব্য যুক্ত হল। বেশ লক্ষণীয় জনসমর্থন পাওয়া গেল।

এখন প্রশ্ন হল নতুন কাগজের জন্য অর্থ সংগ্রহ। প্রত্যেককেই কিছু কিছু ধার করতে হল। আমিও ঐ উদ্দেশ্যে বর্ধমান গেলাম। নগদ টাকা তো ছিল না। মা আমাকে তাঁর গয়না দিলেন বন্দক দিতে। আমি বন্দক দিয়ে কিছু টাকা সংগ্রহ করে আনলাম। অবশ্য মাস পাঁচ-ছয়ের মধ্যে শোধ করে দিয়ে গয়না ছাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। বর্ধমানের কাজের দায়িত্বের সঙ্গে এই আবার এক নতুন কাজের দায়িত্ব নিতে হল। কাগজ-টাকে টিকিয়ে রাখার জন্যে আমরা উল্লিখিত পাঁচজন প্রচুর পরিশ্রম করেছিলাম। রসুল সাহেবকেই বেশী দায়িত্ব নিতে হল। তিনি একাই হোলটাইমার। মনোরঞ্জনদা, আমি, ইসমাইল রুজির পরিশ্রম করে সন্ধ্যা-বেলায় এসে হাজির হতাম।

আমি প্রেসে থাকায় সন্ধ্যার পরিশ্রম ছাড়া প্রুফ দেখা ইত্যাদিতে সারাদিনই কিছু সাহায্য করতে পারতাম। হায়দ্রাবাদের রাঘবেন্দ্র রাও পরে যোগ দেন। 'কমরেড' কাগজে তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। পরে 'কমরেড' বন্ধ হবার পর তিনি 'হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড'-এ নিযুক্ত হন। স্বাধীনতার পর নিজ দেশ থেকে রাজ্যসভায় কংগ্রেসের সদস্য হয়েছিলেন। আমরা সবই লিখতাম। কিছু বিশেষ কলমের ভারও নিতে হয়েছিল। পুরনো 'দি মুসলমান' কাগজে 'মুসলিম ওয়ার্ল্ড' নামে একটা কলম বেরুতো। আমরা তার বদলে শিরোনামা দিলাম 'আওয়ার ইস্টার্ন ওয়ার্ল্ড'। অবশ্য বিষয়বস্তু থাকতো পশ্চিম এশিয়ার। এ কলমের ভার ছিল আমার উপর। বিদেশী পত্রিকা সব খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে পড়ে টুকরো-টাকরা সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী যা সংবাদ পাওয়া যেত তাই জড়ো করে এই কলমে দিতাম। তখন

প্যালেস্টাইন-এ তীব্র সংগ্রাম চলছে। বিশ্ব-পরিস্থিতিতে তখন স্পেন ও আবিসিনিয়ায় ফ্যাসিবাদ-বিরোধী সংগ্রাম চলছে। তার বিস্তারিত বিবরণ আমাদের কাগজে ছাপা হতো। একটা উল্লেখযোগ্য ফিচার ছিল 'কার্টুন'। প্রথম শুরু করেছিলেন 'গভর্নমেণ্ট স্কুল অব আর্ট' থেকে পাশ করা মৌলানা আজাদের এক নিকট আত্মীয়। দুঃখের বিষয় তিনি অল্প বয়সেই মারা গেলেন। তারপর রাঘব রাও ম্যানেজ করতেন। কয়েকটি কার্টুন আকর্ষণীয় হওয়ার কারণে অন্যান্য কয়েকটি পত্রিকায় পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল। লেখা উপস্থাপনা ইত্যাদির জন্য পত্রিকাটি সুনামও অর্জন করেছিল। একটি লক্ষ্য করার বিষয়—বিধান রায়, নলিনী সরকার, কিরণশঙ্কর দলের কংগ্রেসীদের কাছে কোন সাহায্যই পাওয়া যায়নি। নলিনী সরকার তো মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভায় যোগ দিয়ে চরম প্রতিক্রিয়াশীল সাম্প্রদায়িক পত্রিকা 'আজাদ'কে সরকারী তহবিল থেকে ত্রিশ হাজার টাকা দেন। এখন বিড়লার বই থেকে জানা যাচ্ছে, বিড়লার মাধ্যমে ইনি গান্ধীজীকে পৃথক নির্বাচনের পক্ষে ওকালতি করতে বলেছিলেন। পূর্ববঙ্গের হিন্দুরা স্বপ্নেও জানতেন না, অথচ এই ব্যক্তি নিজেকে তাদের পক্ষে প্রবক্তা ঘোষণা করে গান্ধীজীকে জানালেন পূর্ব বাংলার হিন্দুরা মিশ্র নির্বাচন চায় না, তারা পৃথক নির্বাচন চায়। ম্যাকডোনাল্ড-এর 'কমিউন্যাল এ্যাওয়ার্ড'-এর কিছু রহস্য এর মধ্যে পাওয়া যাবে। সদানন্দের 'ফ্রী প্রেস জার্নাল' এদের চক্রান্ত ফাঁস করে দেওয়ায় বিধান রায়, নলিনী সরকার ফ্রী প্রেস ভেঙ্গে বিধু সেনগুপ্তকে দিয়ে ইউনাইটেড প্রেসের সূচনা করলেন। কংগ্রেসের মধ্যে কেবল উদারহৃদয় শরৎচন্দ্র বসু আমাদের বিশেষ সাহায্য করেছিলেন। রসুল সাহেব তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। আমরা কেউই যে তাঁর বিশেষ দলের ছিলাম না, বরং সমাজতন্ত্রের প্রভাব বেশী ছিল, এসব জানা সত্ত্বেও সমর্থন ব্যাপারে তাঁর কোন দ্বিধা সঙ্কোচ ছিল না। আমাদের সঙ্গতির একান্ত স্বল্পতা সত্ত্বেও ১৯৩৯ সালের যুদ্ধারম্ভের আগে পর্যন্ত কোনরকমে কাগজ টিকিয়ে রেখেছিলাম। সরকার দশ হাজার টাকা সিকিউরিটি দাবি করায় কাগজ বন্ধ করতে হল।

১৯৩৭ সালের ৪ঠা জানুয়ারী 'কমরেড' পত্রিকার প্রথম সংখ্যা বের হয়েছিল। এই স্বল্প আয়ুর মধ্যে অনেক ঝড় ঝাপটা সহ্য করতে হয়েছিল। কিন্তু আদর্শের ঋজু দৃঢ় পদক্ষেপ স্বাভাবিকভাবেই মুসলমান বুদ্ধিজীবীদের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশের দরদ আকর্ষণ করতে পেরেছিল। বলা বাহুল্য, সাধারণভাবে ও হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে প্রগতিশীল মানুষদের

মজন একটা স্থান অর্জন করতে পেরেছিল। বিপদের মধ্যে সবচেয়ে বড় আঘাত হয়েছিল শ্রদ্ধেয় মৌলভী সাহেবের সান্নিপাত রোগে পতন। ঐ রোগে তিনি দীর্ঘকাল চেতনাহীন অবস্থায় পড়েছিলেন। প্রথমদিন বেল-গাছিয়ায় আমাদের আলোচনার সময় তাঁর সাহসদীপ্ত মুখশ্রী মনে পড়ে। এখনও তাঁর গলার স্বর যেন শুনতে পাচ্ছি। অল্প কয়েকটি কথা, কিন্তু প্রতিটি অক্ষরে ছিল এক শক্তিশালী বলিষ্ঠতার পরিচয়। বললেন ঃ "আরম্ভ কর, আঘাতে নিরুৎসাহ হয়ো না। এইভাবেই তো সেই স্বদেশী-আন্দোলন থেকে শুরু করে এই ত্রিশ বছর চালিয়েছি।" এই অবস্থায় তাঁর খোঁজ খবর নিতে অনেকেই তাঁর শয্যার পাশে এসেছেন। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু আত্মগোপন করার আগে পর্যন্ত শত কাজকর্মের ব্যস্ততার মধ্যেও মাঝে মাঝে এক-আধবার আসতেন। মৌলভী সাহেব কখনও পদ-প্রয়াসী ছিলেন না। একান্ত তাঁরই অনুরোধে কর্পোরেশনের অলডারম্যান হতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। তাঁর এইরূপে শয্যা গ্রহণের পর আবুল হায়াত সাহেবের অনুমতি নিয়ে সম্পাদক হিসাবে তাঁর নামাঙ্কনে কাগজ চালিয়ে গিয়েছিলাম। এক আদর্শনিষ্ঠ দৃঢ়চেতা মানুষের পাশে দাঁড়াতে পেরে-ছিলাম। এই স্মৃতিটুকু গৌরবের বলে মনে করি।

পার্টির প্রসার ও কংগ্রেসে আমাদের শক্তি বৃদ্ধি

আই. পি. আর. পি নেতৃত্বে থাকা কালেও আমরা কংগ্রেস থেকে বিচ্ছিন্ন হইনি। ইতিমধ্যে আন্তর্জাতিক সপ্তম কংগ্রেসে ডিমিট্রভের অভি-ভাষণের পর কমিউনিস্ট পার্টিরও দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন হলো। কিন্তু খুব সহজে হয়নি। সঙ্কীর্ণতা এত দৃঢ়ভাবে এমন গতিতে ছিল যে তার জট শিথিল করতে কষ্ট পেতে হয়েছিল।

পূর্বেই বলেছি, অনেকদিন ধরেই কমিউনিস্ট পার্টির দরজা আমাদের বিরুদ্ধে রুদ্ধ ছিল। কলকাতায় কমিউনিস্ট পার্টি তখন ডাঃ রণেন সেন দ্বারা পরিচালিত। তিনি কখনই বর্ধমান জেলা কমিটির প্রতি সদয় হতে পারেন নি। আসানসোলের ট্রেড ইউনিয়নের স্বার্থে কমরেড বিনয় চৌধুরী ও কমরেড বিজয় পাল অনেক কাকুতি মিনতি করেও কিছু সুবিধে করতে পারেন নি। ট্রেড ইউনিয়ন নাকি একটা খুব বড় রহস্যজনক ব্যাপার। আর ডাঃ সেন নাকি তার এক বড় বিশেষজ্ঞ। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বর্ধমান জেলা কমিটির অভিজ্ঞতায় ক্ষতির দু-একটা দৃষ্টান্ত আমরা পেয়েছিলাম। এখানে বলে রাখা ভাল, বঙ্কিম-বাবুকে সভাপতি করে বর্ধমান জেলা কমিটি বার্ণপুরে শক্তিশালী ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে তুলেছিল। এতে কলকাতা থেকে কাউকে নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন মনে হয়নি। বর্ধমানে পার্টির ক্যাডারদের দ্বারাই তা হয়েছিল। ১৯৪৫ সালে জেলা কমিটির নেতৃত্বে বার্ণপুরে ট্রেড ইউনিয়নের স্ট্রাইক করার সিদ্ধান্ত ছিল। শ্রমিকশ্রেণী একাগ্রভাবেই তা চেয়েছিল। এই সময় ১৯৪৫ সালে নির্বাচন ঘোষিত হয়। প্রাদেশিক কমিটি কমরেড ইন্দ্রজিৎ গুপ্তকে এখানে শ্রমিককেন্দ্রে দাঁড় করানোর সিদ্ধান্ত করেন। জেলা কমিটি স্ট্রাইককে নির্বাচনের প্রতিবন্ধক বলে মনে করতেন না। বরং মনে করে-ছিলেন, নির্বাচনে বিশেষ আনুকূল্য হবে। কিন্তু ট্রেড ইউনিয়ন বিশেষজ্ঞ কমরেড রণেন সেন এসে উপস্থিত হলেন। আঙুল গুণে দেখালেন কর্মীরা স্ট্রাইকে নিযুক্ত হলে নির্বাচনের কাজ হবে না। ফলে স্ট্রাইক করা হলো

না। শ্রমিকশ্রেণীর ধারণা হলো বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে। কংগ্রেসের শ্রমিক নেতা প্রফেসার আব্দুল বারি ইউনিয়নের নেতা হলেন। যে যাই করুক বঙ্কিমবাবুকে দণ্ড দিতে হয়। ইউনিয়নের চাল-চাঁদা তোলা হতো। ফলে বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগে বঙ্কিমবাবু চাল-চোর আখ্যা পেলেন। আর আমরা হলাম চাল চোরের দল। বর্ধমান জেলা ছাড়া ডাঃ রণেন সেনের খ্যাতি অক্ষুণ্ণ রইল, কমরেড বিনয় চৌধুরী ও বিজয় পাল পেলেন শুধু কমরেড রণেন সেনের ব্যক্তিগত এজেন্ট কয়েকজন কর্মী। আর একবার কয়লাখনি শ্রমিকের ধর্মঘটের সিদ্ধান্তকে এইভাবে বানচাল করার চেষ্টা হয়েছিল। এবার কিন্তু জেলা কমিটি ও স্থানীয় কমিটির দৃঢ়চিত্ততার জন্য সে চেষ্টা ব্যর্থ হয় এবং তার ফল ভাল হয়। এর জন্য প্রশংসা প্রাপ্য কমরেড বিজয় পালের।

সঙ্কীর্ণতার আলোচনা করতে গিয়ে এতদূর বিষয়ান্তরে এসে পড়েছি। আলোচনা শুরু করেছিলাম কংগ্রেসে আমাদের কাজকর্ম নিয়ে। ১৯৩৫-এ পার্টি তৈরী হবার আগে থেকেই আমাদের অনেক সমর্থক ও কর্মী কংগ্রেসের সভ্য ছিলেন ও সাধারণের কাছে কংগ্রেসের কর্মী বলেই পরিচিত ছিলেন। যাঁরা জেলের বাইরে ছিলেন তাঁদের মধ্যে কমরেড হেলারাম চট্টোপাধ্যায় কংগ্রেসের অন্যতম নেতৃস্থানীয় কর্মী বলেই পরিচিত ছিলেন। তাঁর সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে তখন আমরা চলতে শুরু করেছি। পূর্বেই বলেছি, ১৯৩৩ সালে জেলা কৃষক সম্মেলনের কিছুদিন পর তিনি কলকাতা গিয়ে শ্রমিক আন্দোলনের কাজ শুরু করেন। ১৯৩৫ সালের গোড়ায় তিনি কঠিনভাবে 'প্লুরিসি' রোগে আক্রান্ত হলেন। তিনি তখন বীডন্ স্ট্রীটের এক মেসে থাকতেন। তিনি রোগে আক্রান্ত হবার পর আমাদের প্রধান সমস্যা দাঁড়াল তাঁর চিকিৎসা করিয়ে কোন রকমে তাঁকে সুস্থ করা। তিনি ইতিপূর্বে পার্টি মেম্বার হলেও যা-কিছু করণীয় তার দায়িত্ব পড়ে গেল আমাদের মত কয়েকজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু-বান্ধবের উপর। কলকাতায় আর কেউ ছিল না, ছিলাম শুধু আমি, আর মেজদা (রমেন চৌধুরী)। মেজদা সময় পেতেন কম, সুতরাং কিছু কিছু আর্থিক সাহায্য, পথ্য ইত্যাদি জুগিয়ে দেওয়া ছাড়া আর কিছু করে উঠতে পারতেন না। তবে যা করতেন তাঁর নিজের উদ্যোগে নিষ্ঠার সঙ্গেই করে যেতেন। তাগিদ দিতে হত না। মোটমাট দায়িত্বটা রোগীর নিজের উপর আর আমার উপরেই পড়ে গেল। পুরানো আই. পি. আর. পি. কমরেডদের অনেকের কাছে সাহায্য পেতাম। মনে পড়ে, কমরেড বিশ্বনাথ মুখার্জী রোগীর কাছে মাঝে মাঝে বীডন্

স্ট্রীটে আসতেন। সিমডালের কমরেড অজিত সেন (পরবর্তী কালে জেলা পার্টির অন্যতম নেতা) তখন কলকাতায় মেসে থেকে পড়তেন। ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর স্বভাব ও রীতি অনুযায়ী খোঁজও রাখতেন, সাহায্যও করতেন। আমি থাকতাম পার্ক সার্কাসে। অতদূরে গিয়ে দেখাশুনা করা কঠিন হতো। তাছাড়া খরচ-খরচার অভাব খুব। সুতরাং একটা কামরা ভাড়া করে তাঁকে পার্ক সার্কাসে নিয়ে এলাম। তাঁর মিলটা (Meal) নিকটস্থ আমাদের বাসা থেকে টিফিন ক্যারিয়ারে আনা হতো। এইভাবে কয়েক মাস থাকার পর তিনি অনেকটা সুস্থ হলেন এবং হাটগোবিন্দপুরে ফেরার পরেও তাঁকে অনেকদিন বিশ্রামে থাকতে হল। তাঁর পরিবারের ভরণ-পোষণের সমস্যা তাঁর প্রাথমিক শিক্ষকের চাকরি ছেড়ে স্বদেশী কাজে যোগদানের পর থেকে বরাবরই কঠিন ছিল। আলোচ্য সময়ে তা কঠিনতর হয়েছিল। সুতরাং তিনি কাজের অনুসন্ধান করছিলেন। বর্ধমান-কালনা বাস লাইনে চলতি বাসে দেখাশুনা করার একটি চাকরি পেলেন। ভগ্ন স্বাস্থ্যেও তিনি সেই চাকরি গ্রহণ করলেন। এতেও সমাধান হয়নি। তাঁকে খাড়া রাখতেই হবে এই বিবেচনায় আমি একটি চাকরি গ্রহণ করলাম। বেতনের শতকরা ৪০ ভাগ তাঁকেই দিতাম। পার্টির অন্যান্য কিছু খরচও বহন করতে হতো। এইসব বহন করে খুব অল্পই নিজের ব্যক্তিগত প্রয়োজন মেটাবার জন্য থাকতো। ১৯৪১ সালে আমি চাকরিতে পদত্যাগ করি। সেই সময় পর্যন্ত পার্টির কাজে বর্ধমান আসা-যাওয়া, কলকাতায় চাকরি, অন্যান্য কাজ, সব মিলিয়ে বেশ হয়রান হতে হয়েছে।

যাই হোক, দেশে ফিরেই কমরেড হেলারাম চট্টোপাধ্যায় অন্যান্য কাজের সঙ্গে সহকর্মী যেমন কমরেড অশ্বিনী মণ্ডল এবং অন্যান্যদের নিয়ে কংগ্রেসের সভ্য সংগ্রহের দিকে জোর দিলেন। ১৯৩৬ সালের মধ্যেই হাটগোবিন্দপুর ও কুড়মুন ইউনিয়নে উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় সভ্য সংগৃহীত হয়েছিল। ১৯৩৭ সালে কমরেড বঙ্কিম মুখার্জী এবং আর একজন (নাম মনে পড়ছে না) বর্ধমান সদর মহকুমার এইসব অঞ্চল থেকে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৩৬ সালে কংগ্রেসের অধিবেশনে সভাপতি জহরলাল নেহরুর অভিভাষণ দেশে প্রচুর উৎসাহ সৃষ্টি করে। তিনি এমন কি সংঘগত ভাবে ট্রেড ইউনিয়ন ও কৃষক সমিতির কংগ্রেসে এ্যাফিলিয়েটেড হবার কথা বলেন। ইতিমধ্যে নির্বাচনের ডঙ্কা বেজে ওঠে। ১৯৩৫ সালের গঠনতন্ত্রকে ধ্বংস করার জন্য কংগ্রেস নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে এই বলে ঘোষিত হয়। নির্বাচনে আমরা কংগ্রেস প্রার্থীর

পক্ষে প্রাণপণ পরিশ্রম করি। সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেসে আমাদের সভ্য-সংখ্যা বৃদ্ধি হয়। ১৯৩৬-৩৭ সালে কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ নির্বাচনেও আমরা প্রাদেশিক কংগ্রেসেও কিছু প্রার্থী পাঠাতে পেরেছিলাম।

প্রাদেশিক কংগ্রেসে নির্বাচনের যখন প্রস্তুতি চলছে. সুভাষবাবু আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে বর্ধমানে গান্ধীবাদীদের বিরুদ্ধে প্রতিনিধি না দেওয়ার কথা বলেন। তিনি আশা করেছিলেন ডঃ প্রফুল্ল ঘোষের অভয় আশ্রমের সঙ্গে প্রফুল্ল সেনের হরিপাল কল্যাণ সংঘের (যার সঙ্গে শ্রদ্ধেয় বিজয় কুমার ভট্টাচার্য. শ্রদ্ধেয় যাদবেন্দ্রনাথ পাঁজা প্রমুখ যুক্ত ছিলেন)—এই দুই গ্রুপের পরস্পরের যে বিরোধ ছিল তার ফলে শ্রীপ্রফুল্ল সেন এবং হুগলী-বর্ধমানে তাঁদের সহকর্মীরা তাঁকে সমর্থন করবেন। কমরেড হেলারাম এবং আমি বঙ্কিমবাবুর সঙ্গে আলাপ করলাম। তিনি বললেন, "আমরা বামপন্থীরা যখন এক যোগে সুভাষবাবুকে নেতা হিসাবে সামনে রেখে চলতে যাচ্ছি, তখন তাঁর ইচ্ছাটা পূরণ করাই ভাল। তবে সদরে যখন তোমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ, এক-আধটা সীট তোমাদের জন্য ছেড়ে দিতে বলতে পার।" আমরা জেলা কমিটিতে যুক্তি করলাম। সুভাষবাবু বলে পাঠিয়েছিলেন. তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের সময় উভয় পক্ষের একজন করে প্রতিনিধি উপস্থিত থাকবেন। আমরা ঠিক করলাম, আমাদের পক্ষে কমরেড হেলারাম থাকবেন। আমরা একটা পদ্ধতি স্থির করলাম। ঠিক করলাম, সিট সংখ্যা বেশী পাই আর না পাই বর্ধমান সদর মহকুমায় আমাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা স্বীকৃত হতে হবে। কমরেড হেলারাম চট্টোপাধ্যায়কে আমরা সেই মতো নির্দেশ দিলাম। দক্ষিণপন্থীদের প্রতিনিধি হয়েছিলেন শ্রদ্ধেয় যাদবেন্দ্রনাথ পাঁজা। নির্ধারিত দিনে সুভাষবাবুর সামনে হেলারামবাবু ও যাদবেন্দ্রবাবু বসলেন। হেলারামবাবু প্রথমেই আমাদেব প্রস্তাবমতো বললেন. "আমরা আপনাদের ইচ্ছায় সীট ছেড়ে দিতে পারি, কিন্তু এমনিই তো বোঝা যায় কোন-কোনটা আমাদের সুনিশ্চিত, কোনটা বা ও'দের সুনিশ্চিত, আর কয়টাই বা অনিশ্চিত। এটা আলোচনা হয়ে গেলে যা বলবেন তাই করবো।" পদ্ধতিটা গৃহীত হল। অধিকাংশ সীট যে আমাদের, আর তুলনায় তাঁদের অত্যন্ত কম. একে একে হিসাবে পাঁজা মশায় স্বীকার করলেন। হেলারামবাবু আমাদের প্রস্তাবমতো আরও বললেন. "আপনারা সব সীটই নিন, একটি সীট আমাদের জন্য ছেড়ে দিন।" সুভাষবাবু পাঁজা মশায়কে বললেন. "এ তো অন্যায় কথা নয়, এতে আপনার রাজী হওয়া উচিত।" এইভাবে সিদ্ধান্ত হয়ে গেল। পাঁজা মশায় হেলারামবাবুকে

বললেন, "তোমাদের প্রার্থীর মনোনয়ন-পত্রটা পাঠিয়ে দিও। শাহেদুল্লাহ্‌কে দিয়ে যেতে বলো।" আমাদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমি ত্বরিত হায়াত সাহেবকে দিয়ে নমিনেশন পেপার সই করিয়ে কংগ্রেস অফিসে উপস্থিত হলাম।

পাঁজা মশায় খালি গায়ে তেল মেখে বারান্দায় পায়চারি করছিলেন। আমাকে দেখেই বললেন, "নমিনেশন পেপার এনেছো ?" তাঁর হাতে মনোনয়নপত্র দিয়ে দিলাম। তারপর কিছুক্ষণ কুশলাদি আলাপ-পরিচয় করে আমি চলে এলাম। আন্‌কনটেস্‌টেড নির্বাচন হবে, আর কিছু করণীয় নেই। নির্বাচনের ফল ঘোষণা করার দিন আমি কলকাতায় ছিলাম। কাগজে দেখলাম হায়াত সাহেবের নাম নেই, আছে কংগ্রেসের একজন সাধারণ কর্মী প্রীতিভাজন প্রয়াত গোবর্ধন পালের নাম। অবাক হয়ে গেলাম। সুভাষবাবুর সামনে যা স্বীকৃত হয়েছে তা অবজ্ঞাত হয়েছে। স্টেশন থেকে সোজা কংগ্রেস অফিসে গেলাম। যাবার পথেই আমাদের পক্ষের দু'চার জনের সঙ্গে দেখা হল। দেখলাম সবাই আমার উপর রুষ্ট : "ওরা বলছে, কোন নমিনেশন পেপার পায়নি।" আমি বললাম, "আমি পাঁজা মশায়ের হাতে নমিনেশন পেপার দিলাম, আর পাইনি বললেই হবে !" কংগ্রেস অফিসে ঢুকেই পাঁজা মশায়কে বললাম, "আমি আপনার হাতে নমিনেশন পেপার দিয়ে গেলাম না ?" তিনি চোখটা নামিয়ে মাথা চুলকাতে চুলকাতে বললেন, "তা তো দিয়েছো বাপু, ওরা বলছে অফিসে দিয়ে রসিদ নেওয়া হয়নি। সুতরাং ওটা দেওয়াই নয়।" আমি বললাম, "দেওয়ার তো কথা জেলা কংগ্রেসের প্রেসিডেন্টকে। আপনিই তো প্রেসিডেন্ট। আর দিলাম কংগ্রেস অফিসেই। সুতরাং কৈফিয়তটা গ্রহণীয় নয়।" তিনি চুপ করে থাকলেন। দেখলাম, তিনি বুঝছেন জিনিসটা অন্যায় হয়েছে, কিন্তু দলের চাপে চুপ করে থাকতে বাধ্য। আমাদেরও কোন উপায় ছিল না, কারণ আমি সত্যিই তো কোন রসিদ নিইনি। সোজাসুজি প্রতারণা। কংগ্রেসে এরূপ প্রতারণার অভিজ্ঞতা অনেকেরই হয়েছে।

পর বৎসরে কোন সেটেলমেন্টের ব্যাপার ছিল না। যাই হোক, আমরা হায়াত সাহেবকে ভাতাড়-আউসগ্রাম আসনের প্রার্থী করলাম। দক্ষিণপন্থীরা দু'জন প্রতিদ্বন্দ্বী দাঁড় করালেন—গুসকরা থেকে মুক্তিদাকে অর্থাৎ শ্রীমুক্তি চট্টোপাধ্যায় আর ভাতাড়ের শিবু হাজরাকে। মুক্তিদা পূর্ব-পরিচিত সুপরিচিত কংগ্রেস কর্মী। আমাদের সঙ্গে কিছু সংস্রবও ছিল।

১৯৩৩ সালে হাটগোবিন্দপুরে প্রথম কৃষক সম্মেলনে যে কমিটি নির্বাচিত হয়েছিল তিনি তার সদস্য ছিলেন। দ্বিতীয় সম্মেলন গুসকরার নিকটে আলুটে তাঁকেই অবলম্বন করে আহুত হয়। যদিও দক্ষিণপন্থীদের ঘোরতর চাপের দরুণ তাঁর সাহায্য ও সাহচর্য খুবই সঙ্কুচিত হয়। সম্মেলন অনুষ্ঠান বাইরে থেকে আসা কর্মীদের নিয়ে আমাদিগকে নিজেদেরই করতে হয়। শিবু হাজরাও ক্যানেল আন্দোলন উপলক্ষে কৃষক সমিতিতে এসেছিলেন এবং কিছু সক্রিয় অংশগ্রহণ করে ভাতাড় থানায় সুপরিচিতও হয়েছিলেন। দেখলাম, এ'রা প্রার্থী থাকলে এ'দের দু'জনের মধ্যেই একজন হবেন। হায়াত সাহেবের কোন চান্‌স্ নেই। প্রত্যাহারের তারিখও পেরিয়ে গেছে। পোলিং-এর তারিখ পর পর দু'দিন ছিল—একদিন গুসকরায় ও একদিন ভাতাড়ে। আমি মুক্তিদাকে গিয়ে অনুরোধ করলাম—পোলিং-এর তারিখে তিনি ঘটনাস্থলে উপস্থিত থেকে প্রত্যাহার ঘোষণা করে নির্বাচকদের তাঁদের ভোটটা হায়াত সাহেবকে দিতে বলবেন। অনুরোধ-উপরোধে তিনি সম্মত হলেন এবং তাই করলেন। আমি পরদিন ভোরেই ভাতাড় চলে গেলাম। পোলিং কেন্দ্রেই শিবু হাজরা মশায়ের সঙ্গে দেখা হল। তাঁকেও অনুরূপ অনুরোধ করলাম। খানিকক্ষণ আলোচনার পর তিনিও সম্মত হলেন এবং নির্বাচকদের বলে তাঁদের ভোটটা হায়াত সাহেবকে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। হায়াত সাহেব প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিতে নির্বাচিত হলেন। দক্ষিণপন্থী নেতারা দু'জনকেই সমর্থনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। একই আসনে সমর্থন করার কোন অর্থ হয় না এটাও তাঁরা বুঝেছিলেন। তাঁরা অর্থাৎ মুক্তিদা ও শিবু হাজরা মহাশয়।

ক্যানেল আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সমর্থক কংগ্রেস সভ্য তীব্র গতিতে বেড়ে গেল। সবচেয়ে বেশী বাড়ল হাটগোবিন্দপুর ও কুড়মুন ইউনিয়নে। রায়নার আন্দোলনের কথা পরে উল্লেখ করবো। আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে রায়নাতেও আমাদের সমর্থক কংগ্রেস সভ্য বেড়েছিল। ইতিমধ্যে ১৯৩৮ সালের শরৎকালে বিনয়দা ও হরেকেষ্ট প্রমুখ জেল থেকে বের হলেন। কমরেড হরেকেষ্ট প্রথমে কলকাতার শ্রমিক আন্দোলনে যোগ দিলেও বিনয়দা ও আমার অনুরোধে কয়েক মাস পরে বর্ধমানেই এলেন। এ'দের আসার পর এবং বিনয়দা নেতৃত্ব নেবার পর স্বভাবতই পার্টির সংগঠন জোরদার হয়। ফলে কংগ্রেসে আমাদের কর্মসূচী আরও প্রসার লাভ করে। রায়না-খণ্ডঘোষে বিশেষ জোরদার হয়। দক্ষিণপন্থীদের

অন্যতম দাশরথি তা-কে কোণঠাসা করা সম্ভব হয়। কমরেড হরেকৃষ্ণ কোঙার সদর মহকুমায় বিশেষ দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

ইতিপূর্বে কংগ্রেসে আমাদের কাজ কমরেড হেলারাম চট্টোপাধ্যায়, কমরেড তারাপদ মোদক, কমরেড অশ্বিনী মণ্ডল, কমরেড বিপদবারণ রায়, চন্দ্রশেখর কোঙার, কমরেড অজিত সেন, শিবপ্রসাদ দত্ত প্রমুখের নেতৃত্বে গ্রামাঞ্চলে প্রসারিত হলেও মোটামুটি হাটগোবিন্দপুর, কুড়মুন, বণ্ডুল, নবস্থা-২, কুচুড় অঞ্চল, মেমারীতে সাতগাছিয়া ও মেমারী, আর পশ্চিম দিকে বাঘাড় অঞ্চল—এর বেশী সীমা অতিক্রম করেনি। অবশ্য বর্ধমান শহরে কমরেড শিবশঙ্কর চৌধুরী, কমরেড শিবপ্রসাদ দত্ত (আলুবাবু), কমরেড দাশরথি চৌধুরী, কমরেড সন্তোষ খাঁ, কমরেড সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—এ'দের মধ্যে আমিও ছিলাম। এতে আমাদের শক্তি অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়িয়েছিল। শ্রীফকির রায় জেল হতে বেরোবার পর আমাদের সকলের চেষ্টায় বামপন্থীদের এক ব্যাপক ঐক্য শহরে সৃষ্টি হয়। ইতিপূর্বে ১৯৩৮ সালে মিউনিসিপ্যাল নির্বাচনে কমরেড শিবশঙ্কর চৌধুরী, সুকুমার এবং উপরে উল্লিখিত কমরেডদের নেতৃত্বে বিশেষ অংশগ্রহণ করায় এক বড় অগ্রগতি হয়েই ছিল। ১৯৩৮ সালের শেষে বামপন্থীদের শক্তি শহরে প্রায় একাধিপত্যে পরিণত হয়। বর্ধমান সদর মহকুমায় সামগ্রিক পরিস্থিতি আমাদের অনুকূলে এসে পড়ে এবং কংগ্রেসের মহকুমা সম্মেলনে আমরা গরিষ্ঠতা লাভ করি। কমরেড হরেকৃষ্ণ কোঙার সম্পাদক নির্বাচিত হন। কমিটি গঠনে কমিউনিস্ট সহ ব্যাপকতর বামপন্থী ঐক্যের প্রতিফলন হয়। শ্রদ্ধেয় পাঁজা মশায় ও বিজয়দা'কে আমরা থাকতে অনুরোধ করেছিলাম, কিন্তু তাঁরা রাজী হননি।

স্বভাবতঃই এর পরই আমাদের প্রচেষ্টা দাঁড়ায় জেলা কংগ্রেস কমিটিতে বামপন্থীদের শক্তিবৃদ্ধি। ইতিমধ্যে সারা ভারতে সুভাষবাবুকে সামনে ধরে বড় বড় ঐক্য সমাবেশ চলছিল। গান্ধীজী ও দক্ষিণপন্থীদের বিরোধিতা সত্ত্বেও তাঁদের প্রার্থী ডঃ পট্টভি সীতারামায়াকে পরাজিত করে সুভাষবাবু দ্বিতীয়বার কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হলেন। কেন তাঁকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হল এবং তাঁর নেতৃত্বে পরিচালিত প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি বাতিল করা হল, তাঁর স্থানে সারা ভারতের কংগ্রেসের কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এ্যাডহক কমিটি নিয়োগ করা হল—এসব ঘটনা পরিচিত এবং নানান পুস্তকে বিবৃত। এখানে পুনরাবৃত্তি করার প্রয়োজন নেই। বাংলাদেশের সুভাষবাবু এবং তাঁর সমর্থকরা স্বতন্ত্র কংগ্রেস করতে প্রয়াসী

হলেন। আমরা তাঁদের বারবার অনুরোধ করলাম, এভাবে সারা ভারতের কংগ্রেস আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন হবেন না। অনেক সাধারণ কংগ্রেস সভ্য আমাদের মতের সমর্থক ছিলেন। সকলেই যা চেয়েছিলেন. সাময়িক মেনে নিয়ে সারা ভারত কংগ্রেস কর্তৃপক্ষের ঔদ্ধত্যকে পরাজিত করা অর্থাৎ লেট্ আস্ স্টুপ্ টু কন্‌কার (Let us stoop to conquer)। আমরা তাঁদের বোঝাতে ব্যর্থ হলাম। তাঁরা বিচ্ছিন্নতার পথই গ্রহণ করলেন। যাই হোক, এই অবস্থায় জেলায় এসবের প্রতিফলন কি দাঁড়াল সেটাই আলোচ্য। এ'দের শক্তি জেলার মধ্যে কেন্দ্রীভূত ছিল প্রধানতঃ কাটোয়া ও কালনা মহকুমায়। এ'রা কংগ্রেস থেকে চলে যাওয়ায় কাটোয়া ও কালনায় কংগ্রেসের সমর্থক রইল খুব কম। যদিচ দক্ষিণপন্থীদের খাতায় মিথ্যা করে সংখ্যা স্ফীত রাখা হল। পরে এসব আলোচনা করছি।

আমরা পূর্বের মতো পুরোদমে কংগ্রেসের সদস্য সংগ্রহ করতে লাগলাম। আসানসোল, বার্ণপুর প্রভৃতি এলাকায় কিছু বৃদ্ধি হয়েছিল। আসানসোল মহকুমায় কংগ্রেসে কমরেড নিত্যানন্দ চৌধুরী সম্পাদক এবং কমরেড সুকুমার সহ-সম্পাদক হলেন। বার্ণপুরে কংগ্রেসের এক সমর্থক কমরেড নিত্যানন্দ চৌধুরীর নামে একটা ঘর সহ জমি লেখাপড়া করে দিলেন। কমরেড সুকুমার মহকুমা কংগ্রেসের অফিস করেছিলেন ঝিকড়িয়া মহল্লার সদর রাস্তার উপর একটি কামরায় ও পরে বর্থশিম বাজারে। কাটোয়া মহকুমাতেও মঙ্গলকোট থানার দু'-একটি জায়গায় আমাদের পক্ষে কিছু সভ্য সংগ্রহ করা হয়েছিল। কিন্তু কালনা মহকুমায় আমরা বিশেষ কিছু করতে পারিনি। আমাদের প্রধান শক্তি ছিল সদর মহকুমা। এখানে ছ' হাজারেরও বেশী আমাদের সভ্য-সংখ্যা ছিল। যুদ্ধ লাগার সঙ্গে সঙ্গেই বিনয়দা এবং হরেকৃষ্ণকে আণ্ডারগ্রাউণ্ডে যেতে হল। ১৯৪০ সালের সম্মেলনে কমরেড অজিত সেনকে সম্পাদক করে মহকুমা কংগ্রেস কমিটি পুনর্গঠিত হলো। নেতৃত্ব সম্পূর্ণ বামপন্থীদের হাতেই থাকল।

এবার জেলা কংগ্রেসের সম্মেলন হবার কথা। দক্ষিণপন্থীরা কাটোয়া ও কালনায় সংখ্যা ভিত্তিহীনভাবে স্ফীত করে নিজেদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ঘোষণা করছিলেন। কংগ্রেসের নিয়ম অনুযায়ী সভ্য তালিকা আমাদের দেখার অধিকার ছিল। কিন্তু আমরা দেখতে চাইলে তাঁরা সম্পূর্ণ অস্বীকার করছিলেন। শ্রদ্ধেয় পাঁচুদা (কমরেড পাঁচু গুহ) তালিকা দেখতে চাওয়ায় তাঁরা অভদ্রভাবে তাঁকে জেলা কংগ্রেস অফিস থেকে বার করে দেন। এরপর তাঁরা এক কৌশল করলেন। জেলা কংগ্রেসের সম্মেলন ডাকলেন

জেলার পশ্চিম প্রান্তে—বরাকরে। তাঁরা আশা করছিলেন বরাকরে আমাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা যেতে পারবেন না। কিন্তু ইতিমধ্যে বামপন্থী শক্তি এত সুসংগঠিত হয়েছিল যে সকল প্রতিনিধিই যথাসময়ে বরাকরে উপস্থিত হলেন। কমরেড হেলারাম চট্টোপাধ্যায়ের চেষ্টায় বিনা পয়সায় বাসের ব্যবস্থা খুব কাজ দিয়েছিল। বর্ধমান সদরে ছ' হাজারের উপর সভ্য হিসাবে বামপন্থীরা যাদের কিছু বেশি প্রতিনিধি পেয়েছিলেন। কাটোয়া, কালনায় সর্বসাকুল্যে দক্ষিণপন্থীদের সাতশোর বেশী সভ্য-সংখ্যা ছিল না। কিন্তু মিথ্যা করে সাত হাজারের কাছাকাছি সভ্য সংগ্রহ দেখিয়ে (অথচ সভ্য-তালিকা প্রদর্শন না করে) আমাদের সদর মহকুমার অপেক্ষা বেশি প্রতিনিধি নিয়ে যাওয়ার কথা ভেবেছিলেন। একটি ঘটনা ঘটল। তখন যুদ্ধের সময় বরাকরের বেশ কিছু অংশে প্রোটেক্টেড্ এরিয়া হিসাবে প্রবেশ নিষেধ ছিল। ওদেব কিছু মিথ্যা প্রতিনিধি এইসব এলাকায় বেড়াতে গিয়ে গ্রেপ্তার হন। অনবহিত গ্রামের মানুষকে মিথ্যা করে প্রতিনিধি করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সুতরাং এরূপ দুর্ঘটনাই স্বাভাবিক। আমাদের সব জেনুইন্ প্রতিনিধি। আমরা সংখ্যায় বেশি থাকায় আমাদেরই প্রস্তাবিত জেলা কংগ্রেস কমিটি নির্বাচিত হলো। শ্রীফকিরচন্দ্র রায়কে সভাপতি, কমরেড জাহেদ আলিকে ও শ্রীপ্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে সহ-সভাপতি এবং কমরেড শিবশঙ্কর চৌধুরীকে সম্পাদক করার মাধ্যমে জেলা কংগ্রেসের ক্ষমতা বামপন্থী ও কমিউনিস্টদের হাতে চলে এল। দক্ষিণ-পন্থী দাশরথি তা একটি কৌতুক কবিতা লিখলেন যা দলমত নির্বিশেষে সবাই উপভোগ করেছিল। শ্রীফকির রায়, বামপন্থীদের অন্যতম শ্রীসুবিমান ঘোষ এবং সি পি আই নেতা হেলারাম চট্টোপাধ্যায়কে ইঙ্গিত করে কয়েকটি লাইন মনে পড়ছে, "ফকিরে আমীর করো মা, এরোপ্লেনের মুখে জুতো ঠেলা দিয়ে তুলে দে মা হেলাফেলা আছে যতো।" প্রত্যেকের নাম এই কবিতায় ছিল, কিন্তু এখন মনে পড়ছে না।

মিউনিসিপ্যাল ও লোকাল বোর্ড নির্বাচন

আমরা এক বিষয়ে প্রথম দিক থেকেই মনোযোগ দিয়েছিলাম। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন নামে পরিচিত ইউনিয়ন বোর্ড, জেলা বোর্ড প্রভৃতির নির্বাচনে অংশ নিতে হবে এইরূপ স্থির করেছিলাম। আমরা তখন সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংস্থা কংগ্রেসের ভেতরে। সুতরাং এইসব ব্যাপারে কংগ্রেসের ভূমিকার অভ্যন্তরে থাকবে আমাদের ভূমিকা। এইভাবে বিষয়টি দেখতাম। ১৯৩৫ সালের ৫ই অক্টোবর পার্টি গঠিত হয়। ১৯৩৬ সালেই উপরোক্ত বিষয়ে অংশগ্রহণের জন্য সচেতন থাকতে হবে এবং সচেষ্ট হতে হবে এই মতো প্রস্তাব আনুষ্ঠানিকভাবে জেলা কমিটিতে গ্রহণ করি। দু' বছরের মধ্যেই বর্ধমান পৌরসভা নির্বাচন, লোকাল বোর্ডের নির্বাচন প্রভৃতি আমাদের সামনে এসে পড়ে। আশু তাগিদ ছিল পৌর নির্বাচনের ব্যবস্থায়। তখনও শহরে জনসাধারণের মধ্যে আমাদের প্রতিষ্ঠা নির্বাচনে সাক্ষাৎ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার মতো অবস্থায় দাঁড়ায়নি। আমরা ঠিক করলাম, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সম্মিলিত ফ্রণ্ট হিসাবে কংগ্রেসকেই সামনে আনতে হবে। আমরা সব নিজেরাই কংগ্রেসের সভ্য এবং কর্মী। আমাদের এই শক্তিকে কাজে লাগিয়ে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শক্তির বৃদ্ধি ও প্রসার ঘটাতে হবে। সুতরাং ১৯৩৮ সালে বর্ধমানে পৌরসভার নির্বাচন ঘোষিত হবার পর এটাই আমাদের কর্মসূচীতে প্রধান স্থান গ্রহণ করে।

এদিকে জেলা কংগ্রেসের শক্তি বৃদ্ধি ও প্রসারের ব্যাপারে কোন পরিকল্পনা ছিল না। গ্রামে গ্রামে গোটা জেলা ধরে যে ১১০০-র মতো ছেলে আইন অমান্যতে জেলে গিয়েছিলেন, তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার চেষ্টা কেউ করতো না। প্রথম প্রথম তাঁরা নিজেরা জেলা অফিসে মাঝে মধ্যে কখনো কখনো আসতেন। জেলা কংগ্রেসের নেতৃত্ব জেলা কংগ্রেসের অফিসে থাকা-খাওয়া ইত্যাদি ভাল নজরে দেখতেন না। বস্তুতঃ গ্রামের কর্মীরা জেলা অফিসে এলে সম্বর্ধিত হতেন না। আমাদের বৈপ্লবিক পরিচয়ের কারণে আমাদের সম্বন্ধে তাঁদের সকলের মন শঙ্কাহীন ছিল না।

তবুও শেষ পর্যন্ত যা দু'-একজন আসতেন আমাদের কাছেই আসতেন। আমাদের কর্মীরা ভাত-আলুভাতে যা জুটতো ভাগ করে আনন্দের সাথেই খেয়ে নিতেন। তবুও আমাদের যোগাযোগ বেশির ভাগ গ্রামেই হতো এবং কৃষক আন্দোলন ও কৃষকসভার প্রসারে তাঁরা নিযুক্ত হতেন। বলা বাহুল্য, আমাদের পরিচালিত কংগ্রেস ও কৃষকসভার সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতা এবং স্বাধীনতার আন্দোলন ছিল প্রধান কর্মসূচী।

এই রকম নানান্ কারণে আমাদের বাইরে কংগ্রেসের স্থায়ী কর্মী সংখ্যা ছিল না। সুতরাং নির্বাচন প্রভৃতি সমারোহের কাজ পড়লে কংগ্রেস নেতৃত্বের নজর আমাদের উপরই পড়তো। আমরাও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শক্তির বিস্তার ও বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সোৎসাহে এসব কাজে যোগ দিতাম। ১৯৩৮ সালে বর্ধমান মিউনিসিপ্যালিটির নির্বাচনে কংগ্রেস অংশগ্রহণ করে। জেলা কংগ্রেস নেতৃত্ব এই সিদ্ধান্ত করেন। আমরা সোৎসাহে সমর্থন করি। কিন্তু নেতৃত্বকে অনুরোধ করি যাতে প্রার্থী মনোনয়ন ঠিকমতো হয়। অবাঞ্ছিত ব্যক্তি মনোনীত হলে কংগ্রেসের শক্তি খর্ব করবে। বস্তুতঃ কয়েকটি ক্ষেত্রে তা ঘটেও ছিল। কয়েকজন হিন্দু-মহাসভার লোক কংগ্রেসের নাম নিয়ে প্রার্থী মনোনীত হয়ে নির্বাচিতও হন। এর জন্য কংগ্রেসকে মূল্য দিতে হয়। কিন্তু এসব পরের কথা। নির্বাচন ঘোষিত হবার পর আমন্ত্রিত হয়ে আমরা কাজে নেমে পড়লাম। কিছু প্রার্থী আমাদের মনোমতো ছিল না। কিন্তু আমরা ভেবেচিন্তে দেখলাম, তা নিয়ে এখনই বাক্‌বিতণ্ডা তুললে নির্বাচনই পণ্ড হবে। আমরা যে শুধু নিজেদের পছন্দমতো প্রার্থীদের পিছনে দাঁড়াবো তাও সম্ভব ছিল না। কারণ এক এক ওয়ার্ডে ৩টা, ৪টা, ৫টা সীট এবং সেই সীটের সংখ্যা অনুযায়ী প্রত্যেক ভোটারের ভোট। অর্থাৎ যে ওয়ার্ডে ৪টি আসন সেখানে প্রত্যেক ভোটারের ৪টি করে ভোট। প্রার্থীদের তালিকা থেকে ভোটার ৪ জনের নাম ঠিক করবেন এবং সেই ৪ জনের নামে দাগ দিয়ে দেবেন। ভোটার যদি তিনজনের বেশী কাউকে উপযুক্ত মনে না করেন, তিনি সেই ৪র্থ ভোটটি না দেওয়া ছাড়া অন্য কিছু করতে পারেন না। কিন্তু এতে আবার সমগ্র দলের ক্ষতি করা হয়। সুতরাং বাধ্য হয়েই কংগ্রেসের মনোনীত সব ক'জনকেই ভোট দিতে হয়।

আমরা আগে কমরেড সুকুমারের আসার কথা বলেছি। ছাত্র আন্দোলনের উদ্দেশ্যে আমরা তাঁকে আগেই কলেজে অর্থাৎ রাজকলেজে ভর্তি করেছিলাম। এখন তিনি ছাত্রদের নিয়ে কংগ্রেসের নির্বাচনে অবতরণ

করলেন। ভোটের প্রচারে ছাত্রদের সভা, শোভাযাত্রা ইত্যাদি প্রবল উৎসাহ সৃষ্টি করে এবং কংগ্রেসের প্রতি সমর্থন সজোরে দেখা দেয়। শহরের মধ্যবর্তী তিনটি ওয়ার্ড A, B, C ছাত্রদের আন্দোলনের প্রভাবে সুসংগঠিত হয়ে যায়। D ওয়ার্ডে, অর্থাৎ আলমগঞ্জ থেকে শুরু করে কাঞ্চননগর পর্যন্ত, সন্তোষ খাঁ প্রার্থী হন। তিনি বন্ধুবর রবি কুণ্ডু প্রমুখকে নিয়ে নিজে নির্বাচন কেন্দ্রে সংগঠন ম্যানেজ করে নেন। E ওয়ার্ডে একটি আসন। তার জন্য কংগ্রেস প্রার্থীর পক্ষে সংগঠন গড়ে তোলেন শহীদ শিবশঙ্কর চৌধুরী। (বাঁকা নদীর দক্ষিণে পশ্চিম দিকটা D ওয়ার্ড। বাঁকা নদীর দক্ষিণে পূর্ব দিকটা অর্থাৎ ইছলাবাজার, নীলপুর ইত্যাদি নিয়ে E ওয়ার্ড। বাঁকার উত্তরে, পূর্ব দিকটা A ওয়ার্ড—এর পশ্চিম সীমা কুণ্ডপুকুর, পিলখানা গলি, ১নং পাথমারা গলি, মেডিকেল স্কুল ইত্যাদি। B ওয়ার্ড পূর্বে উল্লিখিত সীমানা থেকে শুরু করে পশ্চিমে রাজবাড়ী, শ্যামপুকুর, বাবুরবাগ প্রভৃতি। C ওয়ার্ড পূর্বে উল্লিখিত সীমানা থেকে শুরু করে পশ্চিমে শহরের শেষ প্রান্ত—বোরহাট, গোদা, লাকুড়ি প্রভৃতি। ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত এই ব্যবস্থা ছিল। পরে শহরটিকে ২৫টি ওয়ার্ডে ভাগ করা হয়েছে এবং একটি নির্বাচন কেন্দ্রে একজন প্রার্থী, এইভাবেই ব্যবস্থা করা হয়েছে। এখন পশ্চিমবাংলার সব শহরেই এই মতো ব্যবস্থা করা হয়েছে। অতীতের কথা বুঝতে হলে এসব জানা দরকার বলেই এতগুলি কথা লিখতে হলো।)

বিপুল ভোটে আমরা অর্থাৎ তখনকার কংগ্রেস জয়ী হলাম। শহরের অতিশয় জনপ্রিয় নেতা, উকিল শ্রীগিরীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় চেয়ারম্যান নির্বাচিত হলেন। মিউনিসিপ্যালিটির সাফাই কর্মীদের জন্য কিছু দাবি আমরা কংগ্রেসকে দিয়ে মানিয়ে নিয়েছিলাম। এর মধ্যে একটি ছিল 'নাইট স্কুল', সেটার ব্যবস্থা হয়েছিল। আর একটি ছিল তাঁদের জন্য ঘর তৈরী, এটির কিছুই হয়নি। কিছুদিন পর হিন্দু-মহাসভার মনোভাবাপন্ন মেম্বার শ্রীবলাই মুখার্জী, শ্রীসুশীল সেন প্রমুখ নিজেদের চেহারা খুলে ফেললেন এবং খুব বিবাদ বিতর্ক শুরু হয়ে যায়। মোটকথা, শেষে এইসব ঝগড়া-ঝাঁটিতে কংগ্রেস দল ভেঙ্গে যায়। প্রতিশ্রুত কার্যসূচী খুব অল্পই পালিত হয়। এতে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের উপরই লোকের বিরাগ হয়। এর দাগ আমাদের উপর লাগে না। কারণ বোর্ডের মনোনয়ন ইত্যাদিতে আমাদের কোন হাত ছিল না এবং দৈনন্দিন পরিচালনাতেও কোন হাত ছিল না।

আর একটি কাজ সামনে এসে পড়লো। ১৯৪০ সালে জেলা বোর্ড নির্বাচনের প্রাথমিক স্তরে চারটি মহকুমায় যথাক্রমে বর্ধমান, কালনা, কাটোয়া, আসানসোলে লোকাল বোর্ড নির্বাচন হয়। কালনায় কংগ্রেস সব কয়টি আসন লাভ করে। বর্ধমান সদরেও বেশি সংখ্যায় কংগ্রেস সংখ্যাধিক্য লাভ করে। কেবল জামালপুর থানায় রাজা মণিলাল সিংহের মনোনীত একজন সদস্য নির্বাচিত হন। কাটোয়া এবং আসানসোল মহকুমায় সংখ্যাধিক্য হয় কংগ্রেস-বিরোধীদের। মঙ্গলকোট থানায় চারটি আসনই কংগ্রেস লাভ করে। চারটির মধ্যে আমাদের বিশেষ সমর্থিত আহাদ সাহেব ও হায়াত সাহেব নির্বাচিত হন।

কালনা ও সদরে পূর্ব হতেই জয় সুনিশ্চিত ছিল, কিন্তু কাটোয়ায় বিশেষ করে মঙ্গলকোটে আমাদের তীব্র রাজনৈতিক সংগ্রাম করতে হয়। একটা দ্বন্দ্ব হয় আভ্যন্তরীণ, আমাদের অর্থাৎ কমিউনিস্ট ও বামপন্থীদের সঙ্গে দক্ষিণপন্থীদের। দক্ষিণপন্থীরা মঙ্গলকোটের পূর্বাংশের দুটি আসনে চৈতন্যপুরের জমিদার ও জোতদার পরিবারের কর্তাদের মধ্যে দুই ভাই শ্রীহরি চৌধুরী ও শ্রীজ্ঞান চৌধুরীকে প্রার্থী করার জন্য দৃঢ়পরিকর ছিলেন। আমরা তাঁদের শোষণ ও নির্যাতনের কাহিনী তুলে তুমুল প্রতিরোধ করলাম। কিন্তু তখন দক্ষিণপন্থীরা কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ ক্ষমতার শীর্ষে, সুতরাং তাঁদের প্রস্তাবই রইল এবং হরিবাবু ও জ্ঞানবাবু কংগ্রেসের প্রার্থী মনোনীত হলেন। আমরা একটা সমস্যায় পড়লাম। এরকম প্রার্থীকে সমর্থন করি কী করে? একটি সান্ত্বনা ছিল, যদি সেটি সান্ত্বনা বলা যায়। চৈতন্যপুরের পরিবারের শোষণ ইত্যাদি ব্যাপারে চরিত্র যাই হোক, তাঁরা মোটামাট ছিলেন কংগ্রেসের সমর্থক। অন্যদিকে কংগ্রেসের সংগ্রাম যার বিরুদ্ধে মূলতঃ কেন্দ্রীভূত সেই রাজা মণিলাল সিং ছিলেন ইংরেজের পোষ্য, বৃটিশ শাসকের অনুগত ভৃত্য বললেই হয়। আমরা ঠিক করলাম, সংগ্রামের চরিত্র যখন এইরূপ, সারা জেলাব্যাপী কংগ্রেসের মনোনয়নও খুব অবাঞ্ছনীয় চরিত্রের নয়, তখন এই দুটো-একটা আসন নিয়ে কংগ্রেসের বিরোধিতা করা ঠিক হবে না, সে বিরোধিতা ফলতঃ হবে প্রকারন্তরে রাজা মণিলাল সিং ও বৃটিশ শাসকদের সমর্থন। আমরা জেলা কমিটিতে ঠিক করলাম যে, আমরা কুণ্ঠা না করে নির্বাচকদের নিকট এই বিষয়ে আমাদের অবস্থানটা বুঝিয়ে দেব। কংগ্রেস অফিস থেকে হরেকেষ্টর কয়েক জায়গায় সভার প্রোগ্রাম নির্ধারিত হয়, তার মধ্যে মঙ্গলকোটের কয়েকটি স্থান পড়ে। এর মধ্যে একটি সভা পড়ে জ্ঞানবাবু ও হরিবাবুর এলাকায়। হরেকেষ্ট সেখানে

পরিষ্কারভাবে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করেন। কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ সভায় কেন আমরা এ'দের মনোনয়নের বিরোধিতা করেছি এবং কেনই বা শেষকালে ও'দের জয়ী করে জেলা বোর্ডে কংগ্রেসের সদস্য-সংখ্যা বৃদ্ধি করতে চাইছি, তা ভাল করে ব্যাখ্যা করে দেওয়া হয়েছিল।

এর চেয়ে জোরদার সংগ্রাম করতে হলো আমাদিগকে রাজা মণিলাল সিং-এর সমর্থক মুসলিম লীগ সমর্থিত প্রার্থীদের বিরুদ্ধে। মুসলিম লীগের আইনসভার সদস্য আবুল হাসেম ছিলেন মণিলাল সিং-এর জোর সমর্থক। কংগ্রেস প্রার্থী আহাদ সাহেবের বিরুদ্ধে তিনি কাইয়ুম সাহেবকে দাঁড় করালেন এবং মুসলিম লীগের কর্মী ও সংগঠন আহাদ সাহেবের বিরুদ্ধে নিয়োজিত হলো। আহাদ সাহেব, কায়ুম সাহেব উভয়েই পরস্পরের নিকট আত্মীয়। এমন কি আত্মীয়দের মধ্যেও আহাদ সাহেবের সমর্থন ছিল বেশি। কংগ্রেস-বিরোধীরা আহাদ সাহেবের বিরুদ্ধে মিথ্যা নিন্দা ও কুৎসা প্রচার করতে লাগলেন। কিন্তু তাঁদের সব প্রয়াস ব্যর্থ হল। আহাদ সাহেব বিপুল ভোটে জয়ী হলেন। সারা মহকুমা জুড়ে একটি আসন ছিল, যা মুসলমান প্রার্থীর জন্য নির্ধারিত ছিল। কংগ্রেসের তরফ থেকে এই আসনে আবুল হায়াত সাহেবকে দাঁড় করানো হলো। সুতরাং তাঁর বিরুদ্ধেও অত্যন্ত কটু ভাষায় মুসলিম কর্মীদের প্রচার চলতে লাগলো। আমরা সদলবলে পশ্চিম মঙ্গলকোটের এই কেন্দ্রটিতে আহাদ সাহেব ও হায়াত সাহেবের পক্ষে নামলাম। তখন পার্টির যতটুকু শক্তি ছিল সবই এই কেন্দ্রে নিয়োজিত হলো। আমরা জয়ী হলাম। মুসলিম লীগকে প্রচণ্ড আঘাত করা হলো। হাসেম সাহেব এবং তাঁর দলবল যাই করুন, খোদ যাঁরা প্রার্থী ছিলেন তাঁরা তাঁদের চেষ্টায় ঢিল না দিলেও তাঁদের ব্যক্তিগত সৌজন্যে কোন ত্রুটি হয়নি। ন্যায়বিচারের স্বার্থে এটুকু স্বীকার করা উচিত। এ'রা পরে জেলা বোর্ড গঠনের সময় মুসলিম লীগের সমর্থন যাতে কংগ্রেসের পক্ষে হয় তার জন্য আন্তরিক চেষ্টা করেছিলেন এবং সফলও হয়েছিলেন।

একথা এখানে বলা ভাল, কাইয়ুম সাহেব এবং হায়াত সাহেবের প্রতিদ্বন্দ্বী আব্দুর রহিম সাহেব এরকম ঘনিষ্ঠ পরিবারের মধ্যে নির্বাচনের সংগ্রাম চাননি। তাঁরা আবুল হাসেম সাহেবকে এই সিদ্ধান্তে বাধ্য করেন যে, আহাদ সাহেব যদি স্বতন্ত্র দাঁড়ান তাহলে তাঁর বিরুদ্ধে প্রার্থী দেওয়া হবে না এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা হবে না। তাঁরা আমাদের কাছেও স্বতন্ত্র প্রার্থী হবার প্রস্তাব রাখেন, যদিচ তাঁরা জানতেন স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসাবে ঘোষিত হলেও আমরা কংগ্রেসকে সমর্থন করবো। মনোনয়ন ব্যাপারে

কাটোয়ায় কংগ্রেস অফিসে শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মিত্র, এবং শ্রীবিজয়কুমার ভট্টাচার্যের উপস্থিতিতে কংগ্রেস প্রার্থী মনোনয়নের জন্য জেলা কংগ্রেস অফিসে সভা হয়। শ্রীদাশরথি চৌধুরী এবং আমি 'লবিয়িং' করতে কাটোয়ায় উপস্থিত হই। আমরা আহাদ সাহেব সম্পর্কে প্রস্তাব সেখানে করি এবং বলি. আহাদ সাহেবকে স্বতন্ত্র প্রার্থী করলে নির্বাচনের খাটাখাটুনি এবং অর্থ ব্যয় থেকে অব্যাহতি পাওয়া যাবে। এদিকে ঘোরতর কমিউনিস্ট-বিরোধী দক্ষিণপন্থীদের কর্মী শ্রীনরেন চাটুজ্যে আর একজন প্রার্থীকে আহাদ সাহেবের বদলে দিতে জেলা কংগ্রেসকে অনুরোধ করলেন। এ অবস্থায় স্বতন্ত্র প্রার্থিত্বের প্রশ্ন আর ওঠে না। দাশরথি চৌধুরী এবং আমি আহাদ সাহেবের প্রার্থিত্বের উপর জোর দিলাম। জেলা কংগ্রেস কমিটির নেতৃবৃন্দ—শ্রীযাদবেন্দ্র নাথ পাঁজা, শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মিত্র. শ্রীবিজয়কুমার ভট্টাচার্য প্রমুখের মত ও ইচ্ছা আহাদ সাহেবের পক্ষেই ছিল। সুতরাং সহজ ও স্বাভাবিকভাবেই আহাদ সাহেবের নাম গৃহীত হলো।

লোকাল বোর্ড নির্বাচনের পর জেলা বোর্ড নির্বাচন স্থগিত থাকে। লোকাল বোর্ডের দ্বারা জেলা বোর্ডের প্রতিনিধি নির্বাচিত হতেন। তাঁদের দ্বারা ও সরকার-মনোনীত সদস্যদের দ্বারা জেলা বোর্ড গঠিত হতো। বর্ধমান সদরে ও কালনায় কংগ্রেস জিতলেও কাটোয়া ও আসানসোলে কংগ্রেস-বিরোধীদের সংখ্যাধিক্য ছিল। এখন সরকার-মনোনীত আটজন সদস্যের উপর জেলা বোর্ড গঠন নির্ভর করছিল।

পূর্বেই বলেছি, ১৯৪২-এর গোড়াতেই ডিক্টেটরদের হাত থেকে মুক্ত করে কংগ্রেস কমিটির হাতে ক্ষমতা আসে। লোকাল বোর্ড নির্বাচনের আগেই তখনকার দক্ষিণপন্থীদের নিয়ন্ত্রিত জেলা কংগ্রেস কমিটির এক প্রস্তাবে জেলা বোর্ড নির্বাচন ও গঠন—সমস্ত বিষয় নির্ধারণ করা, সিদ্ধান্ত করা ও পরিচালনা করার সমগ্র ক্ষমতা দেওয়া ছিল শ্রদ্ধেয় জিতেন্দ্রনাথ মিত্র এবং শ্রদ্ধেয় বিজয়কুমার ভট্টাচার্যের উপর। আমরা জেলা কংগ্রেস কমিটিতে পুনরায় ক্ষমতায় আসার পর ও ১৯৪২-এর গোড়ায় সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করার পরও উপরোক্ত ব্যবস্থায় কোনরূপ অবস্থান্তর ঘটেনি। তখন এসব বিষয়ে সাধারণতঃ পার্টি থেকে আমারই উপর ভার পড়ে যেত। বস্তুতঃ ১৯৩৬ সাল থেকেই দক্ষিণপন্থীরা পার্টির প্রবক্তা হিসাবে আমাকেই জানতেন। বলা বাহুল্য, আমি পার্টির অনুমোদিত নির্দেশ অনুযায়ী সব কিছু করতাম। এবার জেলা কংগ্রেসের পরিচালক প্রধান শক্তি হিসাবে পার্টিকে সক্রিয় ভূমিকা নিতে হচ্ছে। বর্ধমান ও কালনা লোকাল বোর্ড

থেকে জেলা বোর্ডে মনোনয়ন সম্বন্ধে বিজয়দার সঙ্গে আলাপ করতে গেলাম। আমরা যা জানতাম তার কনফারমেশন পেলাম। তাঁরা যা মনোনয়ন ঠিক করে রেখেছিলেন তা হলো কংগ্রেসের কিছু সমর্থক উকিল মোক্তার প্রমুখকে জেলা বোর্ডের মেম্বার করা। আমাদের কমিউনিস্ট পার্টির জেলা কমিটিতে আমরা ঠিক করেছিলাম, আমরা আমাদের সমর্থকের উপর জোর দিয়ে দলাদলির অভিযোগ হতে দেব না। অন্যদিকে কিছু সুবিধাবাদী মানুষ জেলা বোর্ডে প্রবেশ করে কংগ্রেসের ভাবমূর্তিকে নষ্ট করে, তাও হতে দেব না। ১৯৩৮ সালে কংগ্রেস বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল নির্বাচনে জয়ী হয়েও কিছু সুবিধাবাদীদের দলাদলির কারণে বোর্ডের নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারেন নি। যদি সারাঙ্কণের কর্মীদের মধ্যে যাঁরা দক্ষিণ-পন্থী তাঁরা বোর্ডে গিয়ে গণ্ডগোল করেন, অপবাদ ও গণ্ডগোলের দায়িত্ব তাঁদের উপর পড়বে। কিন্তু গোড়া থেকে যদি জেলা কংগ্রেসের নির্দেশে উকিল, মোক্তার প্রমুখের তালিকা অনুমোদন করে দলাদলির পথ খুলে দিয়ে বদনামের ভাগী হই, সেটা ঠিক হবে না। সেজন্য আমি বিজয়দাকে সারাঙ্কণের কর্মীদের উপর জোর দেবার কথা বললাম। সেই সূত্রে শুধু কমরেড হেলারাম চট্টোপাধ্যায়, শ্রীফকিরচন্দ্র রায় এবং জনাব আবুল হায়াত সাহেবকে তালিকার মধ্যে নিতে বললাম। জিতেনদা ও বিজয়দা ও তার সঙ্গে তাঁদের মনোনীত দক্ষিণপন্থী কর্মীদের তালিকা—যেমন সাত্তার সাহেব, দাশরথি তা-এর মতো যাঁরা কংগ্রেসের পুরোদস্তুর কর্মী প্রমুখকে নিতে অনুরোধ করলাম। তাঁকে পূর্বেই নিবেদন করেছিলাম যে, জেলা বোর্ডের নির্বাচন ব্যাপারে ১৯৩৮ সালের কংগ্রেসের যে সিদ্ধান্ত ছিল তাতে আমরা কোন পরিবর্তন করতে চাই না এবং নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা শ্রদ্ধেয় জিতেনদা ও তাঁর উপরেই ন্যস্ত রাখতে চাই।

ইতিমধ্যে একটা ঘটনা ঘটেছিল যাতে জেলা বোর্ড গঠনের ক্ষমতা কংগ্রেসের অনুকূলে এসেছিল। ফজলুল হক সাহেব তাঁর সমর্থক সহ মুসলিম লীগ থেকে চলে আসায় মুসলিম লীগ মন্ত্রিত্বের পতন হয়। ফজলুল হক সাহেব তাঁর কৃষক-প্রজা পার্টি ও অন্যান্য সমর্থক, হিন্দু মহাসভা এবং কংগ্রেস মনোভাবাপন্ন নানান্ সদস্যদের নিয়ে নতন মন্ত্রিত্ব গঠন করেন। স্বভাবতঃই সরকার কর্তৃক মনোনয়নের ক্ষমতা এই নূতন মন্ত্রিত্বের উপর বর্তায়। কাটোয়া, কালনা, আসানসোল থেকে নির্বাচিত কংগ্রেস সদস্য শ্রীপ্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় একজন মন্ত্রী হন এবং স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন তথা মিউনিসিপ্যালিটি, জেলা বোর্ড প্রভৃতির দায়িত্ব তাঁর হাতে আসে। সকলেই

জানতেন শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মিত্র জেলা বোর্ডের সরকারী মনোনীত সদস্য তাঁর দ্বারা করিয়ে নিতে পারবেন। ঘটেও ছিল তাই।

হাসেম সাহেব এবং মুসলিম লীগের সমস্ত দৃষ্টি ছিল রাজা মণিলাল সিং-এর জয়ের উপর এবং মুসলিম মন্ত্রিত্বের দ্বারা সরকার-মনোনীত সদস্য নিয়োগের উপর। দুই লক্ষ্যতেই পরাজয় ঘটল। নির্বাচনে মণিলাল সিং-এর দল অনেক আসন লাভ করলেও সর্বমোটে সংখ্যালঘু হয়েছিলেন। অন্যদিকে সরকারী মনোনয়নের পথও তাঁদের বন্ধ হয়ে গেল। মুসলিম লীগের সাধারণ সদস্যরাও ভূমিকা পরিবর্তনে আগ্রহী হলেন। বস্তুতঃ তাঁরা এর পূর্বেও হাসেম সাহেব রচিত ভূমিকা পছন্দ করছিলেন না। আমাদের প্রস্তাব এতই পরিচ্ছন্ন ছিল যে, তার কোনরকম সমালোচনা করা চলতো না। পরে বুঝেছিলাম, এতে বিজয়দাকে ব্যক্তিগতভাবে একটু অসুবিধায় ফেলা হলো। শুধু সদস্য মনোনয়ন নয়, চেয়ারম্যান, ভাইস-চেয়ারম্যান মনোনয়নের দায়িত্ব জিতেনদা এবং তাঁকে নিতে হয়। ইতিমধ্যে মুসলিম লীগের যে কয়জন ছিলেন, ব্যক্তিগতভাবে কর্মীদের সঙ্গে আলাপ করে তাঁরা যাতে কংগ্রেসের প্রার্থীকে সমর্থন করেন তার চেষ্টা করতে লাগলাম। বিজয়দার কাছে নির্দিষ্ট প্রস্তাব রাখলাম, জিতেনদা'কে চেয়ার-ম্যান এবং আবুল হায়াত সাহেবকে ভাইস-চেয়ারম্যান করা হোক। জেলা বোর্ডে দু'জন ভাইস-চেয়ারম্যান হতো। আর-একজন সম্বন্ধে আমরা কোন স্থির নির্দেশ দিলাম না। আবুল হায়াত সাহেবের ইচ্ছা ছিল যেন শুধু একজন ভাইস-চেয়ারম্যান নির্ধারণ করা হয় এবং তাঁকে সেই পদের ভার দেওয়া হয়। ব্যক্তিগতভাবে সাত্তার সাহেব ও দাশরথি তা-কে বাদ ধরে আমরা সবাই নানান কারণে হায়াত সাহেবের প্রস্তাবের পক্ষে ছিলাম। জেলা কংগ্রেস কমিটির আহূত সভার দিন সকালে জিতেনদা আমাকে ডেকে বললেন, জেলা কংগ্রেস কমিটির প্রস্তাবে নির্ধারণের ভার বিজয়দাকে বাদ দিয়ে শুধু তাঁর উপরেই দেওয়া হোক। বিজয়দাকে খানিকটা ঝগড়া-বিবাদ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হবে। একদিকে সাত্তার সাহেব অন্যদিকে দাশরথি তা তাঁর বিরুদ্ধে বিক্ষোভের ঝড় তুলেছেন। আমি এতে সম্মত হতে পারলাম না। বামপন্থীরা কেউ জিতেনদা ও বিজয়দার নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার চ্যালেঞ্জ করছিলেন না। পরন্তু আমাদের পার্টির উদ্যোগে তাঁরা সকলেই জিতেনদা ও বিজয়দা উভয় নেতার নির্দেশ মান্য করবেন বলে জানিয়েছিলেন। দক্ষিণপন্থীদের মধ্যে যদি গণ্ডগোল হয় তার দায়িত্ব তাঁদেরই। আমাদের প্রচার ও প্রয়াস অভিযানের ফলে জেলার মুসলিম

লীগও আনুষ্ঠানিক ভাবে কংগ্রেস-নির্ধারিত প্রার্থীদের সমর্থনের পক্ষে রায় দেন। ফলে দুই নেতৃবৃন্দের আনুষ্ঠানিক নির্দেশে শ্রদ্ধেয় জিতেন্দ্রনাথ মিত্র চেয়ারম্যান ও আবুল হায়াত সাহেব ভাইস-চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। জেলা কংগ্রেস কমিটি বামপন্থীদের হাতে আসার ফলেই কংগ্রেস কর্তৃক এইরূপ পদ নির্বাচন সম্ভব হলো।

বিজয়দাকে অনেক সহ্য করতে হলো। কারণ বিক্ষুব্ধ সাত্তার সাহেব ও দাশরথি তা-এর কলুষ বর্ষণ তাঁর উপরেই পড়লো। নির্বাচনের পর আগস্ট আন্দোলনের ভার নেবার জন্য বিজয়দার কলকাতা যাওয়ার সিদ্ধান্ত ছিল। আগের দিন বিকালে সন্ধ্যার দিকে কমরেড শিবশঙ্কর চৌধুরী ও আমাকে তিনি ডেকে পাঠিয়েছিলেন। বর্ধমান সদরে ইউনিয়ন বোর্ডের নমিনেশন থেকে শুরু করে অনেক কিছু নির্দেশ তিনি আমাদিগকে দিলেন। আমরা ঠিক করেছিলাম, বিজয়দা কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তে অযথা কোন গণ্ডগোল করবো না। সুতরাং পরিপূর্ণ সায় দিতে আমাদের কোন অসুবিধা হলো না। একটি নির্দেশ তাঁর ছিল এইরূপ : তিনি আগস্ট আন্দোলনে যোগ দেওয়ার ফলে তাঁর আসন শূন্য হলে তাঁর আসন যেন মেমারীর ব্যবসায়ী কংগ্রেসের সক্রিয় সমর্থক শ্রীভূপেন্দ্রনাথ নায়েককে দেওয়া হয়। ইউনিয়ন বোর্ড সংগঠনের বিষয়ে নানান্ প্রস্তাবের মধ্যে একটা প্রস্তাব ছিল সদর মহকুমার বণ্ডুল ইউনিয়নের প্রেসিডেণ্ট কামারকিতার নৃসিংহ চৌধুরীর বিরুদ্ধে। বহু প্রস্তাবের মধ্যে পরবর্তী ঘটনায় এই দুটির উল্লেখ প্রয়োজন হবে বলে উল্লেখ করলাম। অফিস থেকে বেরিয়ে আসার পর বিজয়দা, শিবশঙ্কর চৌধুরী ও আমার সঙ্গে টাউন হল ময়দানে একটি বেঞ্চিতে বসেন। সরল ভাবেই কিছু মনের কথা পরস্পর আলোচনা করি। প্রাসঙ্গিকভাবে বিজয়দা একটা কথা বলেছিলেন, জীবনে চিরকাল মনে রেখেছি। নানান্ ঘটনা-স্রোতের মধ্যে মাঝে মাঝে একথা মনে পড়েছে। বিজয়দা বললেন, "আমার জীবনে একটা বড় দুঃখ রয়ে গেল. যাঁদের সঙ্গে মতের মিল হলো তাঁদের সঙ্গে মনের মিল হলো না। আর যাঁদের সঙ্গে মনের মিল হলো তাঁদের সঙ্গে মতের মিল হলো না।" বুঝলাম, বিক্ষুব্ধ সাত্তার সাহেব ও দাশরথি তা তাঁর বিরুদ্ধে অত্যন্ত গর্হিত যে সমস্ত কথাবার্তা বলছেন তাঁর মন তাতে ব্যথিত। তাঁর ব্যথিত মন এই ধরণের বৈপরীত্যের একটা ব্যাখ্যা পাবার চেষ্টা করছে। তখন ভেবেছিলাম, কেবল দক্ষিণপন্থীদেরই এরূপ অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হয়। পরে বুঝেছি, এ হচ্ছে জীবনের সাধারণ অভিজ্ঞতা। সদা পরিবর্তনশীল এই জীবনে মনের বিবর্তন একসঙ্গে চলে না। যে

পরিমণ্ডল থেকে আমরা ঘটনাস্রোতে নিক্ষিপ্ত হই বা নিজেদের নিক্ষিপ্ত করি তারও প্রভাব এসব নির্ধারণ করে।

উপরে বর্ণিত বিজয়দার শূন্য আসন সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্যের কথাটা এখানেই সেরে নিই। শূন্য আসনটি পূর্তির সরকারী বিজ্ঞপ্তি যখন হলো তখন পাঁজা মশায় (শ্রদ্ধেয় যাদবেন্দ্রনাথ পাঁজা) জেল থেকে বেরিয়ে এসেছেন। শহরে খোসবাগান অঞ্চলে একটি বাসায় আছেন। সুযোগ-সন্ধানী উকিল-মোক্তাররা তাঁদের মধ্যে একজনকে মনোনীত করার জন্য অনুরোধ করলেন। পাঁজা মশায় সম্মত হয়ে আমাকে ডেকে পাঠালেন। তাঁর মত শোনার পর আমি বললাম, আমরা এ বিষয়ে নিরুপায়। বিজয়দা এক প্রস্তাব করে গেছেন, আমরা তাঁকে কথা দিয়েছি, সুতরাং আমাদের প্রত্যক্ষ কোন প্রয়োজন বা তাগিদ না থাকলেও আমরা সেকথা রাখবার চেষ্টা করবো। অনুরোধ করলাম, যেহেতু তাঁর সঙ্গে এ বিষয়ে ইতিপূর্বে কোন কথা হয়নি, বর্তমানে তাঁর অনুরোধ রক্ষা করার অক্ষমতা যেন তিনি ক্ষমা করেন। আমি ওখান থেকে বের হয়েই উপরিউক্ত উকিল-মোক্তারদের প্রবক্তাদের সঙ্গে দেখা করে আমাদের অক্ষমতাকে জানিয়ে দিয়ে তাঁদের প্রচেষ্টা থেকে নিরস্ত হতে বললাম। সমস্ত কংগ্রেস সদস্যদের সঙ্গে দেখা করে বিজয়দার নির্দেশ এবং তাঁর অনুকূলে আমাদের সিদ্ধান্ত বুঝিয়ে বললাম। মুসলিম লীগের জেলা বোর্ড সমর্থকদের সাথে দেখা করে তাঁদেরও বোঝালাম। এ বিষয়ে আমাদের অর্থাৎ কমিউনিস্ট পার্টির দলগত ও ব্যক্তিগত কোন স্বার্থ নেই, একথা সকলেই বুঝেছিলেন। সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করার মতো গুরুত্বপূর্ণ কিছু না ঘটলে কথা দিলে কথা রাখা আমাদের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম, এ রকম একটা কথা সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়া ভাল। আমরা বরাবর এই রকম করেছি। তাতে আশু যে কোন ক্ষয়ক্ষতি হয়নি এমন বলবো না। কিন্তু সুদূরপ্রসারী ফল বরাবরই ভাল থেকেছে। মনে আছে, উদ্দেশ্য সাধনে আমাকে দিন তিন-চার লাগাতার পরিশ্রম করতে হয়েছিল। ফল ভালোই হলো। অবস্থার গতি বুঝে পাঁজা মশায় তাঁর সংকল্প পরিহার করলেন। বিজয়দার নির্দেশ অনুযায়ী আমাদের প্রস্তাব সফল হলো।

১৯৩৮ সালে কংগ্রেস মিউনিসিপ্যাল নির্বাচনে জয়ী হবার পর বোর্ড গঠন করে। পরে দলাদলির জন্য দলীয় নিয়ন্ত্রণে চালাতে ব্যর্থ হয়। এসব কথা পূর্বে আলোচনা করেছি। ১৯৪১ সালের শেষের দিকে চলতি

বোর্ডের অধিষ্ঠানের সময়সীমা শেষ হবার পর নতুন বোর্ড গঠনের জন্য নির্বাচন এসে পড়ল। ১৯৪২-এর গোড়াতে ইলেকশন। আমরা কয়েক-জন ডিস্ট্রিক্ট কমিটির মেম্বার তখনও প্রকাশ্যে আছি। অশ্বিনী মণ্ডল তখন জেলা অফিসে থাকেন, আর আমি ছিলাম শহরে। মিউনিসিপ্যাল ইলেক্‌শন-এর দায়িত্ব আমাদের দু'জনের উপর পড়লো।

প্রাথমিক কথাবার্তা শুরু হলো। গত বোর্ডের তিক্ত অভিজ্ঞতায় সকলেই বিব্রত বোধ করেন। সেইজন্য জেলা কংগ্রেস কমিটি সিদ্ধান্ত করলেন, কংগ্রেস এবার আর দলগতভাবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে না। তবে মোটামুটি যাঁরা কংগ্রেস পক্ষীয় লোক তাঁরা একসঙ্গে লড়ার সিদ্ধান্ত করেন। এর প্রধান ছিলেন টোগোদা (উকিল শ্রীপ্রণবেশ্বর সরকার), চারুদা (ব্যবসায়ী শ্রীচারুচন্দ্র দে), বোরহাটের ডাঃ শ্রীরুদ্রনাথ ঘোষ প্রমুখ। আজম সাহেব এ'দের সঙ্গেই থাকতেন। এ'রা সব পুরাতন কংগ্রেসী, তাছাড়া প্রায় সবাই শহরের মধ্যে জনপ্রিয়। আমাদের মতাবলম্বী পার্টির সমর্থক সন্তোষ খাঁ-ও এ'দের মধ্যে ছিলেন। সন্তোষ খাঁ চারুদার ব্যবসায়ের তত্ত্বাবধায়ক ও কর্মচারী ছিলেন। সুতরাং বাইরের দিকে তাঁদের এলাকায় অর্থাৎ তখনকার C ওয়ার্ড ও D ওয়ার্ডে চারুদার সম্পর্কিত পরিচয়টাই লোকে জানতেন। কিন্তু রাজনীতিগতভাবে তিনি বরাবরই সি পি. আই.-এর সঙ্গে ছিলেন। ১৯৪৭ সালের এপ্রিল মাসে আমি যে ভারত দ্বিখণ্ডন-বিরোধী প্রস্তাব কংগ্রেস, হিন্দু মহাসভা ও মুসলিম লীগের মিলিত প্রস্তাবের বিরুদ্ধে উত্থাপন করি (পরে আলোচনা করবো), তার প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন তিনি। প্রস্তাব আমি উত্থাপন করি, তিনি সেকেণ্ড করেন, ও ফরওয়ার্ড ব্লকের শ্রীঅজিত রায় সমর্থন করেন। সাধারণভাবে রাজনীতির মহলে সন্তোষ খাঁ-কে সি. পি. আই-এর লোক বলেই মানুষ জানতো।

জেলা কমিটি আমার উপর নির্বাচনের ভার দিয়েছিলেন। তাছাড়া জেলা কমিটির অন্যতম বিশিষ্ট সদস্য কমরেড অশ্বিনী মণ্ডল পার্টির সাধারণ কাজের দায়িত্বে শহরেই ছিলেন। আমি তাঁর সঙ্গে যুক্তি ও আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিতাম। অবশ্য আমরা পার্টির সব সদস্যের মধ্যেই আলোচনা করে যেতাম। কমরেড অশ্বিনী মণ্ডল ও আমি ঠিক করলাম, পুরাতন ওই কংগ্রেসীদের সঙ্গেই আমাদের থাকতে হবে, কিন্তু আমাদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে। টোগোদা, চারুদা প্রমুখ একটা গ্রুপ হিসেবে চলছিলেন। তাঁদের সঙ্গে আমাদের আনুষ্ঠানিক আলোচনা হয়। পার্টির তরফ থেকে আলোচনা চালাচ্ছিলাম আমি এবং কমরেড অশ্বিনী মণ্ডল। আমরা

তাঁদের জানিয়ে দিলাম, আমরা মোটমাট তাঁদের সঙ্গেই থাকবো, কিন্তু আমাদের স্বাতন্ত্র্য থাকবে : "আমাদের সমর্থন আলোচনা বিনা ধরে নেবেন না। আলোচনায় আমরা একমত হলে তখনই মাত্র রাজি বলে ধরে নেবেন।" এছাড়া আমাদের কতকগুলি ইতিবাচক দাবিও ছিল। যেমন, সাফাই কর্মীদের থাকার ঘর তৈরি করতে হবে এবং তাদের পাঠশালা আবার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সাধারণ নাগরিকের কল্যাণীয় কিছু দাবি-দাওয়াও ছিল। এসব লিপিবদ্ধ করা হয় এবং উভয়পক্ষের সই-স্বাক্ষর থাকে।

আমরা তিনজনকে দাঁড় করিয়েছিলাম : E ওয়ার্ডে ইছলাবাজারের মোতোওয়াল্লী কংগ্রেসের সভ্য জনাব আবদুল আহাদ সাহেবকে এবং A ওয়ার্ডে মনসুরকে ও আমোদদা (শ্রীআমোদ বসু)-কে। A ওয়ার্ডে দু'জন প্রার্থীকে জেতাবার মতো ক্ষমতা আমাদের ছিল না। মনসুর জিতলেন কিন্তু আমোদদাকে হারতে হলো। E ওয়ার্ডে আহাদ সাহেব জিতলেন। নির্বাচনে দাঁড়িয়ে হারতে না হয় তার জন্য মনসুর কঠোর পরিশ্রম করে-ছিলেন। প্রার্থিগণ ও অন্যান্যরা ছাড়া আমাকে ও শহীদ শিবশঙ্কর চৌধুরীকে অনেকখানা দায়িত্ব নিতে হয়। আমোদদা ও মনসুরের ওয়ার্ডে আমি ছাত্র ফেডারেশনের কর্মীদের নিয়ে নেমেছিলাম। এই ছাত্রকর্মীদের মধ্যে শান্তব্রত চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ ছিলেন। আর শহীদ শিবশঙ্কর চৌধুরী আহাদ সাহেবের নির্বাচনের ভার নিয়েছিলেন। তাঁর কঠোর পরিশ্রম ব্যর্থ হয়নি। সন্তোষকে নিয়ে আমাদের তিনজন হলো। অবশ্য সন্তোষ ঠিক আমাদের পরিচয়ে নির্বাচিত হননি। তিনি স্বতন্ত্রভাবেই নির্বাচিত হয়েছিলেন। কিন্তু পূর্ব থেকে টোগোদা, চারুদা'দের গ্রুপে ছিলেন বলে, সেই রকমই থাকেন।

কংগ্রেস সমর্থক দল টোগোদাকে চেয়ারম্যান করার প্রস্তাব করেন। আমরা সমর্থন করি। টোগোদার বেশ কিছু মহৎ গুণ ছিল, কিন্তু কিছু ত্রুটিও ছিল। তবে ১৯৪২ সালে যখন আমরা তাঁকে প্রথমবার চেয়ারম্যান করার প্রস্তাব করি তখন এই ত্রুটিগুলিকে যত মারাত্মক এবং যত বড় করে তাঁর শত্রুরা দেখাবার চেষ্টা করতেন, ততখানা নয়। রাজনৈতিকভাবে তিনি ছিলেন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এবং জাতীয় আন্দোলনের পক্ষে। এতেই আমাদের একটা বড় মিলন ক্ষেত্র ছিল। দুঃখের বিষয়, আমরা পরাজিত হোলাম। সরকার মনোনীত সদস্যদের ভোটের জোরে শ্রীসন্তোষ বসু মহাশয় চেয়ারম্যান হলেন। ১৯৪২ সাল থেকে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত এইভাবে শ্রীসন্তোষ বসু চেয়ারম্যান ছিলেন।

টোগোদা চেয়ারম্যান হতে না পারায়, অর্থাৎ বোর্ড আমাদের হাতে না থাকায়, আমরা কিছু সীমিত কাজ করতে পারছিলাম। এই বোর্ডে মনসুরের কাজের প্রোগ্রাম অনুসারে যা করার ইচ্ছা ছিল তা করা যায়নি। মুজফ্‌ফর সাহেব (কমরেড মুজফ্‌ফর আহমদ) নির্দেশ দিলেন, মনসুরকে কৃষকসভার ভারপ্রাপ্ত হয়ে কলকাতায় থাকতে হবে। ফলে, মনসুর কেবল মিটিং-এ আসতেন এবং টুকিটাকি কাজ কিছু থাকলে করতেন। তবে বোর্ড স্বপক্ষীয় হাতে না থাকায় খুব বেশি একটা ঝঞ্ঝাট ছিল না।

১৯৪২-এর মিউনিসিপ্যাল নির্বাচনের পর মিউনিসিপ্যাল কর্মচারী ও শ্রমিকদের অভাব অভিযোগ নিয়ে আমাকে ও কমরেড শিবশঙ্কর চৌধুরীকে নামতে হয়। প্রায় পার্টি প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই এ'দের নিয়ে আন্দোলনও শুরু হয়েছিল। ১৯৩৮ সালে কংগ্রেস কর্তৃক মিউনিসিপ্যাল ইলেকশনে জয়ী হবার পর এ'দের সমিতিতে জোর দেওয়া হয়, সংগ্রামও হয় এবং কিছু কিছু দাবিও আদায় করা সম্ভব হয়। অন্যান্য কর্মীরা ছাড়া কমরেড শিবপ্রসাদ দত্ত ওরফে আলুই প্রধানত এর দায়িত্বে ছিলেন। সাফাই কর্মীদের জন্য একটি সান্ধ্য বিদ্যালয়ও খোলা হয়েছিল। কিছুদিন চলেছিল, কিন্তু কতদিন তা মনে নেই। ১৯৪২ সালে এদের কাজ যখন আবার শুরু করলাম তখন তাদের মধ্যে আমাদের জনপ্রিয়তা আছে, পরিচয়ও আছে, কিন্তু সাংগঠনিক কোন বন্ধন নেই। সুতরাং সবাইকে জড়িয়ে নেবার জন্য আমি একটি গণ-দরখাস্ত ড্রাফ্‌ট করলাম এবং আমি, কালো (প্রয়াত শিব-শঙ্কর চৌধুরী) ও সাফাই কর্মীদের মধ্যে কয়েকজন সমস্ত শ্রমিকদের কাছে ঘুরে টিপসহি নিয়ে নিলাম। তারপর একদিন সভা ডেকে সেই স্বাক্ষরিত দরখাস্ত অনুমোদন করিয়ে নিলাম। আনুষ্ঠানিকভাবে একটি ডেপুটেশনেও সম্মতি নিয়ে নিলাম। কৃষ্ণা ডোম, ফাগুয়া প্রভৃতি ডোমদের মধ্যে কয়েক-জন এবং সাবুজান প্রভৃতি ধাঙড়দের মধ্যে কয়েকজন আর তার সঙ্গে পায়খানা সাফাই কর্মী দু'একজনকে নিয়ে ডেপুটেশন গঠিত হলো। আমি ও বিশু (কমরেড বিশ্বনাথ সেন) ডেপুটেশনের সকলকে নিয়ে চেয়ারম্যান সন্তোষবাবুর সঙ্গে দেখা করলাম। সন্তোষবাবু ঠাণ্ডাভাবেই কথা বলছিলেন, কিন্তু কথাবার্তার মধ্যে সাহেবী ঢঙ বর্জন করা তাঁর পক্ষে কঠিন ছিল। তিনি আমাকে বললেন, "Why not let them go out and we talk about it among ourselves." আমি বললাম, "দেখুন,

এটা আমাদের আনুষ্ঠানিক ডেপুটেশন। সুতরাং আমাদের সকলের মধ্যেই কথা বলতে হবে।"

ইতিমধ্যেই তাঁর চোখ-মুখের ভাব দেখে এবং সঙ্গে সঙ্গে বার কয়েক "let them go out", "let them go out" শুনে কৃষ্ণাও গিয়েছিল চটে। আমি বললাম, "ডেপুটেশন ছাড়া তো আমি কথা বলতে পারবো না।" কৃষ্ণাও বলল, "চ্যালিয়ে বাবু চ্যালিয়ে।" সঙ্গে সঙ্গে আমরা সবাই চলে এলাম। বাইরে বেরোতে না বেরোতেই কৃষ্ণা চিৎকার করে বলল, "চেয়ার-ম্যান গেট আউট বোলা হ্যায়, চ্যলো কাল্‌সে কাম বন্‌ধ।" বাইরে সাফাই কর্মীদের এক বড় জমায়েত অপেক্ষা করছিল। 'গেট আউট' বলেছে শুনে তারাও রুষ্ট এবং সবাই একস্বরে স্ট্রাইকের সিদ্ধান্ত করলো। নিজেদের প্রচলিত ভাষায় তখনই 'কিরে কসম করলো। পরের দিন সকাল থেকেই কাজ বন্ধ। যারা আসেনি তাদের সংঘবদ্ধ করার জন্য ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে সব বেরিয়ে পড়লো। আমরাও তাদের সঙ্গে বেরোলাম। পরের দিন থেকে তিন চারদিন সম্পূর্ণ স্ট্রাইক। পরে সন্তোষবাবু ডেপুটেশনে সকলের সঙ্গে কথা বলে মিটমাট করে নিলেন। আংশিক দাবি আদায় হলো। শ্রমিকরাও খুশি, আমরাও উৎসাহিত।

পৌরসভার ভিতরে তখন আমাদের গ্রুপ, কমরেড সন্তোষ খাঁ, আহ্লাদ সাহেব এবং মনসুর, টোগোদা'র নেতৃত্বে পরিচালিত বিরোধী পক্ষের সাথী। স্ট্রাইকে বিরোধী পক্ষ খুশী হয়েছিলেন। তাঁরা চাইছিলেন স্ট্রাইক চলতে থাকুক, অর্থাৎ স্ট্রাইককে মিউনিসিপ্যাল পলিটিক্সে কাজে লাগানোর ইচ্ছা ছিল। আমার কাছে বিরোধী পক্ষের একজন এরকম প্রস্তাব রাখলেন। আমি তাঁকে বুঝিয়ে বললাম—এ বিষয়ে আমাদের কাছে শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থ এবং জনসাধারণের স্বার্থ বিবেচনায় অগ্রাধিকার রাখবে, শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন মিউনিসিপ্যাল পলিটিকস্-এর সঙ্গে জড়িত হবে না। এ নিয়ে কোন ভুল বোঝাবুঝি হয়নি।

যুদ্ধ ও পার্টি

এদিকে যুদ্ধের অবস্থা ক্রমশঃ ঘোরালো হয়ে উঠছে। যুদ্ধ বাধার সঙ্গে সঙ্গেই কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব থেকে পদত্যাগ করেছিল। যুদ্ধ বাধার আগে সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রাণপণ চেষ্টা করেছিল যাতে হিটলারের আগ্রাসী উদ্দেশ্যের বিরুদ্ধে বৃটেন, সোভিয়েত ইউনিয়ন, ফ্রান্স ইত্যাদি মিলিত হয়ে হিটলারের প্রতিরোধ করা যায়। কিন্তু তাদের সমস্ত আন্তরিক চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল। বৃটেন, ফ্রান্স, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহের ধনপতিগণের অপচেষ্টাতেই হিটলার ও ফ্যাসিজম্-এর উত্থান। জার্মান শ্রমিকশ্রেণীর প্রবল বৈপ্লবিক শক্তি দৃঢ় ও সংহত কমিউনিস্ট পার্টির ক্ষমতাকে পরাজিত করার জন্য জার্মান সোস্যালিস্ট, সোস্যাল ডেমোক্রাট্সদের গণতন্ত্র ও শ্রমিকশ্রেণীর উপর বিশ্বাসঘাতকতা এবং উপরিউক্ত সাম্রাজ্যবাদীদের প্রত্যক্ষ সাহায্য হিটলারকে সফল করেছিল। এখন সাম্রাজ্যবাদীদের লক্ষ্য ছিল হিটলারের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধকে বিফল করে হিটলারকে সোভিয়েতের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করা। সে লক্ষ্য অবশ্য হিটলারের গোড়া থেকেই ছিল। কিন্তু প্রচণ্ড শক্তিশালী সোভিয়েত রাষ্ট্রকে আক্রমণ করবার পূর্বে তাকে আরও শক্তিশালী হতে হবে। তাই চেকোশ্লোভাকিয়া, ফ্রান্স প্রভৃতি ইউরোপের দেশসমূহকে একের পর এক গিলে শক্তি সঞ্চয় করলো। এসব করার পর শেষে সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করলো। ১৯৪১ সালের জুন মাসেই আক্রমণ শুরু হলো। এই আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গেই যুদ্ধের রূপ পরিবর্তন হয়ে গেল। এই আক্রমণ, অর্থাৎ প্রতিরোধের বিশ্ব গণ-ঐক্য ঘটিত হওয়ার পূর্বে যুদ্ধ ছিল সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ। পরে দাঁড়ালো হিটলার ও ফ্যাসিজম্-এর বিরুদ্ধে বিশ্ব-সমাবেশ।

সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গেই কমিউনিস্ট নেতৃত্ব একাংশকে গোপনে আণ্ডারগ্রাউণ্ডে রেখে সামাজ্য-বাদের বিরুদ্ধে প্রস্তুতি শুরু করলো। জনগণের চাপে কংগ্রেস নেতৃত্ব দেখলেন একটা কিছু করতে হয়। গান্ধীজী-কে একক ডিক্‌টেটর করে উপর থেকে তলা পর্যন্ত কংগ্রেস সংগঠনকে

সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় রাখার সিদ্ধান্ত করলেন। জেলায় জেলায় এবং স্থানে স্থানে গান্ধীজী কর্তৃক ডিক্‌টেটর নিযুক্ত হলো। সুতরাং জেলা কংগ্রেস কমিটি হাতে এসে আনুষ্ঠানিকভাবে সাময়িক কোন ফল হলো না। গান্ধীজী নির্দেশ দিলেন, তাঁর নিযুক্ত ডিক্‌টেটর ও তাঁর মনোনীত কর্মীরা এককভাবে প্রকাশ্যে যুদ্ধ-বিরোধী ঘোষণা প্রচার করবেন। মনোনীত ব্যক্তিরা ছাড়া আর কেউ এতে অংশগ্রহণ করবেন না।

এখানে একটি ঘটনার উল্লেখ করি। মিউনিসিপ্যাল শ্রমিকদের নিয়ে আন্দোলনের সময় সাইকেলে গোটা শহর ঘুরে ফিরে কুকার ঘরের সামনে একটি খাটিয়া থাকতো তাতেই বসতাম বা শুতাম। কয়েক দিন পর কিছু দণ্ড দিতে হলো। টাইফয়েডে আক্রান্ত হলাম। বেশ কিছুদিন ভুগলাম। জ্বরের বিরামের পরেও বেশ দুর্বল আছি, সোজা বসে থাকাও কষ্টকর, এমন সময় একদিন শ্রদ্ধেয় বিজয়দা (শ্রীবিজয়কুমার ভট্টাচার্য) ও নির্মলদা (শ্রীনির্মলকুমার বসু)—কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং পরবর্তী-কালে ভারত গভর্নমেণ্টের অ্যানথ্রোপলজির ডাইরেক্টর—দেখা করতে এলেন। নির্মলদা খোলাখুলিভাবেই বললেন যে, গান্ধীজী তাঁকে একটা কাজ দিয়েছেন। তিনি যদি আন্দোলন, স্বভাবতঃই যুদ্ধ-বিরোধী আন্দোলন, আরম্ভ করেন তাহলে কমিউনিস্টরা কি তাতে অংশগ্রহণ করবেন, না তার বিরোধিতা করবেন? আমি তখন তাঁদের সরলভাবে পার্টি পজিশন ব্যাখ্যা করলাম। বললাম, কংগ্রেস এবং গান্ধীজী যাতে এরূপ সিদ্ধান্ত না নেন তার জন্য আমরা সর্বশক্তি দিয়ে চেষ্টা করছি। আমরা মনে করছি, বিশ্বব্যাপী জনগণের যে মিলিত শক্তি তার সঙ্গে মিলিত হয়েই সাম্রাজ্যবাদকে পরাজিত করা সম্ভব হবে এবং দেশকে স্বাধীন করা যাবে। নির্মলদা জিজ্ঞেস করলেন, "তোমাদের বক্তব্য কংগ্রেস যদি গ্রহণ না করে এবং তোমাদের চেষ্টা যদি বিফল হয়, তাহলে তোমরা কী করবে?" আমি তখন বললাম, "আমাদের বর্তমান পজিশন আপনাকে জানালাম। তার মধ্যে ভবিষ্যতের সম্ভাবনা যা নিহিত আছে তা আপনার নির্দিশিত ক্ষেত্রে কী দাঁড়াবে তা আন্দাজ করতে হবে। এর বেশী কিছু বলা সম্ভব নয়।"

এই কাজ জেলায় কীভাবে চলছিল তার পরিচয়ের জন্য আমার কাছে বিবৃত এক ঘটনা বলবো। বন্ধুবর শিবকুমার মিত্র (নন্তুবাবু) ছিলেন আদর্শবান, নিষ্ঠাবান কংগ্রেস কর্মী। কংগ্রেসের ঘোষিত আদর্শ ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিকতা এবং সাম্প্রদায়িকতা-বিরোধিতা। এইরূপ আদর্শের প্রতি তাঁর ছিল অবিচল নিষ্ঠা। মতপার্থক্য সত্ত্বেও এ'র সঙ্গে আমার ও শহীদ

শিবশঙ্কর চৌধুরীর ছিল আন্তরিক ঘনিষ্ঠতা। তার কাছেই শোনা। তাঁর জন্য নির্বাচিত এলাকা গুসকরা থেকে পশ্চিম মঙ্গলকোট, তিনি প্রচার করে ফিরে এসেছিলেন। তিনি বললেন, গুসকরা থেকে একের পর এক গ্রাম দিয়ে তিনি যাত্রা করলেন। তিনি চিৎকার করে যুদ্ধবিরোধী স্লোগান দিয়ে যান কিন্তু লোকে তাঁর কাছে আসেন না। যাঁরা সামনে পড়ে যান তাঁরাও সরে যান। কাশিয়াড়া বা কাশেমনগর পর্যন্ত কেউ একটু জল খেতেও বলল না। সারাদিন এইভাবে উপোস থেকে আমাদের বামপন্থীদের সমর্থক কংগ্রেসের স্থানীয় নেতা আব্দুল আহাদ সাহেবের বাড়ি উঠে খাওয়া-দাওয়ার সমাদর পেলেন। তাঁর কাছে সমাবিষ্ট গ্রামের সাধারণ মানুষও তাঁকে সাদর আপ্যায়ন করলেন।

এর সঙ্গে তুলনায় আমাদের যুদ্ধবিরোধী কাজকর্মের ও প্রচারের অভিজ্ঞতা ছিল অন্যরূপ। আমাদের গোপন প্রচার-অভিযান তুলনায় ছিল যথেষ্ট শক্তিশালী। গোপনীয়তা বজায় রাখার নিপুণতার ফলে সব জায়গাতেই আমরা পেয়েছি সাধারণ মানুষের সহানুভূতি ও সাহায্য। মনে পড়ে, এই সময় ১নং বর্মন স্ট্রীটে আনন্দবাজার ও হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড অফিসে একজন অগ্রজপ্রতিম বন্ধুর সঙ্গে কথা হচ্ছিল। গান্ধীবাদের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা বরাবরই ছিল। এই সময়ে তিনি সম্পূর্ণ অনুরক্ত হয়ে গেছেন। তিনি উপরে বর্ণিত নন্তুবাবুর অভিজ্ঞতার মত কিছু ঘটনার নিদর্শন দিয়ে আমাকে বলেছিলেন, "তোমরা কংগ্রেস নেতৃত্বের গণসংগ্রাম না-করার বিরুদ্ধে অভিযোগ করছো। কিন্তু যে দেশের মানুষ এত ভীত, মানুষের নৈতিক বল এত কম, সে দেশে গণসংগ্রাম হবে কি করে?" অর্থাৎ নিজেদের ইচ্ছাকৃত ভুল পদ্ধতির সমালোচনা না করে দেশের মানুষের প্রতি দোষারোপ! উপরে উল্লিখিত আহাদ সাহেব ছিলেন একটা ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট। স্থানীয় এলাকায় তাঁর জনপ্রিয়তা ছিল অসামান্য। স্থানীয় কাজ ও তার উপলক্ষে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগের ভার ছিল কমরেড দাশরথি চৌধুরীর উপর। দক্ষতার সঙ্গে গোপনীয়তা বজায় রাখার কারণে সর্বত্র অবাধ গতি, অকাতর আশ্রয় লাভের কোন বিঘ্ন ছিল না। আমাদের শক্তি যে শাসকবৃন্দ কর্তৃক অনুভূত হতো তার প্রমাণ পাওয়া গেল যুদ্ধের সময় প্রবর্তিত দেশরক্ষা আইনে আহাদ সাহেবের উপর নির্দেশে। তাঁর প্রভাব ক্ষুন্ন করা যাবে না দেখে এবং তাঁকে গ্রেপ্তার করলে ফল বিপরীত হবে বুঝে পুলিশ এক অভিনব প্রক্রিয়া গ্রহণ করলো। কমরেড দাশরথি চৌধুরী, কমরেড বিপদবারণ রায় এবং কমরেড শিবপ্রসাদ দত্ত (আলুবাবু) প্রমুখ

বাইশজন রাজনৈতিক (কমিউনিস্ট) কর্মীর নাম দিয়ে তাঁকে নোটিশ দেওয়া হলো, গোপনে বা প্রকাশ্যে তাঁদের কারোর সঙ্গে তিনি যেন কোন যোগাযোগ না রাখেন। এই ধরনের নানান্ রকম দৃষ্টান্ত জেলার অন্যত্রও ছিল। বেশ কিছু কর্মীকে জেলা থেকে বহিষ্কার করা হলো। অবশ্য এর মধ্যে অনেকেই গোপনে জেলার মধ্যেই বিচরণ করতেন। এইসব দৃষ্টান্ত সামনে রেখে বন্ধুবরকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম, ভীরুতার দোষ দেশের লোকের নয়, দোষ শোষকশ্রেণীর প্রতিনিধিদের—বিপ্লবের সম্বন্ধে আতঙ্ক। সেই জন্যেই এমন কৌশল, যাতে জনসাধারণ গণ-সমাবেশের কোন উদ্যোগ না নিতে পারে।

১৯৪২ সালের গোড়ায় কংগ্রেস হাইকমাণ্ড কর্তৃক পূর্বের প্রথা বর্জিত হয়ে কমিটিগুলিকে আবার সজীব ও সক্রিয় করার সিদ্ধান্ত করা হলো। তখন আবার আমরা জেলা কংগ্রেস কমিটির অফিস খুলে বসলাম।

১৯৪১ সালে রাশিয়ার বিরুদ্ধে হিটলারের যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর থেকে ১৯৪২ সালের গোড়া পর্যন্ত আমাদের রণনীতি ও রণকৌশল পরিষ্কার হতে কিছু বিলম্ব হয়ে যায়। ১৯৪২ সালের গোড়া থেকে আমরা যুদ্ধকে সমর্থন করার সিদ্ধান্তকে গ্রহণ করি। ১৯৪২ সালের গোড়ায় ফ্যাসিবিরোধী যুদ্ধের বিরুদ্ধে কংগ্রেসও দাঁড়ায়নি। আমরা উল্লিখিত রূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পরও জেলা পার্টির কেন্দ্র গোপনেই রাখতে হয়। কারণ তখনও নেতাদের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা ও গ্রেপ্তারী পরোয়ানা ছিল। প্রকাশ্যে জেলা কংগ্রেস অফিস খোলার পর আমরা আমাদের রণনীতি ও রণকৌশল অনুযায়ী কংগ্রেসের কাজকর্ম শুরু করি। আমি নিজে সম্পাদক কমরেড শিবশঙ্কর চৌধুরীর সহায়ক হই। কংগ্রেসের নির্দেশ ছিল জনগণের নিজেদের আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করা। আমরা জেলা কংগ্রেস কমিটির সভায় জনরক্ষা কমিটি গঠন করি। আমি তার আহ্বায়ক মনোনীত হই।

বর্ধমানের রায়না থানায় পাষণ্ডা, কামারগড়ে, বড়বৈনান ও রামবাটী গ্রামে ১৯৪২ সালের ৭, ৮, ৯, ১১ই মে তারিখে ফ্যাসিস্ট-বিরোধী সভা অনুষ্ঠিত হয়। কমরেড অশ্বিনীকুমার মণ্ডল, ভুজঙ্গভূষণ সেন প্রমুখ জাপানী আক্রমণের স্বরূপ, জাতীয় গভর্নমেন্টের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করেন এবং চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুন্ঠনের সংশ্লিষ্ট বন্দী কমরেড গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিং, সুবোধ রায়, সুবোধ চৌধুরী প্রমুখ এবং মেদিনীপুর ম্যাজিস্ট্রেট হত্যার দীর্ঘ-মেয়াদী বন্দী সুকুমার সেন প্রমুখ দীর্ঘ-মেয়াদী ফ্যাসিস্ট-বিরোধী বন্দীদের মুক্তির দাবি করেন।

এই সঙ্গে জামালপুর থানার পর্বতপুর গ্রামে এক ফ্যাসিস্ট-বিরোধী সম্মেলন হয়েছিল। কৃষক নেতা কমরেড জাহেদ আলি ছিলেন সভাপতি। পার্শ্ববর্তী প্রায় ১৫ খানা গ্রামের লোকজন যোগদান করেছিলেন। জেলা কংগ্রেসের সভাপতি শ্রদ্ধেয় ফকিরচন্দ্র রায়, ভুজঙ্গভূষণ সেন, অশ্বিনীকুমার মণ্ডল ও রাধাশ্যাম মুখার্জী ফ্যাসিস্ট রীতিনীতির জঘন্যতা, জনযুদ্ধের প্রয়োজনীয়তা, বন্দীমুক্তি, পণ্যমূল্য নির্ধারণ প্রভৃতি বিষয়ে বক্তৃতা করেন।

ফ্যাসিস্ট-বিরোধী যুদ্ধের পক্ষে প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পক্ষ থেকে কমিউনিস্ট পার্টিকে কার্যকরীভাবে আইনসঙ্গত করার দাবী তোলা হয়। আমরা প্রচার করতে আরম্ভ করি। ৫ই আগস্ট ১৯৪২ বর্ধমানে বংশগোপাল টাউন হলে এক বিরাট ফ্যাসিস্ট-বিরোধী সভা হয়। প্রায় পাঁচ হাজার মজুর, কৃষক, ছাত্র উপস্থিত ছিলেন। কমরেড বঙ্কিম মুখার্জী বক্তৃতা করেন। শ্রোতারা একাগ্র মনে তাঁর বক্তব্য শোনেন ও উৎসাহিত হন।

এর প্রস্তুতিতে রাজ পাবলিক লাইব্রেরীতে কমরেড শচীনন্দন অধিকারীর সভাপতিত্বে নিখিল ভারত রাজনৈতিক বন্দী মুক্তি দিবস পালিত হয়। সারা ভারত কৃষকসভার যুগ্ম-সম্পাদক মনসুর হবিব বক্তৃতা করেন। সভার শেষে একটি শোভাযাত্রা বের হয়ে বিভিন্ন জাপ-বিরোধী গান ও বিভিন্ন ধ্বনি সহ প্রধান রাস্তা প্রদক্ষিণ করে জেলা কংগ্রেস অফিসের সামনে শেষ হয়। বলা বাহুল্য, কংগ্রেস অফিসে এই সময় পরিচালক ছিলেন আমাদের সহকর্মীরা।

১লা আগস্ট তারিখে রায়নায় কমিউনিস্ট পার্টি দিবস পালিত হয়েছিল। কমিউনিস্ট পার্টি বৈধ ঘোষিত হওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করা হয়। কিন্তু তখনও বাংলা তথা ভারতে কমিউনিস্টদের উপর ও সাধারণ ভাবে ফ্যাসিস্ট-বিরোধী কর্মীদের উপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হয়নি। প্রত্যাহার দাবি করা হয়। পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ দাবি করা হয়। বক্তব্য রাখেন কমরেড কালীপদ মণ্ডল। হাটতলার সুপরিচিত ব্যবসায়ী শরৎচন্দ্র কোঙার মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

একদিকে আমরা যেমন বন্দীদের মুক্তি দাবি করছি, অন্যদিকে তেমনই বারবার বহু বিজ্ঞাপিত কংগ্রেস নেতারা পুলিশের সঙ্গে সহযোগিতা করে তাদের আশ্রয়ে থেকে আমাদের কর্মীদের গ্রেপ্তার করাতে থাকেন। ১৯৪২ সালে আগস্ট আন্দোলন শুরু হওয়ার পর রায়নায় আগস্ট আন্দোলনের অনুষ্ঠাতা কংগ্রেসীরা এই নতুন খেল শুরু করেন। আই. বি.-র কর্তৃপক্ষের সমর্থনে তাদের এজেন্ট কালী সরকারের সঙ্গে চক্রান্ত করে

কমিউনিস্ট পার্টির কর্মীদের আগস্ট আন্দোলনের অভিযোগে গ্রেপ্তার করিয়ে পুলিশ কর্তৃক বন্দী রাখার ব্যবস্থা করেন। এইরূপে কমরেড বিপদবারণ রায়, পাঁচু গুহ ও কালীপদ মণ্ডলকে জেলে দেওয়া হয়। জামিন নিয়ে মুক্ত করালেও বার বার গ্রেপ্তার করা হয়। ১৯৪২ সালে এইভাবে তাঁরা অনেক-দিন বন্দী থাকেন।

যাই হোক, এসময়ের উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে জেলার বে-আইনী কেন্দ্রের প্রকাশ্যে আসা। পার্টি পলিসি সাধারণভাবে পূর্বের মতোই সরকার-বিরোধী ছিল কিন্তু যেহেতু হিটলার কর্তৃক সোভিয়েত আক্রমণের পর যুদ্ধের চরিত্র বদলিয়ে যায় এবং সারা বিশ্বব্যাপী ফ্যাসি-বিরোধী তথা জার্মানী, ইতালি এবং জাপান-বিরোধী জনগণের ফ্রন্ট গড়ে ওঠে, সেই-হেতু ভারতের পার্টি পলিসিও ফ্যাসি-বিরোধী যুদ্ধের সমর্থনে নির্দেশিত হয়। এবার অধিকতর খোলাখুলিভাবে পার্টির রাজনৈতিক কাজকর্ম করার সুবিধা হয়। যাঁরা গোপনে ছিলেন—কমরেড বিনয় চৌধুরী, কমরেড হরেকৃষ্ণ কোঙার, কমরেড দাশরথি চৌধুরী—সব বেরিয়ে আসেন। কমরেড বিপদবারণের আসতে বিলম্ব হয়। কারণ তিনি রায়না থানায় আণ্ডার-গ্রাউণ্ড যাবার কিছুদিন পরেই জেলার সীমানা পেরিয়ে আরামবাগের ব্যাঙ্গা গ্রামে প্রায় পার্টি থেকে বিচ্ছিন্ন এক স্থানীয় পার্টি-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা খুব অসুবিধা ছিল। সেইজন্য তাঁর বেরিয়ে আসতে কিছু বিলম্ব হয়েছিল। এঁরা বেরিয়ে আসার পর বর্ধমান শহরে হাতিপুকুর গলিতে জেলা কমিটির প্রকাশ্য দপ্তর শুরু করা হয়।

১৯৪২ সালের শেষে হাটগোবিন্দপুরে আমরা জেলায় পার্টির প্রকাশ্য সম্মেলনের আয়োজন করতে থাকি। পার্টির উপর 'ব্যান' বা নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হওয়ার পর প্রকাশ্য সম্মেলন এই প্রথম। শহীদ সুকুমার ব্যানার্জীর নামানুসারে সম্মেলন স্থলের নামকরণ করা হয়। ২৩শে ডিসেম্বর, ১৯৪২ সালে সম্মেলন উপলক্ষে জনসভা হয়। প্রয়াত কমরেড হারিস ও কমরেড নীরদ দাসের নামে তোরণ করা হয়। বাঁকুড়ার প্রবীণ কমিউনিস্ট নেতা প্রমথ ঘোষ রক্তপতাকা উত্তোলন করেন। ৩৪ জন পার্টি সভ্য, ২৭ জন এক্টিভিস্ট ও দুই জন পার্টি সমর্থক মহিলা কমরেড সম্মেলনে যোগ-দান করেন। পার্টির জেলা কমিটির সম্পাদক কমরেড বিনয় চৌধুরী রিপোর্ট পেশ করেন।

রায়নায় কৃষক সংগঠন

আদমপুরের মামলায় যখন আমরা জড়িয়ে পড়েছি এবং চকদীঘির জমিদারের (চকদীঘির জমিদার ও মন্ত্রী বিজয়প্রসাদ সিংহ রায়) জুলুম ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে আদমপুরের প্রয়াত কৃষক নেতার নেতৃত্বে কৃষকগণ সংগ্রাম করে যাচ্ছেন, কমরেড প্রদ্যোৎ মণ্ডল আমাদের সঙ্গে এসে যোগদান করেন সেই সময়। তখন তাঁর পরিচয় ছিল তিনি প্রাক্তন রাজনৈতিক বন্দী। বাড়ি বীরভূম জেলা, কিন্তু তাঁর গ্রাম সিঙ্গি বর্ধমান জেলার সীমার নিকট অজয় নদীর পাশে। এক পাশে বীরভূম, আর এক পাশে বর্ধমান। বর্ধমান জেলায় সিঙ্গির বিপরীত দিকে অজয়ের ধারে হচ্ছে মঙ্গলকোট থানার গতিষ্ঠা ও পালিগ্রাম অঞ্চলের গ্রামগুলি। নানান কারণে তাঁর সম্পর্ক বর্ধমান জেলায় খুব বেশী। বর্ধমানের কমরেডদের সঙ্গেও পূর্ব থেকে পরিচয় ছিল। তিনি বর্ধমানে কাজকর্ম করার সংকল্প করেন ও বিনয়দার সঙ্গে দেখা করেন। তাঁকে রায়না অঞ্চলে কাজ করতে পাঠানো হয়।

অল্পদিনের মধ্যেই কাজকর্মের সূত্রে রসিকখণ্ডের ডাঃ গঙ্গানারায়ণ হালদার ও তাঁর একান্ত বন্ধু কমরেড পাঁচু গুহর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। কমরেড পাঁচু গুহর বিপ্লবী রাজনীতির সঙ্গে পরিচয় হয়েই ছিল। চট্টগ্রাম বিদ্রোহীদের অন্যতম সহকর্মী পূর্ণেন্দু দস্তিদার রায়না থানায় অন্তরীণ ছিলেন। পাঁচুদার প্রথম দীক্ষা গ্রহণ তাঁরই কাছে। মার্কসবাদেরও সূচনা তাঁর কাছেই হয়েছিল। এতদিন বাদে মনোমতো যোগাযোগ পেয়ে তিনিও খুব আকৃষ্ট হলেন। কমরেড গঙ্গানারায়ণ হালদার ছিলেন অসাধারণ এক প্রাণময় পুরুষ। গরীবের উপর অত্যাচারের বিরুদ্ধে এবং যে কোন অন্যায়ের বিরুদ্ধে স্বতঃই সামনে এসে দাঁড়াতেন। জনপ্রিয় ডাক্তার, চিকিৎসক হিসাবেও খ্যাত। চশমখোর হলে হয়তো আরও বিরাট রোজগার হতো। কিন্তু সাধারণ মানুষের সহজ বিচারবোধের কারণে দিনরাত তাদের সেবায় খেটে যা পেতেন তাতেই সচ্ছল অবস্থা ছিল। তিনি তো অনেকবার ঝঞ্ঝাটে পড়েছেন। একটা ঘটনা উল্লেখ করছি তাঁর প্রকৃতিটা বোঝাবার

জন্য। ১৯৪৩ সালে খাদ্য সঙ্কটের সূচনায় আমরা ব্যস্ত, অফিসে কি কাজ করছিলাম, এমন সময় সকালে কমরেড দায়ুদ এসে হাজির। বললেন, "ডাক্তার এবং কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করে এনেছে। জামিনের জন্য এসেছি। এখনই ব্যবস্থা করুন।" বললেন, "আমার সম্বল কোথায়? বাড়িতে গয়নাও তো সামান্য, তাই বন্ধক দিয়ে টাকা এনেছি।" জিজ্ঞেস করলাম, "ব্যাপার কি?" সারমর্ম যা জানলাম, একটা পুকুরপাড়ে মুসলমানদের কবরস্থান। জমিদার সেটা বেদখল করার ইচ্ছায়, ছিটেবেড়ার কিছু কঞ্চি বসিয়ে মতলব হাসিল করার চেষ্টায় ছিল। ডাক্তার তাঁর সাগরেদ কৃষক সমিতির কর্মী হিন্দু-মুসলমান কৃষকদের দিয়ে ওসব ভেঙ্গে-ভুঙ্গে দিয়ে বে-দখলের চেষ্টা ধূলিসাৎ করে দেন। জমিদার থানার সঙ্গে চক্রান্ত করে ডাক্তার ও তাঁর কয়েকজন সঙ্গীকে গ্রেপ্তার করায়। হাতের কাজ ফেলে দিয়ে তখনই কোর্টে ছুটতে হলো। দরদী মোক্তারমশায়দের দিয়ে জামিনের ব্যবস্থা করা গেল। পরে মামলা থেকে খালাস করা গিয়েছিল। এ অঞ্চলে সম্প্রদায় ও বর্ণ নির্বিশেষে এক নিবিড় ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এর অন্যতম কারণ এই হৃদয়বান মানুষটি ও তাঁর সঙ্গীসাথীরা। পাঁচুদা ডাক্তারের একান্ত বন্ধু। তিনি কৃষক সমিতি ও কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ-দানের পর দ্বিধাহীনভাবে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কমিউনিস্ট পার্টি ও কৃষক সমিতির কাজে আত্মদান করেছিলেন। এরই ক্রমোত্তর বিকাশ নদীর ওধারে অর্থাৎ দক্ষিণ দিকে সি. পি. আই. (এম)-এর বর্তমান শক্তিতে পরিণত হয়।

রায়নায় তাঁর কাজকর্ম সম্বন্ধে কমরেড প্রদ্যোৎ মণ্ডল আমাকে যা লিখেছেন তাই এখানে দিয়ে দিচ্ছি :

"কয়েক দিন পর পাঁচুদার নামে একটি চিঠি নিয়ে রায়না রওনা হলাম। পাঁচুদা রায়না বাজারে রাধু স্বর্ণকারের দোকানে আমার থাকার ও খাওয়ার ব্যবস্থা করে দেন। রায়না থানায় সে সময় ১৫টি ইউনিয়ন ও খণ্ডঘোষ থানায় ৭টি ইউনিয়ন। আমি পাঁচুদার (পাঁচু গুহ) সাথে আলোচনা করে ঐ ২২টি ইউনিয়নে কৃষক সমিতির প্রাথমিক কমিটি গঠন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করলাম। ১০০ জন সভ্য না হলে কৃষক সমিতির প্রাথমিক কমিটি গঠন করা চলতো না। যতদূর মনে আছে দাশুদা (দাশরথি চৌধুরী) তখন বর্ধমান কৃষকসভার সম্পাদক। সে সময় যুদ্ধ চলছে (দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ)। আমি পায়ে হেঁটে গ্রামের পর গ্রাম ঘুরি।

ছোট ছোট বৈঠক করে যুদ্ধের বিরুদ্ধে কথা বলি। স্বাধীনতার জন্য লড়াইয়ের কথা বলি। জমিদার ও মহাজনের শোষণের কথা বলি। জিনিসপত্রের বেশী বেশী মূল্য বৃদ্ধির বিরুদ্ধে কথা বলি। তারপর কৃষক সমিতির সভ্য হওয়ার জন্য আবেদন জানাই। রায়না ও খণ্ডঘোষ থানার বেশীর ভাগ গ্রামে (প্রায় প্রতিটি গ্রাম) আমি ঘুরেছি। সমগ্র থানায় কৃষক সমিতিকে পরিচিত করতে সক্ষম হই। সব গ্রামের সব মানুষের নাম মনে নাই। ত'বে উত্তরে হিজলনা, শালগাছা, বনতির, দক্ষিণে একলক্ষ্মী, উচালন, ছোটবৈনান, গোতান, ফুটো কামারহাটি, পূর্বে ধামাস, মেড়াল, সাঁকটে, বোরো, পশ্চিমে বোঁয়াই, সসঙ্গা, তোড়কণা প্রভৃতি গ্রাম এবং রায়নার কাছাকাছি সেহারাবাজার, রামবাটি, শ্যামসুন্দরপুর, সহজপুর, বিদ্যানিধি, পিপলে, বোগরা প্রভৃতি গ্রাম আমি বারবার গেছি এবং কৃষিজীবী মানুষকে সমিতির মধ্যে আনবার জন্য প্রচার করেছি। সকল মানুষের দেশপ্রেমের কাছে আবেদন জানিয়েছি।

"গ্রামের কৃষিজীবী মধ্যবিত্তদের কাছে সাড়া পেয়েছি, আর আমি গেছিও প্রধানতঃ ওদের কাছেই। গরীব ক্ষেতমজুর ভাগচাষীদের মধ্যে যেতে পারি নাই, সেরূপ গ্রামের ধনী জমিদার বা মহাজনের কাছে যাই নাই। একটি মাত্র গ্রাম—কামারহাটিতে কেবল মাত্র তেঁতুলে বাগদীদের নিয়ে কৃষক সমিতি গঠন করা হয়। ঐ গ্রামে সে সময় অন্য কোন সম্প্রদায়ের বাস ছিলো না। কৃষক সমিতির কাজে আমি অনেকের সক্রিয় সহযোগিতা পাই। সকলের নাম মনে নাই। তবে পিপলের বিনয় ডাক্তার, বোগরার ধনেশ্বর সামন্ত, সহজপুরের গঙ্গা ডাক্তার (গঙ্গা হালদার), নিমাই দাঁ, রামবাটির বিমান মণ্ডল, রায়নার কালি মণ্ডল, একলক্ষ্মীর সৌরীন ডাক্তার, কামারহাটির নকুল বাগের কথা ভুলি নাই। কংগ্রেসী কর্মী নিতাই ঘোষ ও অদ্বৈত মাঝির কাছ হতেও অনেক সাহায্য পেয়েছি।

"কৃষক সমিতিগুলি সংগঠন করার পর স্থানীয় কোন দাবীর ভিত্তিতে আন্দোলন গড়ার কথা ভাবতে হলো। রায়না ও খণ্ডঘোষের দিকে দামোদর নদীর কোন বাঁধ ছিল না। সে জন্য প্রতি বৎসর বন্যার জলে রায়না ও খণ্ডঘোষের একটা বিরাট এলাকায় ঘর-বাড়ী, চাষ-আবাদের ভীষণ ক্ষতি হতো। দামোদরের জল অনেকগুলো 'হানা' (ভাঙ্গন) দিয়ে বার হয়ে গ্রাম ও মাঠ প্লাবিত করতো। এই হানাগুলি সরকার বাঁধার জন্য কোন ব্যবস্থা নিতো না—যাতে দামোদরের জল রেললাইন ও বর্ধমান শহরের ক্ষতি করতে না পারে তার জন্য দামোদরের বর্ধমানের দিকে বাঁধ দেওয়া ও

রক্ষা করার দিকে নজর দিতো। চকদীঘির জমিদারও চাইতো না রায়নার দিকে দামোদরের বন্যার প্রতিরোধে কোন বাঁধের ব্যবস্থা, কেননা দামোদরের অন্যদিকে চকদীঘির অবস্থান আর সে দিকের বাঁধ ভালো ভাবেই দেওয়া হতো ও রক্ষা করা হতো।

"চীনদেশের কান্না বা দুঃখ বলা হতো হোয়াং হো নদীকে। তেমনি দামোদরকে তখন রায়না-খণ্ডঘোষের দুঃখ বললে ভুল হতো না। অনেক-গুলোর মধ্যে 'নাকড়া' একটি হানা। এই হানা ছিল বিরাট এক ভাঙ্গন। ঐ হানা দিয়ে উত্তর-পূর্ব রায়নার বিরাট অংশে বন্যার জল প্রবেশ করে মানুষের সর্বনাশ ডেকে আনতো প্রায় প্রতি বৎসর। এই হানা বাঁধার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হলো। তখনও দেশের স্বাধীনতা আসে নাই। তার জন্য বিশেষ কোন একটি বা দুটি শ্রেণীকে সংগঠিত করলেই হবে না। বেশীর ভাগ মানুষকে স্বাধীনতার আন্দোলনে সামিল করা একান্ত প্রয়োজন। 'নাকড়া' হানা বাঁধার আন্দোলনে এলাকার প্রায় সব মানুষকে (বড় লোক, গরীব লোক, মধ্যবিত্ত চাষী, ক্ষেতমজুর, উচ্চ শ্রেণী-ভুক্ত, তপশীল শ্রেণীভুক্ত, হিন্দু, মুসলমান) টানা সম্ভব হবে। এই চিন্তা করে 'নাকড়া' হানা বাঁধার জন্য আন্দোলন সংগঠন করতে শুরু করলাম। মানুষের কাছ হতে বেশ সাড়া পাওয়া গেল। একদিন প্রচার পত্রিকা ('সংবাদ' নামে একটি সাপ্তাহিক কাগজ প্রচার কাজে ব্যবহার করা হয়) সংগ্রহ করার জন্য বর্ধমান পার্টি অফিসে আসি।

"দিনটা ২৩শে জুন, ১৯৪০। পরিকল্পনা ছিলো পলাশী যুদ্ধের স্মরণে বনাতির গ্রামে একটা বৈঠক করা হবে। বনাতির হিন্দু-মুসলমানের গ্রাম। কিন্তু ঐদিন দুপুরে পার্টি অফিসে পুলিশ আমাকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বর্ধমান ছেড়ে যেতে আদেশ জারী করে। ঐ দিনই বিনয়দাকেও বর্ধমান জেলা হতে বহিষ্কার করা হয় (আমার যতদূর মনে আছে)। আমার রায়না ফিরে যাওয়া আর সম্ভব হয় না।"

১৯৪২ সালেই আমাদের প্রকাশ্য কার্যক্রম ক্রমোত্তর বিস্তার লাভ করছিল। প্রয়াসকে সুসংগঠিত করার উদ্দেশ্যে জেলায় আশু কৃষক সম্মেলন করার প্রয়োজন ছিল। রায়নায় সংগঠিত এলাকায় জেলার কৃষক সম্মেলন আহ্বান করার সিদ্ধান্ত হয়। সম্মেলন আহূত হয় রায়না থানার আহারবেলমা ইউনিয়নে আলালপুর গ্রামে। ১৯৪৩ সালের ৭ই, ৮ই ফেব্রুয়ারী। স্থানীয় কর্মীদের সঙ্গে মিলিত হয়ে আমরা গ্রামে গ্রামে

সম্মেলনের প্রচার করতে থাকি এবং চাঁদা সংগ্রহ করি। রূপসোনা গ্রামের একটা ইন্‌টারেস্টিং অভিজ্ঞতা মনে পড়ে। আমি, ডাঃ গঙ্গা হালদার ও আরও সঙ্গীদের নিয়ে মিঞাদের এক খানকায় উপস্থিত হলাম। তখন মুসলমান মাতব্বরদের মধ্যে মুসলিম লীগের আধিপত্য। তাদের ভাবভঙ্গি দেখেই বোঝা গিয়েছিল সাধারণ সৌজন্য প্রসার করতেও তারা প্রস্তুত ছিল না। আমি 'আস্‌লামালাইকুম্' বলতে তারা আনুষ্ঠানিক জবাব দিতে বাধ্য হলো। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বললো, "আমরা তো মুসলিম লীগের।" ইতিমধ্যে তাদের সৌজন্যের অপেক্ষা না করে আমি চৌকি ইত্যাদি যা ছিল তাতেই বসে পড়লাম এবং অন্যদের বসতে ইশারা করলাম। মুসলিম লীগের কথা তুলতেই আমি বললাম, "ওটা তো আপনাদের রাজনৈতিক ব্যাপার। কৃষক সমিতি তো শ্রেণীগত গণ-সংগঠন। কংগ্রেস বা মুসলিম লীগের অনেকেই আমাদের প্রতিষ্ঠানে আছেন।" তখন ওদের মধ্যে একজন বললেন, "আমরা মুসলমান, হিন্দুদের সঙ্গে আমরা কোন সংগঠন করব না।" বলতেই আমি বললাম, "হিন্দুর সঙ্গে মিশবেন না, কিন্তু আমি জানি আহার-বেলমার বিশালাক্ষ বসু একজন হিন্দু, মধ্যরাত্রে ডাকলে আপনি ছুটে যাবেন।" এর জবাবে সে বা অন্য কেউ কিছু বলল না। স্তব্ধ হয়ে গেল। ইতিমধ্যে গ্রামের সাধারণ মানুষ বেশ কিছু জমা হয়ে গিয়েছিলেন। তাদের উদ্দেশ্য করে আমাদের প্রচার আমি বললাম। এবং সম্মেলনের প্রকাশ্য সভায় যোগ দিতে আমন্ত্রণ করলাম। প্রচার শেষে উঠে পড়লাম, সমবেত জনতার মুখ-চোখ দেখে বুঝলাম প্রচারে ফল হয়েছে। বিশেষ লোকটিকে পাল্টা খোঁচা দেওয়ায় লোকে খুশিই হয়েছে। পথে আসতে আসতে ডাঃ গঙ্গা হালদার বললেন, "ও তো সত্যই বিশালাক্ষর দালাল। কিন্তু আপনি সেটা বুঝলেন কি করে?" বললাম, "ওর কথাতেই বুঝলাম।"

যেমন পূর্বেই বলেছি, নির্ধারিত তারিখ ৭ই ও ৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯৪৩ সম্মেলন খুব সফল ভাবেই অনুষ্ঠিত হলো। কমরেড অমৃতেন্দু মুখোপাধ্যায় ছিলেন সভাপতি ও প্রধান বক্তা। জেলার নেতারাও বক্তৃতা দেন। ছয় হাজারেরও বেশী জনসমাবেশ ছিল।

দুর্ভিক্ষের সময় ত্রাণকার্যে পার্টি

১৩৪৯ সালে রায়নায় ফসল ভাল হয়নি। শুকোর মতো হয়েছিল। পৌষ মাস না পেরোতেই গ্রামাঞ্চলে খাদ্যাভাব শুরু হলো। এদিকে ধানের দাম চড়তে শুরু করেছে। প্রথম চমকে দেওয়ার মতো বৃদ্ধি ঘটলো মাঘ মাসে।

বলা বাহুল্য, চালের দামও সেই অনুপাতে বাড়লো। বর্ধমান শহরেও দোকানের মধ্যে উত্তেজনা শুরু হলো। আমার মনে আছে, একদিন বোরহাটে চালের দোকানে গণ্ডগোল হয়। জনতা জমা হয়ে হঠাৎ দাম বাড়ানোর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছিল। দোকানদার নিরন্তর ঔদ্ধত্য করে যাচ্ছিল। সংবাদ পেয়ে আমি আর বিশু (কমরেড বিশ্বনাথ সেন, ইতি-পূর্বে উল্লিখিত প্রয়াত কমরেড জগন্নাথ সেনের ভাই) উপস্থিত হই। দোকানদারকে কম দরে দিতে বলতে থাকি এবং জনতার বিক্ষোভ যাতে শৃঙ্খলিত সংযতভাবে হয় তার চেষ্টা করি। ইতিমধ্যে পুলিশ এসে পড়ে এবং প্ররোচনার অবস্থা সৃষ্টি করে। যাই হোক, সেদিন অবস্থা বেশিদূর গড়ায় না। পার্টির সামনে একটা নতুন কার্যক্রম এসে গেল, এটা বোঝা গেল। আজকে যেমন সব কারণ জানা, তখন তা ছিল না। একটা কারণ যে চোখের সামনে ঘটছিল—মহাজন কর্তৃক 'বাঁধি' দর চড়াও আর ব্যাপক চোরা কারবার! প্রথম তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলা হয় এবং সরকার কর্তৃক সস্তায় খাদ্য সরবরাহ দাবি করা হয়। সমস্ত পার্টিকর্মী স্বতঃই এবং পার্টি নির্দেশে এই আন্দোলনে নেমে পড়েন।

দুর্ভিক্ষের বৎসরে প্রথম র‍্যালি আনা হয় রায়না থেকে। পার্টি কর্মীদের নেতৃত্বে সাড়ে সাত'শ মানুষ বর্ধমান শহরে এসে এস. ডি. ও.-র কাছে উপস্থিত হন। মুখপাত্র ও প্রবক্তা হিসাবে রসিকপুরের কমরেড আবদুস সালাম চৌধুরী গণ-দরখাস্ত পেশ করেন এবং দাবি উপস্থিত করেন। বলা বাহুল্য, সেই দাবির প্রধান অংশই ছিল সরকার কর্তৃক সস্তা

দরে চাল সরবরাহ করা এবং যাঁদের কেনার ক্ষমতা নেই তাঁদের বিনামূল্যে খাদ্য বিতরণ করা। এ রকম কার্যক্রম জেলার সর্বত্রই গ্রহণ করা হয়। পশ্চিম মঙ্গলকোট তথা কাশিয়াড়া, গতিষ্ঠা, চাণক, পালিগ্রাম, লাকুরিয়া অঞ্চল থেকে কমরেড দাশরথি চৌধুরী ও পার্টিসদস্য কমরেড আবদুল মকিত, কমরেড আবদুস সমি কায়সার প্রমুখের নেতৃত্বে সাড়ে চারশো মানুষ বর্ধমান শহরে উপস্থিত হয়ে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে দাবি পেশ করেন। শহরে শহীদ কমরেড শিবশঙ্কর চৌধুরী এবং প্রয়াত অশ্বিনী মণ্ডল, শিবপ্রসাদ দত্ত (আলু) এবং সর্বানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় (নাড়ু) প্রমুখ শহরের অন্যান্য কর্মীদের সঙ্গে মিলে, শহরে দরদী মানুষদের কাছ থেকে চাল, ডাল, তরকারি আদি সংগ্রহ করে এঁদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করেন। পূর্বে উল্লিখিত রায়নার ভুখা মিছিলের সময়ও উক্ত কমরেডদের উদ্যোগে এরূপ করা হয়েছিল।

বর্ধমান শহরে সস্তা রেশনের দাবি আংশিকভাবে স্বীকৃত হলো, কিন্তু জনগণের সহযোগিতা প্রত্যাখ্যান করে কিছু অনুগ্রহ-প্রার্থীদের মাধ্যমে। আমরা ঐক্যবদ্ধ খাদ্য আন্দোলনের জন্যে শহরের সমস্ত মহল্লায় 'খাদ্য কমিটি' গঠন করতে লাগলাম। সঙ্গে সঙ্গে যেটুকু রেশন কার্ডের বিলি সরকারি আমলাতান্ত্রিক পন্থায় করা হয়েছিল তার দুর্নীতি প্রকাশ করতে লাগলাম। এ ব্যাপারে আমরা প্রভূত সাহায্য পেয়েছিলাম বন্ধুবর শ্রীঅমেয় প্রকাশ নন্দের (ঝাঁপুবাবুর) নিকট হতে। তিনি দান-খ্যাতিতে সুপরিচিত জমিদার বংশগোপাল নন্দের (বর্ধমান টাউন হল যাঁর দান) পৌত্র। স্বভাবতঃই বর্ধমান রাজ পরিবারের নিকট আত্মীয়। তাঁর ব্যক্তিগত স্বভাবে কিছু ত্রুটি ছিল। তাতে তিনি নিজেরই ক্ষতি করেছিলেন। কিন্তু সাধারণের কাজে উদারভাবে তাঁর মনের দরজা খোলা থাকতো। যে কাজ ধরতেন তার জন্য অকাতর পরিশ্রমও করতেন। একটা কথা এখানে বলতে হয়। রিলিফ ইত্যাদি আন্দোলনে থাকলেও তিনি রাজনীতিকে পরিহার করে চলতেন। এইভাবেই তিনি রেশন কার্ড তালিকা প্রস্তুত করে আমলা-বিতরিত সস্তা চালের রেশনের তালিকায় কতজন আয়কর দাতা, উচ্চহারে সেল্‌স্ ট্যাক্স দাতা, মোটা টাকার রাজস্ব দাতা এইরূপ রেশন কার্ড পেয়েছেন তার তালিকা উপস্থিত করেন। দুর্নীতি প্রকাশ হয়ে পড়ায় সাধারণের নির্বাচিত 'খাদ্য কমিটি' তালিকা প্রণয়ন করে দেবেন, এই দাবি মেনে নিতে স্থানীয় সরকারী কর্তৃপক্ষ বাধ্য হন। গণ-আন্দোলনের চাপে প্রাদেশিক গভর্নমেন্ট এইভাবে নির্বাচিত কমিটিকে স্বীকার করার নীতি মেনে নেন।

আমরা বর্ধমানে ইতিমধ্যে মহল্লায় মহল্লায় কমিটি গঠন করতে থাকি আর তাঁরা তালিকা প্রস্তুত করতে থাকেন। আমরা মহল্লায় মহল্লায় মহল্লাবাসীদের সভা করি। বলা বাহুল্য, কমরেড হরেকৃষ্ণ কোঙারই ছিলেন এই সভাগুলিতে প্রধান বক্তা। এইভাবে জনমত ও সংগঠনের জোরে রেশন কার্ডের সংখ্যা বৃদ্ধি করানো হলো। এই সময় বর্ধমান শহরের কমরেডদের খুব পরিশ্রম করতে হয়েছিল : মহল্লায় মহল্লায় কমিটি গঠন, রেশন কার্ড তৈরী করা, জনমত গঠন, সভা সমিতি ইত্যাদি। এইসব কাজে অর্থাৎ সভায় বক্তৃতা দেওয়া থেকে শুরু করে রেশন কার্ড তৈরী করা প্রত্যেকটি কাজে কমরেড হরেকৃষ্ণ শুধু নেতৃত্ব ও পরিচালনায় নয়, প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। সরকারী কর্মচারীরা এত রেশন কার্ড ইস্যু করার মতো লোক নেই বলে অভিযোগ করলেন। আমরা জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে বললাম, "আমরা স্বেচ্ছাসেবক দিচ্ছি। তাঁরাই রেশন কার্ড করে দেবেন।" কমরেড হরেকৃষ্ণ কোঙার দায়িত্ব নিলেন। কিছু স্বেচ্ছাসেবক কমরেড হরেকৃষ্ণ কোঙারের নেতৃত্বে সরকারী অফিসে বসে গেলেন। শহীদ কমরেড প্রভাত কুণ্ডু, কমরেড অজিত সেন, কমরেড শিবশঙ্কর দত্ত (আলুবাবু), কমরেড ধর্মদাস রায় প্রমুখ তাঁর সঙ্গে ছিলেন। আমি এক নাগাড়ে থাকতে পারছিলাম না। কারণ এলাকায় সর্বত্র ঘুরতে হচ্ছিল।

এদিকে পার্টির নিজের বাসার অবস্থা অত্যন্ত কঠিন। তখনকার অবস্থার তুলনায় চালের দাম এত বেড়েছে যে পার্টি-কর্মীদের থাকার জায়গায় (যাকে পরে আমরা 'কমিউন' বলতে শুরু করেছিলাম) চাল কিনতে পারি না। যে কয়জন থাকতেন কষ্ট পেতে হয়েছে। আটার দামটা তবু ম্যানেজ করা যেত কিন্তু সে আটাও মুখে দেওয়া অভ্যাস করতে হয়েছিল। সে আটাতে গমের সঙ্গে জোয়ার, বাজরা প্রভৃতি মেশানো থাকতো। অবশ্য চারিদিকের দুর্ভিক্ষ ও হাহাকারের অবস্থায় যা জোটে তাই সৌভাগ্যের কথা, এই মানসিকতায় সব কিছু হাসি মুখে সহ্য করছিলেন। তাছাড়া বৃটিশ সরকারের নির্যাতন, দেশের মানুষের এক অংশের হৃদয়হীন ফাটকাবাজী বাঁধি ও চোরাকারবারীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম এই আদর্শের প্রেরণা ও সহনশীলতা জুগিয়েছিল। মাসখানেক পর যখন পঁচিশ হাজার রেশন কার্ড তৈরী ও বিতরণ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে তখন 'ফুড কমিটি'র সদস্যদের সবারই কানে পৌঁছে গেল, যে স্বেচ্ছাসেবকরা রেশন কার্ড তৈরী করে ইস্যু করছেন, তাঁদের নিজেদের ভাত জুটছে না। আমরা অবশ্য এ কথা বিজ্ঞাপন করিনি। ব্যাপকভাবে সাধারণের কাজ নেওয়াতে কেবল আমাদের সঙ্গে

প্রয়োজনের যোগাযোগ করার জন্য গণ-সমাগম আমাদের অফিস ও বাসায় (যা ছিল যুক্ত) হতে আরম্ভ করলো এবং তা চলতে লাগলো। আমাদের ছোট অফিসে অন্দর-বাহির বলে কিছু ছিল না। মানুষ যাঁরা আসতেন তাঁরা অনেক সময় আমাদের কর্মীদের খেতে দেখতেন। তাঁদের কাছে প্রকৃত অবস্থা অপ্রকাশ্য থাকল না। শেষে 'ফুড কমিটি' থেকে সর্বসম্মতিক্রমে ন্যায্য যুক্তিতেই আমাদের পার্টির বাসার কর্মীদের রেশন কার্ড দেওয়া হলো।

আমার এই সময়ের কাজ বিচিত্র রকমের। যদিচ প্রধান এবং বেশির ভাগ সময়ের কাজ ছিল শহর ও গ্রামের সাধারণ মানুষের সঙ্গে কাজ, তবু বর্ধমানের মহারাজা থেকে শুরু করে জেলার বিভিন্ন রাজনৈতিক পার্টি, পৌরসভা, জেলা বোর্ড নিয়ে 'জেলা খাদ্য কমিটি' গঠন ইত্যাদি বিষয়েও কিছু সময় দিতে হতো। বর্ধমানের মহারাজার সঙ্গে মুসলিম লীগের সভাপতি ও স্থানীয় এম. এল. এ. হাসেম সাহেব, টোগোদা (শ্রীপ্রণবেশ্বর সরকার) এবং আমি দেখা করি। খানিকটা এগিয়ে আরও কিছু প্রয়াসের দরকার বুঝে কংগ্রেসের শ্রদ্ধেয় প্রবীণ নেতা ও জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান জিতেনদা (শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মিত্র)-কে নিয়ে আমি ও টোগোদা পুনর্বার মহারাজার সঙ্গে সাক্ষাত করি। জিতেনদাকে অবশ্য প্রথম থেকেই সব কিছু অবহিত রেখেছিলাম। তিনি সবই অনুমোদন করেছিলেন। আমাদের প্রয়াস বর্ধমানের মহারাজাকে সভাপতি করা, যাতে এই পদের জন্য রাজনৈতিক দলের প্রতিদ্বন্দ্বিতা আশু কার্যক্রমে অর্থাৎ 'জেলা খাদ্য কমিটি' গঠনে কোন বাধা না সৃষ্টি করে। এছাড়াও সরকারী কর্মচারীকে এড়ানো যাবে। মুসলিম লীগ তখন মন্ত্রিত্বে এসেছে। সুতরাং হাসেম সাহেব থাকায় মহারাজা খানিকটা ভরসা পেয়েছিলেন, তারপর কংগ্রেসের আমরা যাওয়ায় মহারাজা জনমত সম্বন্ধে আশ্বস্ত হতে পারলেন। তিনি সভাপতি হতে সম্মত হলেন। আমরা নিজেরা অবশ্য আলোচনা করেছিলাম। জিতেনদা, টোগোদা, তারাপদদা (শ্রীতারাপদ পাল) প্রমুখ কংগ্রেসের সঙ্গীদের সঙ্গে আলোচনা করে কমিটির চেহারাটা ঠিক করে ফেললাম। মহারাজা সভাপতি। হাসেম সাহেব সম্পাদক। বাকী আমরা সব সদস্য। প্রত্যেক পার্টি থেকে একজন প্রতিনিধি। জেলার এম. এল. এ., এম. এল. সি.-রা, পৌরসভার চেয়ারম্যান ও প্রতিনিধি, জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান ও প্রতিনিধি, জেলা বার এ্যাসোসিয়েশন্-এর প্রতিনিধি প্রমুখ কমিটির সদস্য হলেন। পার্টির প্রতিনিধি হিসাবে থাকলেন বিনয়দা; আমি 'ফুড কমিটি'র একজন প্রধান কর্মী হিসাবে সদস্য থাকলাম। এই

নানান রকমের নানা শ্রেণীর লোকদের একসাথে জড়ো করতে আমাকে বহু পরিশ্রম করতে হয়েছিল। কংগ্রেসের মধ্যে আমরা অন্ততঃ এই ব্যাপারে সব একমত থাকায় কোন অসুবিধা হয়নি। কিন্তু অন্যান্যদের সতর্কতা ও সংশয় ছাড়িয়ে এই মিলিত কার্যক্রমে নিয়ে আসতে বেশ বেগ পেতে হয়েছিল। এখানে উল্লেখ করা উচিৎ, মুসলিম লীগ নেতা হাসেম সাহেবের আমরা বেশ সহযোগিতা পেয়েছিলাম।

প্রথমেই আমরা শহরে একটি 'খাদ্য কমিটি' গঠন করেছিলাম। প্রথিতযশা উকিল শ্রদ্ধেয় জ্ঞানদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সভাপতি হতে সম্মত হয়েছিলেন। অনুরূপ খ্যাতিসম্পন্ন উকিল শ্রদ্ধেয় পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় ও মৌলবী গোলাম মর্তুজা সাহেব সদস্য হয়েছিলেন। কমরেড ভুজঙ্গভূষণ সেনকে খাদ্য কমিটির সেক্রেটারী করা হয়েছিল। এছাড়া ছিলেন শহরের বিভিন্ন পার্টির প্রতিনিধি এবং সদ্য প্রতিষ্ঠিত এবং সক্রিয় মহল্লা কমিটির সদস্যগণ। এ'দেরই নেতৃত্বে মহল্লায় মহল্লায় সস্তায় রেশনের জন্য রেশন কার্ডের তালিকা তৈরী হয়েছিল। 'মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি' মহল্লায় মহল্লায় গরীব পরিবারদের তালিকা তৈরীতে সাহায্য করেছিলেন। কমিটিতে তাঁদের প্রতিনিধিও ছিলেন। প্রতিনিধি ছিলেন রাবিয়া শাহেদুল্লাহ ও সামসুন্নেসা করিম (বাদশা)। শহরে চিনি বিতরণের ভার 'খাদ্য কমিটি'র উপর এলো। ফলে শহর কমিটিকে আরও ব্যাপক ভিত্তিতে এবং ইতিমধ্যে যাঁরা বাদ পড়েছেন এমন সব অংশের প্রতিনিধিদের নিয়ে বড় করে গঠনের প্রয়োজন অনুভূত হল। যদিচ প্রথিতযশা উকিলদের আমরা সঙ্গী করতে পেরেছিলাম, তাহলেও বৃহত্তম অংশের সংযোগের জন্য আরও প্রয়াসের প্রয়োজন ছিল। বার এ্যাসোসিয়েশন প্রতিনিধি দেওয়ার জন্য আমাদের আবেদন প্রথমে অগ্রাহ্য করেছিলেন। তাঁরা যে চিঠি দিয়েছিলেন তা-ও খুব কড়া ভাষায়। বিনয়দা ও আমোদদা (আমোদবিহারী বসু), শ্রদ্ধেয় উকিল দিবাকর কোঙার এবং এক বিক্ষুব্ধ অংশকে সম্মত করে টাউন কমিটিতে আনতে পারলেন। বার এ্যাসোসিয়েশনও তাঁদের প্রতিনিধির নাম পাঠালেন। টাউন কমিটির তৎকালীন সভাপতি জ্ঞানদা-প্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সম্যক পরিচয় বাকি ছিল। একথা উপলব্ধি করলাম এই কমিটির সভা পরিচালনায়। সরস মন্তব্যে তিনি সভার পরিচালনায় এক মাধুর্য এনে ফেলতেন। প্রায়ই ইংরাজী, বাংলা, সংস্কৃত কাব্য হতে উদ্ধৃতি তাঁর মন্তব্যে সংশ্লিষ্ট থাকতো। শ্রোতারা রস উপভোগ করতেন। আবার ওকালতির পেশায় প্রোথিত ও আচ্ছাদিত বিদ্যার ভাণ্ডারের কিছু

উন্মোচনও দেখাতেন। সারা জীবন তো রাজনীতিতেই কাটালাম, কিন্তু এ রকম সভাপতি অন্য অনেক জায়গায় পেলে জীবনটা আরও সরস হতো।

চারটি 'মহকুমা ফুড কমিটি' গঠনের সমস্যা সামনে এলো। কারণ প্রত্যেকটি এলাকার খাদ্য সংক্রান্ত অভাব-অভিযোগ উপস্থাপিত করার জন্য এই রকম কমিটির প্রয়োজন ছিল এবং 'জেলা ফুড কমিটি'তেও মহকুমাগুলির প্রতিনিধি নেওয়ার প্রয়োজন ছিল। প্রথমেই আমরা কাটোয়ায় মনোযোগ দিলাম। আমি, শহীদ শিবশঙ্কর চৌধুরী, প্রয়াত কমরেড দাশরথি চৌধুরী ও শান্তব্রত চট্টোপাধ্যায় কাটোয়ায় আন্দোলনে জোর দিলাম। আমি তো কাটোয়ায় আবদ্ধভাবে থাকতে পারি না। আমি কাটোয়া থেকে কালনা গেলাম। ওখানে দু'একজনের সঙ্গে প্রাথমিক কথাবার্তা কয়ে বর্ধমান ফিরলাম।

কাটোয়ায় শীঘ্রই সম্মেলন করা সম্ভব হলো। উপরে উল্লিখিত সকলের নিরলস প্রয়াস ছিল এর পিছনে। বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য শহীদ শিবশঙ্করের কথা। তিনি করোজ গ্রামের অধিবাসী ও কাটোয়ার উকিল প্রয়াত মরহুম মুসা মিঞাকে সঙ্গে করে কাটোয়া ও মঙ্গলকোট থানার প্রায় সবটাই সাইকেলে করে ঘুরলেন। বৃটিশ সরকার ও মহাজনদের সৃষ্ট খাদ্য সঙ্কটে আত্মসমর্পণ করলে চলবে না, সক্রিয়ভাবে এর প্রতিরোধ করতে হবে, নানা রকম ভেদ-বিভেদ অতিক্রম করে সকলে মিলিত হয়ে এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হবে এবং জনগণের সস্তা ও ন্যায্য দরে খাদ্য সরবরাহের দাবি প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। মুসা মিঞার ছিল তাজা প্রাণ, সহৃদয়তা ও সক্রিয়তা। পরিবর্তিত অবস্থায় হয়তো আমরা তাঁকে নিকটে পেতাম। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ১৯৪৭ সালে কাটোয়ায় সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামায় উত্তেজিত জনতাকে শান্ত করতে গিয়ে তিনি প্রাণ হারালেন। কাটোয়ায় সম্মেলন খুব সার্থক হয়েছিল। বেশ কয়েকজন প্রতিনিধি জেলা কমিটিতে নির্বাচিত হলেন।

কালনায় এই সম্মেলন করার জন্য চেষ্টা ইত্যাদি সবের দায়িত্ব প্রধানতঃ আমাকে ও কমরেড শিবশঙ্করকে নিতে হলো। প্রথমেই আমরা সুপরিচিত নেতৃস্থানীয় কংগ্রেসকর্মীদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাত করে যোগাযোগ করার চেষ্টা করি। এই উদ্দেশ্যে পূর্বস্থলীতে মেড়তলা গ্রামে নৃপেনদার (শ্রীনৃপেন ভট্টাচার্য) কাছে যাই। মনে আছে প্রথম দিনই তিনি আমাদের ভালভাবে অভ্যর্থনা করলেন। আমাদের খাদ্য সম্মেলনের উদ্দেশ্য তাঁকে বললাম। বর্ধমানে কিভাবে আমরা জনমত সমর্থিত ঐক্যবদ্ধ কমিটি গঠন

করে মোকাবিলা করছি তা বললাম। তিনি যোগ দিতে সম্মত হলেন। দিদি এবং বৌদি (নৃপেনদার স্ত্রী) আমাদের খুবই যত্ন করেছিলেন। কয়েক-বারই গেছি, একই অভিজ্ঞতা পেয়েছি। প্রসঙ্গতঃ নৃপেনদার সঙ্গে রাজনীতির কথাও আলোচনা হলো। তিনি বললেন, "তোমরা এখানে এসে আন্দোলন কর। অন্যে যে যাই বুঝুক, আমি বুঝি এটাতে আমাদের সাহায্যই হবে। মতান্তর ঘটলেও বিচ্ছেদ হবে না বলেই মনে হয়।" যাই হোক, আশু কার্যক্রমের কয়েক ধাপ ঠিক করা হলো। উনি আমাদের প্রথমেই নিয়ে গেলেন কাষ্ঠশালীতে শ্রীরামেন্দু ভট্টাচার্য মহাশয়ের বাড়ি। তাঁর সঙ্গে অনেক আলাপ-আলোচনা হলো। তিনিও আমাদের কার্যসূচী সমর্থন করলেন। আসার পথে চুপিতেও ঘোরাফেরা করলাম। নৃপেনদা স্থানীয় নেতৃত্ব, স্থানীয় মানুষদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ায় কিছুক্ষণ সৌজন্যের বিনিময় হলো।

(একটা কথা এখানে উল্লেখ করে যাই। স্বাধীনতার পর ১৯৫১ সালে জেলা বোর্ডের নির্বাচনে ফরওয়ার্ড ব্লকের মনোনীত শ্রীরমনীমোহন চক্রবর্তী প্রার্থী হন। চুপি ও কাষ্ঠশালীতে আমাদের সমর্থকরাই তাঁকে প্রার্থী করেছিলেন। প্রথম দিকে আমাদের যে ওখানে কেউ সমর্থক আছেন রমনীমোহন আমাদের জানান নি। পরে এক সভায় আহূত হয়ে আমি দেখলাম উক্ত প্রার্থী ব্যতিরেকে ওখানকার যে সব কর্মী ছিলেন সবাই আমাদেরই সমর্থক। যাই হোক, এই সভা উপলক্ষে আমি যখন উপস্থিত হয়েছিলাম, আমি একবার নৃপেনদা, রামেন্দুবাবুর ওখানে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলাম। ও'রা কংগ্রেসের সমর্থক বলে প্রবল আপত্তি উঠলো। এরূপ ক্ষেত্রে বাদ দেওয়ার প্রয়োজন ছিল না বলেই আমার মনে হয়। আমাদের নিজেদের রাজনৈতিক বিরোধিতার ভূমিকা রেখেও বাড়িতে বৌদি ও নৃপেন-দার সঙ্গে দেখা করে আসা উচিৎ ছিল। কিন্তু এসব ব্যাপারে ঝুঁকি নিতে নেই, সুতরাং স্থানীয় কমরেডদের নির্দেশই গ্রহণ করলাম। এ অবশ্য পরের কথা।)

চুপি, কাষ্ঠশালী ঘোরার পর নৃপেনদার সঙ্গে কথা হলো, তিনি কালনায় আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন। নৃপেনদার একটা কথা বলে রাখা ভাল। ১৯৪২ সালের আন্দোলনের ফলে কালনায় পিউনি পুলিশ ও পিউনি ট্যাক্সের প্রয়োগ হয়েছিল। মানুষের মধ্যে তখনও শঙ্কার ভাব কিছু ছিল। নৃপেনদা কালনায় ওঠার অসুবিধার কথা বললেন। "থাকবেন কোথায় ?" আমি বললাম, "আমি যেখানে উঠেছি সেখানেই উঠবেন।"

এইখানে আমার এক বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা বলতে হয়। এর আগেও আমাকে কালনায় যেতে হয়েছে, কালনা মহকুমার কোন কোন অঞ্চলের রিলিফ ইত্যাদি কাজের জন্য অফিসারদের সঙ্গে দেখা করতে। কালনা শহরে তখন ঐরূপ পরিচয়ে আমাদের কেউ সমর্থক ছিল না। উঠতাম ডাকবাংলায়, খেতাম শহর থেকে কোর্ট যাবার পথে মুসলমান হোটেল ছিল সেই হোটেলে। এখন কি অবস্থা আছে জানি না। সেই হোটেলই আছে কিনা জানি না। কিন্তু সে সময় ঐ হোটেলের রান্না ও পরিচ্ছন্নতা আমার খুব ভাল লাগতো। ১৯৫১-৫২ থেকে অবশ্য আর প্রয়োজন হয়নি। পার্টির সভ্য ও সমর্থকরা খাবার ব্যবস্থা করতেন। যাই হোক, তখন যে অবস্থা হয়েছিল তার বর্ণনা দিই। উপরে মোড়লগাঁর হাঙ্গামার বিবরণের সময় প্রয়াত বেশারত চৌধুরীর কথা উল্লেখ করেছি। আমি সেবার হোল্ডার-এ বিছানাপত্র নিয়ে ডাকবাংলাতে রাত্রে উঠেছি। সকালে শহরে কয়েকজন নবপরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে দেখা করে ডাকবাংলায় ফিরছি এমন সময় রাস্তায় চৌধুরী সাহেবের সঙ্গে দেখা। কি কাজে এসেছি তার পরিচয় নেওয়ার পর তিনিও জানালেন কোন মামলা-মোকদ্দমা সংক্রান্ত বিষয়ে এসেছেন। তিনি বললেন পরের দিনই চলে যাবেন, আছেন জিকরিয়া সাহেবের ওখানে। খাওয়া-দাওয়ার কথা জিজ্ঞেস করায় বললাম, "গঙ্গায় গোসল্ করি আর হোটেলে খাই। আর থাকি তো দু'একদিন, কাজ সেরেই চলে যাই। যাই হোক, এবারে কয়েকদিন থাকতে হবে।" তিনি জিকরিয়া সাহেবের ওখানে আছেন বলায় আমি খুব আশ্চর্য হইনি। কারণ জেলায় মুসলিম লীগ নেতাদের ও তাঁদের সহযোগীদের সঙ্গে তাঁর সদ্‌ভাব ছিল। আমি ডাকবাংলায় শুয়ে একটু বিশ্রাম নিচ্ছি এমন সময় একজন পোশাকে-পরিচ্ছদে ভদ্রলোক, সোজাসুজি আমাকে দেখে সালামাদি বিনিময়ের পরই আমাকে বললেন, "আপনি এখানে কেন? আমার নাম জিকরিয়া। আমি থাকতে আপনার অন্য জায়গায় থাকা চলবে না।" সঙ্গে যে ছিল, বুঝলাম তাঁর বাড়ির কাজের লোক। তিনি নিজেই আমার বিছানা গুটোতে লাগলেন এবং তাঁর লোককে বললেন আমার সুটকেশ, বিছানাদি তাঁর বাড়ি নিয়ে যেতে। আমি নিরুপায় হয়েই তাঁর বাড়ি গেলাম। একজন এরকম দাগী অপরাধী বলে পরিচিত ব্যক্তির বাড়িতে থাকায় পজিশনটা কি রকম দাঁড়াবে তাই ভাবছিলাম। ও'র বাড়িতে চৌধুরী সাহেবের সঙ্গে পুনঃ সাক্ষাত হলো। জিকরিয়া সাহেব কামরা ছেড়ে চলে যাওয়ার পর চৌধুরী সাহেবকে বললাম, "আপনি এ কি বাধালেন?

আমি এখানে থাকবো কি করে ?" তিনি জবাব দিলেন, "কি করবো ভাই, আমি তোমার কথা তুলতেই, তোমার আসার ব্যাপারটা ভাল করে জেনে নিয়েই, বাড়ির লোকটাকে নিয়েই দৌড়লো তোমাকে আনতে।" তখন আর ভদ্রলোকের সঙ্গে কোন কথাবার্তা হলো না। সন্ধ্যায় তাঁর বাসায় দেখা করতে ও আড্ডা দিতে এসেছিলেন কালনার ও. সি. ও অন্যান্য পুলিশ অফিসাররা। আমিও কাজে বেরিয়ে গিয়েছিলাম। রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর কথাবার্তা হলো। বললেন, "এখানেই থাকতে হবে, যতবার আসবেন এখানেই থাকবেন।" আমি বললাম, "তা সম্ভব হবে না, অন্যান্য কর্মীও তো আমার সঙ্গে আসবেন।" তিনি বললেন, "ভাবনা কি, তাঁদেরও নিয়ে আসবেন। দেখছেন না, কুলুটের ছেলেরা আছে।" (কুলুটের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার্থীরা তখন ওখানে থেকেই পরীক্ষা দিচ্ছিল।) তারপর শহীদ শিবশঙ্কর চৌধুরী, আমি ও কমরেড চন্দ্রশেখর কোঙার ওখানে উঠি। গঙ্গার ধারেই নবনির্মিত বাড়ি। এখন আছে কিনা জানি না। উপরের তে-তলার একটা কামরা আমাদিগকে দিয়ে দেওয়া হলো। ওখানে থাকতাম ও কাজে গ্রামে ও শহরে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতাম। শহীদ কমরেড আবদুল গফুর আমার কাছ থেকে ডাক পেয়ে বাগ্‌নাপাড়া থেকে আমাদের সঙ্গে এসে যোগ দিতেন। ঐখানেই নৃপেনদাও আমাদের সঙ্গে এসে একদিন ছিলেন। এখানেই বলে রেখে দিই, কিছুদিন এভাবে থাকার পর আমাদের কাজ ফুরলো, আর বুঝতে পারলাম এতজন মানুষ এতদিন থাকা ঠিক হচ্ছে না। জিকরিয়া সাহেব প্রায়ই থাকতেন না। ও'র অনুপস্থিতিতে বাড়ির লোকদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে একদিন আমরা সব চলে গেলাম। ভদ্রলোকের খ্যাতি-অখ্যাতি যাই হোক, আমাদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করেছেন।

কালনা যাওয়া-আসার প্রথম দিকেই আমরা শহীদ শিবশঙ্করের ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সূত্রে ডাঃ সন্তোষ ঘোষ ও তাঁর ভাই সুকুমার ঘোষের সঙ্গে দেখা করি। তাঁরা সহানুভূতি প্রকাশ করলেন ও সমর্থন করলেন, কিছু গাইডেন্‌স্ দিলেন। কিন্তু প্রত্যক্ষ তখন কিছু করতে পারবেন না বলে জানালেন। সম্মেলনের জন্য সন্তোষদা কিছু আর্থিক সাহায্য করেছিলেন। এই সময়ের মধ্যে শহরের গণ্যমান্য অনেকের সঙ্গে আমরা দেখা করেছিলাম। এ'দের মধ্যে কুসুমগ্রামের উকিল হরগোবিন্দ রেজ মহাশয়ের নাম উল্লেখ করতে হয়। তিনি চেনা-পরিচিত মানুষদের ভাল করে বলে দেবেন বললেন। ইতিপূর্বেই আমরা মহকুমা খাদ্য সম্মেলনটি

নাদনঘাটে করবো বলে ঠিক করেছিলাম। নাদনঘাটে আমি আর শহীদ শিবশঙ্কর মন্তেশ্বর গ্রামের নিকট লোহার গ্রামের তালুকদার সেখ সাহেবের দোকানে থাকতাম। তাঁর কাছেই খাওয়া-দাওয়া করতাম। আমি অবশ্য নিজে সে সময়ে এবং পরবর্তীকালে শান্তিপুর নিবাসী কাপড়ের দোকানদার জহীর সাহেবের ওখানে থাকতাম। অনেকদিন ধরে মাঝে মাঝে থাকতে থাকতে 'জহীর ভাই' বলতে আরম্ভ করেছিলাম। আরো অনেকের সঙ্গেই ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। কালনা বা নাদনঘাটে এক নাগাড়ে থাকছিলাম তা নয়। মন্তেশ্বর, পূর্বস্থলী ও কালনা থানার বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে সম্মেলনের প্রস্তুতি করছিলাম, চাঁদাও পেয়েছিলাম এবং সহযোগী কাজ করবার লোকও পেয়েছিলাম। এখানকার ব্যবসায়ীদের মধ্যে অবোধবিহারী পাণ্ডে মহাশয়ের কাছে সাহায্য পেয়েছিলাম। সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে এক প্রতিনিধিমণ্ডলীকে 'জেলা খাদ্য কমিটি'র অন্তর্ভুক্ত করা হলো। এ'দের মধ্যে কংগ্রেসের নৃপেনদা, রামেন্দু ভট্টাচার্য ছাড়াও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ যেমন কুসুমগ্রাম নিবাসী সদ্যপ্রয়াত ডাঃ আবুল হাসনাত প্রমুখ ছিলেন। এছাড়া বিশিষ্ট অন্যান্য ব্যক্তিও ছিলেন। এ'রা মহকুমা সম্মেলনেও উপস্থিত ছিলেন।

আমাদের সকলকেই খুব পরিশ্রম করতে হতো। হাঁটা-চলার আর বিরাম নেই। আর জেলার এক প্রান্ত থেকে আর-এক প্রান্ত পর্যন্ত ছোটাছুটি করতে হয়েছে নেতৃস্থানীয়দের। তখনকার দিনে অধিকাংশই কাঁচা রাস্তা বা আল-পথ ছাড়া রাস্তাবিহীন। সুতরাং বাসে যাওয়া-আসার এলাকা বা পয়েণ্ট খুব কম। কালনা মহকুমায় মন্তেশ্বরে হাঁটতে হতো সবচেয়ে বেশী। সদরে নদীর দক্ষিণে প্রচুর হাঁটতে হতো। কাটোয়া মহকুমায় মাত্র দুটো উপায়--ছোট লাইনের রেল ও বর্ধমান থেকে নতুনহাট পাকা-রাস্তায় বাস। ফলে হাঁটতে কম হতো না। মোটকথা, বাসের সাহায্যে যাতায়াতের সুযোগ খুব কমই পাওয়া যেত। ইতিপূর্বে আমরা ছিলাম ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র এলাকায় সীমিত। আর সংখ্যার দিক থেকে আমাদের শক্তিও ছিল খুব কম। কিন্তু সর্বগ্রাসী খাদ্য-সঙ্কট ব্যাপক এলাকায় ত্বরিত গতিতে আমাদের কাজকর্মের প্রসার বিস্তার ঘটাতে বাধ্য করলো। কাটোয়ায় গ্রামের পর গ্রাম ঘুরছি, এমন সময় হয়তো ছুটে রায়না আসতে হলো। আবার মাঝে কোথায় বাঘাড় অঞ্চলে আসতে হলো। আবার আসানসোল ছুটতে হচ্ছে। এ অবস্থা আমাদের সবারই।

সাধারণ কর্মী ও নেতৃবৃন্দ আমাদের সকলকেই খুব কঠিন পরিশ্রম করতে হয়েছে। কোথাও কোথাও আবার খাদ্য-সংকট এত বেশি যে মুখ ফুটে খাবার কথা বলা যেত না। রায়নায় এই অবস্থাটা হতো বেশি। মনে আছে, বিপদদা কিছু চিড়ে-গুড় রাখতেন, উপরি উপরি দু'তিনদিন এই চিড়ে-গুড় খেয়েই কাটাতে হয়েছে। সহানুভূতিসম্পন্ন মানুষ দু'একদিন অভুক্ত মানুষের ভিড়ের মধ্যে থেকে আড়ালে টেনে নিয়ে গিয়ে খাবার জন্য নিয়ে যেতেন। কিন্তু সে সুযোগও বেশি ঘটতো না। স্থানীয় কমরেডদের অবস্থাও কঠিন। ঘরে চালের জোগাড় থাকলে পাঁচুদাও এক-আধ দিন নিয়ে যেতেন নিজের গ্রামে। একদিনকার কথা মনে আছে। সারাদিন বিভিন্ন গ্রামের মানুষদের সঙ্গে রায়না অফিসে এবং কাছাকাছি গ্রামগুলিতে ছোটাছুটি করে কেটে গেল। অফিসে ফিরে পাঁচুদা বললেন, "চলুন আরও একটু হাঁটাহাঁটি করতে হবে। আজ আমার ওখানেই চাট্টি খাওয়ার ব্যবস্থা করা গেছে।" খাওয়া-দাওয়ার পর টুক্ টুক্ করে ফিরছি, পাঁচুদা খানিকটা এগিয়ে দিতে আমার সঙ্গে আছেন। ঘোর অন্ধকারের মধ্যে এক মেয়ের আওয়াজ, শুধু অন্ধকারকে বিদীর্ণ করে নয় আমাদের হৃদয়কে মোচড় দিয়েঃ "বাবাগো আর পারছি না, আমাদের দু'জনকে তুলে নাও। নিজে না পাই, বাচ্চাটাকেও দু'মুঠো দিতে পারলাম না।" দু'জনেই থমকে দাঁড়িয়ে গেলাম। অন্ধকারে দু'জনে কিছুক্ষণ নীরব থেকে পাঁচুদা বললেন, "চলুন দেখি কি ব্যাপার।" দেখলাম, পুকুরের পাড়ে মা ও মেয়ে এত ক্ষুধার্ত এবং এত দুর্বল যে ভাল করে কাঁদতেও পারছে না। যাই হোক, তাদের দুর্বল কণ্ঠে শেষ পর্যন্ত যা বোঝা গেল, মা মেয়েকে নিয়ে দু'জনে ডুবতে এসেছিল কিন্তু মেয়ের মুখ চেয়ে মনস্থির করতে পারছিল না। বাঁকুড়া থেকে এসেছে। কয়েকদিন অভুক্ত। পাঁচুদা বললেন, "এসো মা আমার সঙ্গে।" আমাকে বললেন, "আজ রাতেই এর কোনরকমে খাওয়ার ব্যবস্থা করতেই হবে।" রাত তখন দশটা। সেই রাতেই পাশের এক গাঁয়ে এক গেরস্তর কড়া নাড়লেন আর নিজের নাম বললেন। দু'জন মহিলা দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন। পাঁচুদা অনশনগ্রস্তদের দেখিয়ে বললেন, "এ'দের খাওয়াতে হবে।" বুঝলাম, ভদ্রমহিলা আমাদের অবস্থা জানেন। বললেন, "তোমরা খেয়েছো তো ?" ইঙ্গিতটা আমাকে দেখিয়েই। পাঁচুদা বললেন, "হ্যাঁ, আমাদের বাড়ীতে খাইয়ে এগিয়ে দিতে এসেছিলাম, এসে এই ফ্যাসাদে পড়লাম।" তারপর এর সঙ্গে যোগ দিয়ে বললেন, "আজ রাতটা এদের খাইয়ে বাঁচিয়ে দেন, তারপর কোথাও কাজে লাগিয়ে দেবার

চেষ্টা করবেন। দিন তিন-চার খেতে পেলেই অল্পবিস্তর কাজ করতে পারবে।” সেই রাত্রে পাঁচুদার আর বাড়ি ফেরা হলো না, অফিসেই থাকতে হলো।

এ ঘটনা বিরল ঘটনা ছিল না। সকলকেই প্রায় এরকম ঘটনার মুখোমুখি হতে হচ্ছিল। মনে পড়ে, নাদনঘাট সম্মেলনের প্রস্তুতির সময় কুসুমগ্রাম থেকে একদিন সাইকেলে ভরদুপুরের রোদে নাদনঘাট আসছি। হয়রান হয়ে এক জায়গায় পুকুর পাড়ে গাছতলায় দাঁড়িয়েছি। পুকুরের জলের চেয়ে গাছপালা বেশি। একটা মেয়ে জলে হাতড়ে শাকপাতা তুলছে। মনে হচ্ছে চেষ্টার তুলনায় শাকপাতা খুব কম পাচ্ছে। ঝোঁকা অবস্থা থেকে একবার মাথাটা তুলে বললো, “মাগো, একটা পুকুরে তিনটি গাঁয়ের লোক পড়লে কি কিছু থাকে? আজ বাচ্চাদের কিছুই দিতে পারবো না।” এই রকম দৃশ্য তো সচরাচর পথে ঘাটে। কলকাতায় যে শোচনীয় দৃশ্য দেখেছি, বর্ধমানে অবশ্য তার চেয়ে অনেক কম।

বর্ধমান শহরে যখন অবস্থাটা অন্ততঃ কিছু আয়ত্তে আনা গিয়েছিল, তখন সংগঠিত প্রয়াসে একটা ধারাবাহিক সাহায্যের ব্যবস্থা করা গিয়েছিল। শহরে সস্তা দরে চালের রেশন কার্ড পঁচিশ হাজারের উপর বিলি হয়েছে। চিনি, কেরোসিন তেল প্রভৃতি ‘ফুড কমিটি’র স্লিপ অনুযায়ী বিতরণ হয়েছে। এই হলো সাধারণ চলতি ব্যবস্থা। তাছাড়া ‘রিলিফ কীচেন’-এর রান্না অন্ন বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই ‘রিলিফ কীচেন’ পরিচালনায় প্রভূত সাহায্য করেছিলেন ‘মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি’। অনশন-অর্ধাশনগ্রস্ত জীর্ণ মানুষ পথে পথে এসে পড়ছেন। বর্ধমান শহরে, স্টেশনে, জি. টি. রোডে—এসব জায়গায় এঁদের জমায়েত দেখা যাচ্ছিল। তাঁদের সোজাসুজি ভাত খাওয়ালে পেটের অসুখে মারা যাবে। অন্য ব্যবস্থা করতে হতো। সুতরাং এইসব স্টারভেশন কেসের অন্য ব্যবস্থা করতে হতো। সদ্যপ্রয়াত কমরেড ডাক্তার শরদীশ রায়, এম. পি. তখন ছিলেন বর্ধমান হাসপাতালের ‘হাউস সার্জেন’। তিনি সমস্ত ব্যবস্থার ভার নিয়েছিলেন। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষও সহযোগিতা করেছিলেন। ওষুধপত্র এবং ভুখা পেটের উপযোগী তরল খাবার আমরা চাঁদা করে ব্যবস্থা করেছিলাম। পরের দিকে রেডক্রশ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান থেকেও পাওয়া গিয়েছিল। অনশন ও অর্ধাশনের জন্য রোগে আক্রান্ত মানুষও এসে পড়ছিল। তাঁদেরও হাসপাতালে ভর্তি করা হচ্ছিল। এঁদের সকলের সেবার জন্য ডাঃ শরদীশ রায়ের নেতৃত্বে মেডিকেল ছাত্রদের নিয়ে স্বেচ্ছাসেবক সংগঠন করা হয়েছিল। অত্যন্ত বেদনাদায়ক অবস্থা ছিল রাস্তায়,

রেল স্টেশনে অনশনে মৃত মানুষের মৃতদেহগুলির। মুসলমান লাশের ব্যবস্থা নিয়েছিলেন 'তজহীজ্ তক্ফীন কমিটি'। হিন্দু সৎকার সমিতিও ভার নিয়েছিলেন।

এখানে বর্ধমান শহরে 'মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি'র এবং সাধারণভাবে 'ফুড কমিটি'র স্বেচ্ছাসেবকদের কাজের কিছু উল্লেখ করা উচিত। প্রথম দিকে স্বেচ্ছাসেবক ও স্বেচ্ছাসেবিকাদের কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছে। প্রথম সরকারের নিকট হতে যেটুকু আদায় করা সম্ভব হয়েছিল সেটুকু মাত্র এই—তাঁরা কিছু সস্তা চালের দোকান খুলবেন। এখানে কিউ করে লাইন বেঁধে লোককে নিতে হতো। দোকানদার যোগসাজসে চাল পাচার করতে না পারে তা লক্ষ্য রাখার জন্য এবং ক্রেতাদের সাহায্য করার জন্য আমাদের স্বেচ্ছাসেবকরা উপস্থিত থাকবেন. সরকারকে এটা মানতে হয়েছিল। কিছু দোকান মেয়েদের জন্য আলাদা করা হয়েছিল। মহিলাদের যে দোকানে দেওয়া হতো সেখানে আমাদের 'মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি'র কর্মীরা ডিউটি দিতেন। এইভাবে যাঁরা এই সব দোকানে ডিউটি দিতেন. তাঁদের কঠোর পরিশ্রম করতে হতো।

শহরে এই রকম অবস্থা চলছে তখন গ্রামে এক কঠিন অবস্থা শুরু হলো। ধানের দাম যত শীর্ষে উঠতে লাগল ততই উচ্চদামে বিক্রয় করবার ইচ্ছা বাড়তে লাগল। যাঁদের বেশী ধান তাঁরা সাধারণতঃ 'বাড়ি' দিতেন। সাধারণ রেট ছিল মনে সওয়া মন অর্থাৎ এক মন ধান নিলে পৌষ-মাঘ মাসে এক মন দশ সের দিতে হতো (এখন অবশ্য সুদের রেট অনেক বেড়ে গেছে।) এবারে ধানের দাম বাড়ায় 'বাড়ি ঋণ' দেওয়া বন্ধ হয়ে গেল। এক মন ধান যদি তিন-চার মন ধানের দরে বিক্রি করা যায় তাহলে মাত্র দশ সের 'বাড়ি'র জন্য 'বাড়ি' দিতে যাবে কেন ? যারই বেশ ভাল রকমে উদ্বৃত্ত থাকে তারই উচ্চদামে বিক্রয় করার লোভ বেড়ে যায়।

হু হু করে ধান বিক্রি হয়ে বেরিয়ে যেতে লাগল। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল বিরাট ও বিপুল পরিমাণে মহাজনরা বাঁধি করছে। এই গতি ঠেকানো একান্ত প্রয়োজন হয়ে দাঁড়াল। এর মধ্যে মুসলিম লীগ মন্ত্রিত্বে অধিষ্ঠিত হয়েই খুব হৈ চৈ করে ডি-হোর্ডিং (বাঁধাই খোলা) -এর কর্মকাণ্ড ঘোষণা করল। এতে গ্রামের বাঁধি ভেঙ্গে মহাজনদের গদিতে বাঁধি মেলো বেশী। গ্রামে উদ্বৃত্তের অধিকারীদের বাঁধি ভেঙ্গে মহাজনদের গোদামে এসে জড়ো হতে লাগলো। আমরা এই সময় 'জেলা ফুড কমিটি'র তরফ থেকে সার্বিক দিক বিচার করে এবং জনগণের দাবি উপস্থিত করে

সরকারকে এক স্মারকলিপি দিয়েছিলাম। তখনকার চীফ সেক্রেটারী আজিজ আহমদ, হাসেম সাহেবকে বলেছিলেন, "জনসাধারণের তরফ থেকে আপনাদের সুরচিত স্মারকলিপি সাইক্লোস্টাইল করিয়ে সমস্ত প্রদেশে ডিভিশনাল কমিশনার, ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট এবং এস ডি. ও.-দিগকে পাঠিয়ে দিয়েছি।" এই দরখাস্তের ফলেই জেলায় জেলায় 'কর্ডন' ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয় এবং অবাধ ধান-চাল রপ্তানির বদলে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু হয়।

এখন আমরা গ্রামে কি করছিলাম তাই আলোচনা করি। সর্বপ্রথম আমাদের রায়নাতেই ডাক দিতে হলো: গ্রাম ও এলাকায় বাড়ির জন্য এবং সস্তায় কৃষি মজুর প্রমুখকে সস্তা এবং ন্যায্য দরে বিক্রির জন্য, ধান বিক্রয় করা ও চালান দেওয়া চলবে না। একদিকে খাদ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে নীচে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও এস ডি. ও. প্রভৃতি অফিসারদের এই একই মর্মে চাপ দিতে লাগলাম। আমরা এক একটি গ্রামে বা এলাকায় কার কাছে কত ধান আছে হিসেব করে ফেললাম এবং সঙ্গে সঙ্গে কে কাকে বাড়ি দিতে পারে এবং দেওয়া উচিত, সেটারও হিসেব করে ফেললাম। কে তাদের জন্য কি পরিমাণ ধানের চাল তৈরী করে খাদ্য কমিটির অনুমোদিত দোকান মারফত বিক্রয় করবে, তাও ঠিক করে ফেললাম। কিন্তু ধান যদি বাইরে বিক্রি হয়ে যায় তাহলে গ্রামের এ ব্যবস্থা সার্থক হবে কি করে? আমরা বললাম, "আমরা লুটপাট বিশৃঙ্খলা তো করবোই না, বরং ঠেকাবো। কিন্তু স্থানীয় কৃষক সমিতি বা খাদ্য কমিটির অনুমতি ব্যতিরেকে কোন বিক্রয় করা চলবে না।" রায়নায় এই আন্দোলন খুব জোরদার হয়েছিল।

আমি তো উপরেই ব্যাখ্যা করেছি একদিকে কংগ্রেসের দুরভিসন্ধিমূলক ধান-চাল লুট করার প্রস্তাবের আমরা বিরোধিতা করতাম। কংগ্রেসীদের উদ্দেশ্য ছিল "লুটেপুটে খাই" আর মোটাসোটা ধানওয়ালাদের কাছে ঘুষ আদায়। এইরূপে সাধারণকে বঞ্চিত করে মুষ্টিমেয় মানুষ কর্তৃক যথেচ্ছ লুটতরাজ করা। এদের আতঙ্কে স্বল্পবিত্তর ধান যাদের কাছে আছে তারাও বিক্রয় করবার চেষ্টা করবে, আর কৃষকরা ধান বাড়ি থেকে বঞ্চিত হবে।

অন্যদিকে আমাদের চেষ্টা ছিল যেমন উপরে বলেছি, কিছুটা ধান বাড়ি দিয়ে অভাব মোচন করে তাঁরা বিক্রয় করতে পারবেন। এই শর্তে তাঁদের ধান আটকে রাখা। উপর্যুপরি র‍্যালিতে আমরা সরকারি অফিসারদের এই পদ্ধতি মেনে নিতে বাধ্য করার চেষ্টা করি। এই সূত্রে আমরা সদরের

এস. ডি. ও-কে সহজপুর হাটতলায় কৃষক সমিতি কর্তৃক আহূত র‍্যালিতে উপস্থিত হতে অনুরোধ করলাম। ইতিমধ্যে বর্ধমান শহরে আমাদের সমর্থনে ঐক্যবদ্ধ জনমত যথেষ্ট শক্তিশালী হয়েছিল। এইরূপ শক্তিকে এস. ডি ও.-কে মেনে নিতে হয়েছিল। তিনি আমাদের প্রস্তাবমতে নির্দিষ্ট তারিখে আসতে সম্মত হন। নির্দিষ্ট দিনে আরও সুনিশ্চিত হওয়ার উদ্দেশ্যে আমি সহজপুর হাটতলা থেকে খুব ভোরে সাইকেলে বেরিয়ে সকালে বর্ধমানে এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করি। তিনি স্বীকৃত কার্যসূচী কনফার্ম করেন এবং বলেন, তিনি মোটরে বেলা দু'টোর মধ্যে হাটতলায় উপস্থিত হবেন এবং সমবেত গ্রামবাসীদের কথা শুনবেন। আমি তৎক্ষণাৎ সাইকেলে সহজপুর হাটতলার উদ্দেশ্যে রওনা হই। তখন সদরঘাটে পুল ছিল না। রৌদ্রে উত্তপ্ত বালির উপর দিয়ে সাইকেলকে টানতে টানতে দামোদর পেরোতে হতো। এই অবস্থায় যাওয়া-আসায় ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হয়ে হাটতলা ফিরলাম। কিন্তু জনসমাবেশ দেখে উৎসাহ-উদ্দীপনায় আমার ক্লান্তি দূর হয়ে গেল। আমাদের বক্তব্য এস ডি ও-কে ভাল করেই বলা হলো। তিনি বললেন, আইনের ক্ষমতা সীমিত, তবুও তিনি যতটা সম্ভব সাহায্য করবেন। এই বিরাট জনসমাবেশেও তাঁকে জনমতের শক্তি বুঝতে হলো। এই শক্তির প্রভাব মালিকদের উপরও পড়লো।

ইতিমধ্যে আর একটি ঘটনা ঘটল যা উল্লেখযোগ্য। আমরা চতুর্দিকে প্রচারে স্থানীয় যানবাহন আটকে দিয়েছিলাম। আমাদের অনুমতি ব্যতিত কোথাও ধানের গাড়ি বের হচ্ছিল না। গ্রামের সঙ্গে ফয়সালা হলে তবেই অনুমতি দেওয়া হচ্ছিল। এখন একটা সমস্যা আমাদিগকে ভাবিত করলো। মাছখাড়া গ্রামের অধিবাসীদের বড় অংশের পেশা গরুর গাড়ীতে মাল বওয়া। প্রধানত ধান-চাল বওয়া। গ্রামের গরুর গাড়ির সংখ্যাও প্রচুর। একই পেশার দরুন তাদের সমবেত শক্তিও গণ্য করার মতো। ধানের মালিকরা তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে না পারেন সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। এই কাজ হাসিল করার জন্য আমাদের একটি বুদ্ধি গজালো। ঐ গ্রামে অর্থাৎ মাছখাঁড়ায় হাটতলার পাশাপাশি গ্রামের কার কার আত্মীয়তা আছে তার তালিকা প্রস্তুত করা হলো। উক্ত তালিকা অনুযায়ী মানুষদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলো। তাঁরা সকলে সমবেত হয়ে চেষ্টায় নামলেন। মাছখাঁড়ার মানুষ ধান-মালিকদের কাজে ধান-মালিকদের সাহায্য না করেন সেরূপ অনুরোধ করা হলো। তাঁরা নিজেরাও গরীব, উদ্দেশ্যের প্রতি সহানুভূতি তাঁদের ছিল সবারই। কিন্তু মাল বওয়াতেই

তাদের রুজি। সুতরাং মাল বইতে অস্বীকৃতি তাদেরও অন্নকষ্ট। তা সত্ত্বেও গ্রামসুদ্ধ মিলে পাশাপাশি গ্রামবাসীদের অনুরোধ রক্ষা করতে সম্মত হলেন। দিনসাতেক ধরে তাঁরা দৃঢ়ভাবে তাঁদের সিদ্ধান্তে অটুট থাকেন। এতেই অনেক কাজ উদ্ধার হয়ে গেল।

এক সময় আমাদের প্রবর্তিত এই বিধি রায়নার আশিটি গ্রাম পর্যন্ত কম বেশী চালু হয়ে গিয়েছিল। আহারবেলমা ইউনিয়নে সহজপুর হাটতলায় এর কেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছিল। দূর দূর গ্রামের মানুষ গাড়িতে ধান বা চাল থাকলে, তার পরিমাণ যত কমই হোক, পথে গ্রামের মানুষ আটকে দিত। সহজপুরে ডাক্তার গঙ্গানারায়ণ হালদার আর রায়নায় কমরেড পাঁচু গুহ—এ'দের অনুমতিপত্র চাওয়া হতো এবং সেই অনুমতিপত্র পেলে তবে গাড়ি ছেড়ে দেওয়া হতো। এমন অবস্থা হয়েছে, যেখানে-সেখানে গাড়ি আটকে দেওয়া হয়েছে, আমাদের কাছে হয় সহজপুরে না হয় রায়নায় খবর এসেছে, যে অবস্থায় থাকি তখনই ছুটতে হয়েছে বোঝাপড়া করে ফয়সালার জন্য। কাকে কতটা ধান বাড়ির জন্য বা বিক্রয়ের জন্য দিতে হবে, তার তো সব তালিকা ঠিক করা হয়ে গিয়েছিল। বাকি তিনি বিক্রি করতে পারবেন, এও ঠিক করা হয়ে গিয়েছিল। এইভাবে বিচার-বিবেচনা করায় এবং জনমতের চাপ সৃষ্টি করতে পারায় অনেক গ্রামেই মিটমাট করা সম্ভব হয়েছিল।

আমাদিগকে কি রকম ছোটাছুটি করতে হচ্ছিল তার দৃষ্টান্ত হিসাবে একটা কাহিনী বলি। কয়েকদিন রায়না হাটতলায় কাটিয়ে আমাতে বিপদদাতে সহজপুর হাটতলায় এলাম। রায়নায় থাকতে দু'দিন আগে এক জায়গায় খাওয়া হয়েছিল—বোধ হয় বোখরার ধনেশ সামন্ত মশায়ের ওখানে। আগের দিন আড়ালে চিড়ে-গুড় খেয়েই কাটিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সদা-সর্বদাই ক্ষুধার্ত মানুষের ভিড়, তার মধ্যে নিজেদের খাওয়ার ব্যবস্থা করা সম্ভব হতো না। কেউ বলছেন তাঁর ধানের ব্যবস্থাটা করে দিতে হবে, কেউ এসেছেন নালিশ করতে—আগে যাঁরা ধান দেবেন বলেছিলেন তাঁরা আর দিচ্ছেন না—বিরতিহীনভাবে এইভাবে চলতে থাকতো, তার মধ্যে নির্লজ্জভাবে আমরা নিজেরা খাই কি করে? রায়না হাটতলা অফিসের ভিতরে ছিটেবেড়ার একটা আড়াল ছিল, সেইখানে চিড়ে-গুড় রাখা থাকতো। হাতের মুঠোয় চিড়ে আর গুড় নিয়ে শুকনো চিড়ে-গুড় মুখে দিয়ে গ্লাসের জল নিয়ে ধীরে ধীরে চিবিয়ে খাওয়া হতো। এদিন আমরা আসবার পথে বললাম, আজ ডাক্তারের ওখানে চাট্টি খেতে হবে।

বেশ কিছুদিন ধরে দিলদরাজ অর্থাৎ উদারহৃদয় ডাক্তারের বাড়ি দল বেঁধে খেয়ে চালিয়েছিলাম। এর কিছুদিন আগে আমরা বুঝেছিলাম এটা ঠিক হচ্ছে না। ডাক্তারের পয়সা তো অফুরন্ত নয়, তাছাড়া মেয়েদের উপরও জুলুম হতো। সেই জন্য চাট্টি করে খাবার ব্যবস্থা করার চেষ্টা করতাম। কিন্তু এ কয়দিন নিয়মিত খেতে পাওয়া যায়নি বা অনশনে কাটাতে হয়েছে। সেইহেতু ডাক্তারের বাড়িতে খাওয়ার খুব আগ্রহ। কিন্তু এসেই দেখলাম কয়েকজন লোক অপেক্ষা করছেন। কয়েক মাইল দূরে বহরমপুর গ্রামে স্থানীয় জমির মালিকের ধান-চালের গাড়ি আটকানো হয়েছে। ওরা বলেছে পুলিশে খবর দেবে। খাওয়ার কথা শিকেয় উঠলো। দু'জনে, আমি আর বিপদদা, ওদের সঙ্গে তখনই ছুটলাম বহরমপুর। ধানের মালিক মুসলমান। গ্রামে হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই বাস। আমাদের নেতৃত্বে যাঁরা সক্রিয় হয়েছেন, তাঁদেরও একটা বড় অংশ মুসলমান। এ'রা সব আমাদের নিয়ে একজনের বৈঠকখানায় ওঠালেন। তিনি হিন্দু। কথাবার্তা আরম্ভ করা গেল। ও'রা কিছু অবসর চাইলেন, সকলকে জড়ো করার জন্য। আর বোধহয় নিজেরা চাট্টি খাওয়ার জন্য। কিন্তু আমাদের খাওয়ার কথা কেউ তুললেন না। ভাবটা এই যেন আমরা খেয়েই এসেছি। অথচ খিদেয় আমাদের চোখে অন্ধকার দেখার মতো অবস্থা হয়েছে। সামনে ডোবাটায় জল খুব কম, ছেলেরা কাদায় খেলছে। বিপদদা বললেন, "কিরে, আমাদের জন্যে মাছ ধরছিস বুঝি? মাছ পাবি না। দরকার নেই, আমাদের ডাল-ভাত হলেই চলবে।" অর্থাৎ বিপদদা ভাতের আবেদনটা দাখিল করার জন্য একটা পদ্ধতি বের করলেন। সামনে যাঁরা ছিলেন তাঁরা চমকে উঠলেন। তাঁরা বললেন, "সে কি, এখনও খাননি?" যাই হোক, তাঁরা তখনই খাওয়ার ব্যবস্থা করলেন। বুঝলাম, কোন বাড়ির কেউ কেউ এ বেলা উপোস গেলেন। যখন কিছু লোক আরও এসে উপস্থিত হলেন, তখন আলোচনা আরম্ভ হয়ে গেল। মুসলমানরা বললেন, "এখন খানিকটা টলেছে। আমাদের মধ্যে বিভেদ আনতে চাইছে। বলছে, আমি মুসলমানদের দিই, হিন্দুরা তাহলে পাবে কোত্থেকে? ধান-চাল তো ওদেরই ঘরে আছে, আর কারও ঘরে নাই। আমরা বলে এসেছি সকলকে যদি না দাও আমরা নেব না। সকলকে দিতেই হবে।" এমন কথাও নাকি বলছিল যে হিন্দুরা হিন্দুর কাছ থেকে নিক্। ইঙ্গিতটা আমরা যাঁদের বৈঠকখানায় বসেছি তাঁদেরই উপর। এককালে তাঁদের অবস্থা ভাল ছিল, সেই ভাল অবস্থার সময়কার ব্যবহারে হয়তো কিছু অভিযোগও থাকতে

পারে। যাই হোক, এখন তাঁদের সে অবস্থা নেই, তাঁরা নিজেরাই প্রার্থী। সুতরাং এ ইঙ্গিতের কোন অর্থ নেই। আমরা মুসলমান গ্রামবাসীদের স্ট্যাণ্ড সমর্থন করলাম। বললাম, এই একতায় চিড় ধরতে দেবেন না। আমরা ধানের মালিকের সঙ্গে দেখা করলাম। তাঁকে বোঝালাম। ন্যূনপক্ষে কি পরিমাণ ধানের দরকার সেটা হিসেব করে ফেলেছিলাম। তাঁর মজুত ধান এর কয়েকগুণ বেশি। বললাম, "এই একটা অংশমাত্র দিয়ে বাকি তো বিক্রি করতে পারেন। আমরা কোন বাধা দেব না। বরং আর কোথাও বাধা না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখবো।" শেষে তাঁরা রাজি হ'লেন। অন্যত্র আরও অভিজ্ঞতা তো হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত সমাধান হলো। জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে এখানে অভাবী মানুষের যে ঐক্য দেখলাম তা আমরা সর্বত্রই দেখেছি সে সময়। এই ঐক্যই সেই সময় আমাদের ও জনগণের মনোবল উঁচু করে রেখেছিল।

রায়না থানার নেতৃস্থানীয় কর্মী ডাঃ গঙ্গানারায়ণ হালদার আর পাঁচুদা (কমরেড পাঁচু গুহ) ছাড়া আরও অনেকে ছিলেন। কমরেড কালী-পদ মণ্ডল, কমরেড রামসহায় ভট্টাচার্য রায়না কেন্দ্রে সক্রিয় কর্মী ছিলেন। এছাড়া আরও অনেকে কাজকর্ম করতেন। রসিকখণ্ড, সহজপুর প্রভৃতি পাশাপাশি গ্রাম নিয়ে এক সবল সংগঠন গড়ে উঠেছিল। কেন্দ্র ছিল হাটতলা। এ শুধু ঐ এলাকার কেন্দ্র নয়, খাদ্য আন্দোলন চলাকালে রায়না থানার এক বিস্তৃত এলাকার কেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কমরেড কুশধ্বজ পৈলে, আব্দুস সালাম চৌধুরী, কমরেড দায়ুদ, কমরেড তারা চক্রবর্তী, কমরেড শঙ্কর মজুমদার প্রমুখ অনেক কমরেড তখন ছিলেন। কাজ পড়লে বা মিটিং ডাকলে বেশ বড় সংখ্যায় সব জড়ো হতেন। অনেকের চেহারা টক্ টক্ করে চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু দুঃখের বিষয় নাম মনে পড়ছে না। বিস্মৃতি বড় বেদনাদায়ক, যাঁদের সাহায্যে স্মৃতিকে জাগানো যেত তাঁরাও বেশীর ভাগই আর জীবিত নেই।

কাজের চাপও ছিল খুব বেশি। বেশ কিছুদিন ধরে ছিল রাত-পাহারা। শুধু গ্রামে নয়, রাস্তায় এমন কি গুরুত্বপূর্ণ 'নিগের' মোড়ে মোড়ে। আমরা নেতৃস্থানীয় কেউ যেখানেই থাকতাম, রাত্রে দু'-একবার ঘুরে কর্তব্যরত স্বেচ্ছাসেবকদের সঙ্গে দেখা করতাম, কিছুক্ষণ বসে বসে বিভিন্ন গ্রামের আন্দোলনের অবস্থা ও তার সম্প্রতিতম খবর নিয়ে আলোচনায় বসতাম।

আমাদের এক বড় সমস্যা ছিল 'মাদানগরের' জমা ধানের গোলা নিয়ে। মাদানগরে দেওয়ার প্রশ্ন তো ছিলই, বিস্তৃত এলাকায় অভাবের কিছু অংশ মেটানোর জন্য স্বভাবতঃই সকলের লক্ষ্য ছিল এই ধানের উপর। ছ' ফুট সাত ফুট তারের বেড়া দিয়ে ঘেরা ছিল 'দাঁ' মশাইয়ের এইসব ধানের গোলা! কার কতো গোলা ছিল—৩০-৪০-৫০--এখন মনে নেই। দু'ধারে তারের বেড়ার মাঝে ছিল পথ। এই পথ দিয়ে যেতে যেতে গোলাগুলি দেখতাম।

এ'রা সাধারণতঃ ধান বিক্রয় করতেন না। নিজেদের শত শত বিঘার জমির ধান ছাড়া 'বাড়ির ধান' মজুত হতে থাকতো। অনেক দিনের সব পুরনো মড়াই দেখেছি। বছরের পর বছর মড়াই খোলা হয়নি, শেওলা পড়ে গেছে, এমন মড়াই দেখেছি। কিছু কিছু মড়াইয়ের গায়ে জল ঢুকে ধানের আঁকুড় বেরিয়ে গেছে। আমরা বার বার মালিকদের সাথে কথা বলেছিলাম। ধানের দর হু হু করে বাড়ছে, সুতরাং মালিকদের বিক্রয় করার লোভ প্রচুর। কিন্তু চতুর্দিকে গ্রামের মানুষ কেউ গাড়ি বেরোতে দেবেন না। রায়না থানার কংগ্রেসের নেতা তখন লুটের আওয়াজ দিয়েছেন। কিছু সমাজবিরোধীদের তাঁরা রিক্রুট করতে পেরেছেন।

কিন্তু মানুষ আমাদের কাছে শুনছিলেন এবং নিজেও বুঝছিলেন লুঠতরাজ, বিশৃঙ্খলায় আরও ধান বিক্রি হয়ে যাবে ও তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যাবে। শৃঙ্খলিত ব্যবস্থায় মালিকদের সঙ্গে সমঝোতা করে বা সমঝোতা চাপিয়ে দিয়ে একটা নিয়মানুবর্তিতা রেখে ধান বিতরণ করলে সেটাই সুষ্ঠু ব্যবস্থা হবে। মাদানগরের ধান আমরা অনেক দিন আটকে রাখতে পেরে-ছিলাম। কিছু কিছু মালিক আমাদের কথামতো ধান দিয়েও ছিলেন। কিন্তু যাঁদের খুব বেশি ধান ছিল স্বাভাবিকভাবেই তাঁদের উপরেই আমাদের ও জনসাধারণের দাবি ছিল বেশি। এই দ্বন্দ্বের মধ্যে সরকারী আমলাদের যোগসাজসে তাঁরা ধানের মোটা অংশই বার করে নিয়ে যেতে পারলেন। ১৯৪২ সাল বা ১৩৪৯ সালের আশ্বিনে প্রবল ঝড় হয়। সেই ঝড় বর্ধমানের উপর দিয়েও বয়ে গিয়েছিল এবং কিছু কিছু ক্ষতিও হয়েছিল। কিন্তু দক্ষিণের মেদিনীপুরের বিরাট অংশ বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল। ১৩৫০ সালে রোপণের জন্য মেদিনীপুরে বীজ ধানের প্রয়োজন হয়ে পড়ল খুব বেশি। গণ-আন্দোলনের চাপে সরকার থেকে বীজ সংগ্রহের চেষ্টা হয়। উদ্বৃত্ত ধান বর্ধমানেই বেশি পাওয়া সম্ভব। এই কারণে সরকারের দৃষ্টি পড়ল বর্ধমানে। মাদানগরের ধান পুরনো। ধানের বীজ হিসাবে কোন মূল্যই

ছিল না। সরকারী অফিসারদের সঙ্গে যোগসাজসে আচম্বিতে সশস্ত্র রিজার্ভ ফোর্সের এক বাহিনী ও লরী নিয়ে গিয়ে সরকারী অফিসাররা এই ধান নিয়ে আসেন। এই আচম্বিতে আক্রমণের জন্য আমাদের সংগঠন উপযোগী ছিল না ও প্রস্তুত ছিল না। এইভাবে মালিকরা তাঁদের কাজ অনেকখানা হাসিল করতে পারলেন। কিন্তু এও সত্য, এর পূর্বেই আমরাও অনেকখানা আদায় করে নিতে পেরেছিলাম ও সার্থক হয়েছিলাম।

ইতিপূর্বেই বলেছি, জেলার সর্বত্রই আমরা এই ধরণের কাজে নিযুক্ত ছিলাম। অবশ্য বিনয়দাকে যেহেতু বোম্বাইতে পার্টি কংগ্রেসে যেতে হয়েছিল, সংকটের আবর্তের ঘোরতম অবস্থার সময় জেলায় থাকতে পারেন নি। ফিরে এসেই বর্ধমান শহরে ও রায়নায় আমাদের সঙ্গে যোগ দিলেন। একসঙ্গে আমরা সুকুর প্রভৃতি কয়েকটি গ্রামে ঘুরলাম এবং বৈঠক মাধ্যমে আমাদের প্রচলিত রীতিতে যাদের আছে, যাদের নাই তাদের মধ্যে একটা দেওয়া-নেওয়ার ব্যবস্থা করলাম। সুকুরে বৈঠকের সময় একটা জিনিস দেখলাম যা চিরকাল আমার মনে রয়ে গেছে। সভা যখন শেষ করে এনেছি তখন একজন বিনয়দাকে বলে উঠলেন, “আপনারা তো কেবল গরীবের জন্য বলছেন। আমাদের ধনীদের অসুবিধার কথা বলছেন না কেন ?” গ্রাম থেকে ফেরার সময় সভার সংগঠক আমাদের বন্ধু গ্রামেরই অধিবাসী বিভূতি তা মশাইকে জিজ্ঞেস করলাম, “উক্ত ভদ্রলোকের জমি কত ?” তিনি বললেন, “কতই হবে, ১৪-১৫ বিঘা হবে।” গ্রামে দারিদ্র্যের মধ্যে কত কষ্টে মানুষ বেষ্টিত থাকে। এর মধ্যে সামান্য কিছু সৌভাগ্যে থাকলে মানুষ নিজেকে ধনী ভাবে!

রায়নায় সবচেয়ে বেশি পরিশ্রম করতে হয়েছে এবং সাফল্য অর্জিত হয়েছে। এর পরেই মঙ্গলকোট কিছু দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কমরেড দাশরথি চৌধুরী সহকর্মীদের নিয়ে কয়েক জায়গায় উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেন। চৈতন্যপুরকে ভাঙার মতো শক্তি তখন আমাদের ছিল না। তবু এখানেও কিছু সাফল্য অর্জিত হয়। বর্ধমান সদরের বেলকাশ ছাড়া সব অঞ্চলেই কিছু না কিছু কাজ হয়েছে। কিন্তু বাঘাড় অঞ্চল এক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সেদিন যাঁরা সক্রিয় ছিলেন—তালিতের কমরেড ধর্মদাস মিশ্র, কমরেড গঙ্গাধর ভট্টাচার্য, শিমডালের কমরেড অজিত সেন—কেউই জীবিত নেই। কমরেড ধর্মদাস ক্যানেল আন্দোলন থেকে শুরু করে পঞ্চাশ দশকে মৃত্যুর দিন পর্যন্ত বিরতিহীনভাবে সক্রিয় ছিলেন। মনে আছে, খাদ্য আন্দোলনের সময় একদিন ধান আটকিয়ে রেখে সাইকেলে করে রাত্রি

একটার সময় আমার কাছে বর্ধমান এসেছিলেন (পরে এর সমাধান সম্ভব হয়েছিল কিন্তু ধর্মদাসের সময়োচিত হস্তক্ষেপের ফলে)। গলসী থানাতেও একাংশে কিছু বোঝাপড়া করে আমরা সমাধান করতে পেরেছিলাম।

বর্ধমান শহরে আমাদের কাজের বর্ণনা আগেই বলেছি। 'ফুড কমিটি'র সংগঠনের ব্যাপারে সাধারণের সহযোগিতায় গভর্নমেন্টের সঙ্গে বোঝাপড়া হয়ে যায়। আমাদের আন্দোলনের ফলেই নীতি হিসাবে খাদ্য কমিটির সংগঠনের সিদ্ধান্ত গভর্নমেন্ট মেনে নিয়েছে। আমাদের 'জেলা খাদ্য কমিটি'তে বর্ধমানের মহারাজ প্রেসিডেন্ট হিসাবে ছিলেন। এখন ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটকে ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসাবে নিতে হলো। বর্ধমান সদর মহকুমা ফুড কমিটিতে আমি ছিলাম সম্পাদক। কমরেড হরেকৃষ্ণ কোঙারও কমিটিতে সক্রিয় ভূমিকায় ছিলেন। সরকারের সঙ্গে কথা বোঝাপড়ায় বোঝা গেল কাজের সুবিধার জন্যই এস. ডি. ও.-কে সভাপতি হিসাবে নেওয়া দরকার। ইতিপূর্বেই জনদরদী স্বনামখ্যাত ডাঃ অহিভূষণ মুখোপাধ্যায়কে সভাপতি করেই 'ফুড কমিটি' গঠিত হয়েছিল। তিনি আমার অনুরোধেই রাজী হয়েছিলেন। তাঁকে গিয়ে অবস্থাটা বললাম। তিনি একটুকুও ক্ষুণ্ণ হলেন না। বললেন, "আসল তো দরকার কাজ। এই দুর্ভিক্ষ-সংকটে মানুষকে যতটুকু সাহায্য করতে পারা যায়, সেইটিই দরকার। আমি তো পদাধিকারী হয়েও কোথাও থাকতে চাই না। তুমি বলেছিলে বলে রাজি হয়েছিলাম। এই সুযোগে যদি অব্যাহতি পাই ভালোই।" তিনি প্রয়োজনীয় একটা সরল পদত্যাগপত্র আমার হাতে দিলেন। পরে একই রূপ অনুরোধ নিয়ে আমাকে জ্ঞানবাবুর (শ্রীজ্ঞানদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, বর্ধমান টাউন ফুড কমিটির প্রেসিডেন্ট) কাছে যেতে হয়েছিল। তাঁকেও বললাম, সরকারী সার্কুলার অনুযায়ী আনুষ্ঠানিক সরকারী স্বীকৃতির জন্য ডিস্ট্রিক্ট জজকে সভাপতি করতে হবে। তিনিও তৎক্ষণাৎ রাজী হয়ে গেলেন এবং অনুরূপ মন্তব্য করলেন, তবে একটু সরসভাবে। আর আমাদের সঙ্গে কথাবার্তার যে রীতি তিনি গ্রহণ করেছিলেন সেইভাবে একটি ইংরেজি কবিতা উদ্ধৃত করে আমাদের শুভ ইচ্ছা জানালেন। কবিতাটির শব্দ মনে নেই, কিন্তু ভাবার্থ মনে আছে। ভাবার্থ—"যে হাওয়া এসেছে তাকেই অভ্যর্থনা করে নাও, তাকেই অনুকূল করে পাল তুলে দাও, কামনা করি যাত্রা শুভ হবে।"

আগেই বলেছি টাউন কমিটির সেক্রেটারী ছিলেন কমরেড ভুজঙ্গ-ভূষণ সেন। এ'র সঙ্গে আমাদের পরিচয় বহুদিনের, কারণ তিনি

ছিলেন একজন জেলার পুরনো কংগ্রেস কর্মী। ভাল করে সাহচর্য্য ও ঘনিষ্ঠতা হলেও, ত্রিশ দশকের শেষ ক'টা বছরে সদর মহকুমার কংগ্রেস কমিটি দখলে আনার জন্য বামপন্থী জোট আমরা করেছিলাম, পূর্বেই উল্লেখ করেছি। এই সময় কমরেড ভুজঙ্গভূষণ সেনের সঙ্গে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হয়ে যায়। একথাও পূর্বে বলেছি যে কমরেড হরেকৃষ্ণ কোঙার মহকুমা কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক হন। বিনয়দা, কালো (শহীদ শিবশঙ্কর চৌধুরী), কমরেড অজিত সেন প্রমুখ সক্রিয় সদস্য ছিলেন। বামপন্থী কংগ্রেসীদের তরফ থেকে 'সংবাদ' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা বার করা হয়। এই 'সংবাদ' পত্রিকায় সে সময় আমাদের খুবই সাহায্য হচ্ছিল। কমরেড ভুজঙ্গ-ভূষণ সেন ছিলেন এই পত্রিকার সম্পাদক। প্রায় একাই তিনি এর সব দায়িত্ব বহন করতেন। তিনি বি. এ. পাশ করে আয়ুর্বেদ পড়েন এবং শেষ পর্যন্ত পেশাগতভাবে কবিরাজ হন। পেশায় তাঁর আয়ও ছিল ভাল। বর্ধমান শহরে কালীতলার কাছে বি. সি. রোডের দক্ষিণ ধারে তাঁর বড় কবিরাজি চেম্বার ও ঔষধালয় ছিল। এই দোকানটি ক্রমোত্তর বামপন্থী রাজনীতির একটি কেন্দ্র হয়ে দাঁড়াল। তখন সকলেরই সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা, কিন্তু কমরেড অশ্বিনী মণ্ডল তাঁর নিকটতম। এই সময় তিনি সিডনি এবং বিয়েট্রিস ওয়েবের 'সোভিয়েত কমিউনিজম্ অর এ নিউ সিভিলিজাশন্ ?' বইখানি পড়েন। তিনি 'ইমোশন্যাল' প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। এর থেকে 'ফ্রেণ্ডস অব দি সোভিয়েত ইউনিয়ন' সংস্থার প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ সম্পাদকের দায়িত্ব নেওয়া বেশিদিন সময় লাগেনি। শীঘ্রই তিনি পার্টি-সদস্য হয়ে যান। পার্টিতে আসার পর তাঁর কাজ আরও বেড়ে যায়। খাদ্য আন্দোলনের সময়ে খাদ্য ও রিলিফের কাজে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিয়োজিত করেন। শেষে দোকান লাটে ওঠে। সাইন বোর্ড ও দোকানের জিনিসপত্র বি. বি. ঘোষ রোডের উপর নিজের বাড়িতে স্থানান্তরিত করেন। সেখানেও কি ব্যবসা করতে পারতেন ?

অভাবী মানুষের অভাবের তাড়নায়, তাঁদের রিলিফের চেষ্টায়, আমাদের সকলের মতো তাঁকেও ঘরছাড়া হতে হয়েছিল, অর্থাৎ বর্ধমানের রাজপথ ও অলি-গলিতে ঘুরতে হতো। স্বভাবতঃই পেশায় ভাঁটা পড়ল। নিতান্ত যাঁরা নাছোড়বান্দা তাঁরাও বাড়ি পর্যন্ত বার বার ধাওয়া করে বিফল মনোরথ হলেন। এর ফল যা হয় তাই হতে লাগল। সংসার যাত্রায় বিশেষ কষ্ট হলো। ভাগ্যে মাথা গুঁজবার জায়গা বাড়িটা করা ছিল! তবুও কমরেড ভুজঙ্গভূষণ সেন অন্য সকল সারাক্ষণের কর্মীদের মতোই

আত্মনিবেদিত হয়ে কাজ করতে লাগলেন। আমাদেরও খুব মানসিক কষ্ট হতো, যেমন এ রকম অন্যান্য ক্ষেত্রেও হতো। শেষে ফুড কমিটির ব্যাপার থেকে সরে আসার পর আমরা তাঁকে হোল টাইমার থেকে পার্ট টাইমার-এর ভূমিকা গ্রহণ করতে বললাম এবং কাশেমনগর স্কুলে তিনি শিক্ষকের পদ গ্রহণ করলেন। পরে সেখান থেকে তিনি হাটগোবিন্দপুর ইউনিয়নের অন্তঃস্থ গ্রাম রাইপুর স্কুলে যোগদান করলেন। তবুও তিনি জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত পার্টির কিছু না কিছু কাজ করে গেছেন এবং পার্টি-সদস্যের কর্তব্য পালন করে গেছেন।

এই সময় টাউন ফুড কমিটির নির্বাচিত সক্রিয় সহ-সভাপতি ছিলেন বর্ধমানের স্বনামখ্যাত উকিল, জনাব গোলাম মর্তুজা। পরে জেলা জজ্‌কে সভাপতি করতে হয়। আর একজন সহ-সভাপতি ছিলেন বর্ধমানের পৌর-সভার বহু পুরাতন জনপ্রিয় সদস্য স্বনামখ্যাত উকিল গিরীন্দ্রনাথ চট্টো-পাধ্যায়। সম্পাদকের সঙ্গে সদা-সর্বদাই কাজে নিযুক্ত ছিলেন যেসব পদাধিকারী তাঁরাও বর্ধমানের সুপরিচিত বিশিষ্ট জনদরদী মানুষ। যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন সৈয়দ হেসামুল হক্‌ (ওরফে নসির সাহেব)। সহ-সম্পাদক ছিলেন অমেয় প্রকাশ নন্দে ও মথুরানাথ ঘোষ। অমেয় প্রকাশ নন্দের পরিচয় আগেই দিয়েছি। মথুরানাথ ঘোষ ছিলেন কংগ্রেসের পুরাতন কর্মী। উপরে বর্ণিত যেসব যুব সম্মেলনে আমাদের পার্টির উদ্ভব তার অন্যতম নেতৃস্থানীয় উদ্যোক্তা ছিলেন শ্রদ্ধেয় মথুরাদা। তার আগেই তিনিই ১৯৩০-৩২ এর আন্দোলনে কারাবরণ করেছিলেন। তিনি সাংসারিক প্রয়োজনে প্রথমে মিউনিসিপ্যাল স্কুলের শিক্ষক হন। পরে বর্ধমান প্রেসের স্বত্বাধিকারী হয়ে মুদ্রণ ব্যবসায় নিযুক্ত হন। কিন্তু স্কুলের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন নি। মিউনিসিপ্যাল স্কুলের গভর্নিং বডির তিনি ছিলেন সেক্রেটারী। স্পোর্টসম্যান হিসাবেও তাঁর খ্যাতি ছিল। ফুটবল খেলায় নাম ছিল। তিনি বর্ধমানের সমস্ত খেলার ক্লাব বা যুবসংঘ প্রভৃতির সঙ্গে বরাবর যোগাযোগ রাখতেন। এই ভূমিকাতেই তাঁর উপরে উল্লিখিত 'ইয়ংমেনস্‌ মুসলিম এ্যাসোসিয়েশন'-এর সঙ্গে সংযোগ ছিল। তাঁর জনপ্রিয়তা ও দরদী স্বভাব সহজেই তাঁকে ফুড কমিটিতে নিয়ে এসেছিল। সৈয়দ হেসামুল হক্‌ বর্ধমানের সুপরিচিত জনদরদী নাগরিক। এক সময়ে বর্ধমানে সকল শুভ প্রচেষ্টায় কর্তব্যের আহ্বানে তাঁকে জড়িয়ে পড়তে হয়েছে। উপরিউক্ত টাউন ফুড কমিটির সকল পদাধিকারীর মধ্যে একমাত্র

তিনিই জীবিত আছেন। বয়স আশি বছরের ওপর, এখন অবশ্য অবসর গ্রহণ করতে হয়েছে।

ফুড কমিটি আন্দোলনের মধ্য থেকে শহরে পার্টি অনেক দরদী সমর্থক পেয়েছিল। এখানে শাহচেতনের প্রয়াত সেখ এলাহির নাম প্রথমেই নিতে হয়। তিনি যতদিন শারীরিকভাবে সবল ও সক্ষম ছিলেন, ততদিন শহরের প্রতিটি কাজে তিনি পার্টির প্রদত্ত দায়িত্ব গ্রহণ করতেন ও পালন করতেন। পরে তিনি সান্নিপাত রোগে শয্যাশায়ী হন ও মারা যান। পাড়ায় পাড়ায় রিক্সা শ্রমিক ও বিড়ি শ্রমিক কমরেড, 'মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি'র কর্মী, অনেকেরই পার্টির সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক হয়। এই সম্পর্ক পরে নির্বাচনাদিতে আমাদের যথেষ্ট সহায়ক হয়েছিল।

ফুড কমিটি আন্দোলনে একটি বড় ঘটনা হচ্ছে দ্বিতীয়বারের পদাধিকারী ও কর্মপরিষদ নির্বাচন। প্রথমবারের নির্বাচন হওয়ায় এক এক পাড়ায় যখন ফুড কমিটি তৈরী হয়, সেই সময়ই তাঁরা তাঁদের শহর কমিটিতে তাঁদের প্রতিনিধি নির্বাচন করে দেন। উপরের বর্ণনায় আমরা জনগণের শত্রুদের বিরতিহীন বিরোধিতার কথা লিখিনি। সব মনেও নেই। আর এখন সংশ্লিষ্ট যাঁরা বলতে পারতেন তাঁরাও বেঁচে নেই। হিন্দু মহাসভার কাণ্ডারীরাই বিরোধিতায় হৈ চৈ করতেন বেশি। কিন্তু তাঁদের কর্মক্ষমতার দৌড় বেশি নয়, উৎকট চিৎকারটা কিছু বেশি। তাঁদের প্রচারে কেউ কানও দিত না। তবে 'বার এ্যাসোসিয়েশন্'-এর অনেক উকিল আমাদের সঙ্গে থাকা সত্ত্বেও এক গণ্য অংশের বিরোধিতার সম্বন্ধে আমাদিগকে কিছু ভাবতে হয়েছিল। যে ধরনের কমিটি আমরা করেছিলাম, সামগ্রিক জনগণের কমিটি, তাতে শহরের শিক্ষিত মহলের এরকম একটা অংশ আমাদের বিরোধিতায় থাকবেন এটা বাঞ্ছনীয় নয়। তাঁদের সংখ্যার কথা নয়, গুণগতভাবে তাঁদের একটা পরিচয় নাগরিক জীবনে থাকে। তাঁরাই বা বিরোধিতা করবেন কেন? আমরা তাঁদের সমর্থন অর্জনের জন্য সক্রিয় এক পদ্ধতি গ্রহণ করলাম। উপরে বলেছি, আমরা কেমন করে প্রথিতযশা উকিল শ্রীদিবাকর কোঙার মহাশয় এবং তাঁর মাধ্যমে উকিল মহলের গণ্যমান্য অনেকের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম। কিছু উদ্দেশ্যমূলক বিরোধী প্রচারে তাঁদের মধ্যে বিভ্রান্তি ঘটেছিল। আলাপ-পরিচয় হতে তাঁদের কাছে সব পরিষ্কার হয়ে গেল। এর জন্য দিবাকরবাবুই বিশেষ মনোযোগ দেন এবং শ্রম স্বীকার করেন। তাছাড়া টাউন কমিটির প্রেসিডেন্ট

শ্রীজ্ঞানদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ও যথেষ্ট সাহায্য করেন। এরূপ চারিদিকের প্রয়াসের ফলে 'বার এ্যাসোসিয়েশন্' তাঁদের প্রতিনিধি দেন। এখন বিরোধী থাকলেন হিন্দু-মহাসভার কয়েকজন (সকলে নয়) এবং শহরের মুসলিম লীগের কিছু নগণ্য ব্যক্তি। এ'রা মিলে-মিশে যতটুকু ক্ষমতা তার চেয়ে বেশি চিৎকার কোলাহলে আসর জমাবার চেষ্টা করতেন।

শহর ফুড কমিটির নির্বাচন প্রায় একটা সাধারণ নির্বাচনের ব্যাপার হয়ে গেল। এক একটি মহল্লায় কমিটি হয়ে হয়ে শেষ পর্যন্ত গোটা শহরটিতে ৫৩টি 'মহল্লা ফুড কমিটি' গঠিত হয়েছিল। 'শহর কমিটি' গভর্নমেণ্টের কাছ থেকে যে মাল পেতেন ৫৩টি মহল্লায়, জনসংখ্যা অনুযায়ী ভাগ করে দিয়ে দিতেন। পারিবারিক রেশন কার্ড দিয়ে নিয়মদস্তুর ব্যবস্থা ছিল। এই কার্ড-হোল্ডাররাই পাড়ায় পাড়ায় নির্বাচক। বিরোধী পক্ষেরা কিছু কিছু পাড়ায় ব্যক্তিগত অসন্তোষের সুযোগ নিয়ে দলবৃদ্ধির চেষ্টা করতেন। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল কমিটিগুলি দখল করা এবং প্রতিনিধি নির্বাচনের সুযোগ নিয়ে শহর কমিটি দখল করা। আসল উদ্দেশ্য ছিল লুটেপুটে খাওয়া! দু'চারটে মানুষকে বিভ্রান্ত করে তাঁদের সঙ্গে যুক্ত করতে পেরেছিলেন। ৫৩টি মহল্লায় প্রত্যেকটি সভাতে আমাদের যোগ্য কমরেডরা উপস্থিত থেকে ফুড কমিটির তখনকার পদাধিকারী ও প্রতিনিধিদের অনুকূলে সাফল্য অর্জন করেন। কমরেড হরেকৃষ্ণ কোঙারকে এবং কমরেড ভুজঙ্গভূষণ সেনকে প্রায় প্রত্যেকটি সভায় বক্তৃতা দিতে হয়। আমাকেও মহল্লা ঘুরে ঘুরে যথেষ্ট খাটতে হয়। প্রত্যেক মহল্লাতে শ্রমিক ও গরীব মানুষ দল বেঁধে আমাদের পক্ষে ছিলেন। আমাদের সমর্থক কর্মীরা অকাতর পরিশ্রম করেছিলেন। প্রায় সবক'টি মহল্লাতেই আমরা জয়ী হলাম।

গুজব উঠল যে, নির্বাচনের দিন মুষ্টিমেয় বিরোধীরা অসন্তুষ্ট ব্যবসায়ীদের সাহায্য নিয়ে টাউন ফুড কমিটির নির্বাচনের সভায় বাইরে থেকে গণ্ডগোল করতে পারে। জনগণের যে শক্তি আমরা সংগঠিত করতে পেরেছিলাম তাতে তারা এরূপ উদ্যোগে সাহস করবে বলে বিশ্বাস করিনি। তবুও আমরা সভা যাতে নির্বিঘ্নে চলতে পারে তার জন্য স্বেচ্ছাসেবক নিয়ে গঠিত গার্ড-এর ব্যবস্থা করলাম। বিনয়দা এর নেতৃত্ব দিলেন এবং প্রবেশমুখে দাঁড়িয়ে বিধি-ব্যবস্থা করতে লাগলেন। কমরেড হরেকৃষ্ণ, ভুজঙ্গ সেন ও আমি সভার ভিতরে থাকলাম। সভা অনুষ্ঠিত হলো ছুটির দিনে সি. এম. এস. স্কুলে। বিরোধী পক্ষের চিৎকার

হৈ-হামারীর ফলে এস. ডি. ও. উপস্থিত ছিলেন। তিনি অবশ্য মহকুমা ফুড কমিটির প্রেসিডেন্ট হিসাবে পদাধিকারবলেই উপস্থিত থাকতে পারতেন, কিন্তু প্রশাসনের প্রতিনিধি হিসাবেও তাঁকে থাকতে হয়েছিল। জেলা ফুড কমিটির সেক্রেটারী হাসেম সাহেব, মহকুমা ফুড কমিটির সেক্রেটারী হিসাবে আমি—টাউন ফুড কমিটির বাইরের এই দুইজন ছিলাম। কমরেড হরেকৃষ্ণ নিজে মহল্লার প্রতিনিধি ছিলেন।

আমাদের সংগঠিত শক্তি দেখে বিরোধীরা বিশেষ কিছু করতে সাহস করেন নি। দু'একটা আনুষ্ঠানিক প্রতিবাদ ব্যক্ত করেছিলেন। তার যথাযথ উত্তর দেওয়া হলো। তারপর নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হলো। বিপুল ভোটাধিক্যে আমরা জয়ী হলাম। মহল্লার নির্বাচন থেকে শুরু করে এই নির্বাচন আমাদের অনুকূলে শহরের গরীব খেটে-খাওয়া মানুষের দ্বিধাহীন সমর্থনের পরিচয় রেখে দিল। সঙ্গে সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠানে শহরের অন্যান্য শ্রেণী, ছোট ব্যবসায়ী—সকলেরই সমর্থন লাভের সৌভাগ্য আমাদের হয়েছিল।

বন্যায় ত্রাণকার্যে পার্টি

এখনকার দিনে প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ব্যাপক খাদ্য-সংকট, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি হলে ব্যাপক সাধারণ মানুষ সাহায্য করার জন্য ছুটে বেরিয়ে পড়েন এবং সরকারীভাবেও সাহায্যের চেষ্টা হয়। পশ্চিমবাংলায় বামপন্থী সরকার এরূপ আচম্বিত সংকটের সঙ্গে সঙ্গে যত ত্বরিত সম্ভব দুর্গত বিপন্ন মানুষের সেবায় সাহায্য উপস্থিত করেন। কিন্তু আমরা যখন স্বাধীনতা এবং বিপ্লবের আদর্শ নিয়ে রাজনীতির কর্মক্ষেত্রে নেমেছি, তখন দেশ বিদেশী শক্তির অধীন। যা চোখের সামনে সুস্পষ্ট ছিল তা সরকারী সাহায্য নয়, ছিল বৃটিশ সরকারের নির্মম ঔদাসীন্য। আমাদের পূর্বসূরীদেরও অভিজ্ঞতা তাই। এ রকম সময় সঙ্কটাপন্ন মানুষের অবস্থা দেখে বা শুনে নিকটে ও দূরে দেশের মানুষ বিচলিত হতেন। ত্বরিত সেবার জন্য এগিয়ে আসতেন তাঁরাই, যাঁরা বিপ্লবের আদর্শ ও পথ নিয়েছেন। বিপন্ন মানুষের রক্ষায় ও সেবায় তাঁরা ঝাঁপিয়ে পড়তেন। দেশের সাধারণ মানুষ তাঁদের আবেদনে সাড়া দিতেন এবং যাঁর যতটুকু ক্ষমতা সাহায্য দিতেন। ১৯১৩ সাল বা বাংলা ১৩২০ সালের দামোদরের বানে সারা বাংলার রাজনৈতিক কর্মী সাহায্যার্থে বর্ধমানে এসেছিলেন। মাত্র কয়েক বৎসর আগে বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন সারা বাংলাদেশকে আলোড়িত করেছিল। লক্ষ্যকে সীমিত ধরলে আন্দোলন সফলও হয়েছিল। সুতরাং তার ঢেউয়ের শীর্ষে যাঁরা উঠেছিলেন, তাঁদের মধ্যে অম্বিকাদা চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের খ্যাতিমান নেতাদের অন্যতম। ১৯৪৬ সালে মুক্তির পর উনি যখন বর্ধমানে এসেছিলেন, আলমগঞ্জের সুপরিচিত ব্যবসায়ী অভয় কোঙার মহাশয় সেই সময়কার কথা তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিলেন। বিশ সালের বানে যাঁরা অম্বিকাদার মত বাইরে থেকে এসেছিলেন, স্বভাবতঃই তাঁরা অনেক স্থানীয় সহযোগী পেয়েছিলেন। ১৯৪৬ সালে তখনও আমাদের পরাধীনতার শৃঙ্খল ভাঙেনি। কিন্তু ১৯১৩ সালে বা ১৩২০ সালে অবস্থা ছিল আরও শোচনীয়। সরকারের ঔদাসীন্য প্রায় একই রকম ছিল। কিন্তু জনগণের উদ্যোগ ও

উদ্যম ও স্বতঃ উত্থিত সাংগঠনিক ক্ষমতা ছিল অপেক্ষাকৃত অনেক বেশি। আঘাতও যেমন আচম্বিত হতো, সাধারণ মানুষের সাড়াও তেমনি ত্বরিত জেগে উঠতো।

দামোদরে ১৯১৩ সালের ২২ বছর পর ১৯৩৫ সাল বাংলা ১৩৪২ সালে আবার প্রবল বন্যা হয়। ১৯১৩ সালের পরও, যেমন ১৯৪১ সালে, মাঝে মাঝে নদীর দক্ষিণে রায়না ও খণ্ডঘোষে ছোটখাট বান হতো, কিন্তু প্রবল বন্যা হয় ঐ ১৯৩৫ সালে। উত্তরে জুজুটি গ্রামের পাশে বাঁধ ভাঙে এবং বেশ অনেক গ্রাম ক্ষতিগ্রস্ত হয়, কিন্তু সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় খণ্ডঘোষ ও রায়না থানার উত্তরাংশের বেশ কিছু গ্রাম, দীর্ঘ বিস্তৃত এলাকা। বর্ধমান শহরেও বন্যা প্রবেশ করে। পার্কাস রোডে আমাদের বাড়ীও জলমগ্ন হয়। সবাইকে দোতলায় উঠে যেতে হয়। কিন্তু বর্ধমান শহরে ক্ষতি বেশি হয়নি, কমসমের উপর দিয়েই গিয়েছিল। তখন আমাদের পার্টি তৈরী হয়নি। আমি কিছু উৎসাহী ছাত্র এবং যুবককে একদিনের মধ্যেই জড়ো করে ফেললাম। তরুণদের মধ্যে ত্রাণকার্যের জন্য উৎসাহ ও উদ্দীপনা এমনই হয়েছিল। পরের দিন সকালে অর্থাৎ বন্যা বেরিয়ে যাবার দু'দিন পরেই স্থির করেছিলাম, এখন ধার করে সাহায্য নিয়ে যাব, পরে চাঁদা তুলে সেসব শোধ করা যাবে। বাজারে বেশ কয়েক মন গুড়, চিড়ে আমি ধার করলাম। গরুর গাড়িতে চড়িয়ে দামোদরের এপারে ইদিলপুরের ঘাটে এসে পৌঁছালাম। ওপারে গিয়ে একটি একটি করে বস্তা ওপরে তুলতে আমাদের বেশ বেগ পেতে হলো। গিয়ে দেখি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের প্রতিষ্ঠিত 'সংকট ত্রাণ সমিতি' আমাদের আগেই পৌঁছে অফিস খুলে বসেছেন। উক্ত প্রতিষ্ঠানের এখানে ভারপ্রাপ্ত কর্মাধ্যক্ষ ছিলেন সাধনবাবু। ওখানে তাঁর সঙ্গে ছিলেন মাত্র আর একজন কর্মী। আমাদের চিড়ে-গুড় প্রভৃতি মাল বয়ে নিয়ে যাবার জন্য গরুর গাড়ি কোথায় পাওয়া যাবে সাধনবাবুর সঙ্গে আলোচনা করলাম। তিনি বললেন, "সদ্য বন্যা-বিধ্বস্ত এলাকায় বান সরে যাবার ৪৮ ঘন্টা পর তোমরা গরুর গাড়ি আশা করছো কিরূপে ? তাছাড়া বন্যার প্রবল স্রোতে রাস্তা-ঘাট সবই তো ভেঙ্গে গেছে। তোমরা ২০ জন আছো, আধ মন করে মাথায় নিলে ১০ মন তো মরা ক্ষুধার্ত মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে পারবে!" সোৎসাহে আমরা সবাই ঠিক করলাম যে তাই ই করবো। আমাদের বেশির ভাগ মাল তাঁদের জিম্মায় রেখে দিলাম। আমরা তাঁদের কাছে খালি বস্তা ধার করলাম। আর নিজেদের বস্তাও খালি হলো। এই দুইয়ে মিলিয়ে ২০টি বস্তায় ১০

মন মাল ভাগ করলাম। এবারে প্রত্যেকে এক বস্তা করে মাথায় নিয়ে মাইল দুই-তিন দূরে শশঙ্গা গ্রামে পৌঁছালাম। ঐ গ্রামটিও বন্যাগ্রস্ত, তবে বেশি বিধ্বস্ত হয়নি। সেখানে খানিকটা বস্তা খালি হলো। চাট্টি করে প্রত্যেকেরই বোঝা কম করে নিলাম। রাত্রে সেখানেই প্রাথমিক স্কুলের বেঞ্চে শুয়ে কাটিয়ে দিলাম। সকালে আবার রওনা হলাম। নিকটস্থ বেশি ক্ষতিগ্রস্ত গ্রাম 'খোরকোলে' গিয়ে পৌঁছালাম। ওখানেই পঞ্চানন তুই মহাশয়ের বৈঠকখানায় আশ্রয় পেলাম। ও ঘরও বানে ভেসেছিল। কিন্তু যেহেতু পাকা দেওয়াল সেজন্য পড়েনি। ভাঙ্গা-ফাটা মেঝে কাদায়-জলে একাকার হয়েছিল। উদ্যোগী গ্রামবাসীরা সাহায্য করলেন। ঝাটটাট দিয়ে খানিকটা থাকার মতো অবস্থা করতে পারলেন। গ্রামের মধ্যে কিছু খড়ের পালুই ছিল যা ভেসে যায়নি। তার থেকে কিছু কিছু করে শুকনো খড় সংগ্রহ করে মেঝেতে বিছিয়ে ফেললেন। আমরা নিজেদের থাকার জন্য সতরঞ্জি নিয়ে গিয়েছিলাম ও খাবার জন্য চাল, ডাল, আলু, লবণ এবং চায়ের ব্যবস্থা নিয়ে গিয়েছিলাম। এই গ্রামেই আমাদের কেন্দ্র স্থাপন করবো বলে ঠিক করলাম। বর্ধমানে ও কলকাতায় চাঁদা ভালোই উঠেছিল। মনসুর কলকাতায় চাঁদার ভার নিয়েছিলেন। সুতরাং পাশের গ্রামে 'ওয়ানে' তারও ভার নিয়ে নিলাম। 'খোরকোলে' হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই বাস। 'ওয়ানে'তে অবশ্য শুধু হিন্দু। উভয় গ্রামেই তপশীলী সম্প্রদায়ের লোক বেশ কিছু ছিলেন। আমাদের প্রতিষ্ঠান থেকে আমরা ঘোষণা করে দিলাম যে, আমরা যে দুটি গ্রাম নির্বাচন করে নিয়েছি, তাদের প্রত্যেককে দৈনিক মাথাপিছু আধ-সের চাল ও একপোয়া ডাল এবং লবণ দেব। তাঁরা খাবার ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয়ে ভাদ্র মাসটা ধরে পুরোদমে চাষ করুন যাতে পর বৎসর দুঃখটার কিছু লাঘব হয়। এইভাবে দু'মাস খাদ্যের রিলিফ দেওয়ার পর কিছু কাপড় বিতরণ করলাম। উল্লিখিত গ্রাম এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলিতে মাসখানেক ধরে ঘর বানাবার জন্য দড়ি, পেরেক ও বাঁশের দাম দেওয়ার মতো কিছু টাকা, প্রয়োজনের একটা পরিমাপ করে, গ্রামে গ্রামে ঘুরে দিয়ে গেলাম।

এই ব্যাপারে এক অভিজ্ঞ মানুষের খুব সাহায্য পেয়েছিলাম। তিনি উলকুণ্ডার পীর সাহেব জনাব মোল্লা নঈমুদ্দিন। ইনি ছিলেন আন্তরিক-ভাবেই সুফী। সুফীদের কাছে আচারের চেয়ে মানুষের প্রতি ভালবাসা ও মানুষের সেবাই আসল ধর্ম। সুফীদের চটের মতো কাপড় 'দাল্‌ক' না হলেও তিনি তাঁতের মোটা কাপড়ই পরতেন। নিজের হাতেই পাঞ্জাবী আদি

পরিধেয় সমস্ত কিছু সূচ দ্বারা সেলাই করে নিতেন। এমন কি নিজের ঘর বানিয়েছেন নিজের হাতে রাজমিস্ত্রীর কাজ করে। আমি যাওয়া-আসা করার সময়ই তাঁর স্ত্রী একদিন মারা গেলেন। তিনি আশ্চর্য সংযমের সঙ্গে সমস্ত সামাজিক আচার পালন করে গেলেন। একদিন সারাদিন বিভিন্ন গ্রামে ঘুরে সন্ধ্যাবেলা গ্রামে ফিরলাম। ফিরেই শোনা গেল গ্রামের একজনের কলেরা হয়েছে। শুনেই তিনি তাঁর হাকিমী ওষুধের বাক্স নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। সারারাত তাঁর সেবা করে ভোরবেলা ফিরলেন। ফিরেই নিজের মৃত স্ত্রীর জন্য সমবেত প্রার্থনা 'ফাতেহা'র আয়োজনে বসে পড়লেন। পরের দিন ভোরে আবার আমাকে নিয়ে ঘুরতে বের হলেন। নামাজের সময় হলে তিনি মাঠে-ঘাটে নামাজ পড়তেন, কিন্তু আমাকে পড়ার তাগিদ দিতেন না। সুফীদের মতবাদ, মুখের কথায় নির্দেশ না দিয়ে দৃষ্টান্তের প্রভাবের উপর নির্ভর করা বাঞ্ছনীয়। খণ্ডঘোষ থানার এ-কেন্দ্র ছাড়া আমরা রায়না থানার 'কুলে' গ্রামে আর এক রিলিফ কেন্দ্র করেছিলাম।

১৯৪৩ সালে আমরা যখন দুর্ভিক্ষ, সংকট নিয়ে ব্যস্ত আছি, সেই সময় আগস্ট মাসে বর্ধমান শহরের কাছে (শহরের পূর্বদিকে) আমিরপুরে বাঁধ ভেঙ্গে দামোদরের প্রবল বন্যা প্রচণ্ড স্রোতে সব ভাসিয়ে নিয়ে যেতে লাগলো। রেলের বাঁধে আটক পড়ে বন্যার জল আরও বিস্তৃত অঞ্চল ভাসাচ্ছিল। রেলের বাঁধ ভাঙার দরকার হয়ে পড়লো। রাত তখন ১০-১১টা। বারবার চেষ্টা করেও জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে টেলিফোনে যোগাযোগ করতে পারলাম না। তখন সাহস করে জেলা বোর্ড অফিস থেকে কলকাতায় মুখ্যমন্ত্রী নাজিমুদ্দিনকে ট্রাঙ্ককল করলাম। তাঁকে বন্যাক্রান্ত গ্রামসমূহের দুর্দশা, ব্যাপক প্রাণহানির আশঙ্কা ইত্যাদির বর্ণনা দিয়ে অবিলম্বে রেলের বাঁধ ভাঙ্গার ব্যবস্থা করতে অনুরোধ করলাম। কিন্তু কাউকে কিছু করতে হলো না। সেই রাত্রেই বন্যার প্রবল স্রোতে বাঁধ আপনিই ভেঙ্গে গেল। আমরা পরের দিন সকালেই রিলিফের ব্যবস্থার উদ্যোগ নিলাম। তখন যুদ্ধের সময়। সবই রেশনিং, সুতরাং দোকান-বাজারে কিছু পাওয়া যেত না। বর্ধমানের সুপরিচিত উকিল তারাপদদাকে সঙ্গে নিয়ে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে দৌড়লাম। তাঁকে 'সিভিল সাপ্লাই ডিপার্টমেণ্ট' বা খাদ্য সরবরাহ বিভাগ থেকে কিছু খাদ্য সরবরাহ করতে অনুরোধ করলাম। তিনি বললেন, সরকারকে অনুমতির জন্য বলবেন,

কিন্তু নিজে থেকে তখনই সরকারী নিয়ম ভাঙতে পারবেন না। একজন অফিসারের পরামর্শ পেয়ে আমরা জজ সাহেবের কাছে দৌড়লাম। মনে রাখতে হবে, তখন যুদ্ধ চলছে। কলকাতা বা কাছাকাছি শহর থেকে বোমা বর্ষণে বা যুদ্ধের কোন সংকটে মানুষ পথে বেরোলে আশ্রয়প্রার্থী সেইসব মানুষের জন্য সরকার থেকে 'ইভাকিউইজ কমিটি' করা হয়েছিল। তার সভাপতি ছিলেন জজ সাহেব, আলোচ্য সময়ে শ্রী বি কে গুহ। তাঁর উক্ত দপ্তরের ভাণ্ডারে বেশ কিছু চিড়ে-গুড় ছিল। সরকারী সরবরাহ সাপেক্ষে তিনি এই ভাণ্ডার থেকে কিছু দিতে রাজি হলেন এবং সেই মতো অর্ডার দিলেন। অবিলম্বে 'বন্যা রিলিফ কমিটি' গঠিত হলো। বর্ধমানে 'জেলা ফুড কমিটি'র কাজে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা অনুসরণ করে বর্ধমানের মহারাজাকে কমিটির সভাপতি করা হলো। হাসেম সাহেবকে সেক্রেটারী ও শ্রীতারাপদ পালকে জয়েন্ট সেক্রেটারী করা হলো। অফিস খোলা হলো জেলা বোর্ডের একটা কামরায়, যাতে বর্ধমানের জনসাধারণের হাতে তার ক্ষমতা থাকে। জেলা বোর্ড তখন কংগ্রেসের হাতে। কাজেই এই সুবিধাটার সুযোগ নেওয়া হলো। শক্তিগড় ও রসুলপুরের মাঝে রেলের বাঁধ ভাঙা হয়। তিন-চার মাস বাদে রেল লাইন পুনরায় তৈরী করা সম্ভব হয়। ইতিমধ্যে এই ভাঙনের দরুণ কলকাতার সঙ্গে সমগ্র উত্তর ভারতের যোগা-যোগ বিচ্ছিন্ন হয়। কিছু মেল, এক্সপ্রেস ট্রেনকে ঘুরিয়ে অন্য পথে হাওড়া স্টেশনে পৌঁছানো হচ্ছিল। আমরা বর্ধমান থেকে কাটোয়া হয়ে হাওড়া যাতায়াত করছিলাম।

বন্যার আঘাতের সঙ্গে সঙ্গে অবস্থা এমন কঠিন হলো যে প্রাণ বাঁচানোর জন্য এবং রিলিফ পৌঁছানোর জন্য নৌকার প্রয়োজন হলো। রিলিফ কমিটি থেকে নৌকা কেনা হলো। এখন হলো সেই নৌকা চালনার মানুষের প্রয়োজন। কলকাতায় পি. আর. সি.-কে অনুরোধ করলাম খিদিরপুর অঞ্চল থেকে নৌ-চালনায় দক্ষতাবিশিষ্ট কর্মী সংগ্রহ করে পাঠিয়ে দিতে। পি. আর. সি সেই মতো কর্মী পাঠিয়ে দিলেন। নৌকা ও মাঝি প্রয়োজনীয় স্থানগুলিতে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। যেখানে রেলের বাঁধ ভাঙা ছিল, শক্তিগড়ের পর সেখান থেকে রসুলপুরের যোগাযোগের জন্য দুটি নৌকা রাখা হলো। মানুষকে আর কাটোয়া যেতে হতো না, এই নৌকার মাধ্যমে রসুলপুরে এসে ট্রেন ধরতেন।

বন্যার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত পার্টি কর্মী নিজের আদর্শের তাগিদে এবং পার্টির নির্দেশে ত্রাণের কাজে নেমে পড়লেন। কয়েক দিনের মধ্যেই এই

স্বতঃ উত্থিত প্রয়াসকে সংগঠিত রূপ দেওয়া হলো। বিনয়দা একটি নৌকা নিয়ে কুচুট অঞ্চলে কাজ করছিলেন। দু'জন ইউরোপিয়ান মিলিটারী অফিসার একটু উ'চু জায়গায় দাঁড়িয়ে কোন সাহায্য আকর্ষণ করার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু যেখানে তাঁরা বন্যার জলের স্রোতের থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন তার কাছে-পিঠে কোন মানুষ কেউ তাঁদের দেখতে পায়নি। এমন সময় বিনয়দার নৌকা কাছাকাছি যাচ্ছিল। বিনয়দা ও'দের উদ্ধার করেন।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হয়, 'কোয়েকার সোসাইটি'র সেবা প্রতিষ্ঠান 'ফ্রেণ্ডস্ এ্যামবুলেনস্ ইউনিট'-এর কয়েকজন কর্মী ত্রাণকার্যের জন্য এসেছিলেন। এ'রা হলেন পামেলা ব্ল্যাঙ্কার ও এরিক ওয়েস্ট উড। এ'রা এরপর বিজুরে একটি রিলিফ কেন্দ্র স্থাপন করে বেশ কিছুদিন কাজ করেন। বিজুরে এই সময় স্বপন দত্ত মহাশয় আমাদের অনেক সাহায্য করেন। বিজুর গ্রামের সঙ্গে এই যোগাযোগ আমাদের মূল্যবান রাজনৈতিক যোগাযোগে পরিণত হয়।

পূর্বেই বলেছি, পার্টির নির্দেশে আমি কেন্দ্রীয় অফিসের ভার নিয়েছিলাম। অফিসের কাজ বলতে তখন বোঝাতো সরকারের সঙ্গে তথা সরকারী কর্মচারীদের সঙ্গে পর্যাপ্ত রিলিফের জন্য লড়ালড়ি, আর নিজেদের মধ্যে সমস্ত রিলিফ কেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ। রিলিফের জন্য চাঁদা সংগ্রহ একটা বড় কাজ ছিল। সাতগাছিয়া, বিজুর, কালনা অঞ্চলে রিলিফের কাজে ছিলেন শহীদ শিবশঙ্কর চৌধুরী। বিনয়দা নৌকা নিয়ে তাঁর সঙ্গে কাজে যোগ দিয়েছিলেন। কমরেড হরেকৃষ্ণ কোঙারও বিজুরে যোগ দেন। কেন্দ্রের কাজ লঘু হওয়ার পর আমি তাঁর সঙ্গে যোগ দিয়েছিলাম। গ্রামে গ্রামে একসঙ্গে ঘুরতাম।

বন্যার জল 'বাঁকা' বেয়ে নাদনঘাটে বাঁকা ও খড়ি নদীর সঙ্গমস্থলে পূর্বস্থলী ও কালনার এক ব্যাপক অংশকে বিপন্ন করেছিল। এই এলাকাতেই শ্রীতারাপদ পালের বাড়ী। তিনি অবিলম্বে বিনয়দা, কমরেড শরদীশ রায়কে এখানে নিয়ে গিয়ে নাদনঘাট ডাকবাংলোয় একটি রিলিফ কেন্দ্র খোলেন। স্থানীয় কিছু সহযোগী কর্মী তাঁদের সঙ্গে যোগ দেন। কমরেড শরদীশ রায়ের প্রয়াসে স্থানীয় মানুষেরা উৎসাহিত হলো।

বন্যায় খাদ্য রিলিফের কাজ সারা হবার পর হেমন্তকালে এবং শীতের প্রারম্ভে কাপড় ও কম্বল দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা হয়। রিলিফ কমিটি থেকে সংগৃহীত অর্থে সব কেনা হয় এবং সমস্ত বন্যা-বিধ্বস্ত এলাকায় বিতরণ করা

হয়। পরিমাণ অবশ্য অল্পই ছিল, তবে নগণ্য নয়। বন্যা-বিধ্বস্ত এলাকার প্রতি ইউনিয়নে জনসংখ্যা অনুপাতে কাপড় 'এ্যালট্‌মেন্ট' করে গাঁট বাঁধা হয়. পরে সেই গাঁটগুলি নির্দিষ্ট এলাকায় পৌঁছে দিয়ে বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়। সাতগাছিয়া থেকে কালনা পর্যন্ত এবং মন্তেশ্বর এলাকার জন্য নির্ধারিত গাঁটগুলি আমরা সাতগাছিয়ার ডাকবাংলোয় জমা করি। কতকগুলি গাঁট মন্তেশ্বরে কুসুমগ্রাম হয়ে মন্তেশ্বর-পূর্বস্থলীর বিভিন্ন কেন্দ্রে পৌঁছাতে হবে, আর অন্য কতকগুলি সোজাসুজি কালনায় নিয়ে গিয়ে তার চারপাশের অঞ্চলে দিতে হবে। আমি ময়নামপুরের আইমাদার সেখ সাহেব-কে চিঠি দিলাম। মন্তেশ্বর, পূর্বস্থলীর গাঁটগুলি তিনি আমার অনুরোধে গরুর গাড়ি পাঠিয়ে সাতগাছিয়া ডাকবাংলো থেকে নিজের বাড়িতে গোদাম-জাত করলেন। তখন বানের জলে সাতগাছিয়া-মাঝেরগ্রাম রাস্তাও ভেঙ্গে গিয়েছিল। মাঝেরগ্রাম পর্যন্তও বাস যেত না। বাকি রাস্তা তো কাঁচাই ছিল। আমি আর কালো ময়নামপুর গেলাম, গিয়ে বলে এলাম, আমরা পরে এসে প্রত্যেক ইউনিয়নের নির্ভরযোগ্য মানুষের হাতে চিঠিপত্র পাঠিয়ে দেব এবং তিনি সেই হিসাবে মাল ছেড়ে দেবেন। পরে গিয়ে এই ব্যবস্থা ভালভাবে সংগঠন করতে হয়েছিল। কমরেড শিবশঙ্কর চৌধুরীর সঙ্গে আমি আর কালনা এলাকায় যেতে পারিনি। কালনা এলাকায় সমগ্র বিতরণ ব্যবস্থা তিনিই সংগঠন করেছিলেন।

উপরে সরকারী কর্মচারীদের সঙ্গে লড়ালড়ির কথা বলেছি। এই সূত্রে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনার বিবরণ এখানে দেব। বন্যার কিছুদিনের মধ্যেই বন্যাগ্রস্ত এলাকার কাজ দেখার জন্য মন্ত্রী শ্রীতারকনাথ মুখোপাধ্যায় বর্ধমান এলেন। রাজবাড়িতে মিটিং হলো। জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের অসহযোগিতা সম্বন্ধে আমাদের যে অভিযোগ ছিল, সেই সম্বন্ধে একটি চিঠি ভালভাবে রচনা করে আমাদের তরফ থেকে মন্ত্রীর হাতে দিই। আমি সেই চিঠি রচনা করেছিলাম। অভিযোগ ছিল কঠোর, অথচ শালীনতা থেকে সামান্যতম বিচ্যুতি ঘটেনি। এতে সমালোচিত ব্যক্তিটি ছাড়া বাকি সবাই সন্তুষ্ট হয়ে-ছিলেন। জেলা জজ বোধ হয় কারও কাছ থেকে ইশারা পেয়েছিলেন, সভা শেষে রাজবাড়ি থেকে বেরোবার সময় মুচকি হেসে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, "এ চিঠির মুন্‌শিয়ানাটা কার ?" বোঝা গেল, অন্য সরকারী কর্মচারীরাও বেশ খুশী হয়েছেন। ঐ চিঠির ফলে সরকারী কর্মচারীদের কাজের ধারা আমরা জনসাধারণের স্বার্থে যা চাইছিলাম অন্তত বেশ কিছুটা

তারই অনুকূলে পরিবর্তিত হয়। এর ফলে রিলিফের কাজে কিছু সুবিধা হয়। এর জন্যই এই ঘটনাটা উল্লেখ করলাম।

ওদিকে অজয় নদীতেও বিরাট বন্যা হলো। বছরের গোড়ার দিকে দুর্ভিক্ষের ছায়া পড়েছিল বেশ গভীরে। অজয় বাঁধ কমিটির পরিচালকরা জেলা বোর্ডের নির্দেশে টেস্ট রিলিফের কাজে নেমে পড়লেন। অজয় বাঁধ নির্মাণের কাজটাই তাঁরা বেছে নিলেন। তাঁরা এবং স্থানীয় মানুষ খুবই পরিশ্রম করেছিলেন। বিরতিহীন ভাবে কাজ করে তাঁরা বাঁধের কাজ শেষ করেছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় তাঁদের সব কাজই বিফল হলো। বন্যায় আবার বাঁধ ভাঙল এবং যে এলাকা অজয়ের বন্যায় প্লাবিত হয় তা আবার প্লাবিত হলো। এরপর অজয় বাঁধ কমিটি ও আমরা অজয় বাঁধ পুনর্নির্মাণের জন্য আন্দোলন করতে লাগলাম। সরকার বরাবর ধুয়ো তুলেছিল, অজয়ের বাঁধ জমিদারের দায়িত্ব—সরকারের কোন দায়িত্ব নেই। আমরা বললাম, খরচা জমিদারদের কাছ থেকে আদায় করতে হয় সরকার করবে, কিন্তু দায়িত্ব সরকারকেই নিতে হবে। এই শ্লোগানে আমাদের এজিটেশন্ চলতে লাগলো। শেষ পর্যন্ত ১৯৪৫ সালে আমাদের লক্ষ্য সাধনে আমরা সফল হয়েছিলাম। এই সমগ্র বিষয়টি বিস্তারিত বিবরণ দাবি করে। সুতরাং স্বতন্ত্রভাবে তাকে আলোচনা করলাম।

পার্টি, গণ-সংগঠন ও কর্মী সম্পর্কে কিছু বৃত্তান্ত

আমরা আন্দোলনের টানে টানে নানান্ কাজকর্মের বর্ণনা দিয়েছি, কিন্তু পার্টি ও গণ-সংগঠনের অগ্রগতির সবিশেষ বর্ণনা স্থগিত রয়ে গেছে। পার্টির বর্ধমান জেলা কমিটির গঠন সম্বন্ধে পূর্বে লিখেছি। প্রথম যাঁরা সদস্য হয়েছিলেন তার বর্ণনাও দিয়েছি। পুনরায় উল্লেখ করতে দোষ নেই। আমি কমরেড হেলারাম চট্টোপাধ্যায়-এর কথা পূর্বে লিখেছি। আমরা তখন যাঁরা পার্টি আরম্ভ করেছিলাম, আমাদের মধ্যে তিনিই ছিলেন বয়সে ও অভিজ্ঞতায় সবচেয়ে বড়। কংগ্রেসের সত্যাগ্রহ আন্দোলন ছাড়া স্বতন্ত্রভাবে কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলনের অভিজ্ঞতা তাঁর হয়ে গেছে। তাঁর বাড়ি ছিল কাঁকসা থানার সোঁয়াই গ্রামে। তিনি হাটগোবিন্দপুরে প্রাথমিক শিক্ষকের কাজ করতেন এবং সেই সূত্রে এই এলাকার মাস্টারমশাই বলে পরিচিত ছিলেন। হাটগোবিন্দপুরের পাশে রামনগরে তিনি আলু তথা কমরেড শিবপ্রসাদ দত্তর বাড়িতে টিউশনি করতেন। (আলু পরবর্তীকালে জেলা কমিটির সদস্য হন। বাল্যকাল হতে তাঁর ছাত্র ছিলেন)। আলুর বাবার কিছু ব্যক্তিগত শত্রু ছিল। তিনি নিহত হন। ফলে কমরেড হেলারামকে তাঁদের বাড়ির অভিভাবকই হয়ে যেতে হয়। ইতিমধ্যে তিনি রাজনৈতিক জীবন শুরু করেছেন। ১৯৩০-৩২ সালে কংগ্রেস আন্দোলনের পর তিনি কৃষক আন্দোলনে মনোনিবেশ করেন। প্রধানতঃ তাঁরই উদ্যোগে কৃষক সমিতি গঠিত হয় এবং ১৯৩৩ সালে হাটগোবিন্দপুরে তার প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এর কিছুটা অবশ্য পূর্বে উল্লেখ করেছি।

বিনয়দা আমাকে বলেছেন, ১৯২৮ সালে তাঁর সঙ্গে কমরেড অশ্বিনী মণ্ডলের প্রথম ওকোর্ষায় এক সভায় দেখা হয়। তিনি তখন ওকোর্ষা স্কুলে পড়তেন। নিকটে করোজ গ্রামে তাঁর বাড়ি। ১৯৩০-৩২ সালের আন্দোলনের পর তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হয় ১৯৩৩ সালে কৃষক সম্মেলনে হাটগোবিন্দপুরে। (প্রসঙ্গত, ১৯৩৪ সালে সড্যা গ্রামে কমরেড শ্যামাপদ

সামন্তের বাড়িতে কৃষক সমিতির অফিস হয়।) তারপর মাঝে মাঝে আমাদের যোগাযোগ হতে থাকে। কাটোয়া, মন্তেশ্বরে দুর্ভিক্ষের রিলিফ-এর সময় এক সঙ্গে কাজ করতে করতে তাঁর সঙ্গে কমরেড দাশরথি চৌধুরীর ঘনিষ্ঠতা হয়। এই ঘনিষ্ঠতা আরও গভীর হয় দামোদরের বন্যায় কংগ্রেসের জুজুটি রিলিফ ক্যাম্পে। কমরেড অশ্বিনী মণ্ডল তাঁকে শীঘ্রই পার্টিতে নিয়ে আসতে সমর্থ হন। তাঁর রিক্রুট করার ক্ষমতা ছিল লক্ষণীয়। স্বাভাবিকভাবেই ১৯৩৫ সালের ৫ই অক্টোবর প্রথম জেলা কমিটি গঠনের সময় তিনি (অশ্বিনী মণ্ডল) নবগঠিত জেলা কমিটির সদস্য হন।

কমরেড শিবপ্রসাদ মুখার্জী ১৯৩০-৩২ এর আন্দোলনের পর জেল থেকে মুক্ত হয়ে তাঁর গ্রামে মেমারী থানার সাতগাছিয়াতেই থাকতেন। হাইস্কুলের শিক্ষক ছিলেন। কর্মক্ষেত্র প্রসারিত করতে না পারলেও তিনি নিজ এলাকায় পার্টির যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিলেন এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বিশ্বস্ততার সঙ্গে পার্টির কাজ করে গেছেন। তবে তাঁর অনুরোধেই গোড়ায় উল্লিখিত কিছুদিন ব্যতিরেকে তাঁকে আর জেলা কমিটিতে রাখা হয়নি।

শিবপ্রসাদ দত্ত (ওরফে আলু)-র বাল্য বয়সের পরিচয় আমরা পেয়েছি। হাটগোবিন্দপুরের পাশে সুপরিচিত গ্রাম রামনগরের দত্ত পরিবারের ছেলে। বালক বয়স হতেই তিনি রাজনীতির গোপনীয় কাজ করতে অভ্যস্ত হন। সেই বালক বয়সেই তিনি কমরেড হেলারামের সহকর্মীদের সঙ্গে অর্থাৎ আমাদের সঙ্গে পরিচিত হন। শেষ পর্যন্ত রাজনীতিরই সারাক্ষণের কর্মী হয়ে যান। তিনি পার্টি সদস্যপদ অর্জন করেন এবং শীঘ্রই নিজ কাজের গুণে জেলা কমিটির সদস্যপদে উন্নীত হন। তিনি সারাজীবন ধরে সমস্ত ফ্রন্টেই কাজ করে গেছেন। বর্ধমানে মিউনিসিপ্যালিটির সাফাই কর্মীদের থেকে শুরু করে কয়লা খনিতে শ্রমিকদের মধ্যে কাজ করেছেন, আবার জেলা কৃষক সমিতির সব আন্দোলনেই প্রায় অংশগ্রহণ করেছেন। কয়েকবার জেলও খাটতে হয়েছে। প্রতিটি সাধারণ নির্বাচন ও অনেক স্থানীয় নির্বাচনে তিনি গুরু দায়িত্ব নিয়ে নেতৃত্ব দিয়েছেন। ১৯৫১ সালে তিনি প্রগতিশীল ব্লকের সম্পাদক ছিলেন। ১৯৫১ সালে জেলা বোর্ড নির্বাচনে প্রগতিশীল ব্লকের জয় এবং ১৯৫২ সালের বর্ধমান শহরে সাধারণ নির্বাচনে জয়ের অনেকখানিই তাঁর অবদান।

কমরেড দাশরথি চৌধুরীর কথা উপরে বলেছি। তাঁর বাড়ি কাটোয়ার কাছে ক্ষীরগ্রামে। তিনি ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় পাশ করেই ১৯৩০ সালে সত্যাগ্রহে যোগদান করেন এবং জেলে যান। তিনি প্রথমে গান্ধীবাদী আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন এবং কংগ্রেসের ভিতরে তিনি গান্ধী-বাদেরই একনিষ্ঠ কর্মী হিসাবে বিবেচিত হতেন। ত্রিশ দশকে সত্যাগ্রহের আন্দোলন সম্পূর্ণ প্রত্যাহৃত হবার অব্যবহিত পূর্বে গান্ধীজী কর্তৃক 'ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ' আখ্যায় এক অধ্যায় অনুষ্ঠিত হয়। এতে তাঁর নির্বাচিত কিছু নির্দিষ্ট কংগ্রেস কর্মীকে তাঁর নির্দেশে সত্যাগ্রহ করতে হয় এবং জেলে যেতে হয়। কমরেড দাশরথি চৌধুরী এই ভূমিকায় নির্বাচিত ও মনোনীত হন। এরপর তিনি দুর্ভিক্ষ, রিলিফ ও বন্যা রিলিফে কমরেড অশ্বিনী মণ্ডলের সংস্পর্শে আসেন। তখন তাঁর গান্ধীবাদে আস্থা শিথিল হয়ে গেছে। ক্রমে তিনি কমিউনিস্ট পার্টির আদর্শে বিশ্বাসী হন। পার্টি-সদস্য ও পরে জেলা কমিটির সদস্য হন। তিনি ক্যানেল আন্দোলনেও গ্রেপ্তার হয়ে বন্দী হন। এরপর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত পার্টির কাজে তিনি কঠোর পরিশ্রম করেন। শেষে ১৯৫০ সালে গোপন অবস্থায় 'বোন্ ক্যান্সার' রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। (১৯৪৮ সালে পার্টি বে-আইনী হবার পর তাঁর বিরুদ্ধে ওয়ারেন্ট ছিল। গোপনে কাটোয়া লাইনে ট্রেনে যাতায়াতের সময় পুলিশ কর্তৃক দৃষ্ট হওয়ায় ট্রেন থেকে লাফিয়ে পড়েন।)

কমরেড বিপদবারণ রায়ের বাড়ি জড়ুলে। তিনি বিনয়দা, হরেকৃষ্ণ প্রমুখের সঙ্গে একই কেসে আসামী ছিলেন। জেল ও অন্তরীণ অবস্থা থেকে ১৯৩৭ সালেই মুক্ত হন এবং অবিলম্বে আমার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন। কৃষক সমিতির কাজে যোগদান করেন। ক্যানেল কর বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় হন এবং গলসী থানায় প্রচারে কর্মরত অবস্থায় উচ্চগ্রাম এলাকায় গ্রেপ্তার হন ও জেলে নীত হন। শীঘ্রই এঁকে জেলা কমিটিতে নিয়ে নেওয়া হয়। তিনি সারাক্ষণের কর্মী থাকাকালে জেলার প্রায় সমস্ত অঞ্চলেই কাজ করেছেন। তবে আউশগ্রাম ও রায়না ছিল প্রধান। পঞ্চাশ দশকের শেষের দিকে তাঁর সাংসারিক অবস্থা তাঁকে আংশিক কর্মী হতে বাধ্য করে। তিনি স্কুলের শিক্ষকতা গ্রহণ করেন। ষাট দশকে কঠিন পীড়ায় মারা যান।

কমরেড তারাপদ মোদকের বাড়ি হাটগোবিন্দপুর। প্রায় গোড়া থেকেই তিনি আমাদের তখনকার প্রধান কেন্দ্র হাটগোবিন্দপুরের স্থানীয়

নেতা ছিলেন। অবশ্য নিকটবর্তী সড্যা গ্রামে কাজকর্ম বাড়ার পর সড্যার কর্মীদের সঙ্গে মিলে তাঁকে একযোগে কাজ করতে হয়। ১৯৪৮-৫০ সালে যখন আমাদিগকে প্রায় সকলকেই আণ্ডারগ্রাউণ্ডে যেতে হয় তখন হাটগোবিন্দপুর আর সড্যাকে অনেক ভার বহন করতে হয়। গুরুভার পড়ে হাটগোবিন্দপুরের উপর. কারণ হাটগোবিন্দপুর পড়ে পাকা রাস্তার উপরে। উপর্যুপরি পুলিশের রেডও হয়েছে। অথচ তাঁর নেতৃত্বে হাটগোবিন্দপুরের কমরেডরা এমনভাবে সংগঠন করেছেন যাতে আমাদের কাজ কোনমতেই ব্যাহত হয়নি। এর জন্য বৃটিশ আমলে সরকারী কর্মচারীরা নিজেদের মধ্যে কথোপকথনে হাটগোবিন্দপুরকে আখ্যা দিয়েছিলেন স্ট্যালিনগ্রাড'। ১৯৬৪ সালে তিনি কঠোর ক্যান্সার রোগে মারা যান।

জেলা কমিটি গঠিত হবার পর পার্টির গঠনতন্ত্র অনুযায়ী সেল গঠনের দিকে মনোযোগ দিতে হলো। কাজের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে তার সম্ভাবনাও দেখা দিল। পূর্বেই উল্লেখ করেছি. ক্যানেল কর বিরোধী আন্দোলনের সূচনাতেই কমরেড অশ্বিনী মণ্ডল কমরেড হেলারামের সঙ্গে সড্যা যান। ঐ যাওয়ার পর তিনি প্রায় দুই মাস ঐ গ্রামে কেন্দ্র করে থেকে যান। সড্যা থেকে কর্মীবৃন্দ ছোট ছোট দলে বিভিন্ন দিকে প্রচারে যেতেন। ভাতার থেকে শুরু করে মেমারী-মন্তেশ্বর পর্যন্ত তাঁরা যেতেন। এইসব কাজের মধ্য দিয়ে সড্যা গ্রামে একটি কর্মীদল গ'ড়ে উঠেছিল। এদের মধ্যে কয়েকজনকে পার্টির সদস্য করা সম্ভব ও প্রয়োজন বিবেচিত হলো। জেলা কমিটির সম্পাদক হিসাবে আমি আহূত হলাম এবং আমাদের নিয়ম ও প্রথামত পার্টি ইউনিট 'সেল' গঠন করলাম। কমরেড মহানন্দ খাঁ হলেন সেলের সম্পাদক। সভ্য হলেন কমরেড শম্ভু কোঙার, কমরেড শ্যাম সামন্ত, কমরেড মৃত্যুঞ্জয় কোঙার, কমরেড দুর্গা কোঙার। এর মধ্যে সবাই মারা গেছেন। হাটগোবিন্দপুরের কমরেড তারাপদ মোদক সভ্য হয়েছিলেন এবং এই ইউনিটের তাঁকে সভ্য করা হয়েছিল। মহানন্দ খাঁ ১৯৪৮-৫০ সালে পার্টির প্রতি বিশ্বাস ভঙ্গ করে কংগ্রেসে যোগদান করেন। বাকি সকলেই জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত পার্টির বিশ্বস্তভাবে কাজ করে গেছেন। হাট-গোবিন্দপুর, কুড়মুন, রায়ান, বণ্ডুল, নবস্থা, বড় পলাশন প্রভৃতি ইউনিয়ন বা অঞ্চলে তাঁরা পার্টির নেতা হিসাবে পরিচিতও ছিলেন এবং নেতৃত্বও করতেন। গ্রামাঞ্চলে এইটিই আমাদের প্রথম 'সেল'। এরপর অন্য 'সেল' গঠিত হবার পর একেই আমরা 'সদর ইস্ট সেল' বলে উল্লেখ করতাম।

ক্যানেল আন্দোলনের পর বর্মীরা জেল থেকে মুক্তি পেলেন। বর্ধমান সদর থানার তালিত-বাঘাড় অঞ্চলে একটি 'সেল' গঠনের প্রয়োজন অনুভূত হলো। সিমডালের কমরেড অজিত সেনের নেতৃত্বে তালিতের কমরেড ধর্মদাস মিশ্র ও কমরেড গঙ্গাধর ভট্টাচার্যকে নিয়ে 'সেল' গঠিত হয়। একে বলা হতো 'সদর ওয়েস্ট ইউনিট'।

ইতিমধ্যে কমরেড দাশরথি চৌধুরীর চেষ্টায় মঙ্গলকোট থানায় কাশিয়াড়া অঞ্চলে বেশ কিছু অগ্রগতি হয়! কমরেড দাশরথি চৌধুরীর উদ্যোগে আবদুল মকিত, আবদুস সামি, গ্রামের কৃষকদের মধ্যে একজন কমরেড কাইসার—তিনজনকে নিয়ে একটি 'সেল' গঠিত হয়। এ'রা সকলেই মারা গেছেন এবং কাজও করে গেছেন। সাংসারিক প্রয়োজনে মকিত সাহেবকে পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশ চলে যেতে হয়েছিল। একে আমরা বলতাম 'ওয়েস্ট মঙ্গলকোট ইউনিট'। পূর্ব মঙ্গলকোটে কাজকর্ম আমাদের কিছু ছিল, কিন্তু 'সেল' গঠনে বিলম্ব হয়।

রায়নায় আমরা ১৯৪২ সালের আগেই 'সেল' গঠন করে ফেলেছি। কমরেড পাঁচু গুহর নেতৃত্বে কমরেড গঙ্গানারায়ণ হালদার ও কালীপদ মণ্ডল ছিলেন 'সেল' সদস্য। এ'রাও সকলে মারা গেছেন।

যত জায়গায় পার্টির কাজকর্ম আরম্ভ হয়েছিল, সব জায়গাতেই পার্টি ইউনিট গঠন করতে পেরেছি এমন নয়। ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখা, দৈনন্দিন খোঁজ-খবর নেওয়ার সুযোগ ছিল কম। আমাদের মুষ্টিমেয় কয়েকজনকে বড় এলাকা ব্যাপী এমন কি জেলা ব্যাপী ছোটাছুটি করতে হতো। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা, পার্টির গঠন ও প্রসার সম্বন্ধে আমাদের ধ্যান-ধারণা ছিল পশ্চাদপদ। আমরা কাকে পার্টি-সদস্য করবো এ নিয়ে খুব বাছোটের ভাব রাখতাম। চারদিক দিয়ে বিচার করে যাকে ভাল মনে হতো এবং পার্টির আদর্শে দৃঢ় থাকতে পারবে এরূপ ধারণা হতো তাকেই শুধু মেম্বার করতাম। গণ-আন্দোলন ও সংগঠনের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে যে সাহসের সঙ্গে তদনুযায়ী সংখ্যা বাড়িয়ে যাওয়া যেতো, একথা খেয়াল থাকতো না। সর্বোপরি, শুধু গণ-সংগঠন ও তার আন্দোলন নয়। পার্টির বৃদ্ধি ও বিস্তার—এটাই একটা প্রধান লক্ষ্য, এটা খেয়াল থাকতো না। আমাদের প্রতিটি কর্মকেন্দ্রে—যেমন কুড়মুন, বণ্ডুল, হাটগোবিন্দপুর বা রায়না অঞ্চল বা কাটোয়া, মঙ্গলকোট, বর্ধমান সদর ও পশ্চিম সদর এলাকা বা গলসী, ভাতাড় বা মেমারীতে—যতটুকু সংগঠন ও সভ্য-সংখ্যা ছিল তার চেয়ে বেশ বাড়ানো যেতো বলে আমার এখন মনে হয়।

অবশ্য সতর্কতার একটা বাস্তব কারণ ছিল। সাম্রাজ্যবাদী পুলিশের সন্ত্রাস এবং উৎকোচ প্রভৃতি দুর্নীতির মাধ্যমে সরকারের নিরন্তর প্রয়াস ছিল আমাদের দলের মধ্যে তাদের লোক ঢোকানো। আমাদের সতর্কতায় হয়তো বাড়াবাড়ি হয়েছে এবং অতি-আড়ষ্টতায় হয়তো পার্টির ক্ষতিও হয়েছে, কিন্তু আমাদের সজাগ দৃষ্টির ফলে শত্রু কিছু ক্ষতিও করতে পারেনি। বর্ধমানের জেলা কংগ্রেস কমিটি যখন আমাদের হাতে এসেছে, ক্যানেল কর বিরোধী আন্দোলনে আমরা যখন সাফল্য অর্জন করেছি, সরকারী সন্ত্রাসের শক্তি, মালিকপক্ষের অত্যাচার যখন রাণীগঞ্জের কাগজ-কল ধর্মঘটে আমাদের মোকাবিলাকে পিছু হটাতে বিফল হয়েছে পৌরসভা, লোকাল বোর্ড, ইউনিয়ন বোর্ড প্রভৃতির ক্ষেত্রে যখন আমরা একটি শক্তি হিসাবে বিবেচিত হতে আরম্ভ করেছি, বন্যা ও দুর্ভিক্ষে বিপন্ন মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে বিপদের প্রতিরোধ করতে সাহায্য করেছি, তখন, ধরুন ১৯৪১ সালে, গোটা জেলায় আমাদের মোট সদস্য সংখ্যা ২৫-৩০ জনের বেশি হবে না। পার্টি-সভ্য হওয়ার আগ্রহ গণ-সংগঠনগুলির অনেক কর্মীরই ছিল। দায়-দায়িত্ব অনেক বেশি একথা মনে করে অনেকে মুখ ফুটে বলতে সংকোচ করতেন। তাছাড়া কাজকর্মের দিক থেকে খুব একটা তাগিদও বোধ করতেন না। কারণ গণ-সংগঠনের মধ্যে, বা কাজ করার সময় কাজ করার সঙ্গে, আমরা সদা-সর্বদাই কর্মী নির্বিশেষে খোলাখুলিভাবে সকলে মিলে আলাপ-আলোচনা করেই কাজ করতাম। তবুও একথা মানতে হবে, আমাদের এ বিষয়ে বিশেষ উদ্যোগের অভাব, মন্দগতি বা আড়ষ্টতা পার্টির ত্বরিত বৃদ্ধিকে ব্যাহত করেছে। আমাদের এই চাল-চলনের রীতিনীতি ১৯৪৩ সালে প্রথম পার্টি কংগ্রেসে সমালোচিত হলো। সিদ্ধান্ত হলো, এই চাল-চলন পরিবর্তন করতে হবে এবং পার্টির সভ্য-সংখ্যা বৃদ্ধিকে আমাদের কার্যক্রমের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে বিবেচনা করতে হবে। পরে এসব প্রয়োজন মতো আলোচনা করবো।

আমরা দেখলাম, পার্টির গোড়া থেকেই কৃষকদের অভাব-অভিযোগ ইত্যাদি নিয়ে আন্দোলন করে গেছি। ১৯৩৩ সালে হাটগোবিন্দপুরে প্রথম সম্মেলন হবার পূর্বেই কৃষক সমিতির সাংগঠনিক কমিটি গঠিত হয়েছিল। কমরেড হেলারাম চট্টোপাধ্যায়, কমরেড চন্দ্রশেখর কোঙার, কমরেড রমেন চৌধুরী, কমরেড প্রাণকৃষ্ণ রায় প্রমুখ এঁরাই ছিলেন এর নেতৃবৃন্দ। সাংগঠনিক কমিটির স্তরে থাকার সময় থেকেই প্রথম সম্মে-লনের পূর্বে ও পরে কতকগুলি জরুরী কাজে হাত দিতে হয়েছিল।

বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক সংকট তখন গভীরে পৌঁছে গেছে। তখন দেশ ইংরেজের। তারা তাদের আধিপত্যকে কাজে লাগিয়ে অর্থনৈতিক সংকটের বোঝা ভারতসহ অন্যান্য উপনিবেশের উপর চাপিয়েছে। অর্থনৈতিক সংকটের চাপে কাঁচামাল ও কৃষিজাত পণ্যের মূল্য অত্যন্ত কমে গেল। ইংরেজ সস্তায় আমাদের কাঁচামাল ও কৃষিপণ্য নিতো এবং তুলনামূলকভাবে বেশি মূল্যে তাদের শিল্পজাত পণ্য এখানে বিক্রী করতো। উল্লিখিত অর্থনৈতিক সংকটের সময় শিল্পজাত পণ্যের মূল্য অনেক কমে গেল। কিন্তু তুলনায় কৃষিজাত পণ্যের মূল্য খুব বেশি কমে গেল। ঔপনিবেশিক চরিত্রের জন্য ইংরেজ সহজেই বোঝাটা অধীন দেশের ঘাড়ে চাপিয়ে দিল। দেশের মধ্যে আবার এর দরুণ দণ্ড দিতে হলো শ্রমিককে ও কৃষককে। চতুর্দিকে কারখানা বন্ধ, মজুর ছাঁটাই ও বেকারী। তীব্র হারে মজুরির পতন সমস্ত শিল্প এলাকায় ও শহর এলাকায় দুস্থতা অত্যন্ত বাড়িয়ে দিল। ফলে কৃষিপণ্যের চাহিদা আরও অনেক কমে গেল। গ্রামে দুস্থতা আরও অনেক বাড়ল। সবচেয়ে সংকট হলো ঋণগ্রস্ত খাতকদের মধ্যে। যারা সাড়ে তিন টাকা মন ধানের দরের সময় সাড়ে তিন'শ টাকা অর্থাৎ ১০০ মন ধানের মূল্য ধার নিয়েছিল, তাদের আড়াই টাকা মন ধানের দরের সময় শুধু ধারের অঙ্কের হিসাবেই ১৪০ মন ধান দিতে হচ্ছিল। এর পরে ছিল উচ্চ হারে সুদ। সুতরাং ধারের দায়ে কৃষকের জমি বিক্রী হয়ে যাচ্ছিল, তা আবার অত্যন্ত সস্তা দরে। এছাড়া বাকি খাজনার দায়ে জমি ছেড়ে দিতে হচ্ছিল। জমি জমিদারের খাস হয়ে যাচ্ছিল। এর বিরুদ্ধে আমরা লাগাতার প্রচার করে যাচ্ছিলাম এবং প্রতিকারের দাবি উপস্থিত করছিলাম। খাজনা মকুবের দাবি করছিলাম, সর্বপ্রকার আদায় সাময়িক স্থগিত করার দাবিও করছিলাম। সুদের হার কমানো এবং দেনা উসুলের মামলা স্থগিত রাখার দাবিও করেছিলাম। যাই হোক, আমরা একটা পদ্ধতি নিয়েছিলাম যাতে কিছুটা কাজ হয়েছিল। জমি হাতছাড়া হওয়াটা কিছুটা রোধ করা গিয়েছিল। অবস্থার বাধ্য-বাধকতার দরুণ জমিদার ও মহাজনও কিছুটা বেকায়দায় পড়েছিল। জমিদারের জমি ছেড়ে দিলে খালি পড়ে থাকার শঙ্কা ছিল। মহাজনের শঙ্কা ছিল খাতক নিঃস্ব হলে সবটাই খোয়া যাবে। ফলে ভাল করে জনমত এবং আন্দোলন সৃষ্টি করতে পারলে বোঝাপড়া করার কিছু অবকাশ ছিল। ইতিমধ্যে সারা বাংলাদেশে কৃষক আন্দোলনের ফলে 'এগ্রিকালচার ডেটরস এ্যাক্ট' পাশ হয়েছিল। এই আইনের শক্তিও কাজে

লেগেছিল। মহাজনরা মিটমাট করতে বাধ্য হয়েছিল। অবস্থার বিপাকে মহাজনকে কিছুটা ছাড় দিয়ে কিস্তিতে দেনাশোধ মেনে নিতে হতো। এই পদ্ধতিতে কমরেড হেলারাম চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ও কর্মীদের চেষ্টায় কয়েকটি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জিত হয়েছিল। তখনকার গণ-নায়ক পত্রিকায় ঐ সব নিদর্শন প্রকাশিত হয়েছিল।

১৯৩৩ সালের পর সরকারী সন্ত্রাসের ফলে আমাদের কিছুটা ছিন্ন-ভিন্ন করে দেয়। সন্ত্রাসবাদী মামলায় কমরেড বিনয় চৌধুরী, কমরেড হরেকৃষ্ণ কোঙার, কমরেড বিপদতারণ রায় প্রমুখকে গা ঢাকা দিতে হয় বা জেলে যেতে হয়। পূর্বেই বলেছি, আমরা যারা বাইরে ছিলাম তারা আবার ধীরে ধীরে কর্মতৎপর হলাম। ১৯৩৫ সালের দামোদরের বন্যায় রিলিফের কাজ আমাদের আবার মিলিত হবার সুযোগ দিল। ১৯৩৬ সালে নির্বাচনের প্রচার গণ-সংযোগের বিস্তার ঘটানো সম্ভব করল। নির্বাচনের অব্যবহিত পর ১৯৩৭ সালে ক্যানেল কর বিরোধী আন্দোলনে কৃষক সমিতি আরও প্রসারিত হলো।

এর অনতিকাল পরেই কৃষক আন্দোলনকে ক্যানেল এলাকার বাইরে সম্প্রসারিত করার আশায় আমরা গুসকরায় আলুট গ্রামে দ্বিতীয় কৃষক সম্মেলনের অনুষ্ঠান করি। গুসকরার মুক্তিদা (শ্রীমুক্তিপদ চট্টোপাধ্যায়) হাটগোবিন্দপুরের প্রথম সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন এবং কৃষক সমিতির কার্যকরী সমিতির সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। বর্ধমানে মুক্তিদার সঙ্গে কমরেড হেলারাম চট্টোপাধ্যায়ের দেখা হলে কৃষক সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশন গুসকরায় করার প্রস্তাব কমরেড হেলারাম করেন এবং মুক্তিদা সম্মত হন। কমরেড দাশরথি চৌধুরী এবং শহীদ কমরেড সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে সম্মেলন অনুষ্ঠানের আয়োজনের জন্য গুসকরায় পাঠানো হয়। হুগলীর এক কমরেড, কমরেড যতীন, উপস্থিত হন ও কাজে যোগ দেন। এছাড়া মনসুরও ছিলেন। আমি নিজেও মাঝে মাঝে এসে সম্ভব মতো সাহায্য করেছি (আমি অন্যত্র নিযুক্ত থাকায় এখানে লাগাতার উপস্থিত হতে পারতাম না)।

কৃষক সমিতির প্রতিষ্ঠার সূচনা থেকেই দক্ষিণপন্থী কংগ্রেসীরা এর তীব্র বিরোধিতা করেন। তাঁদের তরফ থেকে মুক্তিদার উপর বিশেষ চাপ হয়। তিনি আর তেমন করে গা লাগাতে চান না। যাই হোক, কোন রকমে সম্মেলন পর্যন্ত তিনি আমাদের সঙ্গ দিয়েছিলেন। প্রচারাদি সব-কিছুই বাইরে থেকে আগত কর্মীদের করতে হয়েছিল। এমনকি নিজেদের

থাকার আবাসও তাহাদিগকে করে নিতে হয়েছিল। আলুটে তখন রাস্তার ধারে উঁচু ডাঙ্গা ছিল। সেই ডাঙ্গার একপাশে তালগাছ ঘেরা একটি পুকুর ছিল। সেই পুকুরের ধারে ছিল একটা পরিত্যক্ত ঘর। তার ছিল কেবল দেওয়াল, চাল ছিল না, ছিল শুধু চারটি দেওয়াল। জানলা-দরজার ফুটোগুলো ছিল কিন্তু দরজা-জানলা ছিল না। এতেই তাল-পাতার ছাউনি করে কমরেড দাশরথি ও সুকুমার থাকার ব্যবস্থা করে-ছিলেন। কমরেড সুকুমার রসিক ছিলেন। আমি যখন এলাম, আমাকে দেখিয়ে বললেন, "দেখলেন তো, ঘরে মোদের চাঁদের আলো।" তার আগের দিন বিকালে বৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। তালপাতার ছাউনিতেও রোখা যায় নি। কমরেড সুকুমার আরও বললেন, "বৃষ্টি একটুও বাইরে পড়েনি। এ জিনিস কি ছাড়তে আছে? আমরা সব ঘরের মধ্যে ধরে নিয়েছি।"

এসব এলাকায় কংগ্রেসেরও ভালভাবে প্রচার হয়েছিল এমন নয়, ফলে মতাদর্শের আলোচনা ও বিতর্ক—যাতে চেতনা সঞ্চারিত হয়, তেমন কিছু ইতিপূর্বে হয়নি। অন্ততঃ লক্ষণীয় মাত্রায় হয়নি। এই সম্মেলনের অনুষ্ঠান হলো যেন অকর্ষিত জমিতে প্রথম কর্ষণ। তবে আমরা গ্রামে প্রচার করতে গিয়ে দেখছিলাম, কৃষকের মনে নাড়া লাগছিল, আগ্রহ হচ্ছিল, কিন্তু তখনও আমরা ভরসা সৃষ্টি করতে পারিনি। যেমন কিনা ধরুন, তজয় বাঁধ আন্দোলনের সময় করতে পেরেছিলাম। আশু সেদিন আমরা আশান্বিত হতে পারিনি।

স্থানীয় এলাকায় প্রভাব সৃষ্টি ও বিস্তার আমাদের অন্যতম লক্ষ্য ছিল। এতে আমরা সেরূপ সার্থক হইনি বটে, কিন্তু সম্মেলনের প্রধান লক্ষ্য সংগঠনকে সংহত করা—তাতে আমরা সার্থক হয়েছিলাম। স্বভাবতঃই, এর অভিভাষণ এবং সম্মেলন প্রদত্ত বক্তৃতাদি এবং গৃহীত প্রস্তাবসমূহ সমবেত প্রতিনিধিমণ্ডলীর মধ্যে বেশ উৎসাহের সঞ্চার করেছিল।

এর পরের গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান হচ্ছে কুড়মুন গ্রামে প্রাদেশিক কৃষকসভার বৃহত্তর সাধারণ কমিটির অধিবেশন এবং এই অধিবেশনের সমাপ্তির পর অনুষ্ঠিত বৃহৎ জনসভা। তখন আমাদের কর্মসূচীর প্রধান ছিল ক্যানেল কর বিরোধী আন্দোলন ও তার প্রচার। আন্দোলনের প্রচার ও প্রসারে এই রকম সভাগুলি ছিল এক একটি মাইলস্টোনের মতো। কুড়মুনে এই

সভা ও কমরেড বঙ্কিম মুখার্জীর বক্তৃতা প্রভৃতিতে বড় এক অগ্রগতি সাধিত হয়। এ অনুষ্ঠান হয় ১৩৪৪ সালে শীতকালে।

এরপর উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান সড্যায় সদর মহকুমার কৃষক সম্মেলন। ১৩৪৫ সালের গ্রীষ্মে। সভাপতি হয়েছিলেন নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার, যিনি পরে আমাদের প্রতি ঘোর বিশ্বাসঘাতকতা করে সরে পড়েন। এই সম্মেলনে ক্যানেল কর বিরোধী আন্দোলনের ঘাঁটি সড্যা, হাটগোবিন্দপুর এলাকা আরও শক্ত হয়।

আসানসোলে পার্টি

আসানসোলের নির্বাচনকে লক্ষ্য করেই ১৯৩৬ সালে কাজ আরম্ভ করা হয়। ১৯৩৫ সালের গঠনতন্ত্রে শ্রমিক অধ্যুষিত এলাকায় শ্রমিকদের জন্যে সংরক্ষিত কয়েকটি বিশেষ শ্রমিক কেন্দ্র ছিল। এরই একটি আসানসোলে কোলিয়ারী শ্রমিকদের দেওয়া হয়েছিল। এই কেন্দ্রে কমরেড বঙ্কিম মুখার্জীকে প্রার্থী করা হয়। পার্টির সংগঠিত প্রয়াসে কলকাতা ও চব্বিশ পরগণা থেকে অনেক কমরেড আসানসোল আসেন। তাঁরা সু-সংগঠিতভাবে গ্রুপে গ্রুপে ভাগ হয়ে বিভিন্ন জায়গায় কর্মকেন্দ্র গঠন করে নির্বাচনের কাজে লেগে পড়েন। এই সূত্রে কমরেড মুজফ্‌ফর আহমদ এবং কমরেড বঙ্কিম মুখার্জী বর্ধমান কংগ্রেস অফিসে এসে ওঠেন। কলকাতার প্রাদেশিক কংগ্রেস অফিসেই শ্রমিক কেন্দ্রগুলিতে সহযোগিতার নীতি গৃহীত হয়েছিল। অধিকন্তু আলাপ-পরিচয় ইত্যাদি জেলার কংগ্রেস অফিসে পাঁজা মশায় এবং আমাদের সঙ্গে সেরে তাঁরা আসানসোল চলে গেলেন। এখানে একটা কথা উল্লেখ করতে হয়। আমাদের সংগঠনের উৎস কংগ্রেসের প্রবীণ নেতৃবৃন্দ ভাল চোখে দেখেন নি। ব্যক্তিগতভাবে কারো বিরুদ্ধে তাঁদের বিরূপতা ছিল না। আমাদের বৃদ্ধিমান শক্তিতে তাঁরা রুষ্ট হচ্ছিলেন। এই রোষ কার্যক্ষেত্রে নিরন্তর প্ররোচনায় পর্যবসিত হচ্ছিল। আমাদের কমরেডরা এসব সহ্য করে যেতেন এবং রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব ও বিতর্ককে বিষয়ান্তরে চালিত হতে দিতেন না। দু'একজন কমরেড অনেক সময় সহ্য করতে না পেরে দু'একটা কড়া কথা বলে ফেলতেন। পাঁজা মশায় মুজফ্‌ফর সাহেবের কাছে অভিযোগ করেন। মুজফ্‌ফর সাহেব রুষ্ট হয়েছিলেন। হেলারাম বাবুকে এ সম্বন্ধে বলেন, এবং বলেন, কমিউনিস্ট পার্টি তার র‍্যাঙ্কের কাছে শালীনতর ব্যবহার আশা করে। হেলারাম বাবু কৈফিয়ত দেন যে ওরা বেশি প্রোভোক্ করে। স্ব-সমাজে ইংরাজী বলা মুজফ্‌ফর সাহেবের ব্যবহার বহির্ভূত ছিল। কিন্তু সেদিন তাঁর মনের অসন্তোষ হঠাৎ ইংরাজিতেই প্রকাশ পেল। তিনি বললেন, "হোয়াই ডু

ইউ পারমিট ইওরসেলফ্ টু বী প্রোভোক্ড (Why do you permit yourselt to be provoked) ?" পরে বুঝিয়ে বললেন, "শান্ত-ভাবে না বললে রাজনীতি বোঝানো যায় না।"

আসানসোলের নির্বাচনে আমরা সফল হলাম। বঙ্কিম মুখার্জী জয়ী হলেন। কাজের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার মতো বেশ কিছু যোগাযোগ হলো এবং আমরা শ্রমিক সংগঠনের প্রয়াসে নিযুক্ত হলাম। প্রতিবাদ, প্রতিরোধ ও সংগঠনের অভাবে আসানসোলে শিল্প এবং কয়লাখনিতে নিযুক্ত শ্রমিকদের অনেক নিপীড়ন সহ্য করতে হতো। নির্বাচনের প্রচার অভিযানে সুপ্ত শক্তি জাগরিত হলো এবং বিক্ষোভের সাংগঠনিক রূপ দেখা দিতে লাগল। আমাদের উল্লিখিত নির্বাচনের সময় আসানসোল মহকুমায় কারখানা ও খনি আদিতে যেটুকু শ্রমিক সংগঠনের ভাসা ভাসা অস্তিত্ব ছিল, তা ছিল জামসেদপুরে টাটা লোহা ও ইস্পাত কারখানার শ্রমিকদের উপর— যাঁরা নেতৃত্ব করতেন তাঁদেরই। এ'দের নেতা ছিলেন হোমি। ১৯৩৬-৩৭-এর নির্বাচনের পর শ্রমিকদের মধ্যে কংগ্রেসকে আমন্ত্রণ করার কামনা জাগল। হোমির নেতৃত্বের উপর তাঁরা আস্থা হারিয়েছিলেন। তার বদলে অন্য সংগ্রামী ইউনিয়ন গঠন করবার ইচ্ছা হয়েছিল। সেজন্য তাঁরা কংগ্রেস কর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ করে ইউনিয়ন নেতৃত্বে তাঁদেরই আমন্ত্রণ করার চেষ্টায় ছিলেন। আসানসোলে যা অবস্থা ছিল তা খুব পীড়াদায়ক। সন্ত্রাসবাদী ও কমিউনিস্ট তো দূরের কথা, শুধু কংগ্রেসের নামই ছিল ভয়াবহ। মহকুমার মধ্যে রাণীগঞ্জেই কিছু স্বদেশী কাজকর্ম সজীব ছিল। নির্বাচন উপলক্ষে তা সজীবতর হলো। স্বদেশী কাজে যাঁদের পরিচয় ছিল এই সূত্রে তাঁদের নাম বলে নিইঃ ভীমাচরণ রায়, অমূল্য ঘোষ, দুর্গা হালদার, সেখ কালু প্রমুখ। ভীমাচরণ মারা গিয়েছিলেন। কালু সেখ রাণীগঞ্জে আর ছিলেন না। রাণীগঞ্জ পেপার মিলের শ্রমিকরা শ্রীঅমূল্য ঘোষের সঙ্গে যোগাযোগ করেন।

ইতিপূর্বে নির্বাচনোত্তর অনুকূল আবহাওয়ায় কমরেড নিত্যানন্দ চৌধুরী বার্ণপুরে এসে বসেন এবং নরসিংহপুরে অফিস খোলেন। বর্ধমান থেকে কমরেড সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এসে তাঁর সঙ্গে যোগ দিলেন। তাঁরা কংগ্রেসের এক শাখা কমিটি গঠন করেন। সুকুমার ছিলেন দুর্গাপুরের নিকট কুলডিহার ডাঃ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র। ১৯৩০-৩২ সালের প্রচার অভিযানের অন্যতম নায়ক শচীদা (প্রয়াত কমরেড শচীনন্দন অধিকারী) বলতেন, তিনি দুর্গাপুরে গান গেয়ে নানা চেষ্টা করে সভায়

যদিও কিছু লোক জড়ো করতে পারলেন, কিন্তু কেউ সভাপতি হতে চান না। কিশোর সুকুমারকে দেখতে পেয়ে শচীদা বলেন, "তুমিই এসে সভাপতির আসনে বস।" এইভাবেই কমরেড সুকুমারের রাজনীতিতে আবির্ভাব, দেশ সেবার সূচনা, আন্দোলনে যোগদান, জেল, ইত্যাদি পর পর ঘটনা। এখন তিনি আসানসোলে একদিকে ট্রেড ইউনিয়নের কর্মী ও অন্যদিকে কংগ্রেসের সংগঠক। ১৯৩৬ সালে বর্ধমানে এসে ছাত্র ফেডারেশনের সংগঠনে যোগ দেন আর তার নেতৃত্ব করেন। বস্তুতঃ এই উদ্দেশ্যেই পার্টি থেকে তাঁকে কলেজে ভর্তি করা হয়েছিল। টিকিটের পয়সা না থাকায় তিনি কলকাতা থেকে বর্ধমান পায়ে হেঁটে এসেছিলেন।

কমরেড নিত্যানন্দ চৌধুরী ছিলেন কলকাতায় সুপরিচিত নেতৃস্থানীয় ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী। এখন থেকে আসানসোলই ছিল তাঁর কর্মক্ষেত্র।

রাণীগঞ্জের পেপার মিলের শ্রমিকরা অমূল্য ঘোষের সঙ্গে যোগাযোগ করায় এবং তাঁদের কামনা অবহিত করায় তিনি অবিলম্বে বার্ণপুরে কমরেড নিত্যানন্দ চৌধুরীকে খবর দেন। খবর পেয়ে কমরেড নিত্যানন্দ চৌধুরীও ত্বরিত রাণীগঞ্জে এসে অমূল্য ঘোষের পরামর্শ অনুযায়ী পেপার মিলের শ্রমিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। রাণীগঞ্জের কাগজকলে শক্তিশালী ইউনিয়ন গঠিত হলো।

আসানসোলের সুপরিচিত পরিবারের সন্তান কালাচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর ভাই হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়। হরিপদ আন্দামানে ছিলেন। তাঁর অগ্রজ কালাচাঁদদা ছিলেন ডিটেনশনে। বিনয়দা বেরোবার পর পার্টি ইউনিট গঠনের উদ্দেশ্যে পুরানো যোগাযোগ সঞ্জীবিত করার চেষ্টা করেন। তাঁর এইসব পুরনো সাথীদের সঙ্গে আমাকেও পরিচিত করে দেবার জন্য আসানসোল নিয়ে যান। এইসব যাওয়া-আসায় অবশ্য কিছুটা গোপনীয়তা অবলম্বন করতে হয়। কারণ আমাদের কাজকর্ম যতখানি পুলিশের অজ্ঞাত রাখা যায় তার চেষ্টা করতাম।

একদিকে কাজকর্ম অন্যদিকে গোপনীয়তা বজায় রাখার জন্য শচীদা ও বৌদিকে কুলটিতে নিয়ে আসা হয়। শচীদা কুলটিতে কমরেড তারাপদ ঘটকের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তিনি ছিলেন পুরনো বৈপ্লবিক দলের কন্‌ট্যাক্ট এবং শচীদার আত্মীয়। শচীদা হোটেল খোলেন। সাধারণভাবে ইতিহাস লিখতে গিয়ে বিস্তৃতভাবে প্রতিজন কর্মীর জীবন লেখা হয়ে উঠছে না। প্রতিক্ষেত্রেই আছে অতুলনীয় আত্মত্যাগ। মর্মান্তিক ঘটনার বিবরণ যেমন চমকপ্রদভাবে বর্ণনা করে দেওয়া যায়, দৈনন্দিন জীবনের ক্লেশ,

অর্ধাশন, অনশন শুধু মাথা গোঁজার জায়গার অভাব—এই ধরণের অভাব ও অনটনের কষ্টের বিবরণ ততো চমকপ্রদভাবে দেওয়া সহজ নয়। এক অপূর্ব আকর্ষণীয় লক্ষ্য কমরেডদের দৈনন্দিন সংকট অগ্রাহ্য করতে সাহায্য করেছে। শচীদার ও বৌদির জীবন ধরেই যদি যাই, পাব উল্লিখিত কাহিনীর বিশেষ নিদর্শন। বলা বাহুল্য, কুলটির হোটেলের কারবার বেশি দিন চলেনি। পার্টির ও শ্রমিক আন্দোলনের কর্মীরা এক-আধজন এক-আধ দিন খাবেন, এরকম নিয়ন্ত্রণের বাঁধ থাকল না। এক-আধজনটা কয়েকজনে পরিণত হতে দেরি হলো না। এক-আধ বেলাটা নিরন্তরে পর্যবসিত হলো। ফলে হোটেল গুটোতে হলো। আবার অন্য প্রয়াসের পরিচ্ছেদ শুরু হলো।

রাণীগঞ্জ কাগজ কলে সুসংগঠিত ইউনিয়ন গড়ে উঠেছিল। ওখানকার শ্রমিকশ্রেণীকে ন্যায্য প্রাপ্যে তো ফাঁকি দেওয়া হতোই এবং সে ফাঁকি নিদারুণ ফাঁকি। তাছাড়া ছিল নানান উৎপীড়ন। যার মিলিত বোঝা ছিল শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে অসহনীয়। নানান ভাবে আবেদন নিবেদন করেও যখন সাড়া পাওয়া গেল না তখন স্ট্রাইকের ঘোষণা দিতে হলো।

ইউনিয়নের নেতা কমরেড নিত্যানন্দ চৌধুরী। ১৯৩৮-এর অক্টোবরে অবস্থা চূড়ান্ত পর্যায়ে উঠেছে। বিনয়দা তখন বাইরে। হালে হালেই মুক্ত হয়েছেন। তিনিও ইউনিয়নের কাজে যোগ দিলেন। সুকুমার আগে থেকেই যোগ দিয়েছিলেন। কোন বিশেষ উত্তেজক ঘটনা ব্যতিরেকেও সাধারণ অসন্তোষ এবং বৎসরাধিক কালের আন্দোলনের ফলেই স্ট্রাইকের পক্ষে শ্রমিকশ্রেণীর আনুকূল্য দৃঢ় এবং অবিচলিত।

ইউনিয়নের সিদ্ধান্ত ও ঘোষণা অনুযায়ী ১৯৩৮ সালের ১৩ই নভেম্বর স্ট্রাইক শুরু হলো। কারখানায় শ্রমিকেরা প্রবেশ করেন নি। এমন কি যাঁরা মানসিক দিক থেকে দুর্বল এবং দ্বিধাচিত্ত তাঁরাও প্রবেশ করেন নি। স্বভাবতই কারখানার গেটের সামনে নেতৃবৃন্দ আছেন, পিকেট লাইন আছে, যাতে কোন শ্রমিক সাময়িক দুর্বলতায় প্রবেশ না করেন কিংবা কোম্পানীর দালালরা 'ব্ল্যাক লেগস্' নিয়ে এসে কারখানায় প্রবেশ করাতে না পারেন। শ্রমিকরাও স্ট্রাইককে সার্থক করার উদ্দেশ্যে জমা হয়েছেন। স্লোগান চলছে। স্ট্রাইকের অনুকূলে উত্তেজনা ও হৈ চৈ রয়েছে। কিন্তু এসব সত্ত্বেও কোন শান্তি-ভঙ্গকারী আক্রমণাত্মক ঘটনা ঘটেনি। সমস্ত প্ররোচনা কোম্পানী এবং তার দালালদের তরফ থেকে। কোম্পানী ইউ-রোপিয়ান—বামার লরী এ্যাণ্ড কোং। ম্যানেজার এবং উচ্চপদস্থ অফিসার

সবই সাহেব। তখন ইংরেজ শাসন। এলাকা দূরে, কলকাতা শহর হতে বিচ্ছিন্ন। গণতান্ত্রিক এবং সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী কেন্দ্র কলকাতা এবং আশে-পাশের সঙ্গে চেতনার যোগাযোগ অবলম্বন স্বভাবতঃই শীর্ণ। আসানসোল মহকুমার দীর্ঘদিন ধরে প্রতিষ্ঠিত কোলিয়ারী এবং কারখানাগুলিতে সাহেব মালিকদের প্রতাপ ও আধিপত্য অক্ষুণ্ণ। এইরূপ একচ্ছত্র আধিপত্যের জন্য সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শক্তিও খুব বিঘ্নিত। পুলিশ আদালত প্রভৃতি নিষ্পেষণযন্ত্রও অনেকখানি বেপরোয়া। রাণীগঞ্জ, আসানসোলের ব্যাপারে এইরূপ পশ্চাৎপটটা খেয়াল রাখতে হবে।

শ্রমিকদের দিয়ে স্ট্রাইক ভাঙ্গানোর নানান অপচেষ্টা সাহেব অফি-সাররা করেছিল এবং ব্যর্থ হয়েছিল। শেষে সিদ্ধান্ত করেছিল বাইরে থেকে 'ব্ল্যাক লেগস্' নিয়ে এসে স্ট্রাইক ভাঙবে। ইউনিয়ন কর্তৃপক্ষও সেই রকম আশঙ্কা করেছিলেন এবং শান্তিপূর্ণভাবে তাতে বাধা দেবেন তা স্থির করে-ছিলেন। দু'দিন ভালভাবেই স্ট্রাইক চলল। কোম্পানী চেষ্টা করেও 'ব্ল্যাক লেগস্' প্রবেশ করাতে পারেনি। কিন্তু যে ধরনের চরম পর্যায়ে শেষ পর্যন্ত তারা গেল তা কেউ কল্পনা করতে পারেনি। ইউনিয়নের এ্যাসিস্ট্যাণ্ট সেক্রেটারী সুকুমার তখন পিকেট লাইনের ডিউটিতে ছিলেন। ১৫ নভেম্বর সকালে এমন সময় কারখানার ইঞ্জিনিয়ার ব্রাউন সাহেব লরী করে কারখানায় ঢুকিয়ে দেবার জন্য কিছু 'ব্ল্যাক লেগস্' নিয়ে এসে উপস্থিত হলেন। পিকেট লাইন দেখে লরী থেমেছিল। কমরেড সুকুমার বললেন, 'ব্ল্যাক লেগস্'দের ভিতরে যেতে দেওয়া হবে না। লরীর চালক ছিলেন একজন পাঞ্জাবী। তিনি বুঝে গিয়েছিলেন। ব্রাউন সাহেব বললেন চালাতে। ইতিমধ্যে সুকুমার এসে সামনে বাম্পার দু' হাতে ধরে লরীর সামনে আটকে দাঁড়িয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে সামনে দাঁড়িয়ে সেখান থেকে ম্যানেজার লো-সাহেব 'কাম্ অন্', 'কাম্ অন্' বলে ডেকে যাচ্ছে। ড্রাইভার চালাচ্ছে না দেখে পাশে উপবিষ্ট ব্রাউন সাহেব ড্রাইভারকে সরিয়ে দিয়ে নিজে স্টিয়ারিং ধরে সুকুমারের উপর দিয়ে গাড়ি চালিয়ে দিল।

সুকুমারের দেহের উপর দিয়ে গাড়ি চলে গেল। বিনয়দা কিছু দূরে কর্তব্যরত ছিলেন। কানে এল, 'মার দিয়া, মার দিয়া'। তিনি ঘটনাস্থলে ছুটে এলেন। কাছে রাণীগঞ্জের নামকরা ডাক্তার জ্যোতিষবাবু ছিলেন। বিনয়দা সাইকেলে করে গিয়ে তাঁকে ডেকে নিয়ে এলেন। ডাক্তার যখন এলেন তখনও প্রাণ একটু ধুক্ ধুক্ করছিল। কিন্তু মুহূর্তেই সব শেষ হয়ে গেল। ডাক্তার আর চিকিৎসার অবকাশ পেলেন না।

জেলার দুই প্রান্তে দুই আন্দোলন। পূর্বপ্রান্তে ক্যানেল কর বিরোধী আন্দোলন এবং পশ্চিমপ্রান্তে কাগজকল মিলের ধর্মঘট এবং ধর্মঘটের অন্যতম নেতাকে হত্যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আন্দোলন—এই দুইয়ে মিলে গণ-আন্দোলন সমগ্র জেলাকে মথিত করে তুললো। বস্তুতঃ সহানুভূতি ও সমবেদনা সারা দেশে প্রবাহিত হয়ে গেল। জেলার ভিতরে সমস্ত গণ-আন্দোলনের কর্মীরা একজোট হয়ে ধর্মঘট ও প্রতিবাদ প্রতিকারের আন্দোলনের সাফল্যের চেষ্টায় নেমে পড়লেন। পূর্বেই বলেছি, শ্রদ্ধেয় যাদবেন্দ্রনাথ পাঁজা মহাশয়কে সভাপতি এবং কমরেড শিবশঙ্কর চৌধুরীকে সম্পাদক করে উক্ত উদ্দেশ্যে বর্ধমান সদরে কমিটি গঠিত হয়। ধর্মঘটী শ্রমিকদের সাহায্যের জন্য হত্যার অপরাধী কোম্পানীর অফিসার ও কোম্পানীর বিরুদ্ধে মামলায় সাহায্যের জন্য সার্বিক প্রয়াস চলতে থাকে। জেলা কৃষক সমিতি, বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়নসমূহ প্রভৃতির কর্মীরা উক্ত কমিটির, রাণীগঞ্জের ট্রেড ইউনিয়নের কর্মীর সাহায্য ও সহযোগিতায় নেমে পড়েন। বর্ধমান সদরে গ্রামাঞ্চল থেকে বিশেষ করে সড্যা, সিঙপাড়া প্রভৃতি এলাকা থেকে পার্টি ও কৃষক সমিতির আহ্বানে রাণীগঞ্জে ধর্মঘটের স্বেচ্ছাসেবকের কাজে কর্মীরা যোগ দিলেন। তাঁরা রাণীগঞ্জের আশপাশ গ্রামে ও নদীর ওপারে মেজিয়া প্রভৃতি বাঁকুড়া জেলার পার্শ্ববর্তী ও নিকট-বর্তী গ্রামে প্রচার ও সাহায্য সংগ্রহ করতে থাকেন। কমরেড শম্ভু কোঙার, কমরেড শ্যাম সামন্ত প্রমুখ বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেন।

রাণীগঞ্জের স্ট্রাইকের অপূর্ব একনিষ্ঠতা ছিল শ্রমিক থেকে শুরু করে বাবুদেরও। সুকুমারের ঐভাবে নিষ্পেষণে নিহত হওয়ায় সবচেয়ে মথিত হয়েছিল মেয়েদের মন। নারী-শ্রমিকদের থেকে শুরু করে বাবুদের বাসায় বাসায় ঘরণী মেয়েদের মন বেদনায় মথিত ও উত্তেজিত। খুব শক্তিশালী ভূমিকা নেন দাসী বাউরিন, ভগবন্তিয়া প্রমুখ মহিলা-কর্মিগণ। এর ফলে মেহনতী মানুষের একটা সামগ্রিক ঐক্য গঠন করতে ও বজায় রাখতে অনেক সাহায্য হয়েছিল। নারী শ্রমিকদের মধ্যে উল্লিখিত দাসী বাউরিন ও ভগবন্তিয়ার সংগ্রামী দৃঢ়তা ও বলিষ্ঠতা আদর্শ হয়ে ওঠে। বর্ধমান জেলার সর্বত্র, বিশেষ করে বর্ধমান শহরে, স্ট্রাইকের সমর্থনে এবং মামলার খরচের ফাণ্ডের জন্য ব্যাপকভাবে সাহায্য সংগ্রহ হতে থাকে। বর্ধমানের উকিল-মোক্তারদের অনেকে তাঁদের সর্ব শক্তি ও সামর্থ্য দিয়ে মামলা পরি-চালনার দায়িত্ব বহন করেন। উল্লেখযোগ্য সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন শ্রদ্ধেয় শ্রীভবানীপ্রসাদ মজুমদার, তাঁর পুত্র উকিল শ্রীসরোজ মজুমদার, স্বনামখ্যাত

উকিল জনাব গোলাম মহিউদ্দিন, মোক্তার শ্রীরামাপতি ভট্টাচার্য, উকিল শ্রীদুর্গাপদ চৌধুরী প্রমুখ। পরামর্শের জন্য ছিলেন শ্রদ্ধেয় জনাব মহম্মদ ইয়াসিন সাহেব। এইভাবে রাণীগঞ্জের ধর্মঘটও সমগ্র জেলার এক সংগ্রামী গণ-আন্দোলনে পর্যবসিত হয়। ক্যানেল কর বিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে মিলে-মিশে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে একটি বড় গণতান্ত্রিক অভিযান গড়ে ওঠে। দীর্ঘ তিন মাস ধরে স্ট্রাইক চলতে থাকে। স্ট্রাইকের মাঝামাঝি সময়ে বিনয়দা ও নিত্যানন্দ পুলিশ কর্তৃক গ্রেপ্তার হন এবং আসানসোল জেলে তিন মাস থাকতে হয়। কমরেড আব্দুল মোমিন প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস থেকে ধর্মঘট পরিচালনায় সাহায্যের জন্য রাণীগঞ্জে আসেন এবং থাকেন। সাধারণের সাহায্য আর কতটুকু হতে পারে! ফলে দৈনিক অন্নসংস্থানের জন্য শ্রমিকদের ছড়িয়ে পড়ে নানান রকম কাজকর্ম করার চেষ্টা করতে হয়। এ বিষয়ে মধ্যবিত্তরা ছিলেন অসহায়। স্ট্রাইক দীর্ঘায়িত হওয়ায় কিছু দুর্বলতার প্রসার হয়। শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যেও এরূপ দুর্বলতা সংক্রমিত হতে থাকে। তবুও সামগ্রিকভাবে মনোবল ভাঙ্গেনি। স্ট্রাইক যখন ফয়সালা ব্যতিরেকে শেষ হলো, তা শেষ হলো শুধু অনশন, অর্ধাশনের ক্লেশে। সাধারণের সাহায্য সত্ত্বেও এত দীর্ঘদিন ধরে শুধু শত শত শ্রমিক পরিবারের খাবার যোগান কঠিন ছিল। সময়টা ছিল মন্দার সময়। সারা পৃথিবী জুড়ে অর্থ সংকট, ব্যাপক বেকারীর সংকট এক অনতিক্রম্য অভিশাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ অবস্থায় স্ট্রাইক চালিয়ে যাওয়ার অক্ষমতা সাময়িক হতাশ করলেও সহজেই তা কেটে যায় এবং শ্রমিক নতুন করে আন্দোলনের জন্য মনকে প্রস্তুত করতে থাকেন।

আশু লক্ষ্যে ব্যর্থ হলেও আন্দোলন নিষ্ফল হয়নি। সারা আসান-সোল মহকুমায় শ্রমিকশ্রেণীর কাছে জোট বাঁধার ডাক সঞ্চারিত হয়ে গিয়েছিল।

ইতিমধ্যে এল যুদ্ধ, সাম্রাজ্যবাদীদের পারস্পরিক যুদ্ধ। তারিখটা ১৯৩৯-এর ২রা সেপ্টেম্বর। সেই সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরোধিতা ছিল আমাদের সংকল্প। এই সংকল্পকে চূর্ণ করার উদ্দেশ্যে প্রথম আঘাত এলো শ্রমিক আন্দোলনের উপর। জেলা থেকে বহিষ্কৃত করার নির্দেশ সরকার থেকে দেওয়া হতে লাগলো। বহিষ্কৃত হলেন নিত্যানন্দ চৌধুরী, হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় (প্রাক্তন আন্দামান বন্দী) প্রমুখ আরও কয়েকজন। অবশ্য বর্ধমান সদরেও এরূপ বহিষ্কার করা হয়ঃ হরেকৃষ্ণ কোঙার, ছাত্র

ফেডারেশনের নেতা শান্তশীল মজুমদার, মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের প্রফুল্ল চক্রবর্তী প্রমুখ। বিনয়দারও বহিষ্কার আদেশ ছিল কিন্তু সে আদেশ সার্ভ করতে পারে নি—বিনয়দা আণ্ডারগ্রাউণ্ডে চলে যান। পরবর্তীকালে এ'রা আর কেউ বর্ধমানে ফেরেন নি। জেলার ভিতরে মন্তেশ্বর থানার কাই-গ্রামের জমিদার তীর্থ বসুর অনাচার ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে আন্দোলন করার জন্য বিপদবারণ রায় ও কমরেড শিবপ্রসাদ দত্ত (ওরফে আলুবাবু) মন্তেশ্বর থানা থেকে বহিষ্কৃত হন।

আমরা তখন গা-ঢাকা দেবার কৌশল নিয়েছি। আমরা ঠিক করলাম, কোন নিরাপদ জায়গায় জেলার বাইরে জেলার কেন্দ্রীয় অফিস ঠিক করবো। সাময়িকভাবে আমাদের অন্যরকম প্ল্যান করতে হয়। জেলা কেন্দ্র স্থাপনের উদ্দেশ্যে কমরেড বিনয় চৌধুরী এবং হরেকেষ্ট কলকাতা থেকে রওনা হন। মোগলসরাই প্যাসেঞ্জারে নিয়ামতপুরে যাবার উদ্দেশ্যে সীতারামপুরে অবতরণ করেন এবং স্টেশন থেকে পথ ধরে এগোন। ঘটনাচক্রে তাঁরা আই. বি.-র নজরে পড়ে যান। তাঁরা সীতারামপুরেই একটা চায়ের দোকানে চা খেতে ঢোকেন, পুলিশ তাঁদের সেইখানে ঘেরাও করে ও গ্রেপ্তার করে। চা খাবার সময় কমরেড হরেকেষ্ট বন্ধুবর ডাঃ অমরেশ রায়কে আড়ালে একটি চিঠি লিখে আর কিছু কাগজপত্র দিয়ে চায়ের দোকানের লোকটিকে ডাঃ রায়ের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। অনুরোধ রক্ষিত হয়, পুলিশ কিছু জানতে পারে না। যেহেতু হরেকেষ্টর উপর বহিষ্কারের আদেশ ছিল, তাই তা লঙ্ঘনের জন্য তাঁর জেল হয়। বিনয়দাকে বহিষ্কারের অর্ডার সার্ভ করতে পারেনি বলে তিনি মুক্তি পান। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকেও বহিষ্কারের অর্ডার দিয়ে দেওয়া হয়। বিনয়দা খড়্গপুর গেলেন এবং সেখানে কিছুদিন থাকলেন। খড়্গপুরে থাকাকালে কলকাতায় পি. সি-র সঙ্গে দেখা করার এনগেজমেণ্ট হয়। খড়্গপুর থেকে বিনয়দা রামরাজাতলা স্টেশনে এসে নামেন। পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী স্টেশন থেকে তাঁকে কলকাতায় আমার বাসায় নিয়ে আসি। গোপন জায়গায় মীট্ করার উদ্দেশ্যে কমরেড সুধীন ধর তাঁকে নিয়ে যান। তিনি এবং আরও কয়েকজন কমরেড ধরা পড়েন।

হরেকেষ্ট জেল থেকে বেরিয়ে এলে তাঁর বিবাহ হয়। এবার জেলা কমিটির গোপন কেন্দ্র ঠিক করা হয় কুমারডুবিতে। বিনয়দা, হরেকেষ্ট বিভাকে নিয়ে কুমারডুবিতে থাকেন। ব্যবস্থা করেছিলেন কমরেড হারিশ (১৯৪১ সালে তিনি মারা যান।)

পূর্বেই বলেছি, ১৯৪১ সালের জুন মাসে হিটলার কর্তৃক সোভিয়েত রাশিয়া আক্রমণের পর যুদ্ধের চরিত্র যায় বদলে। তখন আর সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ থাকে না অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদীদের পারস্পরিক যুদ্ধ থাকে না। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরোধিতা করা আমাদের কর্তব্য ছিল। কিন্তু হিটলার কর্তৃক সোভিয়েত আক্রমণের পর সেই যুদ্ধ জনগণের যুদ্ধ দাঁড়িয়ে গেল। এসব বুঝতে আমাদের কিছু বিলম্ব হয়েছিল। ১৯৪১ সালের শেষে এবং ১৯৪২ সালের গোড়ায় আমরা রণনীতি ও রণকৌশল পরিবর্তন করি। এখন ফ্যাসি-বিরোধী যুদ্ধে ফ্যাসিস্টদের পরাজয়ই লক্ষ্য দাঁড়িয়ে যায়। এখন সভা-সমিতি করার অধিকার প্রশস্ততর হলো। যাঁরা আণ্ডারগ্রাউণ্ডে ছিলেন তাঁদের বেরিয়ে আসা প্রয়োজন হলো। কিছুদিনের মধ্যেই বিনয়দা ও কমরেড হরেকেষ্ট বেরিয়ে এলেন। ১৯৪২ সালের ১৭ই আগস্ট পার্টি আইনসঙ্গত হলো।

এ সত্ত্বেও হয়রানি থেকে আমরা মুক্তি পাইনি। ১৯৪২-এর ৯ই আগস্ট বোম্বাই-এ গান্ধীজী ও কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ গ্রেপ্তার হন। ১৭ই আগস্ট আমরা কংগ্রেস অফিসে কংগ্রেস জেলা কমিটির সভা আহ্বান করেছিলাম। ঠিক ছিল সভায় একটি নির্ধারিত প্রস্তাব পাশ করেই সভা শেষ করে দেওয়া হবে এবং তখনই কংগ্রেস অফিস ছেড়ে সব বেরিয়ে যেতে হবে যাতে পুলিশ গ্রেপ্তার করতে না পারে। রচিত প্রস্তাবে ছিল, আন্দোলনকে যে পথে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তা কংগ্রেসের নির্দেশিত ছিল না। কংগ্রেস নেতাদের মুক্তি দাবি করা হয়, বলা হয়, ফ্যাসি-বিরোধী যুদ্ধে জয়কে লক্ষ্য রেখে জাতীয় ঐক্য গড়ে তুলতে হবে। সবাই বেরিয়ে পড়তে সক্ষম হন, কিন্তু কমরেড শিবশঙ্কর চৌধুরী ও কমরেড বিশ্বনাথ সেন ধরা পড়েন। পরে কমরেড বিশ্বনাথ সেন মুক্তি পান। কমরেড শিবশঙ্কর চৌধুরী জামিনে থাকেন। শেষে কিছু ঝঞ্ঝাটের পর তিনিও মুক্তি পান।

বিনয়দাকে পি সি-র সঙ্গে মীট করতে বলা হয়। তিনি পি. সি.-র নির্দেশ মতো কলকাতা চলে আসেন ও আমার ওখানে ওঠেন। বিনয়দা ট্রেন থেকে নামলে আমি তাঁকে বাড়িতে নিয়ে আসি। এর বর্ণনা উপরে দিয়েছি। এখানে কিছু পুনরাবৃত্তি হয়ে গেল।

এবার ছাড়া পেলে বিনয়দা হাওড়ার ফণীদার (ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়) সঙ্গে দেখা করে ঝরিয়া চলে যান। এই প্রসঙ্গে একটা কথা যোগ দেওয়া ভাল। কলকাতায় কমরেড হেলারামের যখন কঠিন অবস্থা

চলছে, কমরেড হেলারামকে ফণীদা মাসিক ১০ টাকা করে সাহায্য করতেন। আমি গোপনে গিয়ে নিয়ে আসতাম। এখন তাঁর কাছে আবার আর এক সাহায্য পাওয়া গেল। তিনি বিনয়দাকে কিছুদিন ঝরিয়ায় থাকার ব্যবস্থা করে দেন। সেখান থেকে ফিরে মগমা স্টেশনের নিড়শায় একটা ঘর নেন। এখান থেকে জি. টি. রোড কাছে। ওখানে অল্প কিছুদিন থাকার পর স্থায়ীভাবে কুমারডুবিতে থাকেন। কমরেড হরেকেষ্ট এর মধ্যে বিয়ে করেন। বিবাহ ও অনুষ্ঠানের পর যেটুকু সময় দিতে হয় সেইটুকু দেন ও পরে তাঁর স্ত্রী বিভাকে নিয়ে কুমারডুবি চলে আসেন। এখান থেকেই জেলা কেন্দ্রের কাজ চালানো হয়। আগেই বলেছি, ১৯৪১ সালে হিটলারের রাশিয়া আক্রমণের পর কিছুদিন বাদে আমাদের নীতি ও কৌশল পরিবর্তিত হয়। অবস্থাটা বুঝতে এবং প্রয়োজনীয় নীতি ও কৌশল বদলাতে আমাদের বেশ কয়েক মাস লেগে যায়। ১৯৪১-এর শেষের দিকে ও ১৯৪২-এর গোড়ার দিকে নতুন দিকস্থিতিতে আমরা প্রকাশ্যে কাজ শুরু করি। বিনয়দা প্রকাশ্যে বেরিয়ে এলেন। কমরেড হরেকেষ্টও সেই মতো করলেন। এবার খোলাখুলি ভাবেই বর্ধমান থেকে জেলা কমিটির কাজকর্ম চলতে লাগল।

১৯৪০ সালের শেষে ১৯৪১ সালের গোড়ায় কমরেড বিজয় পাল বর্ধমান জেলায় এসে পার্টির কাজে যোগদান করেন। বিনয়দার সঙ্গে একসঙ্গে আলিপুর জেলে ছিলেন। পরে জেল থেকে বেরিয়ে এসে উভয়ের যোগাযোগ বজায় ছিল। এক সময় তাঁর বহিষ্কারের আদেশ ছিল একাধিক প্রদেশ থেকে—যেমন বাংলাদেশ, বিহার, উত্তরপ্রদেশ, দিল্লী প্রভৃতি। পরে এই নির্দেশ বলবৎ থাকে শুধু কলকাতা আর হাওড়ার ক্ষেত্রে। এই নির্দেশ বজায় থাকে স্বাধীনতা পর্যন্ত। এখন বর্ধমান জেলায় তাঁর থাকার কোন বাধা ছিল না।

পূর্বেই বলেছি, শচীদা ও রেণু বৌদি কুলটিতে এসে হোটেল খুলে বসেছিলেন। উদ্দেশ্যের কথাও বলেছি। কমরেড বিজয় পাল প্রাথমিক কর্মসূত্রে এঁদেরই অবলম্বন করেন। এই সময় তিনি কারখানার শ্রমিকদের মধ্যে এবং কুলটির নাগরিকদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন। পরবর্তীকালে আমি যখন বরাকরে কমরেড শিবপ্রসাদ দত্ত (আলুবাবু)-র কাছে আসি এবং কুলটিতে ঘুরি, তখন এঁদের কয়েকজনের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়। (নীচে এর বিবরণ আছে।)

কুলটিতে থাকতে থাকতেই কমরেড বিজয় পাল কোলিয়ারী শ্রমিকদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করেন। পরে তিনি এ'দের মধ্যেই সংগঠন করতে থাকেন। এই সূত্রে এস. ভিক্টোরিয়া কোলিয়ারীতে বিশেষ যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করতে পারেন। মানবেড়িয়া কোলিয়ারী অফিসকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন কোলিয়ারীর মধ্যে ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন করেন।

বলা বাহুল্য, কৃষক আন্দোলনের ক্ষেত্রে আমি প্রত্যক্ষ যেভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলাম, কোলিয়ারীর ট্রেড ইউনিয়ন ক্ষেত্রে তা ছিলাম না। রাণীগঞ্জ, বার্ণপুর, আসানসোলে বিভিন্ন কর্মসূত্রে মাঝে মাঝে আসা-যাওয়া করতে হয়েছে। বরাকরও বার দুই-তিন এসেছি। কিন্তু কোলিয়ারী শ্রমিকের আসল কর্মক্ষেত্রে সাক্ষাৎ আমার নিজের কোন যোগাযোগ ছিল না। আমাদের পুরোনোদের মধ্যে বিনয়দা ও আলুই তখনকার কথা লিখতে পারতেন। কমরেড বিজয় পাল এসে যোগদানের পর থেকে তিনিই ভাল করে লিখতে পারবেন। সেজন্য আমি আর এ বিষয়ে বেশিদূর এগোলাম না।

১৯৪৩ সালে (বাংলা ১৩৫০) আমরা যখন বর্ধমানে আন্দোলন নিয়ে ব্যস্ত, তখন আসানসোলেও কাজে জোর দিতে হলো। বর্ধমান থেকে কমরেড মাহিন্দ্রকে খাদ্য আন্দোলন ও তার সঙ্গে যুক্ত করে বার্ণপুরে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য পাঠানো হলো। তিনি ছিলেন হায়দ্রাবাদের অধিবাসী। বিশ্বভারতীতে পড়তে এসেছিলেন। ১৯৪২ সালে ছাত্র আন্দোলনে জড়িত হয়ে বিশ্বভারতী থেকে বিতাড়িত হন এবং বর্ধমানে আসেন। তখন আমরা জেলা কংগ্রেস অফিস আবার খুলেছি। মাহিন্দ্র এসে পরিচয় করলেন। দেখলাম, হায়দ্রাবাদের মানুষ বলে পরিষ্কার উর্দু বলেন, আবার বিশ্বভারতীতে থাকায় বাংলাও শিখে ফেলেছেন। ছাত্র আন্দোলনের আমাদের সব কর্মীদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করিয়ে দিলাম। তিনি ছাত্র ফেডারেশনের কর্মী হয়েছিলেন। তিনি তখন বর্ধমান কলেজের ছাত্র। যাই হোক, ছাত্র আন্দোলনে লিপ্ত হয়ে কিছুদিন কাটাবার পর তিনি পার্টিরই কর্মী হয়ে যান। আসানসোলে গোড়া থেকে যা কিছুই আন্দোলন বিনয়দার (বিনয় চৌধুরী) দ্বারাই সূচিত। বস্তুতঃ, অনেকদিনই আসানসোলের দায়িত্ব তাঁর উপরই ছিল। বিনয়দা মাহিন্দ্রকে নিয়ে গিয়ে বার্ণপুরে বসিয়ে দিলেন এবং আসানসোল শহরেও যোগাযোগ

করে দিলেন। আসানসোলে কিভাবে একটা মহকুমা ফুড কমিটি গঠন করা যায় তার দিকে আমরা নজর দিলাম। মাহিন্দ্রকে নিয়ে শহরের কয়েকজন বিশিষ্ট নাগরিকের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করলাম। আলু (কমরেড শিবপ্রসাদ দত্ত) তখন কোলিয়ারী ওয়ার্কার্স ইউনিয়নে কাজ করেন ও বরাকরে থাকেন। তিনিও ওখান থেকে কুলটিতে ফুড কমিটি গঠন করার চেষ্টা করছিলেন।

কি রকম দৈহিক কষ্টে আমাদের কর্মীদের এসব জায়গায় কাজ করতে হতো তার দৃষ্টান্ত কমরেড আলুর দৈনন্দিনের কাজের মধ্যেই পাওয়া যেত। সকালবেলা একটু চা তৈরি করে খেয়ে ইক্‌মিক্‌ কুকারে দু'জনের মতো চাল, ডাল, আলু চড়িয়ে দিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লাম। কুলটিতে গেলাম। যেমন সব কারখানাতে হয় এখানেও তেমনি। মাঝখানে কারখানা ও তার চারিপাশে মানুষের বাস—শ্রমিকসহ সাধারণ মানুষ। চারপাশটাই ঘুরলাম এবং বিশিষ্ট নাগরিক, যেমন ডাঃ অপরেশ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ, যাঁদের নিয়ে আলু ফুড কমিটি করতে চান তাঁদের সঙ্গে দেখা করলাম। প্রচণ্ড রৌদ্রের তাত মাথায় নিয়ে বেলা একটা নাগাদ আলুর বাসায় ফিরলাম। এবার স্নান পর্ব। ছোট বালতি আর মগ নিয়ে দু'জনে বরাকর নদীর উত্তপ্ত বালুর উপর দিয়ে গিয়ে প্রয়াস শুরু করলাম। বালু খুঁড়ে গর্তে জল পেলাম, সেই জল মগে করে বালতিতে তুলে এক একজন স্নান করে নিলাম। তারপর খেয়ে আঁচাবার জন্য বালতিতে জল নিয়ে বাসায় ফিরলাম। তারপর ইক্‌মিক্‌ কুকার থেকে খাবার নামিয়ে খাওয়া-দাওয়া করলাম। আলুকে আবার বিকেলে বেরোতে হতো মজুরদের সঙ্গে দেখা করতে -সন্ধ্যা তক শ্রমিক যাঁরা আসতেন তাঁদের সঙ্গে কাজের কথা কইতে। আমার তো না হয় দু'দিনের ব্যাপার, আলুর ছিল রোজানা। আসানসোলে একবার প্রভাত (শহীদ প্রভাত কুণ্ডু) প্রেসিডেন্ট ছিলেন। নিকলস্‌ রোডে একটা দোকানঘর নেওয়া হয়েছিল। প্রভাতকে জিজ্ঞেস করলাম, 'স্নান কর কোথায় ?' প্রভাত বললেন, 'মিউনিসিপ্যালিটির কলে'। এ অবশ্য আরামেই করা যায়। কিন্তু জিজ্ঞেস করলাম, 'প্রাতঃকৃত্য ?' বললেন, 'ভোরে অন্ধকার থাকতে থাকতে মিউনিসিপ্যালিটির ড্রেনে।' গ্রামে তবু খোলামেলায় থাকা যায়। তখন বর্ধমানের পশ্চিমাংশে শহর ও খনি অঞ্চলে এইভাবে খুবই কষ্ট করে সংগঠন করতে হয়েছে।

এই রকম কষ্ট সহ্য করে আলুকেও কাজ করতে হয়েছে। কোলিয়ারী এলাকায় পর পর কয়েকটি জায়গায় তিনি কাজ করেন। শেষে ছিলেন

জামুড়িয়াতে। এইভাবে কমরেড বিজয় পালকেও অনেক কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছে, সে কোলিয়ারীতেই হোক বা অন্যত্রই হোক। ১৯৫৫ সালেও আমি তাঁকে দেখেছি আসানসোল শহরে বস্তিতে থাকতেন এবং থাকার ব্যাপারে ততো কষ্ট না হলেও খাওয়ার ব্যাপারে খুবই কষ্ট ছিল। কোন কোন সময়ে বুঝেছি, অন্য সাথীকে বুঝতে না দিয়ে নিজের রান্না করা ভাত তাঁকে খাইয়ে দিয়েছেন এবং বাজারে গিয়ে হয়তো একটা রুটি-কাবাব খেয়ে থেকে গেছেন। লাগাতার এই রকম নানান্ কষ্ট স্বীকার করে তাঁর শরীর ভেঙ্গে গিয়েছিল এবং মাঝে মাঝে বেশ কিছুদিন তাঁকে হাসপাতালে ও ঘরে শয্যাশায়ী হয়ে থাকতে হয়েছিল।

প্রসঙ্গতঃ, আলুকে একবার আসানসোল জেলেও দণ্ডভোগ করতে হয়েছিল। বিনয়দার নির্দেশ অনুযায়ী তারাপদ মোদক একটি গেস্‌টেট্‌নার মেশিন আসানসোলে পাঠিয়ে দেন। আলু সেটা নিতে এসে গ্রেপ্তার হন। দণ্ডিত হওয়ার ফলে কয়েক মাস আসানসোল জেলে কাটাতে হয়। গেস্‌টেট্‌নার মেশিনটিও বাজেয়াপ্ত হয়।

বার্ণপুরে ইউনিয়ন হবার পর ১৯৪৩ সালে ব্যাপ্তিতে ও গভীরে ইউনিয়নের কাজ অনেক বেড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে অফিসের কাজও খুব বেড়ে গেল। কিছু রাজনৈতিক কৌশলও দরকার। বিনয়দা রঞ্জিতকে (কমরেড রঞ্জিত গুহ) নিয়ে গিয়ে বার্ণপুরে বসিয়ে দিলেন। রঞ্জিত গুহের বুঝে-সুঝে শত্রুর কৌশলের জবাবে যথাযথ কৌশল প্রয়োগের ক্ষমতা ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তিনি কিছুদিন পরেই 'ইরিসিপ্লাস' বা জহর মোরা রোগে আক্রান্ত হলেন। আসানসোলের ডাক্তারদের দেখানো হলো। সকলেরই অভিমত, কলকাতায় মেডিকেল কলেজে নিয়ে যেতে হবে। রোগীকে কলকতার হাসপাতালে নিয়ে আসা হলো। তখন রোগ এতদূর বেড়ে গেছে যে তাকে আর সামলানো গেল না।

পূর্বেই বলেছি, বর্ধমানে ছাত্রদের একটা গ্রুপ আমাদের সমর্থনে গড়ে উঠেছিল। কমরেড প্রভাতের মতো কমরেড রঞ্জিতও তার অন্যতম। রঞ্জিত গুহর কাকা মণি গুহ ল্যাণ্ড এ্যাকুইজিশন ডিপার্টমেন্টে কাজ করতেন। রঞ্জিত ছোট থেকেই পিতৃহারা, কাকার কাছে থেকেই লেখাপড়া করতেন। তাঁর কাকা মণিবাবু একদিন এসে আমাকে বললেন, পুলিশ ইতিমধ্যে ও'র (রঞ্জিতের) সম্বন্ধে নানান রকম প্রশ্ন ও'কে (মণিবাবুকে)

করেছে। বললেন, "আপনাদের কাজ ছাড়তে আমি বলতে পারবো না। ভাল কা. ই তো করছে। কিন্তু আমার চাকরির ভয় হয়েছে।" আমাকে অনুরোধ করলেন. "অন্য কোথাও থেকে পড়াশুনা করতে পারে তো. আপনি একটু দেখুন।" আমি রঞ্জিতকে জিজ্ঞেস করলাম, আমাদের বাড়িতে থাকতে তাঁর কোন অসুবিধা আছে কিনা। তিনি বললেন, নেই। আমাদের বাড়ির বাইরে একটা ছোট কামরা খালি ছিল। আমি তাঁকে বললাম. "বরিয়াবস্তর নিয়ে এই কামরায় এসে পড়।" তিনি এলেন। এখানে এসে নিশ্চিন্ত হয়ে রাজনৈতিক কাজকর্ম জোরদারভাবে করতে লাগলেন। কয়েক মাসের মধ্যেই জেলা থেকে বহিষ্কারের আদেশ তাঁর উপর দেওয়া হলো। কলকাতায় তিনি আমার বাসায় থাকতে লাগলেন। কলকাতায় আমি ট্রেড ইউনিয়ন কমরেডদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম। শেষকালে কাঁচড়াপাড়া থেকে আমন্ত্রণ এলো এবং সেখানেই তিনি কাজে যোগদান করলেন। ১৯৪৩ সালে বিনয়দার আহ্বানে তিনি বার্ণপুরে এসে যোগ দিলেন। এখানে খুব ভালভাবেই কাজ করছিলেন এবং অল্প দিনের মধ্যেই সাধারণ শ্রমিকদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পেরেছিলেন। মাস ছয়-আট কাজ করতে করতে তাঁর ইরিসিপ্লাস হয় এবং তাতেই তাঁর মৃত্যু হয়।

চল্লিশ দশকের এই সময়টা কোলিয়ারী শ্রমিকদের মধ্যে আমাদের কাজও বেশ লক্ষণীয়ভাবে অগ্রসর হলো। কোলিয়ারীতে যেসব স্থানে ইউনিয়ন তৈরি হয়েছিল তা হচ্ছেঃ (১) বাকসুমুলিয়া, (২) শ্রীপুর, (৩) জামুড়িয়া গ্রুপ, ডিসেরগড়, (৪) লালবাজার ও (৫) বালতোরিয়া কোলিয়ারী (West Victory Colliery)।

প্রসঙ্গতঃ, সুরেশ পাল বর্ধমানের কমরেডদের সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করে আসানসোলে ট্রেড ইউনিয়নের কাজ করতে চান। তিনি পুরাতন রাজবন্দী ছিলেন এবং কাজকর্মে যোগ্যতা দেখাবেন এ আশা আমাদের ছিল। কিন্তু কিছুদিন বাদেই জেলা কমিটির কাছে নানা রকম রিপোর্ট আসতে লাগল, যাতে আন্দাজ করা গেল তিনি আদর্শের পথে আর চলতে প্রস্তুত নন—সোজা কথায়, তখন তাঁর পতন হয়েছে। জেলা কমিটি আমাকে তদন্ত করতে ভার দেন। আমি আসানসোল-বার্ণপুরের সমস্ত নেতৃস্থানীয় কমরেডদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করি। তদন্তে সুরেশ পালের বিরুদ্ধে সমস্ত অভিযোগ প্রমাণিত হয়। এর ফলে ১৯৪৮ সালে জেলা কমিটি তাঁকে পার্টি থেকে বহিষ্কার করে। অব্যবহিত পরেই কোনরকম যোগসাজস করে

তিনি 'লেবার ওয়েলফেয়ার অফিসার' হন। জেলা কমিটি তাঁর বিপথে চলা ঠিকই ধরেছিলেন, এতে আরও প্রমাণিত হলো।

মহিন্দ্র সামাজিক মেলামেশায় খুব পটু ছিলেন। ধীরে ধীরে ভালো-ভাবেই বার্ণপুরে ট্রেড ইউনিয়ন গঠিত হলো। বর্ধমানে এ আর পি (এয়ার রেড প্রি-কশন) গুটিয়ে ফেলায় আমোদদার চাকরি ছিল না। বেকার ছিলেন। ওদিকে বার্ণপুরে পত্রাদি লেখালেখি ইত্যাদি ব্যাপারে ট্রেড ইউনিয়নের কাজ যথেষ্ট বেড়েছিল। আমোদদাকে বলা হলো এবং তিনি গিয়ে যোগ দিলেন। কলকাতা থেকে নীরদদা (কমরেড নীরদ চক্রবর্তী) এলেন আমাদের সাহায্য করতে। এইভাবেই কাজকর্ম চলছিল। মালিক পক্ষ বেপরোয়াভাবে শ্রমিকদের দাবি অগ্রাহ্য করছিল। স্বনামখ্যাত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র অশোক চট্টোপাধ্যায়, লেবার ওয়েলফেয়ার অফিসার, ছিলেন তাদের কর্মচারী ও মন্ত্রণাদাতা। নানান্ কৌশলে তিনি নিরন্তর শ্রমিকদের ঐক্য ভাঙ্গার অপচেষ্টা করে যেতেন। অপ্রত্যাশিত জায়গা থেকে তিনি পেয়ে গেলেন সাহায্য। শ্রমিকদের জোর দাবি, স্ট্রাইক করতে হবে। আমরাই সেই দাবিকে সুসংগঠিত করে রূপ দিয়েছি। এমন সময় এলো ১৯৪৫ সালের নির্বাচন। কমরেড ইন্দ্রজিত গুপ্তকে প্রার্থী করা হয়েছিল। ব্যবস্থা কি করা যাবে না যাবে তা নির্দেশ দেওয়ার জন্য এলেন কমরেড রণেন সেন। এখন যা অভিজ্ঞতা হলো পূর্বে তা উল্লেখ করেছি, কিন্তু এখানে পুনরাবৃত্তিতে দোষ নেই। র‍্যাঙ্ক এণ্ড ফাইল এবং জেলা কমিটির প্রবল প্রতিবাদ উপেক্ষা করে তিনি স্ট্রাইক বন্ধ করার নির্দেশ দিলেন। তাঁর যুক্তি হলো, স্ট্রাইক করলে পার্টির সব শক্তি তাতে আবদ্ধ হয়ে যাবে, নির্বাচনে কাজের লোক পাওয়া যাবে না। আমাদের মনে হয় তাঁর যুক্তি ভুল, কিন্তু পার্টি সংগঠনের নিয়মে তাঁর নির্দেশ মানতে হলো। ফল যা হবার হলো—নির্বাচনেও হারলাম, আর ট্রেড ইউনিয়নও হাত থেকে বেরিয়ে গেল। অবশ্য একথাও সত্য, ১৯৪৫ সালের নির্বাচনে সদ্য জেল থেকে মুক্ত কংগ্রেস নেতাদের বক্তৃতা ও আমাদের নিন্দার মাধ্যমে সাধারণ অনবহিত মানুষকে বিভ্রান্ত করার প্রয়াসে কংগ্রেসের পক্ষে এক অনুকূল হাওয়া বাত্যার মতো বয়ে গিয়েছিল।

তবে নির্বাচনে জয় করার জন্য আমরা প্রচুর চেষ্টা করেছিলাম। কমরেড বিজয় পালের নেতৃত্বে স্থানীয় কর্মীদের অকাতর চেষ্টা তো ছিলই, বাইরে থেকেও স্বেচ্ছাসেবক পাঠানো হয়েছিল। তাঁরাও কঠোর পরিশ্রম

করেছিলেন। নির্বাচনের দিন আমরা বুথ ম্যানেজ করার জন্য বর্ধমান ও কাটোয়া থেকে লরী করে স্বেচ্ছাসেবক নিয়ে গিয়েছিলাম। কংগ্রেসের শীলতাবর্জিত প্রচার, যেখানে সেখানে হিংস্র আক্রমণ—এসব দেখে আমরা বুথ আক্রমণ আশঙ্কা করেছিলাম এবং সেইভাবে স্বেচ্ছাসেবকদের প্রস্তুত থাকতেও বলেছিলাম।

কাজোরা কোলিয়ারীতে ছোরা গ্রামকে কেন্দ্র করে একটা এলাকার ভার কমরেড হরেকৃষ্ণ নিয়েছিলেন। নির্বাচনের আগের দিন কংগ্রেস কর্তৃক নিয়োজিত নৃশংস গুণ্ডারা আমাদের অফিস আক্রমণ করে। কমরেড হরেকৃষ্ণসহ কিছু কর্মীকে হত্যা করার চেষ্টা করে। কমরেড হরেকৃষ্ণ কোঙার এবং কয়েকজন কর্মীর দৃঢ় প্রতিরোধের ফলে তাদের পূর্ণ সংকল্প ব্যর্থ হয়। কিন্তু কমরেড হরেকৃষ্ণ কোঙার প্রচণ্ডরূপে আহত হন। তাঁর একটি পা ভেঙ্গে গিয়েছিল। আমি যখন বর্ধমানের কর্মীদের নিয়ে পৌঁছালাম তখন তাঁকে বেদনায় অত্যন্ত কাতর দেখলাম। কমরেডরা তাঁকে স্থানান্তরিত করার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু তাঁর দৃঢ় সংকল্প অনুযায়ী সেই পোলিং-এর দিনটা তিনি থেকে যান।

আর একটি ঘটনা—সামান্য কয়েক মুহূর্তের হলেও তার গুরুত্ব অলক্ষিত থাকা উচিত নয়। বৃটিশ আমলের পুরাতন রাজনৈতিক বন্দী মেদিনীপুরের কমরেড অজিত মিত্র ছিলেন আমাদের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর নায়ক। কমরেড অজিত মিত্র তাঁদের করণীয় সম্পর্কে স্বেচ্ছাসেবকদের পরামর্শ দিলেন। শেষে বললেন, একজন কমরেডের প্রয়োজন যিনি দৃঢ়ভাবে প্রাণ দেবার জন্য প্রস্তুত থাকবেন। তালিতের প্রয়াত কমরেড গঙ্গাধর ভট্টাচার্য লাফিয়ে উঠে নিজের নাম দিলেন। তাঁর উপর ন্যস্ত কর্তব্য তিনি দৃঢ় ও শান্তভাবেই পালন করেছিলেন। অবশ্য আশঙ্কিত আক্রমণ না হওয়ার কিছু ঘটেনি।

সেদিন নির্বাচনের দিন আমরা কারোরই খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করতে পারিনি। এমন কি ভালো ব্যবস্থা করতে না পারলে তখন পানীয় জল পাওয়াও খুব কষ্টকর ছিল। আমি বেশ কিছু কর্মী নিয়ে গ্র্যাণ্ড কাজোরার পোলিং বুথে ডিউটিতে ছিলাম। সকলেই উপোস আছি এবং উপোস থাকার জন্য প্রস্তুত হয়েই গিয়েছিলাম। কিন্তু তেষ্টায় খুব কাতর হয়ে পড়েছিলাম। পোলিং-এ সরকারী তরফে যাঁরা বর্ধমান থেকে ডিউটিতে এসেছিলেন তাঁরা সবাই আমাকে ভালোভাবে চেনেন। রিসেস্-এর সময় আমাদের খাবার ব্যবস্থা নেই বুঝে তাঁরা খুব অস্বস্তিতে

পড়েছিলেন। আমাকে তাঁদের খাবারের ভাগ নিতে বললেন। আমি বললাম, "আমাদের সকলকেই আজ উপোস থাকতে হবে, জেনেশুনেই প্রস্তুত হয়ে এসেছি, রাত্রে আসানসোলে গিয়ে কিছু খাব। সুতরাং আপনারা আশ্বস্ত হয়ে খান।" আরও বললাম, "তাছাড়া আপনারা সরকারী কর্মচারী, সুতরাং ভোটের কাজে এসে এই সামান্য মানবিক সৌজন্য করলেও কংগ্রেস পক্ষ আপনাদের বিরুদ্ধে লাগবে।" তবে পানীয় জল আমরা কয়েকজন তাঁদের কাছ থেকে নিয়ে খেলাম।

বিনয়দা বরাকর অঞ্চলে ডিউটিতে ছিলেন। পোলিং-এর সময় কংগ্রেস-ওয়ালাদের হৈ-হামারী থাকলেও বিশেষ কিছু ঘটেনি। কিন্তু ঘটলো পোলিং-এর পর।

বরাকরে মানবেড়িয়া অফিসকে কেন্দ্র করে বর্ধমান এবং হাটগোবিন্দপুর অঞ্চলের কিছু Volunteer কাজ করছিলেন। সেই অফিসের উপর আক্রমণের আশঙ্কার খবর পেয়ে বিনয়দা কয়েকজন লোককে নিয়ে একটি গাড়ি করে Volunteer-দের অন্য জায়গায় সরাবার ব্যবস্থা করবার জন্য যান। তিনি ব্যবস্থা করে যখন ফিরছেন তখন কংগ্রেসীরা এক লরী গুণ্ডা-শ্রেণীর লোক নিয়ে তাঁর গাড়ী আটকায় এবং লাঠি চালাতে আরম্ভ করে ও ইট ছুড়তে আরম্ভ করে। এতে বিনয়দা মাথায় আঘাত পান এবং আরও কয়েকজন আহত হন। ইতিমধ্যে শার্টক্লিপ সাহেব Addl. S. P. এসে পড়ায় আক্রমণকারীরা পালিয়ে যায়।

নির্বাচনের পর এবং বার্ণপুর ইউনিয়ন হাত থেকে চলে যাবার পর আবার আমাদিগকে ধীরে ধীরে কাজ শুরু করতে হলো। কমরেড বিজয় পাল এবং যে কয়েকজন কর্মী তখন কাজ করছিলেন, তাঁদের অকাতর পরিশ্রম করতে হতো। কিন্তু অচিরেই আমাদের পরিশ্রম যে ফলপ্রসূ হচ্ছে তার সাক্ষ্য দেখা দিল। সব ফ্রণ্টেই পার্টির অগ্রগতি শুরু হলো। কোলিয়ারী শ্রমিকদের মধ্যে বেশ চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছিল।

কমরেড বিজয় পালের নেতৃত্বে কমরেড রবীন চ্যাটার্জী প্রমুখ পার্টি কর্মীদের সক্রিয় ভূমিকা ও চাঞ্চল্যকে সংগঠিত রূপ দেবার চেষ্টা করেছিলেন। সীমিত এলাকায় হলেও অগ্রগতি হচ্ছিল।

মগমা ঃ একটি সরস অভিজ্ঞতা

বিনয়দা যখন জেলার পশ্চিম দিকে জেলা কমিটির কেন্দ্র স্থাপনের চেষ্টা করছিলেন, পশ্চিমবাংলার সীমানার বাইরে বিহারে কোন নিকটবর্তী এলাকায় জেলা কমিটির কেন্দ্র করা যায় কিনা যখন তাই দেখছিলেন, তখন মগমার কাছে নিড়শা গ্রামে একটি ঘর পাওয়া গিয়েছিল। বিনয়দা, হরেকেষ্ট এবং একজন কর্মী (বিনয়দার মাসতুতো ভাই) এই নিয়ে মগমায় সেই বাসায় জেলা কমিটির কেন্দ্র স্থাপিত হলো। এখানে জেলা কমিটির একটি সভা অনুষ্ঠিত হবার কথা আমার মনে আছে। এর মধ্যে একটি সরস ঘটনা ঘটেছিল, যা আমার মনে হয় পাঠক উপভোগ করবেন।

আমি নিড়শায় জেলা কমিটির সভায় আহূত হয়ে মগমা যাত্রা করলাম। মগমা হচ্ছে বরাকর পেরিয়ে গয়া লাইন অর্থাৎ গ্র্যাণ্ড কর্ড লাইনে ছোট একটি স্টেশন। বিনয়দার নির্দেশ ছিল মেন লাইনে রূপনারায়ণপুর পেরিয়ে দেঁদুয়া স্টেশন নামতে, সেখান থেকে লোক এসে আমাকে গন্তব্যস্থলে নিয়ে যাবেন। হাওড়া স্টেশনে রাত্রে মোগলসরাই প্যাসেঞ্জারে উঠলাম। যথেষ্ট সতর্কতা নিয়েছিলাম। কাছের একটা স্টেশনের টিকিট নিয়েছিলাম, যাতে সন্দেহজনকভাবে টিকিট চেকিং হলে, আই. বি. অনুসরণ করেছে বুঝতে পারলে, সেই টিকিট দেখিয়ে নেমে পড়ব।

গাড়ীতে ওঠার সময় কামরায় বাঙালী আছে কিনা দেখে নিচ্ছিলাম। উদ্দেশ্য বাঙালী থাকলে সেটায় উঠব না। এ গাড়ীতে থাকে বিহারের গ্রামের অধিবাসীরা। বাঙালী দু'চারজন ছড়িয়ে ছিটিয়ে। বাঙালী যাত্রীর পাশে বসলেই কথাবার্তা কইতে হবে, নাম থেকে শুরু করে পেশা ইত্যাদির সম্বন্ধে প্রশ্নাদির সম্মুখীন হতে হবে, সেইজন্য এই ঝামেলা এড়ানোর চেষ্টা। একটি কামরায় দেখলাম বাঙালী একদম নেই, বসার মতো কিছু জায়গাও খালি আছে। আই. বি.-র জন্য প্ল্যাটফর্মের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখছিলাম, এমন সময় গাড়ি ছাড়ল। নিশ্চিন্ত হলাম। গাড়ি ছাড়ার পর কয়েক মিনিটের মধ্যেই বাথরুমের দরজা খুলল এবং একজন বাঙালী ভদ্রলোক!

ভাবলাম, ফাসাদ হলো। পাশে তাঁর জায়গা ছিল, এসে বসলেন। বললেন, "যাকগে মশায়, কথা কওয়ার লোক পাওয়া গেল।" (আমার তো সেই ভয়!) আলাপ হওয়ার পর বুঝলাম, খুব অসুবিধা হবে না। ভদ্রলোক নিজেই কথা কইতে ভালবাসেন। আমাকে কিছু মিথ্যা কথা বলতে হলো। বৈপ্লবিক কাজের প্রয়োজনের তাগিদে মিথ্যা বলতে আমি ওস্তাদ বললেই হয়। ব্যবসায় মন্দার অবস্থা তখনও চলছে। কয়লা বিক্রীতেও সঙ্কট তখনও চলছে। তাই বনে গেলাম কয়লার দালাল। বললাম, "কলকাতার আশেপাশে ঘুরি একটু বড় রকমের খদ্দেরের সন্ধানে, আর এধারে আসি কয়লা খনির মালিক ও কর্মকর্তাদের কাছে।" এইভাবে গল্পের মুখপাত করে দিলাম। বলেছিলাম, দূরে নামবার কথা। দেঁদুয়া এসে প্ল্যাটফর্মে গাড়ি ঢুকছে যখন, তখন হঠাৎ উঠে পড়লাম। ভদ্রলোক বললেন, 'কি হলো?' আমি বললাম, "একজন চেনা লোককে যেন দেখলাম।" দরজায় একটু মাথা ঝুঁকিয়ে দেখে ছুটে এসে পুটলিটা নিয়ে বললাম, "মশাই যাচ্ছি। এই লোকটার সঙ্গে আমার খুব দরকার তাই নামতে হচ্ছে।" তিনি পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। আমি বললাম, "ট্রেন ছাড়বে, এখন তো কথা বলতে পারবো না। আমাদের দালালদের এই রকম কাজ।" দ্রুত দরজায় এসে নেমে পড়লাম। অবশ্য আগেই দেখতে পেয়েছিলাম, কমরেড দাশরথি চৌধুরী আমাকে নিতে এসেছেন। তিনি আমাকে দেখেছিলেন। স্টেশনে কথাবার্তা না কয়ে তাঁর পেছন পেছন চলে গেলাম।

এবার পথ ছেড়ে বেপথে যেতে হবে, সোজা পথ নেইও। এখনও ভাবলে অবাক হই, কমরেড দাশরথি চৌধুরী কেমন করে এরকম অপরিচিত জায়গায়, যেখানে পথের চিহ্ন মাত্র নেই, সেখানে গন্তব্যস্থল ও লক্ষ্য মাথায় রেখে কেমন করে আমাকে নিয়ে গেলেন। অনেকখানি রাস্তা যেতে হয়েছিল। ভোরে বৃষ্টি হয়ে গেছে। উপরের মাটি সিকি ইঞ্চি, আধ ইঞ্চির কাদা হয়ে গেছে, সুতরাং খুব পিছল। মাঝে মাঝে ছোট ছোট পাহাড়, আবার কিছু কিছু চাষ করা ক্ষেত, ক্রমাগত এই রকম উঁচু নিচু। কমরেড দাশরথি চৌধুরী ঠিকই যাচ্ছিলেন, কিন্তু আমি মাঝে মাঝে দু'চারবার স্লিপ খেয়ে পড়ে যাচ্ছিলাম। যাই হোক, শেষে মগমায় পৌঁছে আমাদের যা কাজ ছিল তা হলো।

কিন্তু আমি যার জন্য বলছিলাম সরস কাহিনী, তার প্রধান অংশ বাদ রয়ে গেছে। ফারসীতে বলে 'দারোগ্ গোরা হাফিজা না বাশাদ্'—মর্মার্থ

মিথ্যা কথা যে বলে তার স্মৃতি থাকে না। সেই যে যাত্রীর সঙ্গে মোগলসরাই প্যাসেঞ্জারে দেঁদুয়া পর্যন্ত গিয়েছিলাম তাঁর কথা সব ভুলে গেছি। তিনি কি পরিচয় দিয়েছিলেন তাও ভুলে গেছি। ১৯৪৩ সালের কথা এখন বলছি। যুদ্ধের সময় অনেক জিনিসেরই ঘাটতি হয়েছে। ফিনাইল প্রভৃতি কিছু কেমিক্যাল-এর চাহিদা বেড়েছে। আমার এক বন্ধু কেমিক্যাল কারখানা খুলেছিলেন। তাঁর একটি পণ্যের জন্য সায়েন্স কলেজের সার্টিফিকেটের প্রয়োজন। তিনি সেখানে যাচ্ছিলেন, আমাকে গাড়িতে তুলে নিলেন। তাঁর কাজ সেরে সায়েন্স কলেজ থেকে দু'জনে বেরোচ্ছি এমন সময় পিছন থেকে চিৎকার এলো, "ও মশায়, না দেখা করে চলে যাচ্ছেন যে!" পিছন ফিরে দেখি, সেই ট্রেনের যাত্রী। তিনি সায়েন্স কলেজের রেস্তোরাঁর মালিক। রেস্তোরাঁটি ছিল তখন গেটে ঢুকতেই বাঁদিকে, সায়েন্স কলেজ থেকে কেউ ঢুকলে বেরোলে রেস্তোরাঁ থেকে দেখা যেত। বন্ধুটিকে নিয়ে রেস্তোরাঁয় কিছুক্ষণ বসতে হলো। ফাঁকি দিয়ে চলে যাচ্ছিলাম তার একটা কৈফিয়ত দিতে হলো। কিছু আপ্যায়ন হলো, বিনা পয়সায় কিছু খেতে হলো। ভদ্রলোকের সৌজন্যে কিছু মোহিত হলাম। কিন্তু সমস্যা যখন আসে একটিতে শেষ হয় না। যখন খাচ্ছি, তখন রেস্তোরাঁয় প্রবেশ করলেন ফিজিওলজি ডিপার্টমেন্টের অধ্যাপক প্রীতিভাজন রবি রায়, তিনি আমার ছোট ভাই-এর বন্ধু ও সহপাঠী। আর অগ্রজপ্রতিম বন্ধু সাহিত্য একাডেমির সম্পাদক (তখন বিশ্বভারতীর অধ্যাপক) শ্রীক্ষিতীশ রায়ের ভাই। চা-টা খেয়ে বেরিয়ে আসার সময় রবিও বেরিয়ে এসে আমাদের এগিয়ে দিতে এলেন। রবিকে বললাম, "কয়েক বছর আগে আমাদের বে-আইনী অবস্থায় ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হয়েছে।" এইভাবে সামগ্রিক ঘটনার বর্ণনা দিলাম। বললাম, "এত মিছে কথা বলেছি যে, এখন যদি তুমি বলে দাও খুবই লজ্জায় পড়ব। সুতরাং কিছু বলো না।" রবি হেসেই খুন। রবি বলল, "এতে কী হয়েছে, বললে কোন ক্ষতি নেই।" তবুও আমি নিষেধ করে এলাম।

১৯৪৬ সালে পুনরায় সায়েন্স কলেজে গিয়েছিলাম। ১৯৪৩ সালে দামোদরের বিরাট বন্যা হয়। এর ফলে দামোদরের সংস্কারের জন্য জনমত ক্রমোত্তর জোরদার হতে থাকে। শক্তিগড়, রসুলপুরের মধ্যে রেলের বাঁধ ভেঙ্গে যায়। কলকাতার সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ফলে সরকারের টনক নড়ে। দামোদর ফ্লাড এনকোয়ারি কমিটি গঠিত

হয়। এসব উদ্যোগ চলতে থাকে। ডঃ মেঘনাদ সাহা এই সমস্যায় মনোযোগ দিচ্ছিলেন। মনসুর তখন কৃষকসভার সম্পাদক। আমি কাউন্সিল সদস্য। কৃষকসভার স্মারক-লিপি, বক্তব্য প্রভৃতি যাতে বৈজ্ঞানিক দিক থেকে সঠিক হয়, সেজন্য মনসুর আর আমি ডঃ মেঘনাদ সাহার সঙ্গে দেখা করতে ও সম্ভব হলে আলোচনা করতে সায়েন্স কলেজে গেলাম। ডঃ সাহার সঙ্গে দেখা করে বেরিয়ে আসছি, এমন সময় সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে আবার দেখা। এবার গোড়া থেকেই সহাস্য মুখে তিনি বললেন, "এবার সব জেনেছি। রবিবাবু আমাকে সব বলে দিয়েছেন।" সমাদর গেল বেড়ে। এবারও তিনি চা-টা খাওয়ালেন।

এই তৃতীয় সাক্ষাতের পর আর দেখা-সাক্ষাত হয়নি। আমি তখন থাকতাম বর্ধমানে। শহরে ও গ্রামে কাজে এমন ব্যাপৃত থাকতাম যে কলকাতা আসার অবসরই পেতাম না। দু-একদিনের জন্য এলেও কাজ সেরেই ফিরতে হতো। তবুও মনে হয়, মাঝে মাঝে এক আধবার দেখা করা উচিত ছিল। হয়তো তাঁকে বা তাঁর মাধ্যমে পরিচিত দু'চারজনকে পার্টির ঘনিষ্ঠ সমর্থক করতে পারতাম।

এখানে যা লিখলাম, তার রাজনৈতিক গুরুত্ব বেশি নেই, কেবল একটু সরস অভিজ্ঞতা বলে লিখলাম। আশা করি পাঠকও হয়তো উপভোগ করবেন।

কাটোয়া

বর্ধমানে তখন ছিল চারটি মহকুমা—বর্ধমান, কালনা, কাটোয়া, আসানসোল। দুর্গাপুর তখন আসানসোলের মধ্যেই ছিল। দেশব্যাপী রাজনৈতিক আন্দোলন জেলা কেন্দ্রেও যেমন সাড়া পেত, মহকুমা কেন্দ্রগুলিতেও অনুরূপ সাড়া জাগাতো। অবশ্য কোথাও কম, কোথাও বেশি। ১৯২০-২২ সালের অসহযোগ আন্দোলন সারা জেলাতেই আগ্রহ ও উদ্দীপনা জাগিয়েছিল। সভা, সমিতি, জোলুষ যেমন অন্যত্র চলতে থাকে, কাটোয়াতেও তেমনি চলতে থাকে।

১৯৩০-৩২ সালের আইন-অমান্য আন্দোলনে কাটোয়া শহরের নেতৃস্থানীয় মানুষ এবং সারা মহকুমায় বেশ কিছু কর্মী যোগদান করেন এবং সত্যাগ্রহে কারাবরণ করেন। ১৯৩১ সালে জেলায় কংগ্রেসের সম্মেলন ও জেলায় যুব সম্মেলন সম্বন্ধে পূর্বে লিখেছি। মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় কমিউনিজম-এর কথা রাজনৈতিক কর্মীরা জেনেছিলেন, কিন্তু এর তত্ত্বাদি বিশেষ কিছু অবহিত হতে পারেন নি। ১৯৩১ সালে বর্ধমান যুব সম্মেলনে কমরেড বঙ্কিম মুখার্জীর অভিভাষণে কমিউনিজম-এর বার্তা জেলায় ভালভাবে পৌঁছায়। যাঁরা আগ্রহী এবং এই নবীন চেতনায় উদ্বুদ্ধ তাঁদের পরস্পর যোগাযোগ হতে এবং বর্ধমানে কমিউনিস্ট পার্টির শাখা গঠন হতে কিছু সময় লেগেছিল। কিন্তু গোড়া থেকেই তখনকার কাটোয়ার সুপরিচিত রাজনৈতিক কর্মী অশ্বিনী মণ্ডল পার্টি গঠনের চেষ্টায় সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ১৯৩৩ সালে হাটগোবিন্দপুরে অনুষ্ঠিত জেলা কৃষক সম্মেলনে তিনি যোগদান করেন এবং কার্যকরী সমিতির পদাধিকারী সদস্য নির্বাচিত হন। অবশ্য এর পূর্বেই এই সমিতির সাংগঠনিক কমিটির স্তরে বিশেষ অংশগ্রহণ করেন।

১৯৩৫ সালের ৫ই অক্টোবর বর্ধমানে পার্টির জেলা কমিটি গঠিত হয় এবং তিনি তার সদস্য হন। একথা অবশ্য আমি পূর্বেও লিখেছি।

১৯৩৫ সালে বৃষ্টিপাতের অভাবে বর্ধমান জেলার উত্তর ভাগ কাটোয়া ও মন্তেশ্বরে ব্যাপক ফসল হানি ঘটে এবং ১৯৩৬ সালের গ্রীষ্মকাল হতে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। মন্তেশ্বর থেকে কিভাবে দুর্ভিক্ষগ্রস্ত মানুষের অভিযান বর্ধমানে আনা হয় তা পূর্বে লিখেছি। কাটোয়ায় কংগ্রেসের ত্রাণকার্য আরম্ভ হয়। এক ত্রাণকার্যে কমরেড অশ্বিনী মণ্ডল স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৩৫ সালের বন্যায় ত্রাণকার্যের পর এই দুর্ভিক্ষে কংগ্রেসের ত্রাণকার্য। কমরেড অশ্বিনী মণ্ডল বন্যা রিলিফে যেমন ছিলেন, তেমনি দুর্ভিক্ষ রিলিফেও যোগ দিয়েছিলেন। বন্যা রিলিফে কমরেড দাশরথি চৌধুরী তাঁর সঙ্গী ছিলেন এবং এখানে দুর্ভিক্ষ রিলিফেও উভয়ে পরস্পরের সঙ্গী হলেন। মানুষ যিনি পার্টিতে যোগদান করেন, তিনি নিজের প্রেরণাতেই করেন। তবুও ঘটনাস্রোতের উপলক্ষ ছাড়াও ব্যক্তি-উপলক্ষেরও প্রয়োজন হয়। মানুষকে রিক্রুট করে পার্টিতে আনার ব্যাপারে কমরেড অশ্বিনী মণ্ডলের কিছু প্রতিভা ছিল। এই রিলিফ কাজে ঘনিষ্ঠ যোগা-যোগের ফলে তিনি কমরেড দাশরথি চৌধুরীকে পার্টিতে নিয়ে আসতে পারেন। ফলে ১৯৩৬ সালের শরৎকাল নাগাদ কমরেড দাশরথি চৌধুরী পার্টির ক্যাণ্ডিডেট সদস্য হন এবং পরে শীঘ্রই আনুষ্ঠানিক নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হবার পর পূর্ণ সদস্যপদ লাভ করেন। এইভাবে কাটোয়ায় এখন আমাদের দু'জন গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারী হলেন। কমরেড দাশরথি চৌধুরীর বাড়ি মঙ্গলকোট থানার ক্ষীরগ্রামে। তিনি ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করে আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান করেন এবং নিজ গুণে শীঘ্রই নেতৃবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ১৯৩৪ সালে গান্ধীজী যখন ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহের লাইন নেন তখন শ্রদ্ধেয় বিজয়দার (শ্রীবিজয়কুমার ভট্টাচার্য) প্রস্তাবে এই ভূমিকার জন্য তিনি নির্বাচিত হন এবং ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহে যোগদান করেন ও তার জন্য দণ্ডিত হন। শীঘ্রই তিনি নিজের অভিজ্ঞতা ও কমরেড অশ্বিনী মণ্ডলের সঙ্গে আলোচনার ফলে গান্ধীবাদের ধাঁধা ও আকর্ষণ থেকে নিজেকে মুক্ত করেন। পার্টির সদস্য হবার পর থেকে ১৯৫০ সালে আণ্ডারগ্রাউণ্ড অবস্থায় 'বোন ক্যানসার' রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করা পর্যন্ত তিনি পার্টির বিরামহীন একনিষ্ঠ সক্রিয় কর্মী ছিলেন।

কমরেড অশ্বিনী মণ্ডল ও কমরেড দাশরথি চৌধুরী কাটোয়ায় এক নাগাড়ে মনোযোগ দেবার সময় পাননি। বেশির ভাগ সময়ই তাঁদের জেলা আর কেন্দ্রীয় সংগঠনের কাজে জেলার সদর এলাকায় নিযুক্ত থাকতে হয়েছে। শীঘ্রই তাঁদের উভয়কেই বর্ধমান সদরে ক্যানেল আন্দোলনের কাজে

জড়িত হতে হলো। তাছাড়া সাধারণভাবে জেলা কৃষক সমিতির কেন্দ্রীয় অফিসের কাজ, কৃষক সমিতির বিভিন্ন শাখার সঙ্গে যোগাযোগ, প্রভৃতিতে বেশির ভাগ সময় কেটে যেত। তবু তাঁরা উভয়েই কাটোয়ার সঙ্গে যোগা-যোগ রক্ষা ও প্রসারের চেষ্টা ছাড়েন নি। কমরেড দাশরথি চৌধুরী কাটোয়া শহর ও মঙ্গলকোটে আমাদের স্থায়ী কর্মকেন্দ্র স্থাপন করতে পেরে-ছিলেন।

১৯৪৪ সাল পর্যন্ত কমরেড দাশরথি চৌধুরী ও কমরেড অশ্বিনী মণ্ডলকে কেন্দ্র করেই কাটোয়া মহকুমার বিভিন্ন গ্রামগুলিতে কৃষক সংগঠনের কাজ চলতে থাকে। পূর্ব মঙ্গলকোট, ক্ষীরগ্রাম ও করজগ্রাম ছাড়াও সমসাময়িক কালে কাটোয়া মহকুমার অন্যান্য যে সমস্ত গ্রামে ধীরে ধীরে শক্তিশালী কৃষকসভা গড়ে ওঠে সেগুলির মধ্যে সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য হলো শ্রীখণ্ড, কৈচর, কুরচি, অগ্রদ্বীপ-কালিকাপুর, সুদপুর প্রভৃতি গ্রামাঞ্চল। আর যাঁদের প্রচেষ্টায় এই কাজ সম্ভবপর হয়েছিল তাঁরা হলেন কমরেড নদীয়ানন্দ ঠাকুর, অনঙ্গ রুদ্র, ললিত হাজরা, শান্তব্রত চট্টোপাধ্যায়, শশাঙ্ক শেখর চট্টোপাধ্যায়, সুনীল পাল, সুশীল চক্রবর্তী এবং এককালের কংগ্রেস কর্মী জ্যোতিষচন্দ্র সিংহ প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ।

কাটোয়া মহকুমায় বিভিন্ন কৃষক সংগঠনগুলি বলতে গেলে জন্মলগ্ন থেকেই ছিল কমিউনিস্ট পার্টি সংগঠনের দ্বারা পরিচালিত। প্রতিষ্ঠাতা নেতৃবৃন্দের অনেকেই এককালের জাতীয়তাবাদী কংগ্রেস কর্মী হলেও কাটোয়া মহকুমার বিভিন্ন দাবি-দাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে আন্দোলন শুরু করার বহুপূর্ব থেকেই এ'রা প্রায় সকলেই ছিলেন নিষ্ঠাবান কমিউনিস্ট কর্মী এবং আন্দোলন পরিচালনায় অভিজ্ঞ। সে সময় বিভিন্ন সংগঠনগুলির সঙ্গে কমরেড দাশরথি চৌধুরী যোগাযোগ রক্ষা করতেন। কৃষক সংগঠন ছাড়াও শ্রমিক সংগঠনেও তিনি আত্মনিয়োগ করেন। তখন কাটোয়া মহকুমায় শ্রমিক অধ্যুষিত এলাকা বলতে বর্ধমান-কাটোয়া-আহমদপুর ছোট লাইনের রেল শ্রমিকদের নিয়ে গঠিত অঞ্চলকে বোঝাতো। এই সমস্ত অঞ্চলের শ্রমিকদের নিয়ে দাশরথিবাবুর সভাপতিত্বে 'এ. কে বি. কে. রেলওয়ে ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন' গঠিত হয়। ১৯৪৪ সালে কাটোয়ার মাধবীতলায় একটি বাড়িতে কাটোয়া কমিউনিস্ট পার্টির শাখা অফিস খোলা হয়। ফলে নবোদ্যমে শ্রমিক-কৃষক সংগঠনের কাজ কেন্দ্রীয়ভাবে শুরু হয়ে যায়। পার্টির প্রথম শ্রেণীর কর্মী স্থানীয় সম্পাদক কমরেড শান্তব্রত চট্টোপাধ্যায় এবং কৃষক নেতা ও 'এ. কে. বি. কে. রেলওয়ে ইউনিয়ন'-এর সভাপতি

দাশরথিবাবু দু'জনেই অফিস কমিউনের সংরক্ষণের কর্মী ছিলেন। গ্রাম ও শহরের কৃষক ও শ্রমিক সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত কর্মীরা মিলিত হয়ে এখানেই তাঁদের নিজ নিজ এলাকার আন্দোলনের কর্মসূচী এবং কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। .

মঙ্গলকোটের পশ্চিমাংশ--চাণক, গতিষ্ঠা, লাকুড়িয়া ও পালিগ্রাম—এই চারটি ইউনিয়ন বোর্ডের এলাকাকে আমরা পশ্চিম মঙ্গলকোট বলতাম বা এখনও বলি। এখানকার রাজনৈতিক কর্মকেন্দ্র হয়ে উঠেছিল কাশিয়াড়া, যার বর্তমান প্রচলিত নাম কাশেমনগর। গতিষ্ঠা ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট আহাদ সাহেব ছিলেন কংগ্রেসের সভ্য এবং গ্রামে সাধারণের উপকারে নানান কাজে ব্যাপৃত থাকতেন। ১৯৩১ সালে আমরা বর্ধমানে যে যুব সম্মেলন করি তিনি তাতেও অংশগ্রহণ করেন এবং আমাদের কর্ম-পন্থায় বিশেষ আকৃষ্ট হন। ১৯২১-২২ সালে অসহযোগ আন্দোলনের সময় এ'র পিতা মরহুম আব্দুস সামাদ সাহেবও খেলাফত কমিটি এবং কংগ্রেস কমিটি উভয়েরই সভ্য ছিলেন। ঐ সময় তিনি জেলা কংগ্রেসের সহ সভাপতি ছিলেন। তিনি ও পরবর্তীকালে তাঁর ছেলেরা সাধারণের সেবার কাজে খুব জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। আমরা পরে 'অজয় বাঁধ আন্দোলন' ও 'অজয় বাঁধ কমিটি'র কথা আলোচনা করবো। এই কমিটির কাজ মরহুম সামাদ সাহেবের সময়েই তাঁর নেতৃত্বে শুরু হয়। তিনিই (সামাদ সাহেব, প্রসঙ্গতঃ মহবুব জাহেদী এ'র ভাইপো) এর প্রথম সভাপতি ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর সহকর্মীবৃন্দ এবং তাঁদের সঙ্গে তাঁর ছেলেরা এই কাজ চালিয়ে যান। ত্রিশ দশকের প্রথমার্ধে তাঁরা বন্যাগ্রস্ত এলাকায় ব্যাপকভাবে চাঁদা তুলে বাঁধ মেরামত করেন। এ'রা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে উল্লিখিত চারটি ইউনিয়নের চৌষট্টিটি গ্রামে ঘুরে ঘুরে চাঁদা তোলেন। তখন জেলায় কমিউনিস্ট পার্টির শাখা গঠিত হয়নি। সুতরাং পার্টির সঙ্গে অজয় বাঁধ কমিটির যোগাযোগের প্রশ্নই ওঠে না। অবশ্য পরবর্তীকালে পার্টি গঠনের পর আমাদের কর্মীরা বিশেষ করে কমরেড দাশরথি চৌধুরী এই এলাকায় যাতায়াত শুরু করেন এবং অজয় বাঁধ কমিটির সদস্যদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে থাকেন। কমরেড দাশরথি এখানে কর্মীদের সাহায্য নিয়ে কৃষক সমিতির সভ্য সংগ্রহ করেন। কর্মীদের মধ্যে প্রধান ছিলেন কমরেড মকিত আর কমরেড সমি। জনসেবায় এ'দের পরিবার ও এ'রা সাধারণ মানুষের খুব প্রিয় হয়েছিলেন। ফলে এ'দের সাহায্যে কৃষক সমিতির সংগঠন ও পরিচয় বেশ প্রসার লাভ করে। এ'দেরই চেষ্টায়

বিবেচ্য সংখ্যার মানুষ নিয়ে ভুখা মিছিল বর্ধমান শহরে নীত হয়—যার কথা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। এইভাবে পশ্চিম মঙ্গলকোটে কাশিয়াড়ায় একটি কেন্দ্রীয় সংগঠন গড়ে ওঠে। কাটোয়া মহকুমায় তিনটি থানা—কাটোয়া মঙ্গলকোট ও কেতুগ্রাম। ১৯৩৭ সালের শেষে কমরেড মকিত. সমি-কে নিয়ে 'পার্টি সেল্' গঠিত হয়।

মঙ্গলকোট থানার পূর্বাংশে কৈচোর চৈতন্যপুর ও মাথরুন এলাকায় আমাদের চলাফেরা যাতায়াত চলতে থাকে। কমরেড দাশরথি চৌধুরী এখানে কিছু ব্যক্তিগত রাজনৈতিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারেন। ডঃ সহদেব রুদ্রের সন্তানগণ আমাদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। কমরেড অনঙ্গ রুদ্র ছাত্র আন্দোলনে যোগ দেন এবং ছাত্র ফেডারেশনের নেতৃস্থানীয় সদস্য হন। তাঁর ভাগ্নে. বর্তমান বিধানসভার সদস্য নিখিল সর. এই পথ অনুগমন করে ছাত্র ফেডারেশনে যোগদান করেন এবং জনপ্রিয়তা অর্জন করেন।

এই এলাকায় দাশরথি চৌধুরী সক্রিয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চৈতন্যপুর পরিবার সচকিত হয়ে উঠেন। গ্রামের জমিদার জোতদার শ্রেণীদের মধ্যে এ'দের একটু বৈশিষ্ট্য ছিল! একদিকে তাঁরা মহাজন ও শোষক. তাতে তাঁদের অকরুণতায় কোন ঢিল ছিল না। অন্যদিকে স্বদেশী আন্দোলন ও প্রয়াত মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরীর সময় থেকেই বর্ধমান শহরে কংগ্রেস মহলে যাওয়া-আসা. ওঠা-বসা ছিল। এই সূত্রে জিতেনদা—প্রয়াত জিতেন্দ্রনাথ চৌধুরীর কথা মনে পড়ে। তিনি কংগ্রেসের আন্দোলনে কারাবরণও করেছিলেন. কিন্তু পরিবার থেকে কিছুটা বিচ্ছিন্ন ছিলেন। জ্ঞান চৌধুরীর কথাও মনে হয়। তাঁকে এই পরিবারের রাজনৈতিক দূত বললেই সঠিক হয়। তিনি ও তাঁর দাদা কংগ্রেস মনোনীত লোকাল বোর্ডের সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন. একথা পূর্বে বলেছি। তাঁদের প্রার্থী মনোনয়নে আমরা আপত্তি তুলে-ছিলাম। শেষে আমাদের আপত্তি টেকে না। একথাও বলেছি। তখনকার আমাদের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে কংগ্রেস কর্তৃক মনোনয়নের পর কংগ্রেস প্রার্থী হিসাবে আমাদের সমর্থন পেয়েছিলেন।

কিন্তু এলাকায় যখন আমরা সক্রিয় হতে পারলাম. তখন তাঁরা ধীরে ধীরে আসল রূপ নিতে আরম্ভ করলেন। প্রথম আমাদের লক্ষণীয় ঠুকাঠুকি লাগে ১৩৫০ সালের দুর্ভিক্ষের সময়। ধান ঋণ দেওয়ার ব্যাপারে আমাদের আন্দোলন কিছুটা সফল হলেও এ'দের শক্তিকে আমরা তখনও তেমন দমাতে পারিনি। যাই হোক, খুব শক্তিশালী না হলেও কৈচোরে আমাদের একটি কেন্দ্র গড়ে ওঠে।

এরপর ক্রমোত্তর কিন্তু নিরন্তর আমাদের বিরুদ্ধে চৈতন্যপুরের চৌধুরী-দের বিরোধিতা চলতে থাকে। কাটোয়া শহরে আমাদের কাজ লক্ষণীয়-রূপে বাড়তে থাকে। কমরেড দাশরথি চৌধুরী কাটোয়া শহরের বেশ কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রাখতে থাকেন।

কাটোয়া শহরে পার্টির রাজনৈতিক কাজে প্রথম কোন্ তারিখে যাই সেকথা মনে নেই। মনে থাকা সম্ভবও নয়। তবে প্রথম গুরুত্বপূর্ণ কাজে যাই কংগ্রেস কর্তৃক লোকাল বোর্ডের প্রার্থী মনোনয়নের ব্যাপারে। কাটোয়ায় কংগ্রেস ভবনে এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার জন্য জেলা কংগ্রেস কমিটির সভা ছিল। ১৯৩৮ সালে মঙ্গলকোটের মনোনয়ন নির্ণয়ের ব্যাপারে কমরেড দাশরথি চৌধুরী ও আমাকে উপস্থিত হতে হয়েছিল। দু'টি পয়েন্টে আমাদের বক্তব্য ছিল। একটি ছিল, প্রতিক্রিয়া-শীল শোষক চরিত্রে থাকার দরুণ মঙ্গলকোটের দু'টি কেন্দ্রে চৈতন্যপুর পরিবারের শ্রীহরি চৌধুরী ও শ্রীজ্ঞান চৌধুরীর প্রার্থনা নামঞ্জুর করা। আমাদের এই অনুরোধ রক্ষিত হয়নি, একথা পূর্বেও বলেছি। তাঁরাই প্রার্থী মনোনীত হন। দ্বিতীয় পয়েন্ট হচ্ছে পশ্চিম মঙ্গলকোটে প্রার্থী মনোনয়নের ব্যাপারে। আমাদের অভীপ্সিত প্রার্থী জনাব আব্দুল আহাদ সাহেবকে মনোনীত করার দাবি আমরা করেছিলাম। এতে আমরা দু-রকমের বিকল্প প্রস্তাবের সম্মুখীন হই। রাজা মণিলাল সিংহের সমর্থক আবুল হাসেম সাহেব এবং তাঁর সঙ্গীরা আহাদ সাহেবের চাচাতো বড় ভাই আব্দুল কাইয়ুম সাহেব ওরফে কানু মিঞাকে প্রার্থী করেন। স্থানীয়ভাবে তাঁর যথেষ্ট জনপ্রি।তা ছিল। অজয় বাঁধ কমিটির কাজে তিনিও সক্রিয় ছিলেন। কিন্তু তিনি এবং তাঁর সঙ্গীরা খুব মুস্কিলে পড়েছিলেন। তাঁরা রাজনীতির বিশেষ ধার ধারতেন না। আহাদ সাহেব তাঁদের স্নেহভাজন ছোট ভাই, তাঁর বিরুদ্ধে প্রার্থী হওয়ায় তাঁর মন সরছিল না। অনুরূপ অবস্থা হয়েছিল তাঁর একান্ত বন্ধু পিলসুয়ার জনাব আব্দুর রহিমের। কিন্তু যদিও খেলাফতের সময় থেকে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করতেন তিনি আবুল হায়াত সাহেবের বিরুদ্ধে প্রার্থী হতে ইচ্ছুক ছিলেন না। কাটোয়া মহকুমা ধরে একটি আসন মুসলমানের জন্য রিজার্ভ ছিল। এই আসনে আমরা আবুল হায়াত সাহেবকে প্রার্থী করার প্রস্তাব করি এবং কংগ্রেসও মেনে নেয়। একথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি, এখানে আর বেশি পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নেই।

কমরেড দাশরথি চৌধুরীর কাটোয়ায় যাতায়াত ও যোগাযোগ চলতে থাকে। কাটোয়ায় এক শক্তিশালী কেন্দ্র গঠন করার জন্য তাঁর নিরন্তর প্রয়াস চলতে থাকে। কাটোয়ায় বেশ কিছু শিক্ষিত যুবকের তিনি পরিচয় লাভ করেন। তিনি এই সম্পর্ককে নিবিড়তর করার চেষ্টা করতে থাকেন।

তিনি এই সময়ে আহমদপুর-কাটোয়া এবং বর্ধমান-কাটোয়া রেল ওয়ার্কার্সদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। কিছুদিনের মধ্যেই সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয়। তিনি 'এ. কে. বি. কে রেলওয়েমেন্‌স্ ইউনিয়ন' গঠন করে তা রেজিস্ট্রি করে নেন। এরপর দরকার হয় তাঁর অফিস। কাটোয়া শহরের মাধবীতলায় একটি বাড়ি ভাড়া নিয়ে সেখানে অফিস করেন। এই বাড়িটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল। এরপর আমরা যখন কাটোয়া যাওয়া-আসা করতাম, এই বাড়িতেই উঠতাম। অবশ্য পরে যখন খেড়োপাড়ায় পার্টি অফিস হলো, তখন সেই অফিসেই যাতায়াত করতাম।

কাটোয়ায় খাদ্য সম্মেলনের কথা পূর্বেই বলেছি। এরপর গ্রামাঞ্চলের দিকে আমাদের খাদ্য সঙ্কটের ব্যাপারে কাজকর্ম কিছু কিছু চলতে লাগল।

কমরেড অশ্বিনী মণ্ডল এই সময় তাঁর নিজের গ্রাম করোজ গ্রাম, দাঁইহাট ও কালিকাপুর অঞ্চলে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছিলেন, এবং বর্ধমান সদরের কাজ থেকে যখনই ছুটি পেতেন এই অঞ্চলে রাজনৈতিক প্রোগ্রাম নিয়ে ঘোরাঘুরি করতেন। কাটোয়া শহরের সঙ্গে তিনি যোগাযোগ রাখতেন।

এ. কে. বি. কে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ ইউনিয়ন ভাঙার জন্য প্রবল চেষ্টা করতে লাগল। ইউনিয়নের প্রবীণ নেতা বৃদ্ধ খাঁ সাহেবকে হাতে করার জন্য চক্রান্ত ফাঁদল। রাণীগঞ্জ পেপার মিলের ধর্মঘটের সময় মহিলাদের তথা বাবুদের ও শ্রমিকদের স্ত্রীদের অপূর্ব নিষ্ঠা, সাহস ও ত্যাগ দেখেছিলাম। তারই পুনরায় আরও এক দৃষ্টান্ত এই ক্ষেত্রে দেখলাম। কমরেড দাশরথি চৌধুরী এবং আমি বর্ধমানে পার্টি অফিসে বসে কি একটা কাজ করছি, এমন সময় এ. কে. বি. কে. রেলওয়ে ইউনিয়নের প্রবীণ নেতা খাঁ সাহেব এসে হাজির। এইবার ব্যাপারটা শোনা গেল। রেল কর্তৃপক্ষ ভয় দেখিয়ে খাঁ সাহেবকে কাবু করার চেষ্টা করেছিল। তাঁরও ভয়ে-ভ্রান্তিতে কিছুটা পা পিছলে পিছিয়ে যাবার উপক্রম হয়েছিল। খাঁ সাহেবের স্ত্রীও প্রবীণ। কিছুদিন হলো কিছু সন্দেহজনক মানুষের গতিবিধি ও আচরণ তাঁর ভাল লাগছিল না। তাঁরা এসে বুড়োর সঙ্গে,

অর্থাৎ তাঁর বৃদ্ধ স্বামীর সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে কি সব কথাবার্তা কয়ে যেত। আগন্তুক ও বৃদ্ধের আচরণে তাঁর সন্দেহ ঘনীভূত হয়। শীলতার কারণে বেশি জানার চেষ্টায় তিনি এতদিন বিরত ছিলেন। শেষে এই সংযম তিনি আর রাখলেন না। দরজায় আড়ি পেতে শুনতে লাগলেন। তাঁর কাছে সব পরিষ্কার হয়ে গেল। দেখলেন, ইউনিয়ন ভাঙ্গার ষড়যন্ত্র হয়েছে, তাঁর বৃদ্ধ স্বামী কোম্পানীর দালাল হতে রাজি হয়েছেন। তিনি তখনই সামান্য কাপড়-চোপড় যা ছিল তা গুটিয়ে নিয়ে বৃদ্ধকে সোজাসুজি বলে দিলেন, তিনি দেশে ফিরে যাচ্ছেন, তিনি বেইমান-হারামখোরের ঘরে হারাম খাবেন না। তিনি বললেন, তাঁর শরীরে এখনও ক্ষমতা আছে। তখনই দেশে রওনা হবেন এবং দেশে গিয়ে খেটে খাবেন। বুড়ো তো আকাশ থেকে পড়লেন। খুব হীনতা স্বীকার করে বললেন, আর কখনই দালালি করবেন না। এবারকার মতো তাঁকে মাফ করা হোক। বুড়ি বললেন, "অত সোজায় চলবে না, এখনই গিয়ে দাশরথিবাবুকে নিয়ে এসো। তিনি এলে মিটিং ডেকে শ্রমিকদের কাছে সব অপরাধ স্বীকার করো এবং তাদের কাছেই মাফ চাও। তারা মাফ করলে এবং সব ঠিকঠাক হয়ে গেলে তবে আমি ভাত খাব।" অগত্যা বৃদ্ধকে বর্ধমানে কমরেড দাশরথী চৌধুরীর কাছে ছুটতে হয়েছে। দাশুর বর্ধমানে কিছু কাজ ছিল। আমি তার ভার নিয়ে নিলাম এবং তিনি তখনই বৃদ্ধের সঙ্গে কাটোয়া রওনা হলেন। দাশু ফিরে এসে রিপোর্ট দিলেন, বললেন, "বুড়ির সঙ্গে দেখা হওয়া মাত্র সে বুড়োকে বেইমান আর হারামখোর বলে খুব গালি বর্ষণ করলো এবং বলল, একে আর তোমাদের সঙ্গে রেখো না। এ তোমাদের সঙ্গে থাকার উপযুক্ত নয়।" যাই হোক, শেষে বুড়ির নির্দেশিত প্রোগ্রাম পালন করা হলো। বুড়ো শ্রমিকদের সভায় সব দোষ স্বীকার করলেন এবং মাফ চাইলেন। দাশু বললেন, "আমিও শ্রমিকদের বুঝিয়ে বললাম, সে যখন দোষ স্বীকার করেছে এবারকার মতো মাফ করা হোক।" দাশু বুড়িকেও অনেকক্ষণ বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বিদেয় নিয়ে এসেছেন।

এরপর গ্রামাঞ্চলে কৃষক সমিতির কাজ চলতে থাকে। ১৯৪২ সালে বর্ধমান শহরে ছাত্র আন্দোলনে যুক্ত হয়ে কালিকাপুরের শান্তব্রত চট্টোপাধ্যায় কাটোয়া অফিসের সঙ্গেও যোগাযোগ করেন। তখন থেকে শুরু করে ১৯৫০ সালে জেল থেকে বেরিয়ে আসা পর্যন্ত ইনি নিবিড়ভাবে কাজে লিপ্ত হন। যে কয় বছর তিনি কাজ করেছিলেন, তিনি যথেষ্ট ত্যাগও

করেছিলেন এবং কাজকর্মের ফলে সকলের ভালবাসা ও প্রীতি অর্জন করেছিলেন।

পূর্বে আমি ত্রিশ দশকে ক্যানেল কর বিরোধী আন্দোলনের বিবরণ দিয়েছি। এও পূর্বে উল্লেখ করেছি যে. কমরেড দাশরথি চৌধুরী এবং কমরেড অশ্বিনী মণ্ডল উভয়কে আমাদের সংগঠনের কেন্দ্রের কাজের উপর বেশি মনোযোগ দিতে হতো। সেই সূত্রে কমরেড দাশরথিকে ১৯৩৯ সালের ক্যানেল কর বিরোধী আন্দোলনে সরকারী সংঘাতের সময় বর্ধমান সদরেই থাকতে হয় এবং সত্যাগ্রহে গ্রেপ্তার হ'য়ে জেলে থাকতে হয়। মুক্তির পর তিনি আবার কাজে নেমে পড়েন। অচিরেই আণ্ডারগ্রাউণ্ডে যেতে হয়। কাটোয়া শহর ও গ্রামাঞ্চলে তিনি কাজে নিযুক্ত থাকেন। এদিকে জেলা কেন্দ্রের কাজের জন্য বর্ধমান সদরে ও অন্যান্য জায়গায় যেতে আসতে হয়। ১৯৪২ সালে পার্টির পরিবর্তিত নীতি অনুযায়ী আমাদের আণ্ডারগ্রাউণ্ড কর্মীদের মতো তিনিও বেরিয়ে আসেন। ১৯৪২ সালে রায়নায় সহজপুরের নিকট আলালপুরে জেলা কৃষক সম্মেলন আহুত এবং অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলন অনুষ্ঠানের কাজে আমরা সকলেই নিযুক্ত থাকি. তিনিও থাকেন।

যাই হোক. এখন কাটোয়ার কথায় ফিরে আসা যাক। ১৯৪৩ সালে কাটোয়ায় খাদ্য সম্মেলনের কথা পূর্বে বলেছি। পরে সীমিত শক্তি নিয়েও মঙ্গলকোট থানায় কৈচোর এবং কাশেমনগর ইত্যাদিতে স্থানীয় কর্মীদের সাহায্যে কিছু সাফল্য অর্জন করেন। ইতিমধ্যে তাঁকে তালিত. বাঘাড়. শিমডাল অঞ্চলেও গিয়ে কমরেড অজিত সেনকে সাহায্য করতে হয়।

কাটোয়ায় দুর্ভিক্ষের কাজে আমরা ব্যাপৃত আছি. এমন সময় বর্ষাকালে অজয়ের বাঁধ ভেঙ্গে মঙ্গলকোট থানায় প্লাবন হয় এবং অজয় বাঁধ কমিটিকে রিলিফের কাজে নামতে হয়। কমরেড দাশরথি চৌধুরী এবং আমাদের স্থানীয় কমরেডরা তাঁদের সঙ্গে মিলিত হয়ে কাজে নেমে পড়েন।

এদিকে আগস্ট মাস থেকে দামোদরেও বিরাট বন্যা। বর্ধমান শহরের পূর্ব দিকে বাঁধ ভাঙ্গে, বর্ধমান শহর বেঁচে যায়. কিন্তু গ্রামাঞ্চল বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সুতরাং বর্ধমান সদর, কাটোয়া, কালনা সর্বত্রই পার্টির কর্মীদের বন্যা রিলিফের কাজে নামতে হয়।

মঙ্গলকোট ও আউশগ্রামে অজয় বাঁধ মেরামতির দাবিতে আন্দোলন চলতে থাকে। বর্ধমান সদর মহকুমার আউশগ্রাম থানার পাঁচটি ইউনিয়ন— যথা রামনগর, বেরেণ্ডা, উক্তা, ভেদিয়া ও গুসকরা, এবং মঙ্গলকোট থানার চারটি ইউনিয়ন— গতিষ্ঠা, লাকুড়িয়া, পালিগ্রাম ও চাণক, বন্যায় খুবই ক্ষতি-গ্রস্ত হয়। আমাদের কর্মীরা বাঁধ কমিটিকে সম্মিলিত ফ্রন্ট হিসাবে সামনে রেখে সরকারী দায়িত্বে বাঁধ মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের দাবিতে আন্দোলন করতে লাগলেন। অজয় বাঁধ জমিদার কর্তৃক রক্ষণীয় এবং সরকারের এ বিষয়ে কোন দায়দায়িত্ব নেই—এই কৈফিয়ত দিয়ে গভর্নমেন্ট সমস্ত দাবি-দাওয়া অগ্রাহ্য করছিল। আমাদের কর্মীদের চেষ্টায় সরকারের এই ঔদাসীন্যের বিরুদ্ধে গণ-আন্দোলন সংহত হতে থাকে এবং শক্তি অর্জন করতে থাকে। সামনে থাকেন গতিষ্ঠা ও পালিগ্রাম ইউনিয়ন বোর্ডের সদস্যগণ। সুখের বিষয়, তাঁরা পশ্চিম মঙ্গলকোটের চারজন ইউনিয়ন বোর্ডের সভাপতি এবং সদস্যদের তাঁদের সঙ্গী করতে সফল হন। কমরেড বিপদবারণ রায়, কমরেড দাশরথি চৌধুরী ও আমাদের অন্যান্য কর্মীদের চেষ্টায় আউশগ্রামের পাঁচটি ইউনিয়নের জনসাধারণের সঙ্গে প্রেসিডেন্ট ও মেম্বারদের সংহতিতে যুক্ত করা সম্ভব নয়। এই লাগাতার চেষ্টার ফলে পরিসমাপ্তিতে উল্লেখযোগ্য সাফল্য হয়। এই আন্দোলনে সাফল্য কিছু বিস্তৃত বিবরণ দাবি করে।

১৯৪৪ সালে অজয় বাঁধ কমিটির উদ্যোগে গুসকরায় ব'মানের মহারাজার সভাপতিত্বে এক বিরাট জনসভা ও জনসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। মহারাজা সভাপতি হলে সভাপতিত্বের পদ নিয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে দলাদলির অবকাশ থাকবে না, এই ছিল উদ্দেশ্য। অজয় বাঁধ মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব সরকারকে নিতে হবে, এই দাবির পশ্চাতে দলমত নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধ জনমত গঠন করতে হবে, এই ছিল সভার লক্ষ্য। তাঁর সম্মতি পাওয়ার ব্যাপারে তৎকালে তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারী কিরণদা অর্থাৎ শ্রদ্ধেয় কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের সাহায্য পেলাম। শেষে মহারাজার সম্মতিও পেলাম।

এবারে সভা ঘোষিত হলো। অজয় বাঁধ কমিটি ও কৃষক সমিতির ন'টি ইউনিয়ন ধরে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে এক বড় র‍্যালি নিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত হয়। প্রেসিডেন্টসহ প্রত্যেকটি ইউনিয়ন বোর্ডে ৯ জন করে সদস্য থাকতেন। ঠিক হয় যে, সমস্ত ইউনিয়ন বোর্ডের সভাপতি ও সদস্যগণ অর্থাৎ ৮১ জন এই র‍্যালি লীড করবেন। আরও ঠিক হয়, যেহেতু

বন্যা-বিধ্বস্ত এলাকা দুস্থ হয়ে গেছে এবং ইউনিয়ন বোর্ডের ট্যাক্স আদায় করা অসম্ভব হয়ে উঠেছে, ফলে তাঁরা আর ইউনিয়ন বোর্ডের পরিচালনার ভার রাখতে পারবেন না—সেইজন্য ৮১ জন ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট সদস্যগণ সহ কালেক্‌টরের কাছে একসঙ্গে পদত্যাগ-পত্র দাখিল করবেন। প্রোগ্রাম অনুযায়ী র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয় এবং পদত্যাগ-পত্রও দাখিল করা হয়।

অবশ্য মনে রাখতে হবে, উল্লিখিত ৮১ জনের মধ্যে অনেকেই ছিলেন রাজনীতিক দৃষ্টিতে পশ্চাৎপদ, এমন কি কিছু একেবারে প্রতিক্রিয়াশীল। আরও মনে রাখতে হবে, প্রত্যেক ইউনিয়ন বোর্ডে তিনজন করে সদস্য হতেন সরকার মনোনীত। এসব সত্ত্বেও কৃষক সমিতি এবং অজয় বাঁধ কমিটির নিরলস প্রয়াসে যথেষ্ট জনমতের চাপ ও উৎসাহ সৃষ্টি করতে পারা গিয়েছিল। যার ফলে এইরূপ সুশৃঙ্খল কর্মসূচী সম্পাদন সম্ভব হয়েছিল।

জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে আবেদনের চিঠিপত্র ছাড়া সামগ্রিক বিষয়বস্তুর উপর একটি স্মারকলিপি তাঁর অনুমোদন সহ গভর্নমেণ্টের কাছে প্রেরণের জন্য দেওয়া হয়েছিল। ইতিপূর্বে আমাদের চিঠিপত্রের বিষয়ে তাঁরা কিছু করেছিলেন কিনা এবং কী করেছিলেন, তা সব জানতেও পারিনি। যতটুকু জানতে পেরেছিলাম তাও এখন স্মরণে নেই। যাই হোক, এবারকার র‍্যালি এবং বন্যা-বিধ্বস্ত অঞ্চলের নয়টি ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট ও মেম্বারদের পদত্যাগ স্বাভাবিকভাবেই একটা বড় আলোড়ন সৃষ্টি করল। জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে আবেদন অনুমোদন করে সরকারের কাছে পত্র দিতে হলো এবং স্মারকলিপি পাঠাতে হলো। এবার আমাদের চেষ্টা শুরু হলো কলকাতায় দপ্তরে দপ্তরে। শেষে মন্ত্রিমণ্ডলী ও আমলাদের রায় আমাদের অনুকূলে হলো। সরকারী দীর্ঘসূত্রতায় যথেষ্ট বিলম্ব হয়ে গিয়েছিল। বৈশাখের প্রারম্ভে ফাইল লাটসাহেবের কাছে প্রেরিত হলো। শেষে অর্ডার হলেও বিলম্বের কারণে আলোচ্য বৎসরে করা যাবে কিনা তার সন্দেহ দাঁড়িয়ে গেল। বর্ষা এসে পড়লে তো আর বাঁধ করা যাবে না। ফাইল তাড়াতাড়ি লাটসাহেবের সম্মতি সহ রাইটার্স বিল্ডিং-এ না এলে আর কিছু করা যাবে না। অথচ লাটসাহেবকে তাগিদ দিয়ে ফাইল আনা যায় কি করে? দৌড়লাম অবসরপ্রাপ্ত ডিভিশনাল কমিশনার মোমিন সাহেবের কাছে। তিনি বন্যা-বিধ্বস্ত এলাকারই সন্তান। (প্রসঙ্গতঃ, মহবুব জাহেদী তাঁর ভাইপো)। তিনি চিঠি দিতে অসম্মত হলেন না। কিন্তু দেরিতে সম্মতি পেয়ে কাজ হবে কিনা সে সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ

করলেন। আমরা তাঁকে সুনিশ্চিত করলাম। ধনী-নির্ধন নির্বিশেষে সকলে যেভাবে একজোট হয়েছেন তাতে সরকারী অর্ডার হয়ে গেলে কাজ যে-কোনমতে সম্পন্ন হবে আমাদের এ ভরসা আছে। তিনি পত্র লিখে দিলেন। ফল ভালই হলো। আমি রাইটার্স বিল্ডিং-এ সেক্রেটারীর কাছে গিয়ে অবিলম্বে যাতে ডিভিশনাল কমিশনারের কাছে অর্ডারটা যায় তার ব্যবস্থা করলাম। বর্ধমান ফিরে এসেই শৈলেশদাতে ও আমাতে চুঁচুড়ায় ডিভিশনাল কমিশনারের কাছে ছুটলাম। সুখের বিষয়, ফাইল তাঁর সামনেই ছিল। আমরা বললাম, "অর্ডারটা আমাদের হাতে দেন, আমরা জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে গিয়ে অর্ডারটা দেব।" তিনি রাজি হলেন, বললেন, "আমাদের নিয়ম অনুযায়ী ডাকেও যাক্, আর এক কপি আপনাদের হাতে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে প্রেরণ করা হোক।" আমরা দু'জন সেই কপি নিয়ে বর্ধমানে ফিরলাম এবং জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের হাতে দিলাম। সেদিন তারিখ হচ্ছে ৩রা জুন, ১৯৪৫ অর্থাৎ আষাঢ় মাস ঢুকতে মাত্র ১২ দিন। অবশ্য তার আগেও বর্ষা নেমে যেতে পারতো। আমরা ঝুঁকি নিচ্ছিলাম। এই ১২ দিনের মধ্যে আমাদের এত বড় বাঁধটা ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টকে দিয়ে গড়িয়ে নিতে হবে, তাও কন্ট্রাক্টর-এর মাধ্যমে। কন্ট্রাক্টরগণ ন্যায্যতই প্রশ্ন তুললেন, "এই কয়দিনে কাজ হবে কি করে? আর এত মজুরই বা পাব কোথায়?"

আমরা যেমন গণ-আন্দোলন করে যাচ্ছিলাম এবং সরকারী অফিসে সমস্ত স্তরে তদ্‌বির-তাগাদা দিয়ে যাচ্ছিলাম, তেমনি আমাদের কৃষকসভার সর্বস্তরে যোগাযোগ রেখে আলোচনা করে যাচ্ছিলাম। প্রাদেশিক কৃষক-সভা গোড়া থেকেই আমাদের পরামর্শাদিতে যুক্ত ছিলেন এবং প্রাদেশিক কৃষকসভার তরফ থেকে প্রচার আন্দোলন করে ও জনমত গঠন করে সরকারের উপর চাপ সৃষ্টির চেষ্টা করেছিলেন। এখন হাতে কম সময় থাকলেও এই সময়ের মধ্যে কাজ সম্পন্ন করার জন্য কৃষকসভার সর্বস্তরের কর্মীরা আগ্রহী হয়ে উঠলেন। আমরা কন্‌ট্রাক্টরদের বললাম "আপনারা কাজ আরম্ভ করুন, আপনাদের কাজ করার যত মানুষ চাই আমরা সরবরাহ করবো।" এদিকে চাষের সময় এসে পড়েছে। সব মানুষ নিজের নিজের মাঠে লাঙ্গল নিয়ে প্রস্তুত হচ্ছেন। অনেকে কাজে নেমেও পড়েছেন। আমরা তখন বন্যা-বিধ্বস্ত অঞ্চলে সাতদিনের 'লাঙ্গল বন্ধ' ঘোষণা করলাম এবং তার অনুকূলে গ্রামে গ্রামে প্রচার করতে লাগলাম ও সংগঠন তৈরি করতে লাগলাম। আমরা আওয়াজ তুললাম, যাঁরা ক্ষেতমজুর নন, নিজের

জমিতে দৈহিক পরিশ্রম দিয়ে চাষ করেন বা অনুরূপভাবে ভাগ চাষ করেন, তাঁরাও কাজে নামবেন। যাঁদের জমি আছে কিন্তু দৈহিক কাজে অপারগ তাঁরা নির্ধারিত হিসাব মতো ক্ষতিপূরণ দেবেন। এছাড়া চাঁদাও সংগৃহীত হবে। এইসব সংগৃহীত অর্থে কাজে নিযুক্ত শ্রমিকদের নানান্ ভাবে সাহায্য করা হবে। জেলা কৃষকসভার সকল কর্মী—কমরেড হরেকেষ্ট, কমরেড দাশরথি, কমরেড বিপদবারণ রায় সহ প্রাদেশিক কৃষকসভার কর্মী আবুল মনসুর প্রমুখ এই প্রচার ও সংগঠনে নেমে পড়লেন। এ'দের প্রচারের সঙ্গে সরকারী অফিসের যোগাযোগ এবং নিরন্তর চাপ বজায় রাখার জন্য আমরা কয়েক-জন কেন্দ্রে অর্থাৎ বর্ধমানে নিযুক্ত থাকলাম। দ্রুত যোগাযোগ রাখার জন্য বর্ধমান থেকে বাঁধের কর্মকেন্দ্রগুলিতে আসা-যাওয়া করতে লাগলাম। কাজ আরম্ভের দিন আমরা ফাংশন করলাম। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, এস. ডি. ও. প্রমুখ সরকারী অফিসাররাও সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

কাজটিকে আমরা সকলে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গণ্য করছি এইভাবে মানুষের মনে ছাপ দিতে, সকলে মিলে উৎসাহ উদ্দীপনা সৃষ্টি করতে, আমরা একটা দিন নির্দিষ্ট করলাম। সেই তারিখে প্রাদেশিক কৃষকসভার নেতৃবৃন্দ থেকে শুরু করে জেলার কর্মিগণ, অজয় বাঁধ কমিটির সদস্যগণ ও কর্মীবৃন্দ সকলেই মাথায় করে মাটি বয়ে বাঁধের জায়গায় ফেলতে লাগলেন। অভিজ্ঞ শ্রমিকরা আমাদের দেখিয়ে দিচ্ছিলেন এবং নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। সভা ইত্যাদিও অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

এইভাবে নানান্ দিকে উদ্যম ও উদ্যোগ প্রসারিত করে নির্দিষ্ট তারিখের পূর্বেই আমরা বাঁধ তৈরি সমাপন করতে পারলাম। সমবেত প্রয়াসে এই সাফল্যে স্থানীয় জনগণ খুবই অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে এর প্রভাব সারা জেলায়, এমন কি বাংলাদেশের অন্যত্র সঞ্চারিত হয়েছিল।

হাটগোবিন্দপুরে প্রাদেশিক কৃষক সম্মেলন, ১৯৪৫

১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের কথা বিস্তৃতভাবে বিভিন্ন পুস্তকে আলোচিত হয়েছে। বৃটিশ গভর্নমেণ্ট এবং মুনাফাখোর, ব্যবসায়ী প্রভৃতিদের হৃদয়হীন নিষ্ঠুরতার বলি হয়েছেন বাংলার পঁয়ত্রিশ লক্ষ মানুষ। বেশির ভাগই ক্ষেতমজুর ও গরীব কৃষক। কমিউনিস্ট পার্টি একদিকে রিলিফ এবং অন্যদিকে সরকারী নীতির বিরুদ্ধে গণ-আন্দোলন, হাঙ্গার-মার্চ প্রভৃতি করে চলেছেন। ১৯৪৪ সাল থেকে কৃষকের আর এক সমস্যা দেখা দিল। সরকার দেশের ধনপতিদের সঙ্গে যোগসাজসে সরকার কর্তৃক ক্রয়ে ধানের মূল্য খুব কম করলেন। উদ্দেশ্য, সংকট সমাধানের বোঝা কৃষকের স্কন্ধে চাপানো। কৃষকের ক্ষোভ জেগে উঠছিল। কৃষক সমিতিকে এবং কমিউ-নিস্ট পার্টিকে ধানের ন্যায্য মূল্যের দাবি তুলতে হলো। এ নিয়ে আন্দোলনও হলো। ১৯৪৫ সালের গোড়ায় প্রাদেশিক কৃষকসভার কাউন্সিলের মিটিং-এ বিস্তারিত আলোচনার পর, সরকারকে নির্ধারিত ধানের দর সাড়ে ছ' টাকা থেকে সাড়ে সাত টাকা করতে হবে—এই প্রস্তাব গ্রহণ করা হলো। সারা বাঙলাদেশ জুড়ে এই প্রস্তাবের প্রচার ও আন্দোলন করা স্থির হলো। প্রসঙ্গতঃ এখানে উল্লেখ করে যাওয়া ভাল, প্রাদেশিক কৃষকসভার কাউন্সিলের অন্যতম সদস্য হিসাবে কমিউনিস্ট পার্টির প্রাদেশিক কমিটির তৎকালীন সম্পাদক ভবানী সেনও এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। তিনিও সজোরে এবং দ্বিধাহীনভাবে এই প্রস্তাবের পক্ষে বলেছিলেন।

বর্ধমানে প্রাদেশিক কৃষকসভার সম্মেলন হওয়ার কথা ছিল। ইতিমধ্যে সারা ভারত কৃষক সম্মেলন ময়মনসিং-এর নেত্রকোণায় হবার সিদ্ধান্ত হয়। এক প্রদেশে সারা ভারত সম্মেলন হলে প্রাদেশিক সম্মেলনও নিতান্ত আনুষ্ঠানিক পদ্ধতিতে সেই সঙ্গে সেরে নেওয়া হয়। কিন্তু আমরা বর্ধমানের সদস্যরা চাপ দিলাম যে, সারা ভারত সম্মেলন নেত্রকোণাতেই হোক, কিন্তু তার বেশ কিছুদিন আগে প্রাদেশিক কৃষক সম্মেলন বর্ধমান জেলার হাট-গোবিন্দপুরে হোক। আলাপ-আলোচনার পর আমাদের প্রস্তাবে সবাই

একমত হলেন। এও ঠিক হলো, আমাদের দাবি ধানের দাম ন্যূনপক্ষে সাড়ে সাত টাকা হোক। সম্মেলনের প্রস্তুতিতে এর প্রচার ভালভাবে চলতে থাকবে।

আমরা বর্ধমানে ফিরে এসে কোমর বেঁধে সম্মেলনের প্রস্তুতিতে নেমে পড়লাম। জেলা কৃষক সমিতির বর্ধিত সভায় নেতৃস্থানীয় কয়েকজন কর্মীর উপর নির্দিষ্ট এলাকার ভার দেওয়া হলো। বিনয়দা ভার নিলেন তখনকার কুড়মুন ইউনিয়নের। আমার উপর ভার পড়লো বণ্ডুল এবং কয়েকটি বিক্ষিপ্ত এলাকার। আমাকে আর হরেকেষ্টকে কখনো পৃথক-ভাবে কখনো একসঙ্গে, যেমন মেমারী ও কলকাতায় একসঙ্গে, চাঁদা তুলতে হলো। বর্ধমান শহরে আমি এবং কমরেড ভুজঙ্গ সেন চাঁদা তুললাম। এইভাবে সমগ্র জেলা ভাগ করে কাজ শুরু করা হলো। ঠিক করা হলো, অন্ততঃ হাটগোবিন্দপুর, কুড়মুন, বণ্ডুল—এই তিনটি ইউনিয়নে আড়াইশো মণ করে ধান বা তার দাম তুলতে হবে। অন্যান্য ইউনিয়নগুলিতে আমাদের শক্তির পরিমাপ অনুযায়ী যেখানে যেমন সম্ভব কোটা ঠিক করা হলো। মেমারীতে তখনও আমাদের শক্তি গোটা থানায় ব্যাপক হিসাবে পরবর্তী-কালের মতো শক্তিশালী হয়নি। কিন্তু নানান্ কাজের মধ্য দিয়ে ক্রমোত্তর শক্তিশালী হয়ে যাচ্ছিল। এর মধ্যে কিছুকাল আগে সুষ্ঠুভাবে আলুর বীজ বণ্টন মানুষের মনে একটা ছাপ সৃষ্টি করেছিল। এর আলোচনা পৃথকভাবে করা হয়েছে।

যাই হোক এখন কৃষক সম্মেলনের চাঁদার কথাই বলি। মেমারী বাজারে প্রতি দোকানে আমি আর হরেকেষ্ট চাঁদা তুলছিলাম। এর মধ্যে একজন ব্যবসাদার যা কথা দিয়েছিলেন তা খেলাপ করে কম দিতে চান। চাঁদা তোলার ব্যাপারেও সংগঠনের একটা মর্যাদাবোধ থাকা দরকার। তিনি যা দেবেন বলেছিলেন, সেই মতো অন্যদের বলেও ছিলাম, এখন তাঁর কাছে কম টাকা নিলে তাঁর মিথ্যাচারে অংশীদার হয়ে যাই। সুতরাং আমরা তাঁর চাঁদা নিতে অস্বীকার করলাম। কিছু চড়া কথা বলায় হরেকেষ্ট তাঁর দেওয়া টাকাটা তাঁর কোলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বেরিয়ে এলেন এবং আমিও সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এলাম। ইনি ছিলেন মেমারীর তখনকার সুপরিচিত ব্যবসায়ী নগেন দে মহাশয়ের পুত্র মণি দে। নগেনবাবু অবশ্য তাঁর কথা মতো টাকা দিয়েছিলেন। এঁরা উভয়েই এখন প্রয়াত। সেজন্য আর অলোচনা করছি না। এই ঘটনার এতখানি বিবরণ দিলাম, আমাদের চাঁদা তোলার পদ্ধতির পরিচয় দেওয়ার

জন্য। আমরা একদিকে চাপ দিয়ে জোর-জুলুম করে আদায় করতাম না, অন্যদিকে ভিখারীর মতোও অনুগ্রহ-প্রার্থী হতাম না। তখনও যেমন এখনও তেমনি। আমরা সর্বত্র সব সময় পার্টি ও গণ-সংগঠনের মর্যাদা রেখে সরলভাবে উদ্দেশ্য বর্ণনা করে চাঁদা চাই। জনসাধারণও সেইভাবেই খোলা মনেই যা দেওয়ার দিয়ে থাকেন। বর্ধমান শহরে বাজারগুলিতে আমি ও কমরেড ভুজঙ্গ সেন আদায় করেছিলাম। কমরেড ভুজঙ্গ সেনের বিরুদ্ধে আমার আর কোন নালিশ নেই, শুধু এইটুকু যে, নিজের পকেট থেকে খরচ করে খাওয়া হবে তাতেও তাঁর আপত্তি। চায়ের দোকানে বসতে চাইলে তিনি বলতেন, "কিছুক্ষণের মধ্যেই তো বাড়িতে গিয়ে ভাত খাওয়া হবে। আবার পয়সা খরচ করবেন কেন?" পেটে ক্ষুধা নিয়ে কাজ করা আমাদের সবারই কম বেশি আচরণ ছিল। কিন্তু এ বিষয়ে কমরেড ভুজঙ্গ সেন আমাদের অগ্রগণ্যদের মধ্যে একজন। কলকাতায় আমি আর হরেকেষ্ট হাওড়ার ব্রিজের নিকটে হ্যারিসন রোডের দু'দিকে বিশেষ করে উত্তর দিকে দর্পনারায়ণ ঠাকুর স্ট্রীট, আদ্যশ্রাদ্ধ রোড প্রভৃতিতে দোকান ও মেসগুলিতে চাঁদা তুলেছিলাম। তখনকার দিনে দোকান কর্মচারীরা খুব কম বেতন পেতেন। মেসগুলিতে তাঁদের কাছে যেতাম, দু আনা, চার আনা, আট আনা—যে যেমন দিতেন মাথা পেতে নিতাম। আমরা এ রকম চাঁদা তোলা অর্থ-সংগ্রহের প্রয়োজনে করতাম, কিন্তু তার চেয়ে মানুষের সঙ্গে এবং এলাকার সঙ্গে যোগাযোগের জন্য করতাম বেশি। এদিকে গ্রামাঞ্চলেও আমাদের নির্দিষ্ট অর্পিত দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছিলাম। বণ্ডুল ইউনিয়নে কমরেড গুরুদাস এবং আমি প্রতিটি গ্রাম ঘুরলাম। আহূত বৈঠকে গ্রামস্থ বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ অনুগ্রহ করে আসছিলেন, আবেদনে ভালোই সাড়া পেলাম। অবশ্য বৈঠক ছাড়া অনেক জায়গাতেই ঘরে ঘরে যেতে হচ্ছিল। মাঝে মাঝে অন্যত্র, যেমন—বর্ধমান, কলকাতা, মেমারী, গুসকরা যেতে হলেও আমার উপর ন্যস্ত নির্দিষ্ট এলাকায় কাজ যথা সময়ে সুসম্পন্ন হয়েছিল। প্রতি ইউনিয়নে যেমন, বণ্ডুল ইউনিয়নেও তেমনি আমাদের নির্দিষ্ট কোটার চেয়ে বেশি হয়েছিল। এরূপ অভিজ্ঞতা আমাদের প্রায় সবারই। প্রায় কেউই নির্দিষ্ট অঙ্কের কম নিয়ে ফেরেন নি।

এছাড়া কিছু বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা লিখতে হয়। 'পুরে' গ্রামে কমরেড গুরুদাস আর আমি বৈঠকে বসেছি, দু-একজন বাদ দিলে প্রায় সবই মুসলমান। উপস্থিত গ্রামবাসীদের মধ্যে একজন হঠাৎ বলে উঠলেন, "আমরা সব মুসলমান, আমরা মুসলিম লীগের। আমরা আপনাদের কাজে

সাথ দিতে পারব না।" আমি অমনি পরাম্ করে বলে উঠলাম, "আপনি নিজের কথাই বলুন, বাকি গ্রামবাসীর কথা আপনার বলার কোন অধিকার নেই। আপনি মুসলিম লীগের না কামারকিতের নৃসিংহ চৌধুরীর ? নৃসিংহ চৌধুরী ডাকলেই তো এখুনি ছুটে যাবেন।" মানুষটি আমার কথায় একেবারে চুপ মেরে গেল। বৈঠক চলাকালে আর কথাই বলল না। বৈঠকের পর এবং গ্রামের অন্যান্য কাজ সারার পর যখন গ্রাম থেকে বেরিয়ে আসছিলাম, কমরেড গুরুদাস বললেন, "লোকটি তো ঠিকই নৃসিংহ চৌধুরীর পোষ্য, কিন্তু আপনি সেকথা জানলেন কী করে ?" আমি বললাম, "আন্দাজে ঘা মারলাম, ঠিক লেগে গেছে। অবশ্য দালাল চিনতে দেরি হয় না।"

ঠিক এমনিই একটা ঘটনা ঘটেছিল ১৯৪২ সালে, রায়নায়—বর্ধমান জেলার কৃষক সম্মেলনের অনুষ্ঠানের সময়। রসিকখণ্ডের কমরেড ডাক্তার গঙ্গা হালদার ও সহজপুর হাটতলা ও আশপাশের বিশ-পঁচিশ জন কমরেড, তার সঙ্গে আমি প্রচার ও চাঁদা সংগ্রহের উদ্দেশ্যে কয়েকটি গ্রাম চক্কর দিতে বেরিয়েছিলাম। এর মধ্যে পড়ে মুসলমান প্রতিপত্তির গ্রাম রূপসনা। আমরা ঘুরতে ঘুরতে রূপসনা পৌঁছে এক দহলিজে উঠলাম, উঠে কেউ বলুক না বলুক নিজেরাই বসে পড়লাম। আমরা বসতে না বসতে একজন বললেন, "আপনারা এখানে এলেন কেন ? আমরা মুসলিম লীগের।" আমি বললাম, "আপনাদের মুসলিম লীগ কী এমন দল যে বাপ-ঠাকুরদার শেখানো মুসলমানী আদব-তমিজ ভুলতে হয় ? বিশালাক্ষ বোস কি মুসলিম লীগের নেতা ? তিনি ডাকলে আপনি তো রাতের বেলাতেও ছুটে যাবেন।" লোকটা 'থ' মেরে গেছে। দু-চারজনের স্মিত হাসি দেখে বুঝলাম ঠিক তাক লেগেছে। তারপর অবশ্য গ্রামের লোকেদের সঙ্গে সম্মেলনের উদ্দেশ্য ও তাঁদের সাহায্য দরকার ইত্যাদি আলাপ-আলোচনা করলাম। পথে ফিরতে ডাঃ গঙ্গা হালদার বললেন, "আপনি ঠিকই বলেছেন। কিন্তু লোকটির প্রকৃতি আপনি জানলেন কী করে ?" বললাম, "লোকটির কথা শুনেই আন্দাজ করলাম, দেখছি তাক ঠিক লেগে গেছে।"

ভাণ্ডারডিহি গ্রামে এক ব্যক্তি আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলেন যে, আমরা যে গ্রামে প্রবেশ করি, সেই গ্রামের পাড়ায় পাড়ায় দলাদলি লাগিয়ে দিই। আমি বললাম, "ব্যাপারটি ঠিক উল্টো। আপনাদের গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হাই স্কুল ঝগড়া-বিবাদের ফলে ভাঙতে ভাঙতে নিম্নশ্রেণীর কয়েকটি ক্লাসে পরিণত হয়েছে। সড্যা গ্রামে কৃষক আন্দোলন প্রতিষ্ঠিত

হবার পূর্বে কত ঝগড়া-বিবাদ হয়েছে। এখন কৃষক সমিতি প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে ঝগড়া-বিবাদ তো বন্ধ হয়ে গেছেই, ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা নানান্ দিকে শুরু হয়েছে। হাই স্কুল তৈরি হয়ে গেছে। এইভাবে স্থানীয় আরও দৃষ্টান্ত দেখিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করলাম, সুস্থ এবং সবলের অত্যাচার-বিরোধী রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের অবস্থা ভালোর দিকেই যায়। (এখন অবশ্য ভাণ্ডারডিহিতে হাই স্কুল পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।)

সাধারণ অভিজ্ঞতায় কিছু দৃষ্টান্ত দিলাম মাত্র, আর কিছু নয়।

এতজন কমরেডের এত পরিশ্রম শেষে প্রচণ্ড আঘাত পাবে নিজেদের পার্টির মধ্য থেকেই—এ রকম কথা ভাবতেও পারিনি, ভাবা অসম্ভব। অভ্যর্থনা, জনসমাবেশ, খাওয়ানো-দাওয়ানোর ব্যবস্থা ইত্যাদি সব দিক সফল হলো। কিন্তু একটি প্রস্তাবে আমাদের তুলে আছাড় দিল। ধানের দামের প্রশ্ন কৃষককে খুব বিচলিত করে রেখেছিল। কৃষক সমিতির একমাস আগের প্রস্তাবেও সরকারী ক্রয়মূল্য এবং নিয়ন্ত্রণ মূল্য সাত টাকা দাবি করা হয়েছিল। সম্মেলনের প্রস্তুতিতে বৈঠক, সভা, শোভাযাত্রা সবেতেই এই দাবি বড় স্থান পেয়েছিল। ব্যক্তিগতভাবে পার্টির সমস্ত কর্মী এই দাবি প্রচার করেছেন। কিন্তু সম্মেলনে এসে দক্ষিণপন্থী নেতৃত্ব একেবারে উল্টোরূপ গ্রহণ করলেন। শাসক শক্তির তোষণকারী যোশী, ভবানী সেন দাবি করলেন, সরকারী কম দামই মেনে নিতে হবে। আমার ডিউটি ছিল বর্ধমান শহরে। নানান্ কাজের ভার, নিরন্তর বর্ধমান আর হাটগোবিন্দপুর যাওয়া-আসা করতে হচ্ছিল। যখন হাটগোবিন্দপুরে গিয়ে এই ডিগ্‌বাজির কথা শুনলাম, বুকে একটা প্রচণ্ড ধাক্কা বোধ করলাম। সম্মেলন ডেকে নিজেদিগকে এইভাবে বিশ্বাসভঙ্গকারী ঘোষণা করার চেয়ে সম্মেলন আহ্বান না করাই ভাল ছিল, এ রকম মনে হতে লাগল। সব অভিজ্ঞ ব্যক্তি বলেছিলেন, জনসমাগম হয়েছিল ত্রিশ হাজার। এই ত্রিশ হাজার মানুষ তাহলে কি শুনে গেল? আমাদের কথার উপরে কী করে আর মানুষ বিশ্বাস রাখবে? তখনই মনে স্থির করে ফেললাম, এই দক্ষিণপন্থী নেতাদের নেতৃত্বের পদ থেকে হঠাতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে বুঝলাম এঁদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে শ্রমিক-কৃষক ঐক্যের বিরোধিতা, শ্রমিকদের পাশে কৃষক যাতে না দাঁড়ায় তারই চেষ্টা। ৪৪ বৎসর পরও আমার সেই অভিজ্ঞতায় আমি এখনও দৃঢ়।

প্রসঙ্গতঃ, যোশীর কিছু কথা মনে পড়ে। বর্ধমান থেকে মোটরে তাঁকে যখন হাটগোবিন্দপুরে নিয়ে যাচ্ছি, তখন তিনি আমাকে বললেন,

"বর্ধমানের মহারাজার জমি কত ?" আমি বললাম, "জমিদারী প্রথায় থাকে থাকে ও স্তরে স্তরে ব্যবস্থা করা আছে, মহারাজার নিজের হাতে যখন কোন জমি নেই তখন এ প্রশ্ন উঠে কোত্থেকে ?" তিনি নিজের নির্বুদ্ধিতা তো বুঝলেনই না, বিজ্ঞের মতো মাথা নেড়ে বললেন, "এর অর্থ বর্ধমান জেলার কমিউনিস্ট পার্টির নেতারা জেলার ও প্রদেশের সবচেয়ে বড় জমিদারের কত একর জমি আছে জানেন না।" এই ব্যক্তিই নেত্রকোণায় অনুষ্ঠিত সারা ভারত সম্মেলনে বললেন: "Just now I come from a place, I mean Burdwan, where I saw thirty thousand hoarders demanding raising of food prices"

মর্মার্থ--"আমি এখনই বর্ধমান থেকে আসছি, সেখানে ৩০ হাজার মজুতদারদের সমাবেশ দেখলাম, তাঁরা খাদ্য দ্রব্যের মূল্য বাড়াতে চাইছেন।"

যিনি সাধারণ গরীব, মধ্যবিত্ত এবং জমিহীন কৃষকের জমায়েতকে মজুতদারদের জমায়েত বলে কুৎসা করতে পারেন এবং নিজের পদ-পরিচয়ে কমিউনিস্ট পার্টিকে কৃষকের শত্রু হিসাবে চিহ্নিত করতে পারেন, তাঁর বুদ্ধিতে কমিউনিস্টের নীতিবোধের প্রসার কতটুকু সহজেই অনুমেয়।

কমরেড হরেকেষ্ট সকাল থেকে সরকারী মূল্যের প্রস্তাবের বিরোধিতা করে যাচ্ছেন। তাঁর পরিশ্রান্ত বিমর্ষ মুখ এখনও মনে পড়ছে। যোশী, ভবানী সেনের মতো নেতাদের হাতেই কমিউনিস্ট পার্টি বার বার মার খেয়েছে। তবুও আমরা হতাশ হইনি। দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থী বিচ্যুতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে আজকের সি পি আই (এম) দাঁড়িয়েছে।

এই ধানের মূল্যের লড়াই অনেক দিন পর্যন্ত চলেছিল। প্রথমতঃ, দক্ষিণপন্থী নেতৃত্ব, কৃষক সমাজের বড় অংশ গরীব ও মধ্যবিত্ত—এদের সম্পূর্ণ অবহেলা করতেন। কেবল যখন এদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করে মেহনতী মানুষের ঐক্যকে বানচাল করা যেত, তখনই যাদের এতদিন মজুতদার ও ফাটকাবাজ বলে অভিহিত করেছেন, হঠাৎ তাদের বন্ধু হয়ে এমন উদ্গার শুরু করতেন যাতে বুর্জোয়া ধনপতি ও সাম্রাজ্যবাদ কৃষকের স্বার্থকে উপেক্ষা করে মুনাফা লুঠের সুযোগ পায়। কৃষকের ধানের ন্যায্য দাম দিতে হলে ধানের মূল্য কিছু বাড়াতে হবে, তাহলেই ক্রেতা সাধারণের কষ্ট হবে বলে কৃষকের ন্যায্য দাবিকে মুনাফাবাজী আখ্যা দেওয়া হয় এবং এইভাবে জনমতকে বিভ্রান্ত করা হয়। কৃষকের ন্যায্য দাবি উত্তোলনকে এইভাবে বিভ্রান্ত করা হয় এবং ফলে কৃষক আন্দোলন বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

সাম্রাজ্যবাদ ও বুর্জোয়াদের তোষণকারী দক্ষিণপন্থীদের প্রতিরোধ একান্ত প্রয়োজন হয়েছিল। কিন্তু ১৯৪৫ সাল থেকে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত এইরূপ প্রতিরোধ করতে পারি না, বিভ্রান্তির চক্রেই ঘুরতে থাকি। তখনও আণ্ডারগ্রাউণ্ডে আছি, এই সময় বর্ধমান শহরে এক শেল্টারে অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টির সমালোচনায় 'এডগার্স্ নোট্স্' এক প্রবন্ধ পড়লাম। এই প্রবন্ধে তিনি বলেছিলেন, "ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টি বেশ কৌশল করছে, একদিকে শ্রমিকদের স্বার্থে বলছে ফসলের দামের কিছু অংশ সরকারী খাতে বহন করে ভর্তুকি দিয়ে শ্রমিক ও সাধারণ মানুষকে সস্তা দরে খাদ্য দিতে হবে. অন্যদিকে কৃষকের স্বার্থের দিকে নজর রেখে কৃষককে তার মূল্যের একাংশ সরকারী খাত থেকে ভর্তুকি দিয়ে তার ফসলের মূল্য ন্যায্য দামের নীচে না পড়ে তা দেখতে হবে।" বুঝলাম ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টি ঠিকই ধরেছেন। খাদ্যের কেনাবেচা নিয়ে সরকার যেভাবে একদিকে বিক্রেতা কৃষক এবং অন্যদিকে ক্রেতা-সাধারণ—উভয়কে প্রবঞ্চনার মুখে ফেলে দিচ্ছেন. তাকে বুখতেই হবে। এতে গোটা সমাজের উপকার হবে। খাদ্যের দাম বাড়লে মজুরীর দাবি বাড়ে। ছোটখাটো কলকারখানাগুলিতে সে চাপ সর্বক্ষেত্রে এবং সব সময় বহনীয় হয় না। সুতরাং চতুর্দিকে ব্যবসা-বাণিজ্য, কলকারখানা সুষ্ঠুভাবে চলতে হলে খাদ্যের একটা নিম্নহারে নির্দিষ্ট মূল্য প্রয়োজন অথচ কৃষকের যাতে ক্ষতি না হয়, তাকে দেয় মূল্যের একাংশ সরকারকে বহন করতে হয়।

জেলা কমিটিতে আলোচনা করে কৃষককে প্রাইস্ সাপোর্ট এবং ক্রেতাকে প্রাইস্ সাবসিডি দেওয়ার পক্ষে জনমত সৃষ্টি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলাম। সেইভাবে সভা ইত্যাদিও চলতে লাগল। এদিকে প্রাদেশিক কৃষকসভার কমিটি তখন সক্রিয় নয়, অধিকাংশ কর্মী তখন জেলে বা আণ্ডারগ্রাউণ্ডে। আমরা বর্ধমানে সমস্যার এইরূপ সমাধানমূলক কর্মসূচী নিয়ে কাজ করছি. অথচ প্রদেশের নেতৃত্বের অভাবেও কিছু করে ওঠা যাচ্ছে না, বরং পুরানো নীতিই সব কর্মীদের মনে রয়ে গেছে।

এই সময় পার্টির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রাদেশিক স্তরে কাজ চালাবার জন্য প্রাদেশিক কৃষকসভার কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটিতে আমাকে সম্পাদক করা হয়। নেতাদের উদ্দেশ্য ছিল আমাকে বর্ধমান থেকে এনে এই কাজের ভার দেওয়া। কমরেড মুজাফ্‌ফর আহমদ আমাকে ভার নিতে বললেন এবং বর্ধমান থেকে কলকাতায় চলে এসে সম্পাদকের

দায়িত্ব নিতে বললেন। আমি তাঁকে বোঝালাম, কমরেড সুবোধ চৌধুরী এবং কমরেড হরেকেষ্ট কোঙার দু'জনেই আণ্ডারগ্রাউণ্ডে, পুরনো পরিচিত কর্মী হিসাবে একা আমাকেই সারা জেলা দাবড়ে বেড়াতে হচ্ছে। শুধু প্রকাশ্য কাজের জন্য নয়, যাঁরা আণ্ডারগ্রাউণ্ডে আছেন এবং যাঁরা প্রকাশ্যে কাজ করছেন, তাঁদের অবিচ্ছিন্ন ধারার যোগাযোগ যাতে সক্রিয় থাকে তার জন্য এইরূপ কঠোর পরিশ্রম করে দৌড়াদৌড়ি করতে হচ্ছে। বাইরের কাজে সভা ইত্যাদির জন্য এখানে ওখানে দৌড়াতে হতো, সঙ্গে সঙ্গে রাতের অন্ধকারে আণ্ডারগ্রাউণ্ড কমরেডদের সঙ্গে, বিশেষ করে কমরেড সুবোধ চৌধুরী, কমরেড হরেকেষ্ট কোঙার ও কমরেড তারাপদ-র সঙ্গে দেখা করতে হতো। সুতরাং বর্ধমান থেকে কলকাতা আসা-যাওয়া কঠিন হয়ে যেত।

কমরেড শান্তিময় ঘোষ অফিসের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক নিযুক্ত হয়েছিলেন। তিনি সারা প্রদেশব্যাপী পুনরায় যোগাযোগের পুনঃ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন। এই গোড়ার দিকে শরৎকালে বর্ধমানে জরুরী কাজ থাকায় আমি একটি প্রাদেশিক কৃষকসভায় উপস্থিত হতে পারিনি। কেউ আপত্তি না করলে এজেণ্ডায় দেওয়া হয়নি এমন বিষয় অনেক সময় উত্থাপিত হয়, অনেক সময় আলোচিত হয়ে প্রস্তাবও গৃহীত হয়ে যায়। আমি যে সভায় এখন উপস্থিত হতে পারলাম না, সেই সভায় এমনিই একটি ব্যাপার ঘটে যায়। বিষয়টি হচ্ছে ধানের দাম! কৃষককে ন্যায্য দরের চেয়ে কম দর দেওয়াই ছিল সরকারের নীতি। সেই ১৯৪৫ সালে হাট-গোবিন্দপুরে সম্মেলন থেকে যোশী বা ভবানী সেনের নেতৃত্বে আমরা যা করে যাচ্ছিলাম তা বাস্তবে সরকারী নীতির সমর্থন। অন্যদিকে আমাদের নীতির মাধ্যমে শ্রমিক-কৃষক মৈত্রীর মূলে কুঠারাঘাত করছিলাম। উল্লিখিত সভায় এমন জিনিস আলোচনা হবে জানলে আমি যে-কোনমতে উপস্থিত হতাম। কিন্তু এ ধরণের কোন কথা আলোচনা হবার ঠিক ছিল না, ফলে আমি উপস্থিত থাকিনি। আমরা বর্ধমানে যে নীতি গ্রহণ করেছিলাম, তা একদিকে কৃষককে বিক্রয় মূল্যে সাহায্য (price support) এবং অন্যদিকে ক্রেতাকে ক্রয়মূল্যে সাহায্য (subsidy)। উল্লিখিত সভায় আমার অনুপস্থিতিতে আমাদের এই বক্তব্য তুলে ধরার কেউ ছিল না। ফলে এককালের দক্ষিণপন্থী, ১৯৪৮-৪৯ সালের অতি বামপন্থী, ১৯৫১ সালে পুনরায় নতুন বিক্রমে দক্ষিণপন্থী ভবানী সেন প্রমুখ উপরোক্ত শ্রমিক-কৃষক ঐক্য বিরোধী প্রস্তাব গ্রহণ করিয়ে নেন।

বস্তুতঃ কৃষক তো একশ্রেণীয় হয় না। কৃষকের মধ্যেই ধনী কৃষক, মধ্যবিত্ত কৃষক, গরীব কৃষক, ভূমিহীন কৃষক, ক্ষেতমজুর প্রভৃতি আছেন। নানান অত্যাচার থাকলেও ধনী কৃষক অনেক সময় খুব কম আঘাতে বা বিনা আঘাতে রেহাই পেয়ে যান। অন্যথায় সমস্ত কৃষক সমাজই দুটি অত্যাচারের কম-বেশি ভুক্তভোগী হন।

সামন্ততান্ত্রিক নির্যাতন যা শরৎচন্দ্রের লেখায় 'মহেশ' বা 'অভাগীর স্বর্গ' প্রভৃতিতে পাওয়া যায়, তার বিরুদ্ধে কৃষকের সংগ্রাম সব কৃষককে জড়ো করে, এমন কি শহরে গণতন্ত্রে উদ্বুদ্ধ মানুষেরও সমর্থন পায়। অন্যদিকে থাকে বুর্জোয়া কেনা-বেচার বাজারের ফাটকাবাজী ও দামের ওঠা-নামার খেল। উদ্দেশ্য থাকে করাতের দুই মুখে কাটা। এমন নীতি পরিচালনা করে যাতে কৃষক সস্তা দামে বেচতে বাধ্য হয়, আর শিল্পে তৈরি প্রয়োজনীয় জিনিসও বেশি দামে কিনতে বাধ্য হয়। এর বিরুদ্ধেও কৃষকের সংগ্রাম ন্যায্য প্রতিকার দাবি করে। এর একমাত্র সমাধান যা এখন কৃষকসভার নীতি। সরকার কর্তৃক কৃষককে ন্যায্য মূল্যের জন্য সাহায্য এবং ক্রেতাকে নিম্ন মূল্যে কেনায় সাহায্য দান—এই সমাধান ক্রেতা শ্রমিক ও বিক্রেতা কৃষকের মিলনকে দৃঢ় করে। কিন্তু যোশী, ভবানী সেন কোম্পানী এবং তাঁদের সাঁকরেদরা হাটগোবিন্দপুর সম্মেলন থেকে শুরু করে ১৯৫২ সালে পরাজিত না হওয়া পর্যন্ত শ্রমিক-কৃষক ঐক্যের মূলে কুঠারাঘাত করেছিলেন।

প্রাদেশিক সম্মেলনের পর আলোচ্য প্রস্তাবের ফলে বর্ধমানে কৃষক-সভার প্রচণ্ড ক্ষতি হয়। সম্মেলনের প্রস্তুতিতে নেতা থেকে শুরু করে সাধারণ সদস্য সবাই ধানের মূল্য সাড়ে সাত টাকা দাবি করে আন্দোলন করে গেছেন। হঠাৎ সরকারী কম মূল্য ঘোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কৃষক সম্মেলন ভোল পাল্টে সরকারী প্রস্তাব সাড়ে ছ'টাকার পক্ষে চলে এলেন। এটা জনসাধারণের কাছে গুরুতর বিশ্বাসভঙ্গের কাজ বলে প্রতিভাত হলো। সাময়িকভাবে আমরা জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলাম। এই বিচ্ছিন্নতা আমাদের অনেকদিন ধরে কষ্ট দিয়েছে। মানুষকে বোঝানোর জন্য আমাদিগকে নিরন্তর পরিশ্রম করতে হয়েছে। শেষে ১৯৫০ সালে বর্ধমান জেলায় এবং ১৯৫২ সালে সারা প্রদেশে উপরে উল্লিখিত নূতন মূল্য নীতি এবং লেভির পীড়ন ও যথেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে আন্দোলন, সঙ্গে সঙ্গে গ্রামে ও শহরে ক্রেতাদের জন্য সস্তা দরে খাদ্যের দাবি, লুপ্ত সংযোগকে পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করলো। আত্মসমালোচনায় আমাদের আন্তরিকতা লোকে বুঝলেন।

বর্ধমানে মিউনিসিপ্যাল নির্বাচন, ১৯৪৬

১৯৩৮ ও ১৯৪২ সালের মিউনিসিপ্যাল নির্বাচনের কথা আগেই বলেছি। এরপর নির্বাচনের ডাক ওঠে ১৯৪৬ সালে। ১৯৪২ সালে A ওয়ার্ডে দু'জন প্রার্থী দিয়ে একজনকে জেতাতে পেরেছিলাম। এবার আর দু'জন প্রার্থী করা হলো না। পার্টির নির্দেশে A ওয়ার্ডে কেবল আমি প্রার্থী হিসাবে দাঁড়ালাম। আহাদ সাহেব এবার আর দাঁড়াতে চাইলেন না। আমি জয়ী হয়েছিলাম। পুরানো যে গ্রুপের সঙ্গে আমরা মিলিতভাবে মিউনিসিপ্যাল বোর্ডে কাজ করেছিলাম, এবারও তাঁদের সঙ্গে মিলিত কার্যক্রম গ্রহণ করলাম। এবার আরও আসন লাভ করায় আমরা টোগোদা-কে চেয়ারম্যান করে বোর্ড গঠন করলাম।

মিউনিসিপ্যালিটিতে হিন্দু সাম্প্রদায়িককে মুসলমান সাম্প্রদায়িককে এবং আমলাতন্ত্রের বশংবদদের কোণঠাসা করতে পারায় বাকি আমরা মোটা-মুটি বেশ ভাল সম্পর্ক রেখে চলতে পারছিলাম।

মুশকিল হচ্ছে মানসিক সিদ্ধান্ত বুর্জোয়া গণতন্ত্রের পক্ষে হলেও নীতিগতভাবে সেই সিদ্ধান্তের অনুশীলন প্রতিটি সমস্যায় কোথায় আমাদের অবস্থান নির্দেশ করে তা আমাদের সীমিত জ্ঞানের দরুন সহজে স্থির হয় না। এই রকম ছোটখাটো সমস্যার মধ্যেই স্বায়ত্ত-শাসনে আমাদের চিন্তা-ভাবনার সীমাবদ্ধতা ধরা পড়ে। অভিজ্ঞতা থেকেই দু একটা দৃষ্টান্ত দিলেই সহজে এটা বোঝা যাবে। যেসব বিধির দ্বারা পৌরসভা বা কোন প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হয়, রুলস্ এবং বাই-লজ্ তার গুরুত্বপূর্ণ অংশ। রুলস্ এবং বাই-লজ্-এ ফারাক আছে। রুলস্ আইনের নির্দেশে গভর্মেণ্ট কর্তৃক রচিত হয়। বাই-লজ্ তেমনি আইনের নির্দেশে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা কর্তৃক রচিত এবং নির্দেশিত হয়। ১৯৪৬-৪৭ সালে রিকশা চালনার শৃঙ্খলিত ব্যবস্থার জন্য বাই-লজ্ তৈরির প্রশ্ন মিউনিসিপ্যাল বোর্ডের সামনে আসে। এই প্রসঙ্গে প্রস্তাবিত বাই-লজ্-এর একটি ধারার বিরুদ্ধে আমার প্রবল আপত্তি হয়। এর জন্য মার্কসবাদের প্রয়োজন হয় না। সাধারণ

গণতান্ত্রিক চিন্তাধারাতেই আমার আপত্তি ওঠে। ধারাটি ছিল এইরূপ ঃ চুরি-চামারি বা যে কোন ফৌজদারী বিধির লঙ্ঘনের ফলে সাজা হলে, সুতরাং দাগী হলে, তাকে রিক্শা লাইসেন্স দেওয়া হবে না। আজকে শিল্পে যে রকম বেকারী তাতে শহরে রিক্শা চালনা বেকারদের রোজগারের একটা উপায় করে দেয়। এই রোজগারের পথ বন্ধ করলে গরীবকে তো আরও অপরাধের দিকে ঠেলে দেওয়া হবে। অপরাধের জন্য তো পুলিশ আছে, কোর্ট আছে, তাদেরই এসব তদন্ত রাখার কথা। এর সঙ্গে পৌর-সভাকে জড়ানোর আমি ভীষণ বিপক্ষে। আমি বললাম, "এর সঙ্গে উকিল, মোক্তার যাঁরা কোন কারণে অপরাধী হয়ে পড়েন, তাঁদের জন্য কি মিউনিসিপ্যালিটি কোর্টের দণ্ড ছাড়া আরও কিছু দণ্ডের ব্যবস্থা করবেন ? কিংবা তাঁরা শুধু শিক্ষিত ভদ্রলোক বলে রেহাই পাবেন ?" কিন্তু দেখলাম পৌরসভার কমিশনারদের মধ্যে বেশ বিভ্রান্তি রয়েছে। সুতরাং এই ধারা নাকচ করার জন্য আমি জোর চেষ্টা করতে লাগলাম। মনোনীত সদস্যদের মধ্যে একজন ছিলেন রেলের মেকানিকাল ইঞ্জিনীয়ার। তিনি ছিলেন এ্যাঙ্গলো-ইণ্ডিয়ান এবং খ্রীশ্চান। আমি তাঁর সঙ্গে গিয়ে দেখা করলাম। তাঁকে বললাম, "মানুষ একবার অপরাধ করলে যে তার রুজি-রোজগার বন্ধ করতে হবে, এ বিবেক-বিরুদ্ধ। খ্রীশ্চানের ক্ষেত্রে এরূপ কাজটাই জঘন্য নৈতিক অপরাধ।" বস্তুতঃ মানুষটি ছিলেন খুব ভাল। তাঁর খ্রীশ্চান বিবেক রুজি কেড়ে নেবার প্রস্তাবের বিপক্ষে উত্তপ্ত উত্তেজিত হয়ে উঠল। মিউনিসিপ্যালিটির সভায় আমার প্রতিবাদটি জানালাম। বাকি আমাকে আর কিছু বলতে হলো না। উক্ত ইঞ্জিনীয়ার সদস্য উত্তেজিত ভাষায় এর প্রতিবাদ করলেন এবং মিউনিসিপ্যালিটির এ রকম ধারা প্রণয়ন অত্যন্ত গর্হিত এবং নিন্দনীয় হবে এই কথা বললেন। আমি একটু ইশারায় বলে দিলাম, দরকার হলে আমি এটা কোর্টে নিয়ে যাব। যাই হোক, আমাদের প্রতিবাদের ফলে উক্ত ধারা বর্জিত হলো। যেমন পথে-ঘাটে অনেক মানুষের সদয় ব্যবহার মনে থেকে গেছে, তেমনি এ ইঞ্জিনীয়ার মহাশয়ের কথাও আমার মনে রয়ে গেছে।

এই প্রসঙ্গে পরবর্তী কালের আর একটি কথা মনে পড়ল। তখন বোর্ড এসেছে আমাদের হাতে। সে ঘটনা স্বাধীনতার বেশ কিছুদিন পর। পৌরসভার চেয়ারম্যান তখন ছিলেন মহৎহৃদয় শ্রীশৈলেশচন্দ্র বন্দ্যো-পাধ্যায়। একদিন সকালে পাড়ার এক সুপরিচিত রিক্সাওয়ালা আবদুর

রহমান মিউনিসিপ্যালিটি কর্তৃক তাকে লেখা একটি চিঠি আমাকে দেখাল। একদিন শুনানীর তারিখ দেওয়া আছে, সেদিন উপস্থিত হতে বলা হয়েছে। তাকে জেরা করে জানলাম যে, পথে-ঘাটে রিক্সাওয়ালাদের আচরণ সন্তোষজনক না হলে মিউনিসিপ্যালিটিতে তলবের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং পুনরায় এরূপ ত্রুটি হলে লাইসেন্স কেড়ে নেওয়া হবে এরূপ ধমক দেওয়া হচ্ছে। আমি তো অবাক! কোন আইনে মিউনিসিপ্যালিটি কর্তৃক এরূপ তলব দেওয়ার ক্ষমতা নেই। রিক্সাওয়ালা রাস্তা-ঘাটে মিউ-নিসিপ্যাল আইন ভঙ্গ করলে তা পুলিশের দৃষ্টিতে আনতে হয়। পুলিশের নালিশের ফলে কোর্ট থেকে তলব হয়। সাধারণতঃ যাকে পাঁচ-আইনের মামলা বলে এরকমই হয়। মিউনিসিপ্যালিটি নিজের হাতে এরকম ক্ষমতা নিলে দেশের আইন-ব্যবস্থাকে অগ্রাহ্য করে নাগরিকের অধিকারে হস্তক্ষেপ করা হয়। চেয়ারম্যান শৈলেশদা তো অভিজ্ঞ সিনিয়র মোক্তার। সুতরাং তাঁর পরিচালিত দপ্তরে এরকম হলো কী করে? তাঁর কাছেই গেলাম। যাবার আগে রিক্সাওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করলাম তার বিরুদ্ধে নালিশ কে এবং কী কারণে করতে পারে। একজন পৌর কমিশনারকে (প্রজা সোসালিস্ট পার্টির সদস্য) স্টেশনে গাড়ি ধরিয়ে দিতে না পারায় তিনিই নালিশ করেছেন। আব্দুর রহমান বুড়ো মানুষ, তার দেহের শক্তি বেশি ছিল না। জোরে চালাতে বা বেশি বোঝা নিতে সে ছিল অক্ষম। সে বলল, কমিশনারবাবু যা বই-এর বোঝা এনেছিলেন তা তার পক্ষে বওয়া খুব কঠিন। এরকম বিপদের শঙ্কা থাকে বলে সে স্টেশনে যায় না। শৈলেশদাকে প্রশ্ন করলাম, কোন আইনে তাঁর অফিস এরকম নোটিশ দিয়েছে? চিঠিটা দেখে এবং প্রশ্ন শুনেই তিনি সব বুঝতে পেরেছেন, আমাকে আর কিছু বলতে হলো না। তিনি বললেন, "তোমাদেরই সব সমসাথীরা এরকম প্রথা introduce করেছেন।" খোঁজ নিয়ে জানলাম, শহরের একটা মোড়ে রিক্সাওয়ালারা ভিড় করে এবং খদ্দের নেবার জন্য রিক্সা নিয়ে ছোটাছুটি করে, তাই একজন নালিশ করেছিলেন। এর ফলেই রিক্সাওয়ালাদের বিপর্যয়। আমি সেই নাগরিকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম। তাঁকে আইনের ব্যাপারটা বোঝালাম, তিনি সহজেই ভুলটা বুঝে গেলেন। আমি বললাম, "ভিড়ের জায়গায় নিয়ন্ত্রণ করার জন্য একজন ট্রাফিক পুলিশ পোস্ট না করলে, এরকম হতে বাধ্য।" মিউনিসিপ্যালিটিকে বলা হবে তাঁরা যেন পুলিশকে অনুরোধ করে উক্ত ভিড়ের জায়গায় একজন ট্রাফিক পুলিশ মোতায়েন করান। এর বাইরে মিউনিসিপ্যালিটির কোন

ক্ষমতা নেই। মিউনিসিপ্যালিটি বাই-ল প্রণয়ন করতে পারে কিন্তু সেই বাই-ল কেউ ভাঙলে এ্যাকশন নিতে পারে পুলিশ আর কোর্ট।

উপরে এতগুলো কথা লিখলাম এইটুকু বোঝার জন্য যে, গণতন্ত্র বস্তুটা আংশিক বুঝলে চলে না, প্রশাসনের সব কিছু দেখে শুনে বুঝে নেওয়ার প্রয়োজন হয়। আমরা অবশ্য এ বিষয়ে বরাবরই সজাগ থেকেছি এবং এখনও থাকি। দু-একটা ভুল-ছুট হয় এমন কিছু নয়। আমাদের পার্টি এমনভাবেই গঠিত যে, এ রকম কিছু ঘটলে ভুল ধরা পড়বেই এবং সংশোধিত হবে। সে জন্যেই পার্টি জনগণের ভালবাসা অর্জন করতে পেরেছে।

১৯৪৬ সালে যখন আমরা নির্বাচিত হলাম তখন একদিকে বিরাট আশার আলো, আর একদিকে সঙ্কট। ঘটনার গতিকে প্রবাহিত করার মতো ক্ষমতা আমাদের ছিল না। বুর্জোয়া নেতৃত্ব দেশকে সঠিক পথে নিয়ে যেতে ব্যর্থ হয়েছেন। সারা দেশের স্বাধীনতার আশা এবং সম্ভাবনা উত্থিত হবার সঙ্গে সঙ্গে ছোটখাটো জাতি, সম্প্রদায় সবাই নিজ নিজ দাবি নিয়ে এগিয়ে এলেন। সবচেয়ে বড় সঙ্কটজনক পরিস্থিতি হয়েছিল সাম্প্রদায়িক বিভেদ নিয়ে। বুর্জোয়া নেতৃত্ব সাম্প্রদায়িক বিভেদকে প্রশমিত করার পরিবর্তে বিপরীত অবস্থার সৃষ্টি করল।

সাম্প্রদায়িক বিভেদের ফলে বিবাদ-বিসংবাদ, এমন কি দাঙ্গার সম্মুখীন হতে হয়। কাজেই কেউ আর তার আশু কর্মক্ষেত্রের মধ্যে সীমিত থাকতে পারে না। পৌরসভার সদস্যগণেরও মনোযোগ নানান দিকে বিক্ষিপ্ত হতে থাকে। বৃহত্তর জাতীয় ভবিষ্যতের ভাবনা নিয়েই বিচলিত হতে হয়। কংগ্রেস, মুসলিম লীগ, হিন্দু মহাসভা, বিবদমান বুর্জোয়া নেতাদের অনুগামী হিসাবে নিজ নিজ দলের নেতাদের বক্তব্য ও তার গতিধারা অনুসরণ করতে থাকেন। কমিউনিস্ট পার্টি সুস্থ চেতনা নিয়ে বিভেদের বিরুদ্ধে ঐক্যের প্রয়াস চালিয়ে যেতে থাকে। অন্ততঃ বাংলাদেশকে এই বিভেদের পথ থেকে রোখার জন্য তারা অখণ্ডিতরূপে সম্মিলিত বাংলাদেশের দাবিকে সমর্থন করে। গান্ধীজীও এই দাবিকে আশীর্বাদ দেন এবং সমর্থন করেন। কংগ্রেসের শ্রীশরৎচন্দ্র বসু ও শ্রীযোগেশচন্দ্র গুপ্ত এবং মুসলিগ লীগের জনাব শহীদ সারওয়ার্দি, আবুল হাশিম সোচ্চার প্রচার করতে থাকেন, কিন্তু এর প্রতিরোধ করতে পারেন না। কংগ্রেসের শক্তিশালী ও বৃহত্তর গোষ্ঠী এবং মুসলিম লীগের অনুরূপ গোষ্ঠী দেশ খণ্ডিত

করার দিকেই একমত হন এবং ঐক্যবদ্ধ বাংলার সমস্ত প্রয়াসেরই বিরোধিতা করতে থাকেন। তাঁরা সারা বাংলাদেশের জেলায় জেলায় অখণ্ডিত বাংলা-দেশের দাবির বিরোধিতা করতে নির্দেশ দেন। কৌশল হিসাবে নানান কায়দা ছাড়া জেলায় জেলায় বার অ্যাসোসিয়েশন ও মিউনিসিপ্যালিটিগুলিতে বাংলাদেশ বিভাগ সমর্থন করে প্রস্তাব নিতে বলেন।

বলা বাহুল্য, অচিরেই এইরূপ প্রস্তাব বর্ধমান মিউনিসিপ্যালিটিতেও উত্থাপিত হয়। কংগ্রেস, মুসলিম লীগ, হিন্দু মহাসভা প্রভৃতি যখন এ বিষয়ে একমত তখন প্রস্তাব কার্যকরীভাবে প্রতিরোধ করা সম্ভব ছিল না। বন্ধুবর সন্তোষ খাঁ আমার কাছে এসে বললেন, আমরা দু'জন কমিউনিস্ট এবং ফরওয়ার্ড ব্লকের শ্রীঅজিত রায়কে সঙ্গে টেনে নিয়ে আমাদের বাম-পন্থীদের বিরোধিতা রেকর্ড করাতে হবে। তিনি আমাকে বললেন, "অবিলম্বে ওদের বিরুদ্ধে প্রস্তাব লিখে ফেল।" আমি তাই করলাম। সন্তোষ টাইপ করিয়ে নিয়মানুগ যা করার দরকার তা করলেন। প্রস্তাবের নকল শ্রীঅজিত রায়কে দেখালাম এবং তাঁর সম্মতি পেলাম। চেয়ারম্যান টোগোদা প্রমুখ আমরা যাঁদের সঙ্গে মিলিতভাবে পৌরসভার কাজ করতাম, তাঁদের মধ্যেও আমাদের প্রস্তাবের কপি নিয়ে প্রচার করতে ছাড়লাম না। সভার দিন প্রস্তাব হলো এবং তার বিরুদ্ধে অর্থাৎ দেশ বিভাগের বিরুদ্ধে প্রস্তাব পেশ করলাম। সন্তোষ আমার প্রস্তাব সেকেণ্ড করলেন এবং অজিত রায় সমর্থন করলেন। আমাদের প্রস্তাব পরাজিত হলো। দেশ বিভাগের ফলে দেশবাসীর উপর দিয়ে যা দুঃখ দুর্দশা ঘটে গেছে তার বিচার ভবিষ্যৎ প্রজন্ম করে যাবেন। এই অপরাধে আমরা যে অংশীদার নই তা মিউ-নিসিপ্যালিটির রেকর্ডে নথিভুক্ত করে ভালোই করেছি। কমরেড সন্তোষ খাঁয়ের উদ্যোগেই আচারগুলি দ্রুত সম্পাদন করা সম্ভব হয়েছিল। সাম্প্রদায়ি-কতার বিরুদ্ধে তাঁর নিরন্তর প্রয়াস বরাবর মনে থাকবে। শুধু প্রস্তাবেই তিনি ক্ষান্ত হননি। সভা, বৈঠক ইত্যাদি করেছিলেন। কাঞ্চননগরের সভায় আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন।

১৯৪৮ সালে ফেব্রুয়ারীর শেষে আমি আণ্ডারগ্রাউণ্ডে যাই। পৌর-সভার দায়িত্ব রাখা আমার আর ঠিক নয় এটা ভাবছিলাম। এমন সময় রাস্তার ধারে জায়গা বিলি ইত্যাদি নিয়ে কিছু কথা কানে এলো, যা আমার ভাল লাগল না। আণ্ডারগ্রাউণ্ড থেকেই আমি পদত্যাগ-পত্র দাখিল করলাম এবং পদত্যাগ করলাম।

বন্দীমুক্তি আন্দোলন

১৯৪৬ সালের ২৪ জুলাই তারিখে আমরা বিধানসভায় মন্ত্রিমণ্ডলীর কাছে রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির দাবিতে বড় মিছিল নিয়ে উপস্থিত হলাম। মন্ত্রিত্ব তখন মুসলিম লীগের। মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন শহীদ সারওয়ার্দি। স্বনামখ্যাত স্বাধীনতা-সংগ্রামীরা তখন রাজনৈতিক বন্দী। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় ছিলেন চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের অভিযোগে দণ্ডপ্রাপ্ত বন্দিগণ। অবশ্য তাঁদের সঙ্গে ছিলেন অন্যান্য কেসের সুখ্যাত রাজনৈতিক বন্দীরা। এ'দের সকলের মধ্যে অধিকাংশই তখন ছিলেন সি. পি. আই.-এর সমর্থক। জেলে পড়াশুনা করে কমিউনিস্ট আদর্শ, মত ও পথে বিশ্বাসী হন। প্রয়াত কমরেড অম্বিকা চক্রবর্তী, কমরেড গণেশ ঘোষ, কমরেড সুকুমার সেন প্রমুখের নাম তালিকার শীর্ষে।

বহুদিন থেকেই ছাত্র ফেডারেশন, কৃষক সমিতি, ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন ও সাধারণভাবে দেশের মানুষ উক্ত বন্দীদের মুক্তির দাবিতে আন্দোলন করছিলেন। ১৯৩৭-৩৮ সালে প্রধানতঃ ছাত্র ফেডারেশনের নেতৃত্বে এই আন্দোলন তীব্র হয়। মুক্তির দাবির সঙ্গে সঙ্গে মুক্তি সাপেক্ষে অবিলম্বে বন্দীদের আন্দামান থেকে দেশে ফিরিয়ে আনার দাবিও করা হয়। বন্দীরাও আন্দামানে অনশন ধর্মঘট করেন। অনশনের দরুন বন্দীদের অবস্থা কঠিন হয়। শেষে দেশের জনগণের তরফ থেকে গান্ধীজী, কমরেড মুজফ্‌ফর আহমদ্ প্রমুখ নেতৃবৃন্দের অনুরোধে তাঁরা অনশন ভঙ্গ করেন। যাই হোক, গণ-আন্দোলনের চাপে এ'দের মুক্তির দাবি স্বীকৃত না হলেও আন্দামান থেকে দেশের জেলে ফিরিয়ে আনা হয়। কিন্তু বন্দিত্ব থেকেই যায়।

উপরে উল্লিখিত ১৯৪৬ সালের ২৪ জুলাই তারিখের মিছিলের ফলে শেষ পর্যন্ত মুক্তির দাবিও গৃহীত হয় এবং বন্দীরা ১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৪৬ তারিখে মুক্তি পান। দণ্ডিত আসামীদের মধ্যে দু-চারজন ব্যতিরেকে

সকলেই ছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির সমর্থক এবং ভবিষ্যত কর্মপন্থায় কমিউ-নিস্ট পার্টিতে যোগদানে সঙ্কল্প ঘোষণা করেন।

এ'দের মুক্তির পর স্বভাবতই সারা পশ্চিমবাংলা ধরে বিভিন্ন জেলা থেকে আমন্ত্রণ ও অভিনন্দনের জন্য দাবি পার্টির প্রাদেশিক দপ্তরে আসতে থাকে। আমরাও বর্ধমান থেকে তাই চেয়েছিলাম। বিশেষ করে এ'দের অন্যতম কমরেড সুবোধ চৌধুরী ছিলেন বর্ধমানের অগ্রদ্বীপ গ্রামের। চট্টগ্রামে তাঁর মামা চাকরি করতেন। কাটোয়ায় কে. ডি. স্কুলে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ার পর স্কুলে-কলেজে লেখাপড়া করার জন্য তিনি চট্টগ্রাম যান এবং মামার বাড়িতে থেকে ওখানেই পড়াশুনা করেন। ঐ সময় তিনি শহীদ সূর্য সেনের নেতৃত্বে পরিচালিত বিপ্লবী দলের সংস্পর্শে আসেন এবং ঐ দলে যুক্ত হন। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখলের পর জালালাবাদের খণ্ডযুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেন এবং গুলি নিঃশেষ হওয়ায় ধৃত হন।

সমস্ত মুক্ত বন্দীদের সর্বত্র পাঠানো সম্ভব নয় দেখে এ'দের কয়েকটি গ্রুপে ভাগ করা হয়। বর্ধমানে যে গ্রুপ আসেন, তার নেতৃত্বে ছিলেন কমরেড অম্বিকা চক্রবর্তী। বলা বাহুল্য, কমরেড সুবোধ চৌধুরী এই গ্রুপে ছিলেন। বর্ধমানে অভিনন্দনের কার্যসূচীতে ছিল তাঁদের একটা টাকার তোড়া দেওয়া হবে। এর উদ্দেশ্যও ছিল। একদিকে যেমন তাঁদের সম্মান প্রদর্শন, অন্যদিকে তেমনি মুক্তির অব্যবহিত পরেই তাঁদের ব্যক্তিগত আশু যা প্রয়োজন তার কিছুটা ব্যবস্থা করা। শহীদ শিবশঙ্কর চৌধুরী এবং আমার উপর প্রধানতঃ এই তোড়া সংগ্রহের ভার দেওয়া হয়। শহরের ছাত্র ও 'মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি'র কর্মীরাও সংগ্রহের অভিযানে যোগ দেন। হাতে সময় ছিল অল্প। প্রচার করতেই তিন-চারদিন চলে গেল। তবুও আমরা জোর উদ্যোগে নেমে পড়লাম। ১৯৪৫ সালে জেল থেকে মুক্তির পর এবং আশু নির্বাচনের প্রারম্ভে বর্ধমান জেলা কংগ্রেসের উদ্যোগে কংগ্রেস থেকে জহরলাল নেহরুকে আমন্ত্রণ করে আনা হয়। অভিনন্দনের সময় জেলা কংগ্রেসের তরফ থেকে তাঁকে এক হাজার টাকার একটা তোড়া দেওয়া হয়। শহীদ শিবশঙ্কর ও আমাতে ঠিক করি আমাদের উপঢৌকন এর বেশি করতে হবে। দ্বিগুণের বেশি করতে পারলে ভাল হয়। এক-দিনের মধ্যেই আমাদের আদায় করতে হয়। বিকালে তাঁদের দেওয়ার কথা। আমাদের আদায় দু' হাজারের কাছাকাছি হলেও ছাত্র ও সাধারণ কমরেডদের কিছু এর সঙ্গে যোগ হলো। মহিলা সমিতির কর্মীদের সংগ্রহ ছিল উল্লেখযোগ্য। তাঁদের সংগ্রহের মধ্যে সোনার গহনাও ছিল। এর

মূল্যমান ধরে তাঁদের সংগ্রহ তিন-চারশোর মতো হলো (তখন অবশ্য সোনার দাম কম ছিল)। ফলে সৌভাগ্যবশতঃ মোট সংগৃহীত অর্থ আমাদের লক্ষ্যমাত্রা তো হলোই, বরং কিছু বেশিই হলো।

অতঃপর এইসব কর্মী ও নেতৃবৃন্দ কোন ফ্রন্টে এবং কোথায় কাজ করবেন, অনুষ্ঠানাদির ফাঁকে ফাঁকে তার আলোচনা চলতে থাকে। বলা বাহুল্য, বরাবরের মতো এক্ষেত্রেও পার্টির তরফ থেকে আমাদের সর্বাগ্রগণ্য নেতা কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ এইসব আলোচনা পরিচালনা করেন এবং তাঁরই পরামর্শ ও সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এ'দের প্রত্যেকের কর্মক্ষেত্র নির্ণীত হয়।

কমরেড সুবোধ চৌধুরীর বাড়ি বর্ধমানে। কাল অনুযায়ী বর্ধমান জেলায় শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র, মহিলা আন্দোলন যথেষ্ট শক্তিশালী। কমরেড সুবোধ চৌধুরী ঠিক করেছিলেন, তিনি আসানসোল মহকুমায় শ্রমিক আন্দোলনে যোগ দেবেন। এ বিষয়ে পার্টিরও অসম্মতি ছিল না। আপাততঃ গ্রামে আত্মীয়-স্বজন ও স্ব-গ্রামবাসী সকলের সঙ্গে দেখা করার জন্য গ্রামের বাড়িতে কিছুদিন থাকবেন মনস্থ করে কমরেড সুবোধ চৌধুরী অগ্রদ্বীপ গেলেন। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাঁর পরিকল্পনা পূর্বেই বলেছি। কিন্তু উল্লিখিত কিছু-দিনের মধ্যেই ঘটনা পরম্পরায় এমন অবস্থা দাঁড়াল যে, গ্রামের নিপীড়িত কৃষকদের সাহায্যের জন্য তাঁকে আটকে যেতো হলো। যেমন পরে বর্ণিত হবে, ঘটনার স্রোতে গ্রামে কৃষকদের ছোটখাটো অভাব অভিযোগ নিরাকরণে এক এক ধাপ করে শেষে তাঁকে কৃষক আন্দোলনেই জড়িয়ে যেতে হলো।

স্বাধীনতার মুখে

বর্ধমান তো দেশের একফোঁটা মাত্র। সুতরাং দেশে যা কিছু প্লাবন বয়ে যায়, সে ভাল হোক বা মন্দ হোক, তা জেলাকেও অনস্পর্শিত রাখে না। খাদ্য আন্দোলনের শেষাংশে তীব্র বস্ত্র সঙ্কট। কাপড় আর পাওয়া যায় না। এসব পূর্বে লিখেছি। রাজনীতি ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক বিভেদ বেড়েই চলেছে। একদিকে মুসলিম লীগের প্রদেশ বা রাজ্যগুলিতে বৃহত্তর অধিকারের দাবি শেষ পর্যন্ত দেশভাগের দাবিতে পর্যবসিত হয়েছে। (এই প্রসঙ্গে একটু উল্লেখ করা দরকার, পাকিস্তান তৈরি হবার পর তার প্রদেশ-গুলির অধিকার পাকিস্তানের রাষ্ট্রপরিচালকরা স্বীকার করেন নি—যদিচ পূর্বে এই ছিল এঁদের প্রধান দাবি। বরং তাঁরাও সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রের মুঠোর মধ্যে রাখতে চান।) অন্যদিকে কেন্দ্র সমস্ত দেশটাকে মুঠোর মধ্যে একচ্ছত্র অধিকারে রাখবে, তা জেদে পরিণত হয়েছে। ফলে ভাঙ্গন অনিবার্য হয়ে উঠল।

যাই হোক, এই তিক্ততার মাঝখানে আমরা আবার 'ফুড কমিটি'র মধ্যে জড়িয়ে থেকে দেশের যে আশু কর্তব্য রাজনৈতিক সমাধানের চেষ্টা, তাতেই সম্পূর্ণ নিয়োজিত হবার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠলাম এবং এইসব খুচরো ঝঞ্ঝাট থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য ব্যস্ত হলাম। সরকারী কর্ম-চারীরাও লাগাতার বিরোধিতা করে যাচ্ছিল। তাদের বিরোধিতা ঠেকাতে গিয়ে আমরা এইসব খুচরো ব্যাপারে আরো জড়িয়ে যাচ্ছিলাম। যাই হোক, বর্ধমানের ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট বেল্ সাহেব আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। বর্ধমানের স্বনামখ্যাত উকিল সন্তোষ কুমার বসু আমাদের কেস নিয়ে ডিভিশনাল কমিশনারের ওখানে যেতে রাজি হলেন। 'ফুড কমিটি'র পক্ষে আমি, মথুরাদা সন্তোষবাবুর সঙ্গে গেলাম। সন্তোষ-বাবু আমাদের বক্তব্য জোরের সাথে রাখলেন। অভিযোগগুলো সম্পূর্ণ বাতিল হলো। পূর্বে থেকে আমাদের যে মতলব ছিল তাও কমিশনারকে

আসার সময় জানিয়ে দিলাম। বলে এলাম, আমরা আর এসব ঝঞ্ঝাটে থাকতে চাইছি না। এইভাবে অব্যাহতি নিয়ে চলে এলাম।

সন্তোষবাবু আগেই ট্রেনে করে চলে এলেন। আমরা চুঁচুড়ার কোর্টের হোটেলে খেতে বসলাম। এখানে একটা ঘটনা ঘটেছিল। সেটা আমার ইতিহাস বর্ণনার ক্ষেত্রে তুচ্ছ হলেও মজার কথা বলে লিখছি। মথুরাদা হোটেলওয়ালার কাছে টক চাইলেন। হোটেলওয়ালা বলল, "টক তো বাবু নেই।" এক পাশে এক ভদ্রলোক খাচ্ছিলেন। আমাদের উদ্দেশ্য করে বললেন, "মশাইদের বাড়ি কোথায় জানতে পারি কি?" মথুরাদা বললেন, "বর্ধমানে।" ভদ্রলোক বললেন, "শুনেই বুঝেছি! কী যে আপনাদের টেস্ট। আস্ত মাছকেও টকে দিয়ে নষ্ট করেন।" শুনে মথুরাদা প্রতিবাদ করলেন এবং বর্ধমানের রান্নার ওকালতি করতে লাগলেন। শেষে একটা বড় অস্ত্র নিক্ষেপ করলেন। ভাগ্যে বৌদি সেখানে ছিলেন না। বললেন, "আমার শ্বশুর বাড়ি কোন্নগর। হুগলীর মেয়ের রান্না রোজ খাই। সুতরাং আপনাদের স্বাদের কথা আর বলতে হবে না।" হোটেলওয়ালা একবার এ পক্ষ একবার অপর পক্ষকে সায় দিয়ে ঝগড়া মেটাবার চেষ্টা করছে। শেষে টক মাছের কথা উঠলে হোটেলওয়ালা বলল, "টক মাছ আমাদের অনেকেরই ভাল লাগে না।" এই বলে একবার হুগলীবাসীকে সমর্থন করে পরে বর্ধমানবাসীর পক্ষ নিয়ে বললেন, "তা ভাল করে রাঁধলে টক মাছ ভাল হয় বৈকি!" যেই বলা, হুগলীবাসী আস্তিন গুটিয়ে বলতে লাগলেন, "হুগলীর বিশ্বাসঘাতক, তোমাকে এখান থেকে উঠিয়ে ছাড়ব।" আর পাঁচজন এসে তাকে সংযত করল। আমরা পয়সা দিয়ে বিদায় হলাম। আমি বললাম, "আপনি কিন্তু বৌদির রান্নার অযথা সমালোচনা করেছেন।" তিনি বললেন, "ঠিকই বলেছো, বেচারা রাঁধে ভাল। কি করবো তর্কের বশে বলতে হলো।"

এ তো গেল হাসির খোরাক। কিন্তু মনের ভিতর ক্রোধ জেগে উঠেছিল দেশের বিশ্বাসঘাতকদের উপর। ট্রেন ধরার জন্যে ব্যাণ্ডেল স্টেশনে এলাম। তারিখটা ছিল দেশের ইতিহাসে সেই কলঙ্কের দিন। ১৬ই আগস্ট, ১৯৪৬। কলকাতার ভয়াবহ হত্যাকাণ্ডের কথা ট্রেনে প্যাসেঞ্জারদের কাছে শুনলাম। বেশি নয়, সবাই আতঙ্কগ্রস্ত। পাছে এখানে ট্রেনেও কিছু ঘটে এইজন্যে এখানে বেশি আলোচনা হচ্ছিল না।

আমাদের সাম্প্রদায়িকতা-বিরোধী সংগ্রাম স্বভাবতই আরও সজোরে শুরু করতে হলো। কোথা থেকে যেন একটা দমকা হাওয়া এসে পারস্পরিক বিশ্বাসের আবহাওয়া বিষাক্ত করতে লাগল। সেদিন বিনয়দাকে অফিসে

বসিয়ে আমি, হরেকেষ্ট, শিবশঙ্কর চৌধুরী প্রমুখ গোটা শহরে ঘুরছিলাম। আমি ঘুরতে ঘুরতে মহাজনটুলীর কাছে পুরাতন অসহযোগ আন্দোলনের সময় থেকে পরিচিত খুবই ভদ্রলোক, বয়সে গুরুজন-স্থানীয় বন্ধুর কাছে উপস্থিত হলাম। কলকাতায় দাঙ্গা-হাঙ্গামার উল্লেখ করে শুরু করলাম। তিনি আমার কথায় সায় দিয়ে গেলেন। অফিসে প্রবেশ করে বিনয়দাকে (প্রয়াত বিনয় বসু) যখন এই ধরণের আনন্দের সংবাদ পরিবেশন করছি, হরেকেষ্ট এসে পড়ল। বলল, "তোমার কথা সব ভুল। এ ভদ্রলোক তো খুবই উত্তেজিত। মুসলমান বিদ্বেষে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছেন।" মুসলমানদের মধ্যেও এরকম দু-চারটি কথা শুনছিলাম। মুসলমানরা সংখ্যালঘু হলেও বিদ্বেষে কম যাবে কেন? তবে তাদের মধ্যে আতঙ্কের ব্যাপারটাই বেশি ছিল। বুঝলাম, সাময়িক হলেও সমস্যা খুব কঠিন।

কলকাতার পর শুরু হলো বিহারে। বিহারে মুসলমান গ্রামগুলি আক্রান্ত হচ্ছিল। পুরাতন দিনে আমাদের বাড়িতে কাজ করার সূত্র ধরে কিছু বিহারের মানুষ আশ্রয় নিয়েছিল। বিহারের কিছুদিন পর শুরু হলো নোয়াখালিতে। দাঙ্গা নিরোধের চেষ্টায় সাহায্য করতে মুসলমান কমরেডদের নোয়াখালি যেতে হবে। আমি নির্দেশ পাওয়া মাত্রই নোয়াখালি রওনা হলাম। নির্দেশ ছিল চাঁদপুরে নামবার। চাঁদপুরেই নামলাম। সেখান থেকে ইয়াকুব মিঞার ওখানে গেলাম। স্টীমারেই এন বি. এ.-র সত্যবাবুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তাঁদের পরিবারবর্গ গ্রাম ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয়ে গেছেন। তাঁদের খোঁজেই যাচ্ছিলেন। এরকম বিপদেও তাঁর মনের জোর বেশ দেখেছিলাম। স্টেশনেই তাঁর সঙ্গে গ্রামের ছেলের দেখা হয়ে গেল। তাঁর গ্রামে খুনোখুনি হয়নি বলে 'দীনমানা'র সহাস্য বর্ণনা দিচ্ছিলেন। একজন ব্রাহ্মণের কথা বললেন, তিনি দিনকতক আগে আচার পালনের ত্রুটির জন্য কোন বিশেষ পরিবারের উপর কিছু সামাজিক দৌরাত্ম্যের হোতা হয়েছিলেন। দীনমানার সময় তাঁর করুণ অবস্থা গ্রামবাসী-স্বজনের সামাজিক পীড়নের সময় যা ছিল তার সঙ্গে তুলনায় তার হাসির উদ্রেক করেছিল। আমি কিন্তু তখন তার জন্য মনে কষ্ট পাচ্ছিলাম। ভাবছিলাম, সাতশো বছর পাঠান, মুঘল, মুসলমান রাজাদের আমলেও যা পরস্পরের কাছ থেকে সহ্য করতে হয়নি তা আজ এই ইংরেজ আমলে করতে হচ্ছে।

তবে পরে বুঝেছিলাম, এই দীনমানা ব্যাপারটা কিছুটা খেলার মতো ব্যাপার হয়েছে। অবশ্য ঘটনার সময় নয়, পরে ভেবে দেখলে। এই প্রসঙ্গে পরে হাসনাবাদের নেতা কমরেড কৃষ্ণসুন্দর ভৌমিকের একটি কাহিনী

শুনেছিলাম তাই মনে পড়ে। হাজার কাজের ভিড়ে তাঁর স্বস্তিই ছিল না। একদিন যখন তাঁর অফিসে গেছি সামান্য কিছু স্বস্তি পেয়ে আমার সঙ্গে ভাল করে কথা বলতে লাগলেন। তাঁর জেলা নোয়াখালির লোকে এরকম একটা কাণ্ড করল, যাতে এত লোক ভাবড়া খেয়ে পালিয়ে হাসনাবাদ প্রভৃতি জায়গায় আশ্রয় নিতে বাধ্য হলো। এর জন্য মনে দুঃখের সঙ্গে কুণ্ঠা মিশ্রিত ছিল। বললেন, এদের যারা নেতৃত্ব দিয়েছে তারা অবশ্য শয়তান, বদমায়েশ লোক। কিন্তু এদের কর্মকাণ্ড তলিয়ে দেখলে এদেরও অবোধ শিশুর মতো মনে হয়। আশ্রয়-কেন্দ্রে আগত এক সূত্রধর পরিবারের অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিচ্ছিলেন। দীনমানার পরের দিন গুণ্ডাশ্রেণীর বদমাশগুলো গ্রামের সব বুড়োদের জমা করে করে বলেছে, ওদের ঘরে বিয়ে দেওয়ার মতো ছেলেমেয়ে রয়েছে, গ্রামে মুসলমান ছেলেমেয়েদের সাথে বিয়ে দিয়ে দিক, তবেই তো বলা যায় 'দীন' মেনেছে। সূত্রধর পরিবারের কর্তা খুব বুদ্ধিমান। বুড়োরা যখন তাঁর কাছে এলেন তখন বললেন, "সেই তো গো, আমরা তো তাই ভাবছিলাম। তোমরা তো সব জান, ফরিদপুরের কয়েকটা ঘর ছাড়া আমাদের বিয়ে-সাদি চলতো না। সে অনেক ফজিয়ত। এখন তো দীনমানার ফলে ঘরের ছেলেমেয়েদের মধ্যেই বিয়ে দিতে পারবো। আমাদের সবারই ভাইবোন ছেলেমেয়েদের নিয়ে মেলার মতো পাত্রপাত্রীও আছে। একদিন বসে দিন তারিখ ঠিক করা যাক।" বুড়োরাও যেন স্বস্তি পেল। গুণ্ডাদিগকে বলল, "ঠিকই তো, ঘরে ছেলেমেয়ে থাকতে বাইরে দেবে কেন?" এইভাবে তারা রক্ষা পেল। প্রথমদিকে দু-একটা খুনোখুনি হয়েছিল বটে, তখন খুনোখুনি ছিল না। সেজন্য উদ্বেগের অবস্থা কিছুটা কম ছিল। কিন্তু ঘরদোর ছেড়ে যাদের বেরোতে হয়েছে, ভবিষ্যৎ অনির্দিষ্ট, তাঁদের সান্ত্বনা কোথায়?

আমরা ইয়াকুব মিঞার ওখান থেকে কৃষক সমিতির নেতৃত্বে পরিচালিত হাসনাবাদ রিলিফ কেন্দ্রের দিকে রওনা হলাম। মাঠে ও খাল বেয়ে আমাদের নৌকা চলেছিল। মাঝে মাঝে খালের ধারে কৃষক সমিতির ভলাণ্টিয়ারদের পাহারা, তাঁরা নৌকা চেক (check) করছিলেন। আমরা ইয়াকুব মিঞা কর্তৃক কমরেড কৃষ্ণসুন্দর ভৌমিককে দেওয়া আমাদের পরিচয়-পত্র দেখিয়ে ছাড় পাচ্ছিলাম। কৃষক সমিতির শাসিত এলাকায় আর বৃহত্তর শান্ত এলাকায় যাতে গুণ্ডারা প্রবেশ করতে না পারে সেজন্য দীর্ঘ লাইন ধরে এরূপ পাহারার ব্যবস্থা। এ'রাও সব মুসলমান, কৃষক সমিতির মুসলমান। এক দশকের আগে কৃষ্ণসুন্দর ভৌমিক, ইয়াকুব মিঞা প্রভৃতির নেতৃত্বে

এখানে বিরাট কৃষক আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। ১৯৩৬ সালের আইনসভার নির্বাচনে কৃষক সমিতির পাঁচজন প্রার্থী জয়ী হয়েছিলেন। সুতরাং পরবর্তী-কালে এর নেতাদের এক বড় অংশ কমিউনিস্ট পার্টিতে প্রবেশ করেন। যাই হোক, তখনও অর্থাৎ ১৯৪৬ সালে. সেই পুরাতন ঐতিহ্যের অনেকখানিই রয়ে গেছে। বরং দাঙ্গাবাজদের চ্যালেঞ্জের মুখে সেই পুরাতন শ্রেণীচেতনা আরও জেগে উঠেছে। আমার মনে মনে একটা চিন্তা হচ্ছিল। নেতা কমরেড ইউসুফ সাহেব এবং কমরেড কৃষ্ণসুন্দর দাঙ্গা ঠেকাতে যে বিরাট স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গড়ে তুলেছেন তার মধ্যে যদি দয়া বা করুণার মনোভাব থাকে তাহলে তা কতটা টেকসই হবে? পরীক্ষা করার জন্য আমি একজন বয়স্ক স্বেচ্ছাসেবককে বললাম, "আপনারা খুব হৃদয়বান, এরকম করে খাটছেন!" তিনি বললেন. "মশায় অত ধম্মকথা বুঝি না". ছাতি খুলে দেখিয়ে বললেন. "এই দেখুন, পুলিশের গুলির দাগ। আমাদের বুকের সে জ্বালা মেটেনি। সেই একই দুশমন. ভেকটা শুধু আর এক রকম।" ত্রিশ দশকে কুমিল্লা নোয়াখালিতে যে বিরাট কৃষক আন্দোলন হয়েছিল. তাতে পুলিশ কৃষকের উপর গুলি চালিয়েছিল। এ হোল দাঙ্গা-রোধকারী স্বেচ্ছাসেবকের কথা। কিন্তু এই কৃষক সমিতির এলাকার বাইরে অনবহিত কৃষকদের সাম্প্রদায়িক নেতারা বিপথে চালিত করতে সমর্থ হয়েছিল। আমি ও ডাঃ শান্তি রায় এক দাঙ্গাবিধ্বস্ত গ্রামে গিয়েছিলাম। গ্রামের অধিবাসী চিত্ত চৌধুরী এবং আরও দু-একজন ছিলেন। সংখ্যালঘুদের ঘর আগুন জ্বালিয়ে নষ্ট করা হয়েছে। একটা বিশেষ দৃশ্য চোখে পড়েছিল। আগুনে উত্তপ্ত টিনগুলো ছিটকে উপর দিকে বাইরে চলে গেছে। উত্তপ্ত টিন গলে প্রায় নরম হয়ে গেছে। সেই টিন সুপারি গাছে পড়ায় টিন ফুঁড়ে সুপারি গাছের শুকনো মাথা বেরিয়ে আছে। আরও কিছু দৃশ্য দেখেছিলাম। বিপথে চালিত কৃষকের বিক্ষোভের চিহ্ন। শত শত দলিলের কাগজ আনপোড়া, আধপোড়া. প্রায়-পোড়া বিস্তর ছাইয়ের মধ্যে ছড়িয়ে আছে। দু-চারটে টুকরো যা পড়তে পারলাম. দেখলাম সব মহাজনী দেনার তমসুকের দলিল। বেশ খানিকটা এলাকা জুড়ে ছিল টিনের ঘর। ধ্বংসাবশেষ দেখে বোঝা গেল। এখানকার টিনের ঘরই সম্পদের চিহ্ন। দেওয়াল শুদ্ধ টিনের।

যখন চিত্তবাবুর গ্রামে গেলাম, তিনি বা গ্রামের আর একজন নিজেদের ঘরগুলো দেখতে গেলেন। যতটা সম্ভব বন্ধুস্থানীয় গ্রামবাসীরা রক্ষা করছেন। শূন্য ঘর সব পড়ে আছে। ও'রা নিজের জায়গায় ঘুরে বললেন, "আশ্চর্য, ডাবগুলো রয়ে গেছে।" আমাদের দলের একজন গাছে উঠে ডাব

পাড়লেন। নৌকা থেকে কাটারি এনে ডাব কেটে খাওয়া হলো। ইতিমধ্যে দেখা গেল দূরে গ্রাম থেকে একটি নৌকা বেরিয়েছে। মনে হলো গুণ্ডাদেরই নৌকা। আক্রান্ত হবার আশঙ্কায় আমাদের মুহূর্তে নৌকায় উঠে হাসনাবাদে ফিরতে হলো। দু-চার দিনের মধ্যেই মিলিটারী এসে উপস্থিত হলো। বিভিন্ন গ্রাম থেকে দাঙ্গাকারীদের ধরে আনতে লাগল। আমরা যারা বাইরে থেকে গিয়েছিলাম, সব ফিরে এলাম। আমরা গালিমপুর হাসনাবাদকে কেন্দ্র করে অনেকগুলি গ্রাম ঘুরেছিলাম এবং শান্তিসভা ইত্যাদি করেছিলাম। বেশ কিছু ঘোরাঘুরি করতে হয়েছিল। দাঙ্গাবিধ্বস্ত এলাকার বাইরে কৃষক সমিতির প্রচারের ফলে সাধারণ মানুষের শান্তির পক্ষে শক্তি হয়ে উঠেছিল দৃঢ়বদ্ধ। আর যেভাবে বিধ্বস্ত এলাকার অবস্থা বুঝছিলাম, গুণ্ডাদের দৌরাত্ম্যে কিছু সাধারণ মানুষ অবশ্যই বিভ্রান্ত হয়েছিলেন। কিন্তু অনেকেই গোপনে দাঙ্গার বিরুদ্ধে শান্তির কামনায় যতদূর সম্ভব সাহায্য করে যাচ্ছিলেন। একজন আমাকে বলেছিলেন, এরকম সাহায্যকারী না থাকলে এতজন আশ্রয়প্রার্থী গ্রাম থেকে নৌকায় হাসনাবাদের আশ্রয়ে এলেন কী করে ? ফেরার সময় চাঁদপুর হয়ে ফিরলাম।

একটা কথা মনে করলে দুঃখ হয়। বুর্জোয়া-জমিদার দলগুলির সাম্প্রদায়িক নেতারাই বাংলার আকাশ-বাতাসকে কলুষিত করার চেষ্টা করেছেন এবং কিছু সার্থকও হয়েছেন। অথচ বিপন্ন মানুষেরা, পাড়া-পড়শী সাধারণ সহানুভূতিশীল মানুষ এবং কৃষক সমিতি এবং কমিউনিস্ট পার্টির মত বিদ্বেষ-বিরোধী শান্তির প্রয়াসী দল ও সংগঠনের প্রত্যক্ষ সাহায্য পেলেও পারস্পরিক বিদ্বেষের হোতা বিভেদকারী বুর্জোয়া-জমিদার নেতাদের মুখের দিকেই চেয়ে থাকে। বুর্জোয়া সংবাদপত্রে কলুষ প্রচারের এও এক বিষময় ফল। কৃষক সমিতি ও কমিউনিস্ট পার্টির রিলিফের কর্মীরা দুঃখের সঙ্গে বলতেন, "এত খাটছি, চোখের সামনে তারা নিজেরা তার সুফলও ভোগ করছে, তবুও জিজ্ঞেস করছে, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী কবে আসবেন ?" পশ্চিমবাংলাতেও অনুরূপ সঙ্কটের সময় দেখেছি, নিছক স্বার্থান্বেষী পলায়নপর এবং পলাতক মুসলিম লীগ নেতাদের মুখ চেয়ে আছে কিছু মুসলমান। ১৯৫০ সালে আণ্ডারগ্রাউণ্ড অবস্থায় ঘুরে ঘুরে আমাদিগকে মানুষের মনে ভরসা আনতে হয়েছে। গরীব মানুষদের এদের আতঙ্ক প্রচার থেকে বাঁচাতে গিয়ে আমার স্ত্রী ও কর্মী কমরেড রাবিয়াকে কিছু পলায়নপর আত্মীয়দের কাছ থেকে নানা লাঞ্ছনা পেতে হয়েছে।

ইউনাইটেড বেঙ্গল মুভমেন্ট, ১৯৪৭

১৯৪৫ থেকে ১৯৪৭ বুর্জোয়া-জমিদার শ্রেণীর মুখপাত্র কংগ্রেস, মুসলিম লীগ, হিন্দু মহাসভা প্রভৃতি দলগুলি একযোগে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সম্মুখীন হওয়ার বদলে পরস্পর পরস্পরের মধ্যে রেষারেষি, কলহ এবং দ্বন্দ্ব চালিয়ে যাচ্ছিল—সমস্ত দেশের আবহাওয়াকে বিষাক্ত করে তুলেছিল। এর কিছু বিষময় ফল—জেলার মধ্যে দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টির চেষ্টা—তার কিছু বর্ণনা উপরে আমরা করেছি এবং, দুঃখের বিষয়, পরেও করা প্রয়োজন হবে। পাঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম ভারতের শোচনীয় অবস্থা এবং সারা দেশের কথা দেশের প্রৌঢ়ত্বপ্রাপ্ত মানুষ সবাই জানেন। আজকালকার ছেলেমেয়েরা তাঁদের কাছে শুনছেন। এইসব শোচনীয় ঘটনার ইতিহাস অন্যত্র প্রাপ্য। সুতরাং আমি আর এর মধ্যে যাচ্ছি না।

বাঙালীর কাছে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন এসেছিল বাংলাদেশের বিভাগীকরণ। এইরকম যখন অবস্থা তখন কমিউনিস্ট পার্টি দেশের সামনে পৃথক রাষ্ট্র হিসাবে ঐক্যবদ্ধ বাংলার প্রস্তাব রাখলেন। ঘটনাস্রোত বইছিল দ্রুতগতিতে। তাঁরা সেইরকম দ্রুতগতিতেই জনমতের এক বৃহৎ অংশকে এই ঐক্যবদ্ধ প্রস্তাবের পক্ষে আনতে পেরেছিলেন। কংগ্রেস নেতা শ্রীশরৎচন্দ্র বসু এবং যোগেশচন্দ্র গুপ্ত প্রমুখ আরও অনেকে এর জোরদার প্রবক্তা হলেন। তেমনি হলেন শহীদ সারওয়ার্দি, আবুল হাসেম ও আরও কিছু মুসলিম লীগের নেতা। গান্ধীজী জানালেন, তিনি দেশ বিভাগের জন্য মর্মাহত। সুতরাং বাংলাদেশ যদি ঐক্যবদ্ধ থেকে যায়, তার পিছনে রইল তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষা। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, তাঁর মতাবলম্বী বলে যাঁরা এতদিন দাবি করেছিলেন তাঁরা কেউ তাঁর মত সমর্থন করলেন না, বরং জোর গলায় তাঁদের নেতার বিপক্ষে এবং বাংলাদেশের বিভাগীকরণের পক্ষে বক্তব্য ঘোষণা করলেন।

ইংরেজ গভর্নমেন্ট এবং এইসব নেতৃবৃন্দ একটি ধূর্ত কৌশলকে কার্যনীতি হিসাবে গ্রহণ করলেন। তাঁরা জনমতের সামনে 'ইউনাইটেড বেঙ্গল' রাষ্ট্রের পক্ষে মত দেওয়ার কোন স্কোপ রাখলেন না। ঐরূপ বিকল্পের

কোন রায় মানুষের মনে থাকে তার কোন সুযোগই রইল না। জনমতের সামনে এবার প্রশ্ন হিসাবে দাঁড়াল বাংলাদেশের কোন খণ্ড-বিখণ্ড দেশের কোন খণ্ডের সাথে যুক্ত হবে। যদি ইউনাইটেড বেঙ্গলের পক্ষে মত থাকত এবং তা চিহ্নিত করার স্কোপ থাকতো, তাহলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস ইউনাইটেড বেঙ্গলের পক্ষেই দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের রায় থাকত। পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যালঘু ও পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘু নিজেরা তো ইউনাইটেড বেঙ্গলের পক্ষে দাঁড়াতেনই, সংখ্যাগুরুদের বড় অংশকে নিজেদের সঙ্গে আনতে পারতেন। এই সুস্থ স্বরকে কণ্ঠনালী চেপে বন্ধ করে দেওয়া হলো। নিয়ম এমনই হলো যে কঠোরভাবে নির্বাচকের সামনে রাখা হলো ঃ বিভক্ত ভূখণ্ড কোনদিকে যাবে---পাকিস্তান কিংবা ভারতে। ফলে দেশ বিভাগের প্রধান হোতা কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগ যে জয়ী হবে তাতে আর আশ্চর্য কী!

কিভাবে বিভিন্ন বুর্জোয়া-জমিদার দল সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করেছিল, বর্ধমানের মানুষের কাছে তার পরিচয় রয়ে গেছে, যা একটি ছোট্ট ঘটনা। কংগ্রেসের বিধান রায়, নলিনী সরকার, কিরণ শঙ্কর, প্রফুল্ল ঘোষ, প্রফুল্ল সেন এবং তাঁদের সহচররা, যাঁরা দেশ ভাগ সম্বন্ধে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন, তাঁরা এক প্রক্রিয়া গ্রহণ করলেন। দেশ বিভাগের বিরুদ্ধে কণ্ঠস্বরকে কঠোরভাবে স্তব্ধ করার জন্য তাঁরা সমস্ত অবিভক্ত বাংলাদেশের পৌরসভা ও ও বার এ্যাসোসিয়েশন থেকে দেশ বিভাগের পক্ষে প্রস্তাব করিয়ে আনলেন। সব জায়গাতেই নেতাদের নির্দেশে কংগ্রেস, হিন্দু মহাসভা এবং মুসলিম লীগ একত্রে দেশ বিভাগের পক্ষে যে প্রস্তাব তার পক্ষে ভোট দিচ্ছিলেন। বর্ধমান পৌরসভায় যখন এই প্রস্তাব তাঁরা এপ্রিল ১৯৪৭-এ উত্থাপন করেন, কমিউনিস্ট পার্টি ও ফরওয়ার্ড ব্লক তার বিরোধিতা করেন এবং বিকল্প প্রস্তাব রাখেন। বিকল্প প্রস্তাব পেশ করি কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষে আমি এবং সমর্থন করেন কমরেড সন্তোষ খাঁ। ফরওয়ার্ড ব্লক সদস্য শ্রীঅজিত রায়ও এই বিকল্প প্রস্তাব সমর্থন করেন। বলা বাহুল্য, এই প্রস্তাব ছিল দেশ বিভাগের বিপক্ষে এবং স্বাধীন অখণ্ডিত রাষ্ট্রের পক্ষে। কংগ্রেস, হিন্দু মহাসভা ও মুসলিম লীগের ঐক্যবদ্ধ ভোটে এই প্রস্তাব পরাজিত হয় এবং দেশ বিভাগের পক্ষে তাঁদের প্রস্তাব জয়ী হয়। এটি একটি পৌরসভার বিবরণ মাত্র। কিন্তু অনুরূপ ঘটনা ঘটেছিল আরও অনেক পৌরসভায়। সুতরাং এখানে দেওয়া একটি মাত্র ঘটনার পরিচয় হলেও শাসকশ্রেণীর কর্মকাণ্ড উদ্‌ঘাটিত করে। দেশ বিভাগের অপরাধের চিহ্ন কার ললাটে তা এই ছোট ঘটনাই বুঝিয়ে দেয়।

দ্বিতীয় ক্যানেল কর বিরোধী আন্দোলন

ইতিমধ্যে দেশের রাজনৈতিক পট পরিবর্তন আসন্ন হয়ে উঠেছিল. সঙ্গে সঙ্গে বুর্জোয়া-জমিদারদের কলহ-কলুষ দেশটাকে সাম্প্রদায়িক বিষে জর্জরিত করার চেষ্টা করছিল। কমিউনিস্ট পার্টির সমস্ত কর্মীদিগকে বুর্জোয়া-জমিদার সূচিত সাম্প্রদায়িক মত্ততার প্রতিরোধ করতে নামতে হলো।

১৯৪৬ সালের ১৬ই আগস্ট কলকাতায় বর্বর, নৃশংস, অমানুষিক হত্যাকাণ্ড হয়ে গেল। বুর্জোয়া খবরের কাগজগুলি এর বিষ সারা দেশে ছড়িয়ে দেবার চেষ্টা করল। কিছু জায়গায়—যেমন বিহার আর নোয়াখালিতে—দাঙ্গা গৃহদাহ প্রভৃতি ঘ'ল। কিন্তু একটা জিনিস লক্ষ্য করার বিষয়, এত হলাহল উদ্‌গারিত হওয়া সত্ত্বেও পাঞ্জাবের মতো অবস্থা বাংলাদেশে (অবিভক্ত বাংলায়) হয়নি। জাতীয়তার উন্মেষ ঊনবিংশ শতাব্দী থেকেই একটা শক্তি বাংলাদেশে এনেছিল। এস. এ ডাঙ্গে অনেক পাপ করেছেন এবং করছেন, কিন্তু দেশ বিভাগের সময় কলকাতায় এক সভায় বলেছিলেন, "You should be proud that your people of Bengal had defeated the most diabolical game of the British."

ইংরেজের সবচেয়ে শয়তানি খেলা দেশ বিভাগ, তার ফলে যে কদর্যতা আর কলুষপ্লাবন, তাকে পরাজিত করতে পেরেছে এ গৌরব বাংলাদেশের মানুষ করতে পারে।

দেশ বিভাগ হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও এবং সাম্প্রদায়িক উস্কানি সত্ত্বেও ১৯৫০ সালের আগে পর্যন্ত আমাদের বর্ধমানে কিছু সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা ঘটেনি। বাংলাদেশ দেখতে গেলে, নোয়াখালিতে যা হয়েছিল তা সেখানেই সীমিত ছিল—তা আর সারা দেশে প্রসারিত হয়নি। দেশ বিভাগ হলো ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট। ১৯৪৬ সাল ধরে বুর্জোয়া-জমিদার নেতাদের ও তাদের অনুকূলে ইংরাজদের ক্রিয়াকাণ্ড চলছিল এই পরিণতির দিকে! পাঞ্জাবের মতো হলো না—এর মধ্যে যে কৃতিত্ব আছে তার অনেকখানিই

কমিউনিস্টরা দাবি করতে পারেন। দ্বেষ-বিদ্বেষের বিরুদ্ধে নিরন্তর অভিযান চালিয়ে গেছে কমিউনিস্ট পার্টি, সঙ্গে সঙ্গে জনগণের তথা শ্রমিক-কৃষক মধ্যবিত্তের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দাবি-দাওয়ার সংগ্রামও চালিয়ে গেছে। ১৯৪৬ সালে তেভাগা আন্দোলন পূর্ব ও উত্তরবঙ্গের জনগণের শক্তির নিদর্শন রাখল। বর্ধমানে ক্যানেল কর বৃদ্ধির নোটিশ দিয়েছিল। আমরা এর বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে শুরু করে দিয়েছিলাম। প্রাদেশিক কৃষক সভার সিদ্ধান্ত হলো, কৃষকের উপর যখন নতুন সরকারী আক্রমণ এসেছে তখন বর্ধমানে তার মোকাবিলাকেই সামনে রাখতে হবে। সুতরাং বিনয়দা, আমি, তারাপদ মোদক, হরেকেষ্ট কোঙার ও আরও অনেকে আন্দোলন ও সংগঠনে লিপ্ত হলাম। কর আদায় বন্ধ ঘোষণা করলাম এবং তা কার্যকরীও হলো। সরকারী আক্রমণ এলো এবং বড়পলাশন ইউনি.নে হলধরপুরের নির্মল কুণ্ডু মহাশয়ের গরু ক্রোক করা হলো এবং তাকে রাখা হলো পাশের গ্রাম ষাঁড়গাছির খোঁয়াড়ে। এই এলাকায় আমরা পূর্ব হতেই বিশেষ পরিচিত এবং কিছুটা সংগঠিত। ষাঁড়গাছির নিকটবর্তী গ্রাম ভগবান-পুর, তার পাশেই মণ্ডলগ্রামে ছাত্র ফেডারেশনের এক কেন্দ্র ছিল। একটা বড় ঘটনা, স্থানীয় এলাকায় সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার প্রতিরোধ করে পার্টির কর্মিগণ কর্তৃক শান্তি প্রতিষ্ঠা হয়। পূর্বে এই ঘটনার বিবরণ দিয়েছি। গরু নিলাম করতে দেব না—এই প্রতিজ্ঞায় আমাদিগকে সত্যাগ্রহ শুরু করতে হলো। আমরা ষাঁড়গাছিতে সত্যাগ্রহ ক্যাম্প আরম্ভ করলাম। আমি ও বিনয়দা এখানকার কাজে লিপ্ত হলাম। স্থায়ীভাবে আমিই ক্যাম্পের চার্জে থাকলাম। বিনয়দাকে প্রচারে সারা ক্যানেল এলাকাতেই ঘুরতে হচ্ছে। হরেকেষ্টকেও কুড়মুন ইউনিয়ন এবং পাশাপাশি এলাকায় এই দায়িত্ব নিতে হলো। হরেকেষ্টকে সঙ্গে সঙ্গে আরও একটা বড় কাজ হাতে নিতে হলো। কুড়মুনের জমিদার বরাবরই গণ-আন্দোলনের, এমন কি সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনের বিরোধিতা করে আসছিলেন। তিনি ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট হয়ে আসছিলেন। (ইউনিয়ন বোর্ডে বৃটিশ সরকার পক্ষের লোকদের বিজয়ী হওয়া কঠিন ছিল না। ন'জন সদস্যের মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ অর্থাৎ তিনজন হতেন সরকারী মনোনীত সদস্য। নির্বাচিত সদস্যের সংখ্যা ছিল মাত্র ছ'জন। শেষোক্তদের মধ্যে মাত্র দু'জনকে পেলেই সরকার পক্ষীয়রা সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে ইউনিয়ন বোর্ড পরিচালনা করতে পারতেন। ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট হতে পারতেন।) কুড়মুন ইউনিয়নে সড্যা গ্রাম কমিউনিস্ট পার্টির শক্তিশালী কেন্দ্র। অন্যান্য

গ্রামেও আমরা আছি। কিন্তু সরকার-সমর্থক সরকার-মনোনীত সদস্য এক-তৃতীয়াংশ থাকার ফলে ইউনিয়ন বোর্ড আমরা দখল করতে পারতাম না। সম্পূর্ণ ছয়জন নির্বাচিত সদস্যের আসনের মধ্যে অন্ততঃ পাঁচটি জয় করতে পারলে তবেই ইউনিয়ন বোর্ড জয় করা সম্ভব হতো। এই ইউনিয়ন বোর্ডটি হয়ে উঠেছিল প্রতিক্রিয়ার ঘাঁটি। পুলিশকে গোপনে খবর সরবরাহ করা থেকে নানারূপ সাহায্য করতো। কাজেই আসন্ন নির্বাচনে একে পরাজিত করা আশু কর্তব্য দাঁড়িয়ে গেল। সেইজন্য কমরেড হরেকেষ্ট কোঙারকে এর ভারও নিতে হয়েছিল।

এই সময় ক্যানেল কর বিরোধী আন্দোলনের ফলে একটি পুরাতন বসে যাওয়া এলাকায় নতুনভাবে পার্টির প্রভাবের সম্প্রসারণ হলো। কুড়মুনের পাশাপাশি রায়ান ইউনিয়নের সাপড় গ্রাম আবার এগিয়ে এলো। এখানে বেশ কিছু নতুন কর্মী কমরেড সুনীল রায়, সুশীল দত্ত প্রমুখ পার্টিতে এলেন। কমরেড হরেকৃষ্ণ কোঙার এঁদের কুড়মুনের নির্বাচনের কাজে লাগালেন। নির্বাচনে ক্ষুদিরাম রায় মহাশয়কে প্রার্থী করে জমিদার গোস্বামীদের বিরুদ্ধে দল খাড়া করা হয়েছিল। আমরা উক্ত নির্বাচনে জয়ী হয়েছিলাম।

কমরেড সুনীল রায়ের কথা এখানে কিছু বলে যাই। তিনি পার্টিতে আসার পর অক্লান্ত পরিশ্রমের গুণে পার্টির প্রথম সারির নেতৃত্বের মধ্যে উন্নীত হন। ১৯৪৭ সালে কাটোয়ায় অগ্রদ্বীপে যখন জমিদারী অত্যাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলন চলে তখন তাঁকে সেখানে পাঠানো হয়। তাঁকে সেখানে রাব রায় নামে পরিচিত করা হয়। কমরেড সুবোধ চৌধুরীর সহায়ক হিসাবে কমরেড সুনীল নতুন শক্তির জোগান দেন। অগ্রদ্বীপের আন্দোলন আলোচনাকালে এর বিস্তারিত বিবরণ উল্লেখ করবো। পুলিশের গুলি চালনায় তিনজন শহীদ হন। কমরেড সুনীল রায়কে গা ঢাকা দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়। রবি রায় নামে তাঁর নামে পুলিশের ওয়ারেণ্ট ঝুলতে থাকে। জেলা কমিটি তাঁকে মেমারীর আন্দোলনের পরিচালনার ভার দেন। সেখানে নিজ নামে তিনি প্রকাশেই কাজ করতে থাকেন। তিনি সেখানে শুধু মেমারীর নয়, কালনারও ভারপ্রাপ্ত ছিলেন। উভয় জায়গাতেই পার্টির ভিত শুরু হয়েছিল অনেক আগেই। তবুও আজ গভীরতা ও ব্যাপ্তিতে এই দুই এলাকায় পার্টির সংগঠন যেরূপ দাঁড়িয়েছে তাতে কমরেড সুনীল রায়ের প্রাথমিক উদ্যোগের দান অনেকখানি। অত্যন্ত প্রতিশ্রুতিপূর্ণ এক জীবন তাঁর মৃত্যুতে আমরা হারিয়েছিলাম। তাঁকে অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে গেছে,

কলকাতার হাসপাতালে ডাক্তারের রিপোর্টের প্রতীক্ষায় আমি বসে আছি, ডাক্তার এসে বললেন, "বায়োপ্‌সি করতে পাঠালাম, কিন্তু ক্যান্‌সারই জানবেন।" অগত্যা অপারেশনের ক্ষত সারতেই সাপাড়ে পাঠিয়ে দিলাম। অসহনীয় যন্ত্রণায় কয়েক মাস ভুগে তিনি মারা গেলেন।

কিছুদিন বাদে আমরা লক্ষ্য করলাম, যাঁড়গাছি ক্যাম্পে আমাদের আটকে রেখে গভর্নমেণ্ট এধার ওধার ট্যাক্স আদায় করবার চেষ্টা করতে লাগলো। তখন দেড়শো-দু'শো কৃষক জড়ো করে ক্যানেল থেকে গরু ছিনিয়ে নেওয়া হয়। এর জন্য বিনয়দা, আমি, হরেকেষ্ট এবং সড্যার অনেকের বিরুদ্ধে পুলিশ ডাকাতির অভিযোগে মামলা করে। নেতৃত্বের অভিযোগ ছিল বিনয়দার উপর। আমরা বেল (Bail)-এ ছাড়ান পাই। ইতিমধ্যে দেশের রাজনৈতিক অবস্থার পট পরিবর্তন শুরু হয়। পূর্ণ ক্ষমতা হস্তান্তরের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠিত হয়। পাঁজা মশায় প্রমুখ মন্ত্রী হন। আমাদের বিরুদ্ধে মামলা তুলে নেওয়া হয়। আমরা খালাস হই। ক্যানেল করের বৃদ্ধির হার কিছুটা কমানো হয়। অর্থাৎ মোটমাট আমরা আন্দোলনে আংশিক জয়লাভ করি।

স্বাধীনতার পরে

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট দেশ স্বাধীন হলো বলে ঘোষিত হলো। আমাদের সে সময়কার চলতি নিয়ম মতে প্রথমে রিক্সা ওয়ার্কার্সদের মিটিং করলাম। দেশের সমস্যা এবং স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপনের গুরুত্ব ইত্যাদি সম্বন্ধে উক্ত সভায় বক্তৃতা দিয়ে সকলকে উৎসাহিত করে শোভাযাত্রা নিয়ে গেলাম। শোভাযাত্রার নেতৃত্বে আমাদের সঙ্গে কমরেড হরেকেষ্টও ছিলেন। উক্ত শোভাযাত্রা নিয়ে সাধারণ নাগরিকদের শোভাযাত্রায় যোগ দিলাম। স্বভাবতই দাঙ্গা-হাঙ্গামা ইত্যাদির পর স্বাধীনতার ঘোষণায় মানুষের যতটা উৎসাহ-উদ্দীপনা হওয়া দরকার, কোথায় যেন তার মধ্যে একটা ভাটার টান থেকে যাচ্ছিল। অবশ্য "ইয়ে আজাদী ঝুটা হ্যয়" যাঁরা বলেছিলেন, তাঁদের ঐ কথাও ভুল। কিন্তু একটা বড় আশাভঙ্গের বেদনা তার মধ্যে ছিল, এটা সত্য। দাঙ্গা-হাঙ্গামা, হাজার হাজার মানুষের গৃহত্যাগ ও দেশত্যাগ ইত্যাদি মানুষের মনের বিশ্বাসের ভিত নাড়িয়ে দিয়েছিল। একদিকে স্বাধীনতার আনন্দ, অন্যদিকে যা হারিয়েছি তার জন্য বিচ্ছেদের ব্যথা, অবিমিশ্র উল্লাসের অবকাশ বিঘ্নিত করছিল। একজন পুরাতন রাজবন্দী একসময় কেমন যেন বিষণ্ণ হয়ে পড়লেন। চুপ করে বসে ভাবছিলেন, আমি বললাম, "বিষণ্ণ হয়ে পড়লে যে!" বললেন, "অনেক কথাই মনে পড়ছে। ভাবছি ঢাকার সেই গ্রামের কথা, যে গ্রামে আমি অন্তরীণ ছিলাম। আমরা আলাদা হয়ে গেলাম। ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যের অধিবাসী হয়ে গেলাম।" আবার রাস্তায় আনন্দের কোলাহল তাঁর দমিত মনকে জাগিয়ে তুলল।

স্বাধীনতা দিবসের দিন এক দুর্বৃত্তের সমাজবিরোধী আচরণের ফলে কলিগ্রামের কাছে টুব গাঁয়ে এক সাম্প্রদায়িক অসন্তোষের সংবাদ আসে। আমি ত্বরিত পাঁজা মশায়ের সঙ্গে দেখা করে এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করি এবং শান্তির প্রয়াসে সহযোগিতা চাই। ফকিরদা, শ্রীভক্ত রায় ও আমি অবিলম্বে সেখানে যাই এবং আমাদের পূর্ব-পরিচিত বন্ধু রবিবাবু এবং শান্তিকামী জনগণের চেষ্টায় শান্তি প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করে আসি।

স্বাধীনতার অব্যবহিত পূর্বে গান্ধীজীর উদ্যোগে ও কমিউনিস্ট পার্টির আন্দোলনের ফলে দাঙ্গা-বিরোধী শান্তির ঢেউ উথলে উঠেছিল। শহীদ সারওয়ার্দি যোগ দিয়েছিলেন এবং জোলুসের পুরোভাগে ছিলেন। কলকাতার জনগণ গান্ধীজী ও সারওয়ার্দির নেতৃত্বে পরিচালিত শান্তি আন্দোলনে উৎসাহিত হয়ে যোগ দিয়েছিলেন। সেই কলকাতায় আবার হেমন্তকালে দাঙ্গা বাধাবার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু জনগণের মিলিত শক্তি তা ব্যর্থ করতে সমর্থ হয়।

পার্টির প্রাদেশিক সম্মেলন, ১৯৪৭ ও পার্টি কংগ্রেস, ১৯৪৮

১৯৪৭ সালে কলকাতায় পার্টির প্রাদেশিক সম্মেলন হয়। দেশ তখন বিভক্ত হয়েছে। সুতরাং পার্টি ভাগ করার প্রশ্ন এসে গেছে। পাকিস্তানে তখন পার্টি গঠিত হয়ে গেছে। সাজ্জাদ জহীর তার সম্পাদক হয়েছেন। এখানেও পূর্ববঙ্গের জেলাগুলি নিয়ে আলাদা কমিটি গঠন করার প্রস্তাব হলো। আমাদের জেলার মনসুর অবিভক্ত বাংলার কৃষক আন্দোলনের সুপরিচিত কর্মী হিসাবে পূর্ব পাকিস্তান কমিটির জন্য নির্ণীত হলেন। এইভাবে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে পদক্ষেপ শুরু হলো।

পূর্ববাংলা তথা পূর্ব পাকিস্তান থেকে বহু অধিবাসী তখন এপারে এসে গেছেন এবং আসতে থাকছেন। মুহূর্তের মধ্যে এত লোকের আশ্রয় হওয়া কঠিন। নিরাশ্রয় মানুষ পথে-ঘাটে, রেলওয়ে স্টেশনে জমা হচ্ছিলেন। পশ্চিমবাংলার গ্রাম থেকে সম অনুপাতে না হলেও এরকম ভাবে লোক পূর্ববঙ্গে গেলেন। কিন্তু শহর থেকে অর্থাৎ কলকাতা এবং পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে প্রচুর সংখ্যায় উর্দুভাষী মুসলমান পূর্ববাংলা গেলেন এবং অনুরূপভাবে পথে-ঘাটে, স্টেশনে জড়ো হতে লাগলেন। এইভাবে নবগঠিত দুইটি রাষ্ট্রে রিফিউজি সমস্যা এক বড় সমস্যা হিসাবে দেখা দিল এবং তাদের আন্দোলনও শুরু হলো। এ সমস্যা যে কত বড় এতেই বোঝা যায় যে, প্রায় চল্লিশ বছর হতে চললো এখনও একান্ত বসবাসের পূর্ণ সমাধান হয়নি।

সুতরাং সেই প্রারম্ভিককালে এই নবাগত দুর্দশাক্লিষ্ট মানুষের সেবায় ও তাদের দাবি-দাওয়ার আন্দোলনে কমিউনিস্ট পার্টির কর্মীরা নিজেদের নিয়োগ করলেন। এইসব কাজে ব্যাপৃত থাকতে থাকতে পশ্চিমবাংলায় দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেস অধিবেশনের প্রস্তুতি করতে হচ্ছিল। দক্ষিণপন্থী ঝোঁকের বিরুদ্ধে জেগে উঠেছে প্রবল প্রতিরোধ। জেলায় জেলায় জেনারেল বডি মিটিং-এ আলোচনায় প্রাদেশিক নেতৃবৃন্দ এই দক্ষিণপন্থী ঝোঁকের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখছিলেন এবং র‍্যাঙ্ক এ্যাণ্ড ফাইলে প্রচুর সমর্থন পাচ্ছিলেন।

বর্ধমানের সভায় বক্তব্য রাখেন তখনকার পার্টি সম্পাদক কমরেড ভবানী সেন। দক্ষিণপন্থী ঝোঁকের বিরুদ্ধে তাঁর আত্মসমালোচনা কমরেডদের প্রীত করেছিল। লক্ষ্য করার বিষয়, যিনি দক্ষিণপন্থী ঝোঁকের প্রধান হোতা, যিনি পূরণচন্দ যোশীর একান্ত আজ্ঞাবহ, সেই ভবানী সেনই এখন প্রধান সমালোচকদের মধ্যে অন্যতম। আবার ১৯৪৮-৫০ সালে যে তীব্র বামপন্থী ঝোঁক দেখা দিল, তিনিই তার হোতা হলেন। পার্টি, বিশেষ করে দমদমে এবং রাজশাহীতে অনেক মূল্যবান প্রাণ হারালো তাঁর এবং তাঁর সহকর্মীর নির্দেশে। ১৯৫২-তে পদাধিকারীর পদ হারানোর পর ইনিই আবার দক্ষিণপন্থী ঝোঁকের হোতা হলেন এবং মরার দিন পর্যন্ত দক্ষিণপন্থার গভীরেই নিমজ্জিত থাকলেন।

পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেস কলকাতায় অনুষ্ঠিত হলো। দক্ষিণপন্থী ঝোঁকের বিরুদ্ধে এবং প্রধানতঃ সম্পাদক কমরেড পূরণচন্দ যোশীর বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা হলো।

প্রসঙ্গতঃ, সম্মেলনে আমি যেখানে বসেছিলাম সেখানে আমাদের নাম করা ঔপন্যাসিক কমরেড মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আমাদের প্রবীণ দরদী, সে সময়ের সদস্য কমরেড রাধারমণ মিত্র ছিলেন। মানিকবাবুর সংশয়শূন্য (আনসার্ফিসটিকেটেড্) চেহারা এবং একাগ্র মনোনিবেশ আমার খুব ভাল লেগেছিল। মানিকবাবু মাঝে মাঝে দু-একজন লোকের নাম শুনে তাঁর পরিচয় এবং আমাদের কিছু বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত শব্দের অর্থ জানতে চাইছিলেন। আমি বলে দিচ্ছিলাম, রাধারমণদাও তাঁকে অনুরূপ সাহায্য করছিলেন। পূর্বে ও পরে মানিকবাবুর সঙ্গে আর সাক্ষাৎ হয়নি। তখন তো আমি বর্ধমানে থাকতাম। তাছাড়া অব্যবহিত পরেই গেলাম অজ্ঞাতবাসে। মানিকবাবুর মতো এমন একজন প্রতিভাবান মানুষের সঙ্গে আরও পরিচয় করার চেষ্টা করিনি বলে দুঃখ হয়। নব দীক্ষায় দীক্ষিত নিঃসংশয় এক মানুষের আবেগময় চেহারাটি এখনও স্মরণে পড়লে মনকে মুগ্ধ করে।

প্রথম কংগ্রেস হয়েছিল ১৯৪৩ সালে। আমাদের ডেলিগেশন পেয়েছিলাম মাত্র একজনের। বিনয়দা গিয়েছিলেন। তখন আমরা জেলাব্যাপী খাদ্য সঙ্কটের রিলিফের সংগ্রামে লিপ্ত। বিনয়দা, আমি ও হরেকেষ্ট তিনজন আমরা তখন সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য। বিনয়দা বোম্বে যাওয়ায় বাকি আমরা দু'জন অর্থাৎ হরেকেষ্ট ও আমি জেলার অভ্যন্তরে কাজে নিযুক্ত

ছিলাম। জেলায় তখন সমস্ত কমরেড খাদ্য সংকটের সমাধানে রিলিফ ও সংগ্রামে নিযুক্ত। বলা বাহুল্য, নেতৃত্বেরও প্রধান দায়িত্ব পড়েছিল এর পরিচালনায়।

১৯৪৩ সাল থেকে ১৯৪৮ সাল—এই পাঁচ বছরে অনেক কিছু সমস্যা জমে উঠেছিল। আগেই বলেছি, যোশীর নেতৃত্বে দক্ষিণপন্থী ঝোঁক পার্টির অগ্রগতিকে ব্যাহত করেছিল বলে কমরেডরা মনে করেছিলেন। যুদ্ধকালে পার্টি শৃঙ্খলিতভাবে ফ্যাসিবাদের সমর্থনসূচক ধ্যান-ধারণার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে গেছেন। যুদ্ধের সমগ্র ক্লেশ, দুর্ভিক্ষ, সব কিছু সরকার জনগণ ও সাধারণ মানুষের উপর চাপিয়ে দিয়েছিল। দেশীয় ধনী ও বড় বড় জমির মালিকরা একদিকে দেশাত্মবোধের জয়গান গাচ্ছিল এবং অন্যদিকে 'বাঁধি' ও ফাটকাবাজী দ্বারা অবাধ লুণ্ঠন ও শোষণ করে যাচ্ছিল। লক্ষ লক্ষ লোকের মৃত্যু ও তাদের শবের উপর দিয়ে এই ঘৃণ্য শোষকদের রথযাত্রা চলেছিল। এই সময় ঘটনার দ্রুত পরিবর্তন হলো। বুর্জোয়া-জমিদার নেতাদের দলাদলি ও তাদের সংগঠিত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কলুষের ছাপ গোটা দেশের উপর পড়েছিল। পাঞ্জাব ও উত্তরপ্রদেশে এবং, কলকাতা শহরে ঘটল বিভীষিকাময় কাণ্ড। তারই মধ্যে হলো দেশ-ভাগ ইত্যাদি। সুতরাং এই অবস্থায় নতুন কর্মপন্থার সিদ্ধান্ত প্রয়োজন। প্রয়োজন নতুন রণনীতি ও রণকৌশল।

দুঃখের বিষয়, দক্ষিণপন্থী ঝোঁকের বিরুদ্ধে সংগ্রামে বিপরীত বামপন্থী ঝোঁক দেখা দিল। নেতৃত্বের একাংশ এতে মত্ত হলেন।

আণ্ডারগ্রাউণ্ড জীবন

১৯৪৮ সালে পার্টি কংগ্রেস থেকে ফিরেই কংগ্রেস গভর্নমেণ্টের আক্রমণকে মোকাবিলা করতে হলো। পার্টি অফিস 'রেড' হলো। প্রভাত ও হরেকেষ্টকে ধরে নিয়ে গেল। মনসুর তখন প্রাদেশিক কৃষকসভার দপ্তরেই আছেন। কয়েকদিনের জন্য বাড়ি এসেছিলেন। আমরা ঠিক করলাম, তখনই ঘর থেকে বেরিয়ে আণ্ডারগ্রাউণ্ডে রওনা হতে হবে।

দু'জনেই রসিকপুর-বাহিরসর্বমঙ্গলার ভিতর দিয়ে জি. টি. রোড ক্রশ করে কেষ্টপুরে আশ্রয় নিলাম। পরের দিন ভোরেই দু'জনে বেরিয়ে পড়লাম। আমার গন্তব্যস্থল ঠিক করলাম শিমডালের অজিত সেনের বাড়ি। কেষ্টপুর গ্রাম থেকে বেরিয়েই সোজা উত্তরমুখে রেল লাইনের উ'চু বাঁধের উপর উঠলাম। আগেকার গ্রামের মানুষের মতো কম বয়সেই আকাশ দেখে দিক নির্ণয় ও সময় কত হলো তা আন্দাজ করার চেষ্টা করতাম। এই অভ্যাস আণ্ডারগ্রাউণ্ড জীবনে আমাকে অনেক কাজ দিয়েছে। চারিদিক তাকিয়ে সূর্যের অবস্থান দেখে সোজা মাঠে মাঠে শিমডাল যাবার লক্ষ্য ঠিক করে নিলাম। ফাল্গুন মাসের গোড়ার দিক, মাঠে ধান নেই, সুতরাং দিকটা ঠিক রেখে 'আল্' টপ্‌কে টপ্‌কে মাঠের উপর দিয়ে চলে গেলেই হলো। পায়ে চলা পথও নয়, এবড়ো খেবড়ো মাটির উপর দিয়ে যেতে হলো। এছাড়া কোন অসুবিধা নেই। মনের ভিতর চিন্তা একটা ছিল, ফাঁকা মাঠ, দু-একটা গাছ থাকলেও কোন পরিচিত পথনির্দেশ নেই। ভাবছিলাম, এরকম আন্দাজের উপর যেতে ভুল করে যদি শিমডাল থেকে অন্যদিকে দূরে কোথাও পড়ি তাহলে আবার কষ্ট করে ফিরতে হবে। বেশ কিছু দূর যেতে সামনে পড়লো গৌর নদী। ছোট্ট নদী, কাছেই তালিত থেকে বের হয়েছে। বর্ষার জলের ধারা বয়। হালে ক্যানেলের জল তাতে যোগ হয়েছে। পায়ে হেঁটে পেরোনো যাবে বুঝে কাপড় ভাল করে তুলে পেরিয়ে গেলাম। ডানদিকে তাকিয়ে সামনে কিছু দূরে মাহাচাঁদা গ্রাম দেখতে পাচ্ছি। তখন অবশ্য সুনিশ্চিত ছিলাম না, আন্দাজ

করছিলাম। আর বাধার মতো কিছু ছিল না। বেশ কিছুটা হেঁটে সোজা গিয়ে উঠলাম ক্যানেলের বাঁধে। ছোট একটা পুল ক্যানেলের উপর। আন্দাজ করলাম, ডানদিকে শিমডাল আর বাঁদিকে মিলিকপাড়া, মাঝখানে তো সামান্য ব্যবধান, দু-তিন'শ গজের বেশী হবে না। যাই হোক, শিমডাল গ্রামে ঢুকেই বুঝলাম ঠিক এসেছি। অজিতের বাড়িতে গেলাম। অজিত আমাদের ছোটবেলা থেকেই বন্ধু। নিম্নতম ক্লাস থেকে একসঙ্গে পড়েছি। আবার পার্টিতেও সহকর্মী। ঠিক হলো, কয়েকদিন থাকতে হবে, থেকে হাটগোবিন্দপুরের সাথে যোগাযোগ রেখে হাটগোবিন্দপুর রওনা হতে হবে। তালিতে স্নেহভাজন প্রয়াত কমরেড ধর্মদাস মিশ্রকে খবর দেওয়া হলো। তিনি এলে তাঁকে হাটগোবিন্দপুরে প্রয়াত কমরেড তারাপদ মোদকের কাছে পাঠালাম। বলে পাঠালাম, হাটগোবিন্দপুর কিংবা সড্যায় শেল্টার ঠিক করতে হবে। ইতিমধ্যে বিনয়দা নিশ্চয় এসে পড়বেন। সুতরাং তাঁর প্রতীক্ষায় থাকতে হবে। কমরেড ধর্মদাস মিশ্র সব ঠিকঠাক করে পরদিনই ঘুরে এলেন। কমরেড ধর্মদাস এবং আমি চলতি পথ ছেড়ে মেন ক্যানেলের বাঁধ ধরে রওনা হলাম। যে পথ ঘুরে যেতে হলো তা প্রায় ১২-১৪ মাইল হবে। কমরেড তারাপদ শেল্টারের ব্যবস্থা করে রেখে-ছিলেন। পরে সড্যা গেলাম।

কয়েকদিনের মধ্যে বিনয়দা এলেন। তাঁর এ্যাডভেঞ্চার শুনলাম। যে সময় ধরপাকড় হয় এবং পার্টি বে-আইনী ঘোষিত হয়, তিনি মিহিজামে আমাদের অত্যন্ত প্রীতিভাজন দরদী সলিলবাবুর বাড়িতে ছিলেন। সলিল-বাবু মনে-প্রাণে আমাদের আদর্শকে গ্রহণ করেছিলেন। কমরেড বিজয় পাল দিনকতক মিহিজামে ছিলেন, সেই সময় তিনি তাঁকে আমাদের দিকে আকৃষ্ট করেছিলেন। পরে আমাদের সকলের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয়। আমিও সপরিবারে কিছুদিন মিহিজামে ছিলাম। মাসে লক্ষণীয় পরিমাণ চাঁদা তিনি আমাদিগকে দিতেন। তিনি অল্পদিন পরে হার্টের রোগে মারা যান। মিহিজামে তিনি তাঁর পরিবারের দেওয়া এক চ্যারিটেবল প্রতিষ্ঠানের পরিচালক হিসাবে থাকতেন। বেঁচে থাকলে আজ আমাদের এই আদর্শনিষ্ঠ বন্ধুকে কত বড় কাজের শীর্ষে দেখতে পেতাম। মনের ভিতর আদর্শের প্রতি অনুরাগ ও আবেগের প্রবল টান ছিল। মারা যাবার সময় মার্কসের 'ক্যাপিট্যাল' পুস্তকখানি মাথায় ঠেকিয়ে রাখতে বলেন।

বিনয়দা সলিলবাবুর বাড়িতে ছিলেন, এমন সময় জেলার অফিসাররা সলিলবাবুর বাড়িতে এসে উপস্থিত হন। বিনয়দা তাড়াতাড়ি বাড়ি ছেড়ে

পাশে এক জায়গায় আশ্রয় নেন। সেখান থেকে এ'দের কথাবার্তা টুকরো টুকরো শোনা যাচ্ছিল। টুকরো কথা যা শুনছিলেন, বিনয়দার মনে হয়েছিল আমাদের সম্বন্ধেই কথা হচ্ছে। তিনি মনে করলেন, এর পরে সার্চ ইত্যাদি শুরু হবে। তিনি তাড়াতাড়ি মিহিজামের মাঠ, ছোটখাটো পাহাড়, জঙ্গলের ভিতর দিয়ে বরাকর হয়ে আসানসোল পৌঁছালেন। পরে অবশ্য সলিলবাবুর কাছ থেকে জানা গিয়েছিল শঙ্কার কোন কারণ ছিল না।

বিনয়দা, আমি ও তারাপদ এই এলাকাতে সাময়িক একটা আণ্ডারগ্রাউণ্ড জেলা কেন্দ্র স্থাপন করার ঠিক করলাম। আমি এই সময় থেকে দীর্ঘকাল সড্যা এবং হাটগোবিন্দপুর—বর্ধমান শহর ছাড়া এই দুই জায়গাতেই কাটিয়েছি। অবশ্য এসব জায়গায় থেকে জেলার বিভিন্ন জায়গায় ঘোরাঘুরি করতে হতো। এ রকম অবশ্য সবাইকেই করতে হতো।

প্রথম আমাদের কাজ ছিল প্রাদেশিক কমিটির সঙ্গে যোগাযোগ। সেটার অবশ্য একটা অস্থায়ী ব্যবস্থা করা গিয়েছিল। স্থায়ী ব্যবস্থা হয় পরে। কিছুদিন পরে হরেকেষ্ট এবং প্রভাত কুণ্ডু প্রমুখ ছাড়া পেলেন। প্রভাত তখনকার মতো শহরেই থাকলেন। কিন্তু হরেকেষ্ট আণ্ডারগ্রাউণ্ডে চলে গেলেন। হরেকেষ্ট আমাদের বললেন, "নিরাপত্তার প্রয়োজনে এক জায়গায় টাইট হয়ে বসে থাকলে তো চলবে না। এরই মধ্যে ঘোরাঘুরিও করতে হবে, আবার কভারও নিতে হবে।" এই পদ্ধতি স্থির করা হলো। আমরা নিরন্তর ঘোরাঘুরি শুরু করলাম। গাঁয়ে থাকলে আমি প্রধানত হাটগোবিন্দপুর এবং সড্যায় থাকতাম। বর্ধমানেও কয়েকটি শেল্টার ঠিক করেছিলাম। দু-একদিন দু-একদিন করে থেকে পার্টি কমরেডদের সাথে যোগাযোগ করতাম এবং বর্ধমান শহরে রিক্শা শ্রমিক আন্দোলন, ছাত্র আন্দোলন—সাধারণভাবে গণ-আন্দোলন পরিচালনায় সাহায্য করতাম। তবে ঘোরাঘুরি করতে প্রায় সব এলাকাতেই থেকেছি। আসানসোলও মাঝে মাঝে যেতে হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক হবে বলে একটা সমস্যা এখানে আলোচনা করা ভাল। আণ্ডারগ্রাউণ্ডে থাকার নানান অসুবিধা আছে। মানুষের স্নেহ, ভালবাসা সবই পাওয়া যায়, কিন্তু কিছু অসুবিধা অবস্থার মধ্যেই নিহিত থাকে। বৈঠকখানায় তো থাকা যায় না, অন্দরমহলেই থাকতে হয়। প্রত্যেক ব্যক্তি সঙ্কোচমুক্ত এমন তো হয় না। ফলে যিনি থাকেন তাঁকেও কিছু সঙ্কোচ করে চলতে হয়। প্রয়াত কমরেড শম্ভু কোঙার আমাকে একবার বলেছিলেন,

"আপনার সঙ্কোচ এক ফ্যাসাদ। মাঠে চাষের কাজ করতে করতে মনে হলো, এই বেলা দশটার সময়ে তো কমরেডের একটু চা খেতে মন হবে। মাঠের কাজ ছেড়ে এলাম আপনার চায়ের তদ্‌বির করতে। মেয়েরা রয়েছে, বউরা রয়েছে, ডেকে বললেই তো পারেন, চা খাব।" এ অভি-যোগের কি আর উত্তর দেব? এ রকম স্বাধীনতা অবশ্য বেশ কিছু ঘরেই ছিল, তাঁদের ও তাঁদের বাড়ির মেয়েদের অকাতর মনোযোগে অভিভূত হতাম। হাটগোবিন্দপুরের রবিদাস কমরেড গণেশ দাসের বাড়ী একদিন রাত্রে গিয়ে উঠেছিলাম। তিনি বউকে বললেন, "মায়ের কাছে যা, দাদা শুবেন এখানে।" শীতকাল ছিল, এক কাঁথাই গায়ে দিয়ে দু'জনে শুলাম। তাঁর আন্তরিক সারল্যে আমি মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। কত কমরেডকে হয়তো অসুবিধায় ফেলেছি, কিন্তু কেউই তা বুঝতে দেননি। একই আদর্শের অনুগামী হিসাবে ভ্রাতৃত্বের অনুভূতিতে সব অসুবিধা ভুলেছেন।

ভারতের সামাজিক অবস্থায় এক এক সম্প্রদায়ের মানুষকে আত্মগোপন করতে হলে কি রকম অসুবিধা হয়, তা বললে অন্য সবাই বুঝতে পারবেন। একটা কথা বলাই ভালো, হিন্দু-মুসলমানের তিক্ততা না থাকলেও হিন্দু আচারের কঠোর বন্ধনের ফলে এবং মুসলমানদের পর্দার ফলে গার্হস্থ্য জীবনে মেলামেশা কঠিন ছিল, যা এখনও বেশির ভাগ ক্ষেত্রে আছে। আত্ম-গোপন করে আশ্রয় নিতে হলে মানুষের বাড়ির ভেতর অংশেই থাকতে হয়। দুই সমাজের উল্লিখিত আচারে আত্মগোপনের ক্ষেত্রে আমার বিশেষ সঙ্কট উপস্থিত হতো। মুসলমান বাড়িতে আমিই হই কিংবা কোন হিন্দু কমরেডই হন, পর্দা বা অবরোধ প্রথা একটা অসুবিধা ছিল। খাবার দেওয়া ইত্যাদি নানান কাজ পুরুষদেরই করতে হতো। এটা একটা অসুবিধা। হিন্দু বাড়িতে ছিল বা এখনও বেশির ভাগ জায়গাতেই আছে—ভারতবর্ষের সেই চিরকালের ছোঁয়াছুঁয়ির সমস্যা। এ জন্য আমার ক্ষেত্রে বা অন্য মুসলিম কমরেডের ক্ষেত্রে আশ্রয়স্থল ছিল খুব সীমিত। যে সব গ্রামে আশ্রয় নিতাম, সে সব গ্রামে সমর্থন প্রায় সমস্ত গ্রামের থাকলেও উপরোক্ত অসুবিধার কারণে আশ্রয় থাকতো খুব কম—দু-একটি ঘর, বড় গ্রাম হলে আরও দু-একটি বেশি। এতে ব্যবস্থাপকরা বা আমাদের সমর্থকরা লজ্জাবোধ করতেন। চিরকালের আচারের বন্ধন তো ছিঁ'ড়ে ফেলা যায় না। তবে নিজের অভি-জ্ঞতায় দেখেছি, গ্রামের সকলেই আশ্রয়ের ব্যবস্থা করতে ব্যাকুল থাকতেন। আর যেখানে আশ্রয় পেয়েছি, তাঁদের সরল আন্তরিক ব্যবহারে অভিভূত হয়েছি। একটি দৃশ্য বার বার ঘটেছে বলে মনে গেঁথে রয়ে গেছে।

যেখানেই থেকেছি গরীব কৃষক বা সচ্ছল অবস্থার কৃষক, বামুন, কায়েত বা উগ্রক্ষত্রিয় (আগুড়ি), ব্যগ্রক্ষত্রিয় (বাগদি). বা রবিদাস (মুচি)—এঁদের সবারই বাড়িতে বিদায় নেবার সময় বয়স্কা বা বৃদ্ধা মেয়েরা চোখের জল মুছতে মুছতে বারবার বলেছেন, "দেখো বাবা ধরা পড়ো না।" ঘরে ঘরে এই রকম আন্তরিক ও সহৃদয় ব্যবহার যখন স্মরণ করি, ভারতের হাজার হাজার বছরের ঐতিহ্যের সংস্কৃতির কথা মনে পড়ে। জওহরলাল নেহরু "ডিসকভারী অফ ইণ্ডিয়া" বা ভারতের আবিষ্কার বই লিখেছেন, কিন্তু আমরা যেমন এইরূপ জীবনে ভারতের সংস্কৃতিকে দেখেছি তাঁর সে সৌভাগ্য হয়নি।

গ্রামে ও শহরে আত্মগোপন কালে কত দরদী মানুষ আমাদের আশ্রয় দিয়েছেন তার সমগ্র বিবরণ দেওয়া কঠিন। তবুও এখানে কিছু চেষ্টা করছি। হাটগোবিন্দপুরে আমার প্রধান আশ্রয় ছিল কমরেড বনোয়ারী ঘোষের মায়ের কাছে। হাটগোবিন্দপুরে থাকাকালে বেশির ভাগ সময় এখানেই থেকেছি। মাঝে মাঝে দু-একদিন কাজের জন্য বা নিরাপত্তার জন্য দু-একটি ভিন্ন বাড়িতেও থাকতে হয়েছে। এই বাড়িতে আমি যে স্নেহ, প্রীতি ও সযত্ন সমাদর পেয়েছি তা ভোলার নয়। বনোয়ারীর মা ছাড়া পুত্র বনোয়ারী ও শম্ভু কন্যা 'বালক' আমার প্রয়োজনের দিকে খেয়াল রাখতেন। পাঠকের কাছে ইণ্টারেস্টিং হবে বলে একটি ছোট্ট অভিজ্ঞতা বলবো। হাটগোবিন্দপুরে থাকার সময় খুবই সতর্ক হয়ে থাকতে হতো। কারণ পাকা রাস্তার ধারে বলে যে কোন সময় পুলিস রেড হতে পারতো। বার বার হয়েছেও। একদিন কমরেড বনোয়ারীদের ঘরে বসে আছি এমন সময় 'বালক' ছুটে এসে বললো, "দাদা শুয়ে পড়ুন, কারণ পরে বলবো।" গায়ে একটা চাদর দিয়ে দিল। আর একটা দাগ দেওয়া ওষুধের শিশিতে আলতা গুলে রেখে দিল এবং নিজে বসে পাখা করতে লাগল। একটু পরেই ইউনিফর্ম পরা সরকারী কর্মচারী দরজা একটু ফাঁক করে ভিতরে দেখলেন। বালকের দাদাদের মধ্যে শম্ভু ছিলেন। তিনি উর্দি পরা মানুষটিকে বললেন, "জ্বর হয়েছিল, এখন গায়ে দানা বেরিয়েছে। বোধহয় বসন্ত হবে।" আগন্তুক ভয়েই সরে পড়ল। পরে শুনলাম রেডটা ছিল আবগারীর, পুলিশের নয়। তখন ভরা চৈত্রমাস—বসন্তের আক্রমণের সময়। অন্যদিকে এই সময়টা গ্রামাঞ্চলের কিছু ধুরন্ধর ব্যক্তি চক্রান্ত করে গরীব পাড়ায় আবগারীদের রেড ঘটাতো। উদ্দেশ্য কিছু চোরাই পাঁচুই মদ ধরানো. গ্রেপ্তার হলে জামিন দাঁড়ানো, এই জামিনের বদলে আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে আবাদের সময় সস্তায় মজুর পাওয়া। আমি বালককে

বললাম, "এরা তো আবগারী, এতে আমার কি ভয় ছিল ?" বালক বলল, "আপনি তো শহরের বাসিন্দা, যদি চিনতে পেরে কোন রকমে আটকে রেখে শহর থেকে পুলিশকে ডাকাতো, তাহলে ?"

হাটগোবিন্দপুরে আর একটি প্রধান শেল্টার ছিল, কমরেড গোপেশ্বর সিং-এর বাড়ি। তবে এখানে যেহেতু প্রকাশ্য সময়ে আমরা সবাই থেকেছি তার জন্য এর উপর নজর থাকা স্বাভাবিক। সেইজন্য এখানে থাকতাম কম, যদিচ ঘন ঘন মিটিং ইত্যাদি এখানেই হতো। এছাড়া কমরেড কালো দাসের বাড়িতে, কমরেড গোপী রায়দের বাড়িতে মাঝে মাঝে থেকেছি। এক-আধদিন কমরেড গণেশ দাসের বাড়িতেও থেকেছি।

সড্যায় প্রথম দিকে অনেকদিন ছিলাম নির্মল খাঁয়ের বাড়ি। (তিনি ষাট দশকে গ্রাম্য ঝগড়া ও বিভেদের পরিণতিতে কংগ্রেসে চলে গেলেন। আমি মনে করি, আমাদের যদি সময়ে খবর দেওয়া হতো এ ভাঙ্গন আটকাতে পারতাম।) শম্ভু কোঙার মহাশয়ের বাড়ি অনেকদিন ছিলাম। পরবর্তীকালে কমরেড তিনকড়ি কোঙারের ওখানে থেকেছি, কমরেড কমল কোঙারের ওখানে ছিলাম। এছাড়া অন্যত্র স্বতন্ত্র ঘরেও থেকেছি। যেখানেই থেকেছি সযত্ন প্রীতি ও স্নেহ পেয়েছি।

কিন্তু বিধি-নিষেধের বেড়া টপকানো খুব কঠিন। তালিতে এক ব্রাহ্মণ কমরেডের বাড়িতে কখনো কখনো থাকতাম। একবার থাকতে থাকতে আবাদের সময় এসে গেল। তখন গৃহকর্তার সাঁওতাল মুনীশ আনতে সাঁওতাল-পরগণা যাওয়ার কথা। তিনি আমাকে এসে বললেন, "আমাকে তো এখন বাইরে যেতে হবে। সুতরাং আপনাকে অন্য কোন শেল্টারে পৌঁছে দিয়ে যাই।" পৌঁছানোর প্রয়োজন হতো না, শেল্টার থাকলে নিজেই যেতাম। তাছাড়া কাছে-পিঠে কোন শেল্টার ছিল না। অথচ এ অঞ্চলে কাজের দায়িত্বও আছে। আন্তরিক কমরেড অনেকেই ছিলেন কিন্তু তাঁরা করবেন কি ? রাজনৈতিকভাবে তাঁদের সব পরিবার সহানুভূতিশীল হলেও রক্ষণশীলতার আগল রয়েই গিয়েছিল। ফলে সেই সময় সেখানে আমি আশ্রয়হীন। কমরেড ধর্মদাস মিশ্রও তখন ছিলেন না। তিনি থাকলে যা হয় ব্যবস্থা করতেন। একবার তিনি শাটিনন্দীর এক তেঁতুলে সমর্থকের বাড়ি রেখেছিলেন। প্রাচীর নেই, চারিদিকে ঘর। মাঝে মাঝে ফাঁক, আমি খোলা দাওয়ায় বসে কাটাচ্ছিলাম। গৃহকর্তা বাকল দিয়ে বে-আইনী চোলাই করতেন। দুপুরে খাবার পর দু-একজন করে তথাকথিত ভদ্রলোক চোলাই পান করে যাচ্ছিলেন। আমি বললাম,

"এ তো প্রকাশ্যেই থাকা হলো। এ'রা তো দেখে যাচ্ছেন।" গৃহকর্তা বললেন, মোটেই কিছু ভাববেন না। ওরা ভাববে আপনি ওদেরই মতো খদ্দের। দেখছেন না, সেই জন্য কেউ আপনার নামধাম জিজ্ঞেস করছে না।" অন্য একবার কমরেড ধর্মদাস লেবেলক্রসিং-এর রেলকর্মীর ঘরে রেখেছিলেন। কিন্তু তিনি তখন ছিলেন না, অন্যত্র কাজে পাঠিয়েছিলাম। সুতরাং উল্লিখিত গৃহকর্তাকে আমার অসুবিধার কথা বললাম। আমি অভিজ্ঞতায় জানলাম, উক্ত কমরেড বোধহয় খাওয়ার পর আমার থালাটা ধুতেন। তিনি চলে গেলে আমার থালা ধোওয়ার কেউ থাকবে না। প্রশ্নটা আমার কাছে এইভাবে দেখা দিল। আমি বললাম, "আমার তো এখন থাকা ছাড়া উপায় নেই। থালাটা না হয় আমি নিজেই ধুয়ে দেব।" তখন তিনি দাঁড়িয়ে মাথা চুলকোতে লাগলেন। বুঝলাম, মনে একটা কি কথা আছে মুখ ফুটে বলতে পারছেন না। তাঁর এক বিধবা দিদি ছিলেন। কার্যতঃ তিনিই বাড়ির কর্ত্রী। তিনি তাঁর কথা উল্লেখ করে বললেন, তিনি খুব গোঁড়া। তবুও আমার কাছে পরিষ্কার হচ্ছিল না বলে শেষ পর্যন্ত তাঁকে মুখ ফুটে বলতে হলো, তাঁকে গোবর দিয়ে আমার খাবার জায়গাটা নিকোতে হয়। আমি বললাম, "উপায় যখন নেই, গোবর আর জল দিয়ে যেতে বোলো, আমি নিজেই নিকিয়ে নেব।" তাতে যাঁদের সংস্কার তাঁদের সন্তোষ হলো কিনা জানি না। যাই হোক, এরপর যে ক'দিন ছিলাম ঐ ব্যবস্থাই করা হলো।

গত ১৯৮৭ সালের বিধানসভার নির্বাচনের সময় তালিত গিয়েছিলাম। একজন ভদ্রলোক আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি তো তখন আসতেন। কোথায় থাকতেন ?" উপরের বর্ণিত কাহিনীটি বললাম। তিনি বললেন, "এখন ওসব সংস্কারও নেই, অসুবিধাও নেই।" আমি মনে মনে ভাবলাম, অতটা হয়তো নেই, তালিত হয়তো অনেকখানা এগিয়েছে, তবুও গ্রামদেশে, এমন কি শহরের অনেক বাড়িতেও, এসব উঠে গেছে এমন হয়তো সম্ভব নয়।

তবুও একথা সর্বদাই মনে রাখা উচিত, এইসব বিধি-নিষেধের আচরণ অতিক্রম করে সাধারণ মানুষ পরস্পরকে ভালবেসেছে, পরস্পরের বিপদে-আপদে পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। ভারতের এই সম্প্রীতির ঐতিহ্যেরও আমরা উত্তরাধিকারী, একথা এক মুহূর্তের জন্য ভুললে চলবে না।

এটুকু লিখলাম শুধু এই উদ্দেশ্যে, আত্মগোপন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা ও নির্দেশ দেওয়ার সময় পরস্পরের এইসব অসুবিধাগুলি বিবেচনা করা উচিত।

বোম্বেতে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস অধিবেশন, ১৯৪৮

১৯৪৮ সালে গ্রীষ্মকালে পি সি থেকে নির্দেশ এলো, তিনজন শ্রমিক ডেলিগেট সহ আমাকে বোম্বেতে অল্ ইণ্ডিয়া ট্রেড ইউনি.ন কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগদান করতে হবে। আশ্চর্য হলাম। কারণ, আমাদের ট্রেড ইউনিয়নের কাজকর্ম বেশির ভাগ হতো এবং এখনও হয় আসানসোল মহকুমায়। আমি সাধারণত কৃষক আন্দোলনে লিপ্ত। যেহেতু বর্ধমান শহর আমাদের কেন্দ্র, কৃষক আন্দোলন ও অন্যান্য আন্দোলন ছাড়া আমাদিগকে শহরের কয়েকটি ছোটখাটো ট্রেড ইউনিয়নের কাজও করতে হতো। এর মধ্যে প্রধান হচ্ছে রিক্সা শ্রমিক ইউনিয়ন, পৌরসভার সাফাই কর্মীদের ইউনিয়ন ও কর্মচারী ইউনিয়ন। আসানসোল আর রাণীগঞ্জের ট্রেড ইউনিয়নের নেতাদের কথা পি সি. থেকে বলাই হয়নি। নির্দেশ ছিল, গোপনে যেতে হবে এবং একেবারে সম্মেলনে গিয়ে আত্মপ্রকাশ করতে হবে। বর্ধমান থেকে আমি আর সেখ গুলু তৈরি হলাম। আর আসানসোল থেকে নিরঞ্জন ডিহিদার (এখন দক্ষিণপন্থী পার্টিতে এবং একজন কয়লা খাদের সাধারণ শ্রমিক) এবং বার্ণপুরের প্যাটেল। বিনয়দার উপর নির্দেশ না থাকলেও তিনি আমাদের সঙ্গে বোম্বে গেলেন। আমার উপর নির্দেশের অর্থ পরে বুঝেছিলাম। পরে তার উল্লেখ করবো।

আমরা বর্ধমান থেকে গ্র্যাণ্ডকর্ডে অন্য স্টেশনে গিয়ে নামলাম এবং সেখান থেকে বোম্বাই মেল ধরে রওনা হলাম। বোম্বে মেলে দেখলাম কলকাতা থেকে অনেকেই যাচ্ছেন। কমরেড কুমুদ বিশ্বাস, গোপাল আচার্য, নারকেলডাঙ্গার ছোট হালিম এবং যদুনন্দন মিশ্র প্রমুখকে পূর্ব হতেই চিনতাম। পরে পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ সন্দেহে পার্টি থেকে বিতাড়িত কালী ব্যানার্জীও ছিলেন। বোম্বেতে নির্দেশিত স্টেশনে আমরা নামলাম। নির্দেশিত চিহ্ন দেখে আমরা স্থানীয় যেসব কর্মী আমাদের নিতে এসেছিলেন তাঁদের চিনলাম এবং তাঁদের অনুসরণ করলাম। কালী ব্যানার্জী এখানে একটা গণ্ডগোল করেছিলেন। ঘটনাটা ঠিক মনে পড়ছে

না, কিন্তু খুবই প্ররোচনামূলক ছিল। আমরা বর্ধমান জেলার কমরেডরা প্যাটেলকে অনুসরণ করে পৃথক পথ ধরলাম! কমরেড প্যাটেলের কিছু আত্মীয় কারখানায় কাজ করতেন, তিনি তাঁদেরই বাসায় আমাদের নিয়ে গেলেন। পূর্ব থেকে এটাই আমাদের ঠিক ছিল। প্যাটেলকে অনুসরণ করে আমরা একজনের পেছনে আর একজন লাইন বেঁধে যাচ্ছিলাম। স্টেশন থেকে বের হয়ে আশপাশ পেছন সতর্কতার সঙ্গে এক-আধবার তাকিয়ে এগোচ্ছিলাম। কিছু পরে সামনের দিকে মুখ করেই চলতে লাগলাম, পিছনে আর দেখিনি। প্যাটেল এক কয়েকতলা বাড়িতে উঠলেন, আমরাও সঙ্গে সঙ্গে গেলাম। প্যাটেলের আত্মীয়ের সঙ্গে দেখা হলো, তাঁর ঘরে নিয়ে গেলেন। ঘরে প্রবেশ করে দেখি আমাদের পিছন পিছন যদুনন্দন মিশ্রও এসেছেন। তিনি বললেন, রাস্তায় কলকাতার কমরেডদের খেই হারিয়ে ফেলেছিলেন, শেষে আমাদের দেখতে পেয়ে আমাদের পিছন নিয়েছেন।

আমরা স্টেশনেই স্থানীয় কর্মীদের কাছ থেকে ডেলিগেটদের থাকার জায়গা কোথায় করা হয়েছে এবং সম্মেলন কোথায় হবে এসব খবর নিয়ে এসেছিলাম। থাকার জায়গা একটি হাই স্কুলে—ভালই ব্যবস্থা হয়েছিল। কাছেই একাধিক খাবার হোটেল ছিল, সেখানেই খেতাম। আমি আর কমরেড গুলু বেশ কিছু পরিমাণ ছোলার ছাতু, পিঁয়াজ, লঙ্কা, লবণ আর একটা এনামেলের বাসন সঙ্গে নিয়েছিলাম। আমরা জানতাম, মিলের তো বাঁধা খরচ কিন্তু জলখাবারের বেশ খরচ পড়ে যায়। এই ছাতুর ফলে কম পয়সায় আমরা ক'দিন কাটাতে পারি। ডেলিগেট ক্যাম্পে আরও অনেক কমরেড এই ছাতুর অংশীদার হলেন।

বঙ্কিমবাবু (কমরেড বঙ্কিম মুখার্জী) বোম্বেতেই তাঁর স্ত্রী কমরেড শান্তার কাছে পূর্ব থেকেই ছিলেন। সম্মেলনে ও'র সাথে সাক্ষাৎ হলো। সত্য বলতে কি, ও'র জন্য পুলিশের একটি প্ররোচনা বিফল হলো এবং পার্টি একটা ট্রাজেডি থেকে বেঁচে গেল। প্রাদেশিক কমিটির নির্দেশ ছিল, বোম্বাই-এ পুলিশ কিছু করতে উদ্যত হলে পিছু হঠা চলবে না অর্থাৎ এ রকম ঘটনা ঘটলে এগিয়ে গিয়ে পুলিশের গুলির সম্মুখীন হতে হবে এবং মরতে হবে। অতি বামপন্থার নীতি যা চলছিল এও তারই নিদর্শন।

সম্মেলন আরম্ভ হবার আগেই কালী ব্যানার্জী আবার এক প্ররোচনা-মূলক ঘটনা ঘটালেন। পুলিশ আক্রমণ করতে উদ্যত। আমরাও তখন খুব উত্তেজিত হয়ে পড়েছি এবং পুলিশের সামনে এগিয়ে চলেছি। কমরেড

কুমুদ বিশ্বাস, গোপাল আচার্য এবং আমরা কয়েকজন বেশ কিছুটা এগিয়ে গেছি। পুলিশ তখন বন্দুক উঁচিয়েছে, আমাদের তখন উত্তেজনায় কোন হুঁশ ছিল না। বঙ্কিমবাবু পিছনে দূরে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি চিৎকার করে আমাদের নাম ধরে ডাকতে লাগলেন, "গোপাল, কুমুদ, শাহেদুল্লাহ— সব ফিরে এসো।" উত্তেজনার অবস্থায় কথা শুনছি না দেখে তিনিও ক্রুদ্ধ স্বরে ধমকে বললেন, "আমি বলছি চলে এসো।" তাঁর বকুনিতে আমাদের সম্বিৎ ফিরে এলো এবং আমরা চলে এলাম। তারপর আমরা সম্মেলনে যোগদান করলাম।

সম্মেলন শেষ হবার দিন দেখা গেল পশ্চিমবাংলা থেকে বেশ কিছু আই বি. এবং এস বি এসে হাজির হয়েছে। রাস্তায় সম্মেলনের আসা-যাওয়ার পথে কৌতূহলী কিছু পথিক জড়ো হয়েছিল। তার মধ্যে তারাও ছিল। মারাঠী কিছু কমরেডদের ঐ ভিড়ের মধ্যে পথিক হিসাবে আই. বি., এস. বি.-র কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে বলা হয়। উদ্দেশ্য. আই. বি., এস. বি-র কথাবার্তায় কিছু নামের উল্লেখ থাকলে সেইগুলো মনে করে এসে আমাদের বলা। তাতে কাদের ওরা চিনতে পেরেছে তা বোঝা যাবে এবং সেই প্রতিনিধিদের দেশে ফেরার ব্যাপারে বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হবে। দেখা গেল, আমাদের বর্ধমানের ডেলিগেটদের মধ্যে কেবল বিনয়দাকেই চিনতে পেরেছে। অগত্যা ঠিক করা হলো, বিনয়দা সোজা বর্ধমান না ফিরে ঘুরে অন্যান্য প্রদেশের মধ্য দিয়ে দেশে ফিরবেন। আমরা ঠিক করলাম, সোজা ইস্ট ইণ্ডিয়া রেলপথ ধরে বোম্বে-কলকাতা মেলে ফিরবো. পথে কোথাও অন্য ট্রেন ধরে বর্ধমান আসবো। থার্ড ক্লাসে তখন ট্রেনে শোবার ব্যবস্থা ছিল না। এত বেশি ভিড় ছিল যে, আমাদিগকে মেঝেতে বসে আসতে হয়েছিল। মেঝের ধুলোয় কাপড়-চোপড় খুবই ময়লা হয়ে গেল। ঠিক করলাম, ভোর রাতে মোগলসরাই-এ নেমে বেনারসের ট্রেন ধরবো। ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে বিতরিত সাইক্লোস্টাইল কাগজপত্র আমি পুল থেকে গঙ্গায় নিক্ষেপ করলাম। কমরেড গুলুও তাই করলেন। কিন্তু বাকিদের থলিতে রয়ে গেল। তাদের আর গঙ্গাপ্রাপ্তি হলো না।

আমরা বেনারসে নেমে ঠিক করলাম, দশাশ্বমেধ ঘাটে স্নান করে কাপড়-চোপড় ধুয়ে পুজো দিয়ে একটা অতিথিশালায় থেকে বিকেলে আবার দেশের পথের ট্রেন ধরবো। ঘাটে দু'চার সিঁড়ি নামতে না নামতে পাণ্ডারা ছেঁকে ধরলো। কত চাটুজ্যে বাড়ি, মুখুজ্যে বাড়ি তাঁদের মাধ্যমে পুজো-পার্বণ করে গেছেন। আমাদের পকেটে পয়সাও তখন বেশি নেই, যদি বেশি

থাকতো তাহলে একটু উদার হয়ে ওদের এড়াতে পারতাম। দেশ থেকে এতদূর তীর্থ করতে এসে পকেটে পয়সা নেই, এ তারা স্বীকার করবে কেন? ইতিমধ্যে পাণ্ডাদের কথাবার্তায় আমাদের উগ্রপন্থীরা চটে বসে আছেন। তাঁরা জিদ ধরলেন, "পূজোও দেব না আর গঙ্গায় স্নানও করবো না। চলুন ফিরে যাই।" আমি দেখলাম, একটি হট্টগোল সৃষ্টি হচ্ছে। তাই তাড়াতাড়ি ফেরার সিদ্ধান্তই করলাম। পথে নেমে একজন এক্কাওয়ালাকে ধরলাম। বললাম, "একটি অতিথিশালায় নিয়ে চল।" তখনও পাণ্ডারা ছাড়েনি। এক্কাওয়ালা ছিল মুসলমান। সে চাবুক ঘুরিয়ে পাণ্ডাদিগকে বলল, "ভাগো ইঁহাসে, শ্যরীফ্ আদমীকো হয়রান্ ম্যত ক্যরো।" তখন পাণ্ডাদের কাছ থেকে ছাড়ান পেলাম। আশ্চর্য হলাম। দেশ সদ্য ভাগ হয়েছে। সাম্প্রদায়িক ভেদ-বিভেদের বিষময় ফল আকাশে বাতাসে বেশ কিছু রয়েছে। অথচ হিন্দুর এই তীর্থস্থানে মুসলমান এক্কাওয়ালা পাণ্ডাদের উপর চাবুক ঘুরিয়ে আমাদের রেহাই করলো। দেশের সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে প্রীতির ঐতিহ্য যে শেষ হয়নি তার নিদর্শনে মনে আনন্দ হলো।

এক্কাওয়ালা একটা জায়গায় এনে একটা মুসলমান মুসাফিরখানায় এক্কা দাঁড় করিয়ে দিল। আমরা বললাম, "তোমার সঙ্গে কথা ছিল এক অতিথিশালায় নিয়ে আসবে। মুসলমান মুসাফিরখানায় নামবো কেন?" মন্দিরে যে ভূমিকা নিয়েছি, সেই ভূমিকাতেই বলতে হলো, "আমরা তো হিন্দু।" এক্কাওয়ালা তো অবাক, এইরূপ ভাব দেখাল। বলল, "আপনারা বাঙালী না? বাঙালী কাভী কোই জাত হোতা হ্যায়? পূজোর সময় কত বাঙালীকে এখানে এনে তুলেছি।" অগত্যা নামতে হলো। মুসাফিরখানা অফিসে আবার আর এক বিপদ। অফিসের কর্তা বললেন, "আমরা হিন্দু পার্টি নিই, কিন্তু তার মধ্যে অন্ততঃ একজন মুসলমান থাকতে হবে। তার নামেই কামরা বুকিং হবে।" তখন আমাকে বলতে হলো "আমি মুসলমান। আমরা তো বাঙালী, খাওয়া-দাওয়ার বাচ্‌বীচ্ অত আমরা মানি না। সুতরাং যেখানেই সুবিধা পাই উঠে পড়ি।" স্নানের বেশ ব্যবস্থা ভাল ছিল। আমরা কাপড়-চোপড় কেচে নিয়ে ভাল করে শুকোতে দিলাম। শুনলাম, খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা কাছেই মুসলিম হোটেলে, সেখান থেকেই এনে দেবে। হোটেলের লোক এলো। তাকে ভাত আর খাসীর মাংসের অর্ডার দিয়ে খোলা হাওয়ায় গাছের নীচে চারজনে খাটিয়াতে শুয়ে পড়লাম। ওরা তিনজন ঘুমিয়ে গেল।

আমি জেগে ছিলাম। একটু আশ্চর্য হলাম, অনেকক্ষণ আগে ভাত দিয়ে গেছে কিন্তু তরকারি আর আসে না। দু-একবার আমি তাগিদও

দিলাম। ইতিমধ্যে অফিসে আমাকে ডেকে পাঠাল। বলল, "পুলিশ অফিসার এসেছে। আপনাদের পরিচয় ইত্যাদি জানতে চেয়েছে।" আমি গেলাম। মিথ্যা চারটে নাম দিলাম। জানালাম, আমরা ব্যবসাদার। যে দু'জন শিক্ষা-বণিত ছিলেন, তাঁদের জন্য বললাম, "ও'রা আমাদের অফিসের বিয়ারার, আর আমরা দু'জন পার্টনার।" আমি বললাম, "আমরা ব্যবসাসূত্রে বোম্বাই গিয়েছিলাম। আমি মুসলমান, কিন্তু সঙ্গীরা হিন্দু। ওরা বেনারসে নামতে চাইলেন বলে একবার নামলাম, আজই চলে যাব।" আমি ফ্লুয়েণ্টলি উর্দুতে কথা বলছিলাম। পরে বুঝেছিলাম, পুলিশ অফিসারটি মুসলমান।

পুলিশ অফিসার চলে গেল। আমি আর একবার তরকারির তাগাদা দিয়ে শুকনো কাপড় কিছু তুলে খাটিয়ায় পুনরায় শুলাম। আমার পাশে গুলু ছিলেন, তাঁর গায়ে হাত দিয়ে ওঠালাম। উঠিয়ে অবস্থা বললাম। ও'কে বুঝিয়ে বললাম "তুমিও কাপড় তুলে শুয়ে পড়ো, আর পাশের লোককে অনুরূপ করতে বলে দাও।" আমাদের কাজ তো সামান্যই, শুকনো কাপড়-গুলোকে তোলা আর থলিতে ভরা। আমার পলিসি ছিল, একে একে সবাই উঠে কাজ সারবো, অথচ যে কোন সময়ে দেখা যাবে তিনজন শুয়ে শুয়ে ধূম-পান করছি। উদ্দেশ্য ছিল, তাড়াহুড়ো করে পালাতে যাচ্ছি এমন যেন মনে না হয়। এবার কাপড়-চোপড় নিয়ে তরকারির জন্য আবার তাগাদা দিয়ে আমাদের কামরায় ঢুকলাম। আমাদের কামরা থেকে সদর দরজা দেখা যেত। দেখলাম, সেই পুলিশ অফিসার সঙ্গে আরও কয়েকজনকে নিয়ে প্রবেশ করছে। আমি কমরেডদের সতর্ক করে দিলাম। দেখলাম, থলি আজারতে গিয়ে সাইক্লোস্টাইল কাগজগুলো সব বার করেছিল। সেগুলো সামনেই পড়েছিল। সদ্য তোলা শুকনো কাপড়গুলো দিয়ে ঢাকা দিলাম। আমি ঠিক করলাম, এবার এ্যাগ্রেসিভ্ (আক্রমণাত্মক) হতে হবে। ও'দের মধ্যে একজন বাঙালী ছিলেন। বললেন, "আমি বাঙালী—নাম ডি. কে. ভট্টাচার্য।" আমি শোনা মাত্রই বললাম, "আমি বিশ্বাস করি না। আমরা চারজন বাঙালী এসেছি, তাতেই গোবিন্দ বল্লভ পন্থের প্যাণ্ট ঢিলে। সুতরাং এখানে কখনো বাঙালী থাকতে পারে?" তখন একটু থমকে গিয়ে পূর্বে যিনি এসেছিলেন সেই অফিসারটিকে তিনি বললেন, "দেখিয়ে মৌলানা, ইয়ে কিয়া বোল্ রহে হ্যাঁয়?" সেই অফিসারটি লজ্জিত মুখে আমাকে তখন বললেন, "কলকাতায় নানারকম কাণ্ড হচ্ছে তো, সেজন্যই এখানকার গভর্ন-মেণ্ট একটু সতর্ক। আপনারা এসেছেন, ভাল করে বেনারস দেখে যান।" তাঁর সঙ্গে উর্দুতেই কথা হচ্ছিল। বললাম, "মাত্র একদিন থাকবো বলেই

নেমেছিলাম। এখন সেই সিদ্ধান্তে আমরা দৃঢ় হলাম। কলকাতায় পুলিশ লাগার বদনাম হলো না. এখানে সেই বদনামটা নিয়ে যাব? আমাদের কাজ কারবার তো সব ধনপতিদের সঙ্গে।" যাই হোক, আবার পরিচয়পর্ব সারতে হলো। কি পরিচয় আগে দিয়েছি অন্য কেউ তো তা জানে না। সুতরাং আমিই আবার মিথ্যা পরিচয়গুলো দিলাম। আমাদের অফিসের কল্পিত ঠিকানা ও টেলিফোন নম্বর দিয়ে দিলাম। আমি সরল অথচ দৃঢ়-ভাবে সব কিছু বলে যাচ্ছিলাম। তাতে ওরা বিশ্বাসই করে ফেলেছিলো। ওরা জিজ্ঞেস করলেন, আমরা কী ব্যবসা করি। আমি তখন সেই অফিসারকে বললাম, "আপনার কলমটা ভট্টাচার্য মশায়কে বিক্রী করুন. আমি তখন আপনাদের দু'জনের মধ্যে আসা-যাওয়ায় দু' পয়সা লাভ করে নেব। আমরা সাধারণত জমি-জায়গা, বাড়ি-ঘর নিয়ে কারবার করি।" তারপর এক লম্বা গল্প ফেঁদে নিয়ে বললাম, "কলকাতার এক কারখানার মালিক বোম্বাই-এর কয়েকটা মেশিনের খবর পেয়ে আমাদের গাড়িভাড়া দিয়ে পাঠিয়েছিলেন। আমরা দু' পয়সা লাভের উদ্দেশ্যে গিয়েছিলাম। দেখে শুনে এসেছি. কিন্তু এর বেশি আর বলবো না। এটা তো আমাদের ট্রেড সিক্রেট। এটা আমরা সংশ্লিষ্ট পার্টি ছাড়া কাউকে বলি না।"

ইতিমধ্যে ডি. কে. ভট্টাচার্য মশায়ের মন চলে গিয়েছিল সুদূর মৈমন-সিংয়ের পল্লীগ্রামে। দেশভাগের পর অন্য রাষ্ট্রে। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, "কলকাতায় জায়গার দাম কি রকম?" এখনকার তুলনায় তখন দাম অনেক কম ছিল। গল্পসল্পের মধ্য থেকে মানুষের নিকট হতে কিছু জানাও ছিল। জানা অজানা যাই-ই হোক, আমি বেধড়ক কাশীপুর থেকে টালিগঞ্জ পর্যন্ত আন্দাজে দাম বলে গেলাম। গল্প জমিয়ে বললাম, "তবে এর মধ্যে কপালের ব্যাপারও আছে। আমার এক পার্টির আশি হাজার টাকা দিয়ে একটা জমি কেনা ছিল। তাঁর ব্যবসায় টাকার দরকার হওয়ায় বেচতে চাইলেন। আমি হঠাৎ এক ভাল খদ্দেরও পেয়ে গেলাম। তিনি দাম দিতে রাজি হলেন একলাখ কুড়ি হাজার। বিক্রেতা বললেন, 'এক লাখ ত্রিশ হাজার টাকা হলে এখনই দিয়ে দিই।' আমি বললাম. 'তা সম্ভব নয়, যা উঠেছে তাই অপ্রত্যাশিত।' এখন আমার সেই পার্টির বিক্রীর তাগিদ খুব বেশি, কিন্তু ছোটাছুটি হাঁপাহাঁপি করেও লাখের উপরও তুলতে পারছি না। যাই হোক আপনার দরকার বলুন।" তিনি বললেন, "আমি তো মধ্যবিত্ত মানুষ, ওসব লাখ দু-লাখের কথা ভাবতেই পারি না। এদেশে কিছু করবার তাগিদও ছিল না। এখন খেয়াল হয়েছে, কলকাতা বা তার

আশে পাশে সামান্য কিছু জায়গা কিনে রাখি। অবশ্য অনেকে বদলা-বদলি করার কথা ভাবছেন। আমি দেশের মাটির মমতাটা ছাড়তে পারছি না। আমি ওটা করবো না।" আমি বললাম, "ঠিকই তো. কি দরকার দেশের মাটি ছাড়া। কলকাতায় আপনাকে ন্যায্য দরে জায়গা করে দিতে পারবো। তবে যদি বদলা-বদলি করতে চান, তার ব্যবস্থাও করতে পারি। এধারে তো আমরা আছিই, তাছাড়া জেলায় জেলায় অন্য ব্রোকারদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক আছে। পূর্ববঙ্গে ব্রোকারদের সঙ্গেও আমাদের সম্পর্ক আছে।" নিরঞ্জনকে দেখিয়ে বললাম. "পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি জেলা ইনি দেখেন. আর বাকি আমি দেখি। যাই হোক. আপনি যখন জায়গা বলছেন. জায়গাই করে দেব।" ইতিমধ্যে কমরেড গুলু বিনা সঙ্কোচে গৃহীত ভূমিকা পালন করলেন। এসে বললেন, "হুজুর. চাউল তো দে গিয়া. মগর সালুন (তরকারি) দিয়া নেহি, হু' বোলতা. মগর শুনতে তো নেহি।" পুলিশ পক্ষ বিদায় নিতে নিতে দরদের ভণিতা করে গেলেন। বললেন, "ও'দের খাবার ব্যবস্থা করে দাও।"

যাই হোক, আমরা খাওয়া দাওয়া করে থলিটলি নিয়ে স্টেশনের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লাম। আমাদের উপর যে নজর রাখা হচ্ছিল তা বুঝতে দেরি হলো না। পথে ডি. কে. ভট্টাচার্য মশায়ের আবার আবির্ভাব। বললেন. "আপনারা চলে যাচ্ছেন কেন ? বেনারস ইউনিভার্সিটি ইত্যাদি দেখে যান।" আমি হাসতে হাসতে বললাম. "থাকগে. আমাদের না দেখলেও চলবে। আমাদের কলকাতায় কাজের তাগিদ আছে।" যাই হোক, তিনি যাবার আগে বললেন, "আমার কথাটা মনে রাখবেন. জায়গার খবর পেলেই জানাবেন।" তাঁর ঠিকানা পূর্বেও বলেছিলেন, আবার বললেন। আমরা নিজ নিজ জায়গায় ফিরে এলাম।

বোম্বাইয়ে বার বার প্ররোচনা ব্যর্থ হওয়ায় শুধু পুলিশই ব্যর্থকাম হয়নি. ব্যর্থকাম হয়েছিলেন অতি বামপন্থী নেতারাও। পুলিশের গুলিতে কয়েকজন কর্মী নিহত হলে, সেই শোচনীয় ঘটনাকে আন্দোলনের বিষয় করা যাবে—এ যাঁদের কামনা ছিল বঙ্কিমবাবুর সময়োপযোগী হস্তক্ষেপে তা ব্যর্থ হলো। ট্রেড ইউনিয়নের সংগঠনের কর্মী নয়, যেমন শাহেদুল্লাহকে, ট্রেড ইউনিয়ন সম্মেলনে পাঠানোর পিছনে অতি বামপন্থী নেতৃত্বের কি যুক্তি ছিল তা কি বুঝতে বিলম্ব হয় ? এই নেতারাই পরে অতি দক্ষিণপন্থায় ডিগবাজি খেয়ে তাঁদের স্বাতন্ত্র্য আসর জাঁকিয়ে রেখেছেন।

জেলা কৃষক সম্মেলন, ১৯৪৮ এবং তারপর

কৃষক আন্দোলনের ক্ষেত্রে নেতৃত্বের বে-আইনী অবস্থা সত্ত্বেও খোলা-খুলি যতটা সম্ভব আলোচনা হওয়া প্রয়োজন এরূপ অনুভূত হচ্ছিল। প্রাদেশিক পার্টি ও কৃষকসভা থেকেও জেলা সম্মেলন করার নির্দেশ এসেছিল। জেলা কমিটিতে অনেক আলোচনা করে কমরেড দাশরথি চৌধুরীরই প্রস্তাব গ্রহণ করা হলো এবং মঙ্গলকোট থানার কাশিয়াড়া গ্রামে (বর্তমানে কাশেমনগর বলে পরিচিত) জেলা সম্মেলন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। তারিখটা ঠিক মনে নেই -তবে সময়টা ছিল বর্ষাকাল। এই সম্মেলনের আহ্বানে প্রচুর উৎসাহ সৃষ্টি হয়েছিল এবং বেশ ভাল সংখ্যায় প্রতিনিধি সমবেত হয়েছিলেন। সরকার কর্তৃক চারিদিকে কমিউনিস্ট পার্টি ও গণ-সংগঠনের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসের ঘটনা চলছিল। এসব উপেক্ষা করেই প্রতিনিধিরা সমবেত হয়েছিলেন।

সম্মেলনের ব্যবস্থা খুব ভাল হয়েছিল। শুধু খাওয়া, থাকার কথা বলছি না। প্রকাশ্য সভা ও গোপন নেতৃত্ব এই দুয়ের মধ্যে যোগাযোগ বজায় রেখে কাজ চালানোর ব্যবস্থা ভাল হয়েছিল। পার্টির ও কৃষক সভার গোপন নেতৃত্ব উপস্থিত ছিলেন। বস্তুত, প্রকাশ্য কয়েকজন নেতৃস্থানীয় কমরেডদের মাধ্যমে তাঁরাই পরিচালনায় সাহায্য করছিলেন। বিনয়দা, আমি, কমরেড হরেকৃষ্ণ কোঙার, কমরেড বিপদবারণ রায়, কমরেড তারাপদ মোদক প্রমুখ আমরা সবাই ছিলাম। আমাদের থাকা-খাওয়া ও কাজ করার জায়গা পেয়েছিলাম কমরেড সমী-র বাড়ির এক অংশে। প্রধান প্রস্তাবগুলি আমরাই রচনা করে দিচ্ছিলাম এবং যে কমরেড প্রকাশ্যে সভায় তা রাখবেন, তাঁকেও ভাল করে বুঝিয়ে দিচ্ছিলাম। সভায় উপস্থাপিত অন্যান্য প্রস্তাব আমাদের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছিল। আমরা দেখে দিচ্ছিলাম। এইরূপে সম্মেলন ভালভাবেই সম্পাদিত হলো।

গুসকরায় স্টেশনে আই. বি জমায়েত হয়েছে। ফলে আমাদের সিদ্ধান্ত করতে হলো, ওপথে আমাদের ফেরা চলবে না। এদিকে আবার

আসানসোল মহকুমার চুরুলিয়ার কাছে অজয় নদী পেরিয়ে বীরভূম জেলার এক গ্রামে পশ্চিমবঙ্গ পশ্চিম জোনাল কমিটির এক মিটিং। জোনাল কমিটি একটি নতুন বডি। পশ্চিমবঙ্গ কমিটি এই বডি গঠন করেছিল। পরে বিশ্বস্তসূত্রে শুনেছিলাম, এই কমিটি গঠন করা হয়েছিল তখনকার চরম-পন্থী, পরবর্তীকালে এবং বরাবর দক্ষিণপন্থী ধরণী গোস্বামী নামক একজন কমরেডকে সন্তুষ্ট করার জন্য। তাঁকে একটা পদ না দিলে আণ্ডারগ্রাউণ্ড অবস্থায় গোলমাল করে বেড়াচ্ছিলেন। সুতরাং পশ্চিমবঙ্গ কমিটি ও জেলা কমিটির মধ্যস্তরে আর একটি কমিটি গঠন করে তাঁকে তার সম্পাদক করে সন্তুষ্ট করা হলো। বিনয়দা হয়তো তখন জানতেন, আমরা তখন কেউ জানতাম না। উচ্চতর কমিটির নির্দেশ যথেষ্ট মর্যাদা সহকারে মানতাম। কিন্তু এইখানে আমাদের সমস্যা দাঁড়াল, উল্লিখিত কমিটির সভা মাত্র একদিন বাদ। সুতরাং আমাদের প্রচুর ক্লেশ করতে হবে। প্রতিনিধিদের মধ্যে বনপাশ-কামারপাড়ার কমরেড ভোলানাথ ছিলেন। তাঁকে ডেকে কথা কয়ে ঠিক করলাম, রাতে হেঁটে গিয়ে বনপাশ-কামার-পাড়ায় তাঁর বাড়িতে আশ্রয় নেব। সেইদিন বিকালে সেখান থেকে সোজা বর্ধমানের রাস্তা ধরে তালিত পৌঁছাব। সেখানে ধর্মদাস মিশ্রের বাড়িতে উঠব। ভোলানাথের মতো তাঁকেও বলে দেওয়া হয়েছিল। মধ্যরাত্রে মোগলসরাই প্যাসেঞ্জার ধরে অণ্ডাল যাব। অণ্ডাল থেকে চুরুলিয়া মাত্র একটি ট্রেনই আসা-যাওয়া করতো। সেই ট্রেনটি ধরে গন্তব্যস্থলে যাব। দুর্ভোগের কারণ থাকলে সহজেই সেটা সহ্য যায়। কিন্তু এ ঝঞ্ঝাট হচ্ছে অকারণ। আলোচ্য মিটিংটি আমাদের সম্মেলনের কয়েকদিন পর ডাকলে কোন হাঙ্গামাই ছিল না। আমরা নিজ নিজ স্থানে ফিরে দু-চারদিন বিশ্রাম নিয়ে আলোচ্য সভায় যোগ দেবার জন্য আবার বেরোতে পারতাম। যাই হোক, নেতারা যখন নির্ধারণ করেই ফেলেছেন তখন তো যেতে হবে। সুতরাং প্রতিনিধিরা সব প্রস্থান করার পর আমরা বনপাশের পথে রওনা হলাম। মাথায় বর্ষণ ও পায়ে কাদা, পথ এত পিছল যে চলাই কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। দু-একবার আছাড়ও খেতে হলো। এইভাবে ১০ মাইল রাস্তা যেতে রাত অনেক হলো, প্রায় ভোরের দিকে গড়িয়ে পড়ল। যাঁর অতিথি তিনি কোনমতে আয়োজন করে আমাদের জোর করে উঠিয়ে খাওয়ালেন। এতই ক্লান্ত যে, সকালে উঠতে খুব বেলা হয়ে গেল। চান করে খেয়ে নিয়ে আবার দুপুরের পর বেরোলাম। মোহনপুর যখন পৌঁছেছি তখনও অন্ধকার হয়নি। আমরা রাস্তায় লাইন বেঁধে যাচ্ছি,

পথের ধারে সামান্য দূরে এক বৈঠকখানার দাওয়ায় কিছু ব্যক্তি বসেছিলেন। তাঁদের কথাবার্তায় বোঝা গেল, কয়েকজনই আমাদের চিনতে পেরেছেন। আমরা এগোচ্ছি আর তাঁরা একের পর এক আমাদের নাম বলে যাচ্ছেন— বিনয় চৌধুরী, বিপদবারণ রায়, দাশরথি চৌধুরী…। এইভাবে তাঁরা সব নামই বললেন। আমরা ইচ্ছা করেই থামলাম না, নানান প্রশ্ন ঝামেলার মধ্যে পড়তে হবে। পথে আমাদের কিছু কৌতুকও হলো। এক কাছিম সামনে পড়ে গেল, দাশরথি অমনি তাকে লাঠি দিয়ে উল্টে দিলেন। শেষে গামছা করে বেঁধে ধর্মদাসের বাড়ি নিয়ে আসা হলো। আমরা ধর্মদাসের বাড়ি খাওয়া-দাওয়া করে, বিশ্রাম নিয়ে মোগলসরাই প্যাসেঞ্জার ধরলাম। ঘুমোতে পেলাম না, কোন রকমে দাঁড়িয়ে মাঝে মাঝে গাড়ির মেঝেতে উবু হয়ে বসে এইভাবে শেষে অণ্ডাল পৌঁছালাম। অণ্ডালে চুরুলিয়ার গাড়ি ধরলাম এবং চুরুলিয়া পৌঁছালাম। (পাঠক নিশ্চয়ই জানেন, চুরুলিয়া কাজী নজরুল ইসলামের জন্মস্থান।) এবার আমরা গন্তব্যস্থলের দিকে পায়ে হেঁটে রওনা হলাম। জায়গাটা এককালে (সন্ত্রাসবাদী যুগে) বিনয়দার পরিচিত ছিল। তিনিই পথ-প্রদর্শক, আমরা পিছন পিছন যাচ্ছি। শেষে দেখা গেল সে জায়গা আর পাওয়া যায় না। অনেকদিন আগের কথা, বিনয়দার বিস্মৃতির তলে চলে গেছে। কি আর করা যাবে, ফের ফিরতে হলো। যাই হোক, ফিরে আমরা চুরুলিয়ার এক হোটেল থেকে ভাত আনিয়ে খেয়ে নিলাম। বিপদদার উদ্যোগেই এটা সম্ভব হলো। আমি তখন খুবই বিরক্ত হয়েছি। একটা নিরর্থক মিটিং-এর জন্য আমাদের এরূপ কষ্টে ফেলার কোন অর্থ হয় না। ইতিমধ্যে স্থানীয় এক মানুষকে সামান্য কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করার পর সব রাস্তাটা বিনয়দার মনে পড়ে গেছে। খাওয়ার পর তখন আমরা ভিন্ন পথে গন্তব্যস্থলের দিকে এগোলাম। বেশ রাত হয়েছে, তখন আমরা পৌঁছালাম। অন্য যাঁরা সমবেত হয়েছেন তাঁরা খাওয়া-দাওয়া করে শুয়ে পড়েছেন। মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না করে আমরাও শুয়ে পড়লাম। খুব হয়রান হয়েছিলাম। হিসেব করে দেখে-ছিলাম, কাশিয়াড়া থেকে বেরোনোর পর আমাদের হাঁটা হয়েছে তেতাল্লিশ মাইল। আমাদের রওনা হবার মাত্র কিছুক্ষণ আগে কমরেড সুবোধ চৌধুরী দশ মাইল হেঁটে কাশিয়াড়ায় আমাদের কাছে পৌঁছেছিলেন। সুতরাং তাঁর হাঁটা হয়েছিল ৪৩ মাইল।

পরদিন সকালে উঠে দেখলাম, যা আশঙ্কা করছিলাম তাই। আলো-চনার কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ই ছিল না। ইতিমধ্যে ঘরের মালিক এসে

বললেন, আমাদের তাড়াতাড়ি খেয়ে হেঁটে গিয়ে পাণ্ডবেশ্বরের মালগাড়িটা ধরতে হবে। গাড়ির রহস্যটা এখানে একটু বলে দিই। এখন ওখানে প্যাসেঞ্জার ট্রেন হয়েছে। আমরা যেখানে ছিলাম সেটা কোলিয়ারি এলাকা। কয়লা নেবার জন্য একটা মালগাড়ি আসতো, তার জন্য লাইন ছিল। এই গাড়ীর কয়েকটি ওয়াগনে যাত্রীরা উঠে পাণ্ডবেশ্বরে যেতেন। রেলের কর্মীদের কিছু পয়সা দিলেই হতো। ফেরার পথে আবার তত মাইল হাঁটতে হলো না, এতেই আমরা খুশি। ফেরার পথে তালিতে নেমে ৬ মাইল হেঁটে এক গোপন আশ্রয়স্থলে গেলাম।

রায়না যাওয়ার প্রোগ্রাম ছিল। কয়েকদিনের ধকলে খুবই ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত ছিলাম। কিন্তু এই জায়গায় যাঁরা আশ্রয় দিতেন, তাঁদের সৌজন্যের উপর বেশি চাপ দেওয়া উচিত নয়। মাঝে মাঝে দু-একদিন থাকতাম এবং তাঁরাও অনুগ্রহ করে যথেষ্ট যত্ন নিতেন। তাছাড়া এ সময়ে পূজো এসে পড়ল। হিন্দু কমরেডদের অসুবিধা ছিল না, তাঁরা নিজেদের জায়গায় চলে গেলেন। আমার বর্ধমান শহরে একটি এবং সড্যায় ছাড়া নির্ঝঞ্ঝাটে থাকার জায়গা ছিল না। হাটগোবিন্দপুরে ছিল, কিন্তু পূজোর সময় একটা অসুবিধা সৃষ্টি করতে চাইলাম না। ফলে সাত-পাঁচ ভেবে শেষ পর্যন্ত রায়নায় রওনা হলাম। পরে বুঝেছি, এক অপদার্থ কমরেডকে খাতির করতে গিয়ে—নেতাদের ভুলে আমাদের উপর এই নিগ্রহ নিতে হলো।

ছিলাম শহরের পশ্চিম দিকে জি. টি. রোডের কাছে। রায়না যাওয়া মনস্থ করে এখন জি. টি. রোড ধরে শহরের পূর্বে বামুনের ঘাটে যেতে হবে। জি. টি. রোডে উঠে মাথা-ঝোঁকা অর্থাৎ আরোহীকে দেখতে পাওয়া যায় না এমন রিকশা পেয়ে গেলাম। তাই নিয়ে যতদূর পর্যন্ত রিকশায় যাওয়া যায় গিয়ে বামুনের ঘাটে চলে গেলাম। ঘাটে নৌকো ধরতে সামান্য একটু হাঁটতে হলো। কিন্তু আসল হাঁটা তো নদী পার হবার পর। আমার লক্ষ্য ছিল কুলিয়া গ্রামে কমরেডদের বাড়ি। তাই বামুনে গ্রামের ভিতর দিয়ে কুলিয়ার পথ ধরলাম। বেশি প্রশ্নাদি এড়াবার জন্য ঘুরে ঘুরে গেলাম। যেভাবে গেলাম তাতে মাইল দশেক হবে। কয়েকদিনে এতই পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছি যে, হাঁটতে খুব কষ্ট হচ্ছিল। খুবই ধীর মন্থর গতিতে গেলাম। কুলিয়াতে অবশ্য কমরেডদের ঘরে সমাদরেই গৃহীত হলাম। কমরেড ছিলেন মুসলমান, কাজেই পূজোর সময় কোন

অসুবিধা হলো না। দিন দুয়েক এখানে থাকলাম। এই সময় রায়নায় 'আড়ায়' খুব মাছ পড়ছিল, ছোট ছোট কই মাছ। ১০-১৫ সের থেকে শুরু করে এক মণ, দেড় মণ পর্যন্ত পড়ছিল। সুতরাং ভাতের সঙ্গে 'আড়ার' মাছ—এই বাঁধা তরকারি দাঁড়িয়েছিল। সহজপুর-রসিকখণ্ড যেতে এক জায়গায় দেখলাম প্রচুর মাছ শুকোতে দিয়েছে। শুনলাম মাদানগরের রমারঞ্জন দাঁ মশায় 'শুকৃটি' তৈরি করেছেন, পৌষ মাসে সাঁওতাল কৃষাণদের দেবেন বলে। সহজপুর ঢোকার আগেই প্রবল বৃষ্টিপাত শুরু হয়ে গেল। যাই হোক, হাটতলায় এসে উপস্থিত হলাম।

উপস্থিত হয়েই ডাঃ গঙ্গা হালদারের সঙ্গে দেখা। আগে থেকেই কুলিয়া গ্রাম থেকে বলে পাঠানো ছিল। সুতরাং কমরেডদের সাদর অভ্যর্থনা পেলাম। ডাক্তারের তখন সেই বদ অভ্যাস। প্রচণ্ড নেশাগ্রস্ত। আমাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে তিনি শত চেষ্টা করেও ছাড়তে পারেন নি। শেষে তাঁর সেই অসহায়তাকে মেনে নিয়েছিলাম। দেখা মাত্রই তিনি সরস কৌতুকে বললেন, "কোন্ গগন থেকে নেমে এলে চাঁদ? নাচতে জান?" আমিও সরসভাবে বললাম, "আমি নাচতে জানি না, কিন্তু আপনাকে নাচিয়ে ছাড়বো।" আমার কথাটাই ফলল, অনতিকাল পরেই অসুখে পড়লাম। জোর টাইফয়েড।

আমার থাকার জায়গা পূর্ব হতে নির্ধারিত ছিল। বড় গোয়ালের এক পাশে ছিটেবেড়ায় পার্টিশন্ করা এক ঘর। লাঙ্গল, কোদাল, ছানি কাটার বঁটি প্রভৃতি সেখানে থাকে। এই ঘরেই উঁচু করে খড় বিছিয়ে বেশ আরামে শোয়ার ব্যবস্থা হলো। দিন দুই-তিন পরেই জ্বরে পড়লাম, সেই জ্বরই শেষ পর্যন্ত টাইফয়েডে দাঁড়াল। গোয়াল ঘরটি কমরেড আবদুস সালাম চৌধুরীর। খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা তারই বাড়ি থেকে আসছিল। বাড়ি পাশেই। কমরেড চৌধুরী আর তাঁর ১২-১৪ বছরের ছেলে আমার যত্নের দিকে খুবই খেয়াল রেখেছিলেন, আর অসুখের সময় শুশ্রূষার দিকে খেয়াল রেখেছিলেন। অন্যান্য কমরেডরাও ডিউটি দিচ্ছিলেন। ডাক্তার-বাবুর এমনিই ছিল কোমল হৃদয়, আমার এরকম অসুখে তিনি মানসিকভাবে কাতর হয়ে পড়লেন। এবার আমি মাঝে মাঝে চেতনা হারাচ্ছিলাম। বিশ পঁচিশ দিন এভাবে থাকার পর আর নিজের হাতে রাখতে সাহস করছিলেন না, বর্ধমানের বড় ডাক্তারকে দেখানো প্রয়োজন বলে মনে করছিলেন। সুতরাং বর্ধমানের পার্টি অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ করে আমাকে বর্ধমান পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন।

বর্ধমানে প্রভাত ছিলেন, তখনও তিনি আণ্ডারগ্রাউণ্ডে যাননি। তিনি আমার স্ত্রী কমরেড রাবিয়াকে অবিলম্বে খবর দিলেন। বাড়িতেই রাখা হবে এটা ঠিক করা হয়েছিল। উপরে দোতলায় রাখলে আর সতর্কতায় থাকলে কেউ জানতে পারবে না। আমাকে ডুলি করে বর্ধমান নিয়ে যাবার ব্যবস্থা হলো। ডুলি বামুনের ঘাটে বেরিয়ে জি. টি. রোডে আমার জন্য প্রতীক্ষমান রিক্‌শা পর্যন্ত পৌঁছে দিল। রিক্‌শা নিয়ে এসেছিলেন কমরেড গুলু, একটু ভেক পাল্টে। রিক্‌শা থেকে নেমেই আমি বাড়ির ভিতর ঢুকে পড়লাম, কোন রকমে দোতলায় উঠে বিছানায় গড়িয়ে পড়লাম। সামান্য দু-একটা কথা আমার স্ত্রী কমরেড রাবিয়ার সঙ্গে হলো। আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ডাঃ বিষ্টু রায়কে ডাকতে বললাম। পরে বেহুঁস হয়ে পড়েছিলাম।

ডাঃ বিষ্টু রায় তো ছিলেনই, কনসাল্ট করবার জন্য রোগীর নাম-পরিচয় না দিয়ে সরকারী ডাক্তার 'টিচার অব্ মেডিসিন'-কে প্রভাত কল্ দেন। পাছে পুলিশের দৃষ্টি আকর্ষণ হয় সেইজন্য কমরেড শিবশঙ্কর চৌধুরী আসতে পারছিলেন না (তাঁকে তখনও আণ্ডারগ্রাউণ্ডে যেতে হয়নি)। যাই হোক, পরে যুক্তিযাক্তা করে তাঁরা স্বনামখ্যাত চিকিৎসককে কল দেন। বলা বাহুল্য, তিনি সিদ্ধান্ত করেই ভার নেন এবং কাউকে প্রকাশ করেন নি। রাজনীতির দিক থেকে তিনি বরাবরই বিরুদ্ধে ছিলেন এবং আছেন। তিনি আন্তরিকভাবেই কংগ্রেস-ভক্ত। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে আমার স্ত্রীকে এবং আমাকে খুবই স্নেহ করতেন এবং করেন। তিনি আমাকে দেখতে আসতেন অধিক রাত্রে। সেসব কথা আমি তো কিছু জানতাম না, কারণ আমি তখন অচেতন। প্রতি মুহূর্তেই তখন সঙ্কট। ডাক্তারের পরামর্শ সেইভাবে দরকার। আমার স্ত্রী ও কালো আলোচনা করে আমার নিকট-সম্পর্কিত মামা কুসুমগ্রামের প্রয়াত ডাঃ আবুল হাসনাত সাহেবকে নিয়ে আসার কথা ঠিক করেন। কালো তখনই সাইকেলে কুসুমগ্রাম চলে যান। খবর শুনে হাসনাত মামু একবার বাড়িতেও যান নি, ডিসপেনসারী থেকে বাড়িতে কলকাতা যাচ্ছি বলে একটি চিঠি দিয়ে কালোর সাইকেলের পিছনে চড়ে বর্ধমান চলে আসেন। মাসখানেক তিনি বর্ধমানে ছিলেন। আর্থিক দিক দিয়ে এবং পেশার দিক দিয়ে তাঁর প্রচণ্ড ক্ষতি হলো, কিন্তু আমার প্রাণরক্ষায় অবর্ণনীয় সাহায্য হলো। তিনি তো বাড়িতেই থাকতেন। সদা সর্বদাই আমাকে দেখতেন। ডাঃ বিষ্টু রায়ও প্রায় সেইরূপ। খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদির জন্য তাঁকে বাড়ি আসতেই হতো, তা না হলে তিনিও প্রায় সারা দিনটাই আমার বাড়িতে কাটাতেন।

ডাক্তারদেরই অভিমত ছিল রোগী, বেঁচে গেল নার্সিং-এর জন্য। নার্সিং-এ আমার স্ত্রীর অকাতর পরিশ্রম তো ছিলই, উপরন্তু তাঁর এ কাজে ছিল নিপুণতা। দিনরাত মাস-তিনেক তাঁর যেভাবে কেটেছে তা বলা যায় না। একদিকে নিরন্তর মনোযোগে রোগীর সেবা, অন্যদিকে গোপনীয়তা রাখবার জন্য অতিথি অভ্যাগতদের বাড়ির নীচু তলায় স্বল্প সময়ে সৌজন্য মিটিয়ে বিদেয় করা—এও ছিল বড় সমস্যা। তারপর তাঁর নিজের গণ-সংগঠন 'মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি', তাঁর কর্মীরা আসতেন-যেতেন। নানান কৈফিয়ত দিয়ে তাঁদের এড়িয়ে যেতে হতো। তবুও তাঁদের অ্যাটেণ্ড করতে হতো। তাঁর অকাতর বিরতিহীন পরিশ্রম ও উদ্বেগ তাঁকেও শয্যাশায়ী করেনি এটাই আশ্চর্য। ডাঃ বিষ্ণু রায় আমাকে বরাবর বলতেন, এইরূপ নার্সিং-এর জন্যই আমি বেঁচে গেছি। যাই হোক, আমার জীবন সংকট থেকে উদ্ধার হওয়ার ব্যাপারে তিনজন চিকিৎসকেরও ছিল বিরাট দান। ব্যক্তিগতভাবে আমি ও আমার স্ত্রী চিরকাল তাঁদের কথা স্মরণে রেখেছি ও রাখবো।

টাইফয়েডের জ্বর ছাড়ার পরও পূর্ণ আরোগ্য লাভে ছিল অত্যন্ত ধীর ও মন্থর গতি। উঠে বসতে, দাঁড়াতে, প্রতি ধাপেই অনেকদিন সময় লেগেছিল। এইভাবে অনেকদিন কেটে ঘরে দু-চার পা চলতে আরম্ভ করলাম। পায়ে যখন শক্তি ভালভাবে ফিরে এলো, তখন আর বাড়িতে লুকিয়ে থাকার ঝুঁকি না নিয়ে অন্যত্র নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত হলো। কলকাতায় বন্ধু-বান্ধবরা—শহীদ শহীদুল হাসান, প্রয়াত মহম্মদ ইসমাইল ও তাঁর স্ত্রী সাদরে তাঁদের কলকাতার বাসায় স্থান দিলেন। শহীদ শহীদুল হাসান বর্ধমান থেকে আমাকে মোটরে নিয়ে গেলেন। (শহীদ শহীদুল হাসান আমার একান্ত বন্ধু এবং পার্টির সমর্থক। তাঁর দেশ ছিল শ্রীহট্ট। দেশ ভাগ হওয়ার বেশ কিছু দিন পর তিনি পাকিস্তানে নিজ বাড়ি চলে যান এবং ঢাকায় থাকেন। এখানে যতদিন ছিলেন পার্টির নানান কাজে তিনি সহায়ক হন। ঢাকায় এই মতো কাজ চালাবার জন্য তিনি 'গণশক্তি' নাম দিয়ে একটি পত্রিকাও বার করেন। ১৯৭১ সালে স্বতন্ত্র বাংলার আন্দোলন ও যুদ্ধের সময় তিনি ঢাকায় পাকিস্তান সৈন্যবাহিনী কর্তৃক ধৃত এবং নিহত হন। ইসমাইলের পরিচয় পূর্বে 'কমরেড' পত্রিকার কাহিনী বর্ণনার সময় দিয়েছি। তিনিও পার্টির একান্ত সমর্থক ছিলেন।) শহীদ এবং ইসমাইল কলকাতায় একই বাড়িতে থাকতেন। এঁদের বাড়িতে আমি বেশ যত্নের সঙ্গে ছিলাম, দু-মাসের উপর ছিলাম। আরও কিছুদিন থাকার ইচ্ছা

ছিল ও শরীরের জন্য প্রয়োজনও ছিল, কিন্তু হরেকেষ্ট এসে কাজের চাপের কথা বললেন এবং তাড়াতাড়ি জেলায় ফিরতে অনুরোধ করলেন।

অবিলম্বে বিধি-ব্যবস্থা করে রওনা হলাম। হাটগোবিন্দপুরের কমরেড গোপেশ্বর সিংহ ও বনোয়ারী ঘোষ শক্তিগড় স্টেশন থেকে আমাকে নিয়ে যাবেন তাই ঠিক ছিল। সেদিন একটা মস্ত ভুল করেছিলাম, এক লরীওয়ালার অনুগ্রহে রক্ষা পেলাম—তা না হলে কি হতো জানি না। আমি ভুলে এক স্টেশন আগে পালসিট স্টেশনে নেমে পড়েছিলাম। ভুল হওয়ার যুক্তিসঙ্গত কোন কারণ নেই। পালসিট স্টেশন শক্তিগড়ের মতো তখন উ'চু প্লাটফরম ছিল না। প্লাটফরম ছিল গ্রাউণ্ড লেভেলে। নেমেই আমি হতভম্ব। যাই হোক, খুব দ্রুত প্লাটফরম থেকে বেরিয়ে জি. টি. রোডে এসে গেলাম। শক্তিগড়ের দিকে যাচ্ছিল এক লরী, হাত দেখিয়ে তাকে দাঁড় করালাম। ভুলের কারণে এরূপ ঘটেছে এবং আমি অসুস্থ অতটা হাঁটতে পারবো না বলায় ড্রাইভারের করুণা হলো। শক্তিগড়ে পৌঁছে দিল। শক্তিগড় স্টেশনের ভেতরে ঢুকে কমরেডদের খোঁজ করতে গেলাম। সৌভাগ্যবশতঃ ভিতরে ঢুকেই তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে গেল।

ইতিমধ্যে যা ঘটেছে তা রায়নাতে তেভাগা আন্দোলন। বিনয়দা ও বিপদদা এই আন্দোলন পরিচালনা করেন। পুলিশের গুলিতে দু'জন কমরেড শহীদ হন। আমি তখন রোগোত্তীর্ণ হলেও অসমর্থ হয়ে পড়ে আছি। রায়নায় তেভাগা আন্দেলনের বিবরণ যেমন শুনেছিলাম আর স্মৃতিতে যেমন আছে, পরে লেখার চেষ্টা করব।

হাটগোবিন্দপুরে পৌঁছে কাজের ধারার খেই আবার তুলে নিলাম। প্রথমে হরেকেষ্ট, তারাপদ এবং পরে বিনয়দার সঙ্গে আলোচনা করে কাজ আরম্ভ করে দিলাম। রায়না আমি আর যাইনি। বর্ধমান সদর, মন্তেশ্বর ও পূর্বস্থলী, সময়ে সময়ে কালনা এলাকায় যেতে হয়েছে।

কিন্তু এবার ফিরে আসার পরই পরপর কেবল পুলিশ কর্তৃক আক্রমণ এবং কমরেডদের আহত ও নিহত হবার সংবাদে মর্মাহত হতে হচ্ছিল। তার জবাবে স্বৈরাচারী সরকারের ধিক্কারের জন্য সবরকম প্রয়াস চালিয়ে যেতে হচ্ছিল। এরই মধ্যে পার্টির কর্মরত কমরেডদের কারও কারও সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক থাকার ফলে মানসিক অবস্থা নানান রকমে ভারাক্রান্ত ছিল।

কাটোয়া : অগ্রদ্বীপ ও অন্যত্র কৃষক আন্দোলন

জেলার গ্রামাঞ্চলের সার্বিক অবস্থাই সামন্ততন্ত্রের আধিপত্যের বন্ধনে। এর মধ্যে কোন কোন অঞ্চলে অবস্থা খুব নিম্নস্তরের। কৃষক ও প্রজাদের অবস্থা সবচেয়ে কঠিন হতো সেইসব জায়গায় যেখানে জমিদাররাও সেই গ্রামের অধিবাসী। গ্রামের মধ্যে থাকায় এরা নানান রকমে প্রজাদের শোষণ করতো। এদের লালসা সীমাহীন. চাষীর ঘরের চালের কুমড়োর প্রতিও এদের নজর থাকতো। বলা বাহুল্য, গ্রামবাসীর মধ্য থেকে দু-একজন দালালও এরা সৃষ্টি করতো। জাতি-বিদ্বেষও সৃষ্টি করতো ও কাজে লাগাবার চেষ্টা করতো।

অগ্রদ্বীপ গ্রাম গঙ্গার উপরেই. কিন্তু বর্ধমান জেলার অংশ হলেও জেলার মূল অংশ থেকে নদীর দ্বারা বিচ্ছিন্ন। গ্রাম নদীর পূর্বতীরে অবস্থিত। আশপাশ নদীয়া জেলায়। অতীতে নদীর গতি পরিবর্তনের ফলে এই অবস্থা দাঁড়িয়েছে। নবদ্বীপও এইভাবে মূল নদীয়া জেলা থেকে বিচ্ছিন্ন এবং তার অবস্থান নদীর পশ্চিমতটে। এই অবস্থার দরুণ গঙ্গার পূর্বতীরে অবস্থিত সংস্কৃতির কেন্দ্র কাটোয়া. দাঁইহাট, কালনা. সর্বোপরি নবদ্বীপের সংস্কৃতির ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন। গ্রামে জমিদারদের আধিপত্য সর্বাঙ্গীণ।

কমরেড সুবোধ চৌধুরীর অগ্রদ্বীপে ফিরে আসার কথা আগে বলেছি। তাঁর লেখাপড়া সুদূর চট্টগ্রামে। ছাত্রাবস্থাতেই বিপ্লবী দলে যোগদান. পরে দীর্ঘদিন জেলে। প্রায় দুই দশকের উপর ধরেই কমরেড সুবোধ চৌধুরী গ্রামের বাইরে। তারপর দেশহিতৈষণার বড় সুনাম নিয়ে তিনি দেশে ফিরেছেন। স্বভাবতই গ্রামের সাধারণ অভাব-অভিযোগ নিয়ে গ্রামবাসী তাঁর সঙ্গে আলোচনা করতে উদগ্রীব। তাঁরও কামনা গ্রামের এইসব সমস্যার সমাধানের কিছু পথ সূচিত করা। এই উপলক্ষেই যে অভাবটা সবচেয়ে বড় হয়ে তাঁর নজরে পড়ে, গ্রামে পাঠশালার অভাব।

আজকের কিশোর ও তরুণকর্মীরা সাক্ষরতা প্রচারে লিপ্ত হয়েছেন। কিন্তু তখনকার কালে সামন্ত আধিপত্য কত কঠোর ছিল কমরেড সুবোধ

চৌধুরীর প্রারম্ভিক কাজ, সামান্য পাঠশালা গঠনের প্রয়াসের কাহিনী স্মরণ করলে এখনকার কর্মীরা সহজেই বুঝতে পারবেন।

অগ্রদ্বীপ গ্রামে সংখ্যায় গোয়ালারা ছিলেন বেশি, চাষীরা সংখ্যায় অপেক্ষাকৃত কম। জমিদারদের একটা কৌশল ছিল, উঠবন্দী শর্তে উচ্ছেদের জন্য ফসল থাকা অবস্থাতেই চাষীদের খেতের ফসল গোয়ালাদের গরু নামিয়ে খাইয়ে দেওয়া। প্রতিবাদ করার উপায় ছিল না চাষীদের কাছারী বাড়িতে ধরে নিয়ে যেয়ে তারা মারপিট ও নানান রকমে নিগ্রহ করতো। মেয়েদের উপরেও অত্যাচার করতো। চাষীরা এইসব বিষয় কমরেড সুবোধ চৌধুরীকে অবহিত করতেন। চট্টগ্রামে তাঁর বীরত্বের কাহিনী গ্রামে প্রচারিত ছিল. সুতরাং চাষীরা আশা করতেন স্বয়ং ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে যিনি লড়াই করেছেন. তাঁকে বললে কিছু প্রতিকারের ব্যবস্থা হবে। সুবোধ চৌধুরী দেখলেন কিছু একটা ব্যবস্থা করতে হয়। ছোট-বড় নানান অভিযোগ তাঁর সামনে আসে. তিনি একটা অভিযোগের ব্যবস্থা করতে করতে আরও অভিযোগ এসে জমা হয়। ফলে একটা থেকে আর একটা, এ রকমভাবে জমিদারদের নানান অনাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে তাঁকে জড়িয়ে পড়তে হয়। সুতরাং পূর্ব সিদ্ধান্ত মতো আর তাঁর আসানসোল যাওয়া হলো না। স্থানীয় সমস্যাতেই আটকে যেতে হলো।

প্রথমে তিনি জমিদারদের প্ররোচনায় গোয়ালাদের এই ফসল খাওয়ানোর বিরুদ্ধে জন-জমায়েত করে জমিদারদের তার সম্মুখীন করার পরিকল্পনা করেন। চাষীরা মিছিল সংগঠন করে কাছারী বাড়িতে গিয়ে ফসল খাওয়ানোর বিরুদ্ধে জমিদারদের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, এই অনুরোধ করেন। জমিদাররা উদ্ধতভাবে এই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে।

এইভাবে চাষীরা বিক্ষোভে সংহত হতে থাকেন, অন্যদিকে জমিদার-রাও নিরন্তর আঘাত করার জন্য প্রস্তুত হতে থাকে। জমিদারের লোকেরা এই সময় চাষীদের লাঠি নিয়ে আক্রমণ করে। চাষীদের মধ্যে নেতৃ-স্থানীয় মহাদেব বিশ্বাসকে মাথায় লাঠির আঘাতে আহত করে. মাথা ফাটিয়ে দেয়। এ রকম গুরুতর অবস্থায় সহকর্মীরা তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যান। এই সময় এক প্রগতিশীল সাহিত্যানুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হয়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কাটোয়ায় আসেন। এইসব ব্যাপার জ্ঞাত হয়ে তিনি স্বাভাবিকভাবেই মনে আঘাত পান এবং হাসপাতালে আহত মহাদেবকে দেখতে যান। মহাদেব যখন জমিদারদের অত্যাচারের কথা বলেন, তখন

স্বনামখ্যাত সাহিত্যিক রুষ্ট হন ও সহানুভূতি প্রকাশ করে বলেন, "এতদিন ওরা মেরেছে, এবার আমাদের মার দেওয়ার পালা এসেছে।"

এরপর একটা ঘটনা, পূজোর সময় জমিদারদের দ্বারা আমন্ত্রিত হয়ে কংগ্রেসের মন্ত্রী কমলকৃষ্ণ রায় অগ্রদ্বীপে আসেন। বিসর্জনের সময় জমিদারের লেঠেলরা পূর্ব হ'তে প্রস্তুত ছিল এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী তারা সমবেত চাষীদের উপর লাঠি নিয়ে আক্রমণ করে।

এইভাবে চলতে চলতে ১৯৪৮ সালে পার্টি বে-আইনী হয়। এই বে-আইনী অবস্থার সময় কমরেড হরেকৃষ্ণ কোঙার (যিনি তখন আত্ম-গোপন অবস্থায়) আহূত এক জনসভায় ভাষণ দেন এবং চাষীদের সংহতি বৃদ্ধি করার আহ্বান জানান। কমিউনিস্ট পার্টি গোয়ালা এবং চাষীদের মধ্যে জমিদার কর্তৃক বিরোধিতা সৃষ্টি করার কৌশলকে ব্যর্থ করে গোয়ালা এবং চাষীদের মধ্যে মৈত্রী স্থাপনের চেষ্টা করতে হবে বলে সিদ্ধান্ত নেয়। পার্টি গোড়া থেকেই এই প্রয়াসে লিপ্ত ছিল। এই সূত্রে গোয়ালাদের গোচারণের জন্য জমিদারদের কাছে জমি দাবির আন্দোলন শুরু হয়। উল্লেখযোগ্য যে, এই সময় গ্রামে জমিদারদের বাড়িতে পুলিশের ক্যাম্প বসে। পুলিশ কমরেড সৌরী ঘটক ও সুশীল চক্রবর্তীকে রাস্তা থেকে গ্রেফতার করে। পরে কমরেড সুশীল চক্রবর্তী দমদম জেলে রাজবন্দী অবস্থায় মারা যান।

পার্টির এই বে-আইনী অবস্থাতেই ১৯৪৯ সালে পূজোর সময় একদিন কমরেড সুবোধ চৌধুরী, কমরেড শান্তব্রত, কমরেড রবি রায় এক সভার আহ্বান করেন। কমরেড সুবোধ চৌধুরী ও কমরেড শান্তব্রত (এ'দের নামে ওয়ারেন্ট ছিল) বক্তৃতা দিতে যাবার সময় পুলিশের সঙ্গে চাষীদের সংঘর্ষ বাধে। চাষীরা পুলিশের দুটি রাইফেল ছিনিয়ে নেয়। এই ঘটনার পর চাষীদের উপর পুলিশের অবর্ণনীয় নিপীড়ন নেমে আসে। মণি কর্মকার ও আরও কয়েকজন চাষী পুলিশের আক্রমণে এমনই আহত হন যে তার জেরে দ্রুত শারীরিক অবস্থার অধোগতিতে দু-চার বছর পর মারা যান। প্রসঙ্গতঃ এখানে বলে রাখা প্রয়োজন, মেমারীর সুপরিচিত কমিউ-নিস্ট কর্মী ও নেতা কমরেড সুনীল রায় স্থানীয় কমরেডদের সাহায্য করার জন্য পার্টি কর্তৃক অগ্রদ্বীপে প্রেরিত হন। সেখানে তিনি রবি রায় নাম গ্রহণ করেন ও সেইভাবে পরিচিত হন।

উল্লেখযোগ্য যে, অগ্রদ্বীপ গ্রামে আত্মগোপন অবস্থায় কমরেড হরেকৃষ্ণ কোঙার প্রথম কাটোয়া মহকুমা কৃষক সম্মেলনে যে জনসভায় ভাষণ

দেন সেটি সংগঠিত করার জন্য বর্ধমান-কাটোয়া, আহমদপুর-কাটোয়া রেলের কয়েকজন শ্রমিক কমরেড, যাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য জগদীশ, মৃত্যুঞ্জয় প্রমুখ, ছুটি নিয়ে ঐ অঞ্চলে গ্রামে গ্রামে গিয়ে সভা ও স্কোয়াডের মধ্য দিয়ে প্রচার করেন। এই সময়ই রেলে পে-কমিশনের দাবিতে তিন দিনের ধর্মঘট সফল হয়েছিল, যার প্রভাব ঐ এলাকার চাষীদের মধ্যে পড়ে :

ঐ সময় অগ্রদ্বীপে কৃষক আন্দোলনে, সংগ্রামে অংশ নিয়েছিলেন গোপীনাথ বিশ্বাস, পটল বিশ্বাস, গৌর বিশ্বাস, লোহারাম শীল, মহাদেব বিশ্বাস, কালী পাল, কালী কাপুর, বৃন্দাবন ব্যানার্জী, গয়ারাম রায় প্রমুখ।

অগ্রদ্বীপের আন্দোলনকে দমন করার জন্য জমিদার ও সরকার এক সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল, এবং মনে রাখতে হবে, নিপীড়ন ও অত্যাচার গোড়া থেকেই কংগ্রেসের সমর্থন পায়। স্বাধীনতার পর কংগ্রেস তখন সরকারে। সেই সরকার সর্বপ্রকারে পুলিশ নিয়ে জমিদারের পক্ষে নেমে পড়ল। পুলিশের গুলি চালনার সময় কমরেড সুনীল পাল পুলিশের বেয়নেটের আঘাতে নিহত হন। লাঠি চালানো ক্রমাগত লেগেই ছিল। জমিদারের বিরুদ্ধে কিছু জন-জমায়েত হলেই সেই জমায়েতকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য লাঠি, টিয়ারগ্যাস নিয়ে পুলিশ নেমে পড়তো। ইচ্ছামতো বা প্রয়োজনমতো গুলি চালানোর জন্য বন্দুকবাহী রিজার্ভ ফোর্সও থাকতো। পুলিশ ব্যাপকভাবে গ্রেফতার করতে আরম্ভ করে এবং জেলে ও হাজত-বাসে বন্দীদের আট-দশ মাস কাটাতে হয়।

ইতিমধ্যে আমরাও জেলার অন্যত্র গ্রেফতার হই। ফলে এই সময় বর্ধমান জেলে কাটোয়ার অগ্রদ্বীপের চার চাষী, আসানসোলের কোলিয়ারী শ্রমিক, বর্ধমান শহরের ছাত্র ফেডারেশন, রিকশা ইউনিয়ন এবং পার্টির নেতৃস্থানীয় কর্মী—সব মিলে এক বড় সংখ্যায় রাজনৈতিক বন্দী ছিলেন।

এইভাবে ইনভেস্টিগেশনের নামে মাসের পর মাস আমাদের বন্দী রাখছে অথচ কেসও আরম্ভ করছে না। সবই তো মিথ্যা অভিযোগ, ফলে তারা জানতো কোর্টে মামলা নিয়ে গেলেই সবাই খালাস হবে। আমরা তখন এক একটা কেসের আসামীদের নামের তালিকা করে, প্রত্যেক কেসের আসামীদের গণ-স্বাক্ষর করিয়ে হাইকোর্টের চিফ জাস্টিসকে আবেদন করলাম : এইভাবে কেস ঝুলিয়ে রাখার অধিকার সরকারের নেই। হয় তারা কেস আরম্ভ করুক, নয় ছেড়ে দিক। এর পরেই দেখলাম আমাদের আবেদনের ফল হলো। ওদের তাড়াতাড়ি কেস শুরু করতে হলো এবং পর পর সব কমরেডরাই মুক্ত হয়ে গেলেন।

আলোচ্য সময়ে কাটোয়া মহকুমায় আরও কয়েকটি অঞ্চলে পার্টি ও কৃষক সমিতির আন্দোলন সংগ্রাম লক্ষণীয় শক্তি অর্জন করে। মনে পড়ছে প্রয়াত কমরেড ললিত হাজরা ও তাঁর গ্রাম কুরচির কথা। এই এলাকা কাটোয়া থানার মধ্যেই। মহকুমার আর দুটি থানা মঙ্গলকোট ও কেতুগ্রাম। কমরেড ললিত হাজরা কলকাতায় কলেজে পড়েন। এরপর সাংবাদিকতায় তাঁর প্রবল আকর্ষণ থাকার ফলে সাংবাদিকতা পেশায় নিযুক্ত হন। পড়াশোনা ও পেশায় নিযুক্ত থাকার ফলে তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সংস্পর্শে আসেন, পার্টির প্রতি শ্রদ্ধাবান হন। মানুষের সঙ্গে সহজ সরল ও সরস ব্যবহারের কারণে তাঁর গ্রাম ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় তাঁর জনপ্রিয়তা ছিল। অন্যদিকে কিন্তু তাঁদের পরিবারের অতীতের ইতিহাসের কারণে উক্ত পরিবার সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের কিছু বিরূপতাও ছিল। তাঁদের পরিবারের অতীতে তেজরতি ও মহাজনী কারবার ছিল। কিন্তু ললিত হাজরা ও তাঁর ভাই শান্তি হাজরার (তিনি পরে স্টোভ দুর্ঘটনায় মারা যান) প্রীতিপূর্ণ আচরণে তাঁদের বিরুদ্ধে বিরূপতা আর থাকেনি। ঐ সময় কমরেড সৌরী ঘটককে ঐ স্থানে সংগঠনের কাজ করার জন্য পাঠানো হয়। এ'দের সমবেত উদ্যোগে গীধগ্রাম, কবুই, কুরচিতে কৃষক সমিতি গড়ে ওঠে।

পরে ১৯৫৬ সালে কুরচিতে জেলা কৃষক সমিতির সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের প্রকাশ্য সমাবেশে প্রধান বক্তা ছিলেন কমরেড বঙ্কিম মুখার্জী। স্বনামখ্যাত তুলসী লাহিড়ী ও অন্যান্যদের উদ্যোগে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। গণনাট্যেরও উদ্যোগ ছিল।

পূর্ব মঙ্গলকোটে কৃষক আন্দোলনের মাধ্যমে অনঙ্গ রুদ্র ছাড়া আরও কিছু কর্মী এগিয়ে এলেন। এই অগ্রগামীদের তালিকায় আছেন শ্রীখণ্ডের শম্ভু চট্টোপাধ্যায়, যবগ্রাম-নিগনের রামভক্ত মাঝি, গঙ্গাধর সর নিখিল সর, বৈদ্যপাড়ার কমরেড ইয়াসিন, কমরেড মোস্তাদির, শিমুলিয়ার শামসুল হুদা, বাজার বনকাপাসী অঞ্চলের প্রভাত মুখার্জী, পালিশগ্রামের শান্তি রায় প্রমুখ। সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে স্থানীয় নেতৃত্ব গড়ে উঠেছিল। নেতৃত্বের মধ্যে ছিলেন কমরেড অনঙ্গ রুদ্র, কমরেড শম্ভু চট্টোপাধ্যায়, কমরেড মোস্তাদির প্রমুখ।

কেতুগ্রামে কাটারীডিহি গ্রামের ভোলা হাজরা কীর্ণাহার স্টেশনে চায়ের স্টল করতেন। রেলের ইউনিয়নের সংস্পর্শে এসে তিনি কমিউনিস্ট

মনোভাবাপন্ন হন। পালিটা গ্রামে তাঁর শ্বশুরবাড়ী। সেখানেই কিছু কাজকর্ম আরম্ভ করেন। এটাও মনে রাখতে হবে, কাটোয়া শহরে কমিউনিস্ট পার্টির প্রভাব কেতুগ্রাম থানায় অল্প-বিস্তর ব্যাপ্ত হয়। এই সূত্রে পালিটা ইউ-নিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট আনওয়ারুল আজিম পার্টির সংস্পর্শে আসেন। কমরেড ভোলা হাজরা, কমরেড আনওয়ারুল আজিম প্রমুখ উল্লিখিত অঞ্চলে কিছু প্রভাবশালী সংগঠন গড়ে তোলেন। এই সংগঠনের উদ্যোগে পালিটায় কাটোয়া মহকুমা কৃষক সম্মেলন আহূত হয়। সম্মেলনে আমি সভাপতি হই। মহকুমা কৃষক সমিতির সম্পাদক কমরেড সৌরী ঘটক সম্মেলন অনুষ্ঠানে সক্রিয় ভূমিকা নেন।

পরে ১৯৬২ সালে বিধানসভা নির্বাচনে কেতুগ্রামে পার্টি অপেক্ষা-কৃত দুর্বল থাকা সত্ত্বেও কংগ্রেস প্রার্থীকে পরাজিত করে, কমিউনিস্ট পার্টির কমরেড মোহন ঠাকুর জয়ী হন। পরবর্তীকালে কেতুগ্রাম নির্বাচনী কেন্দ্র অপশিলী কেন্দ্র হিসেবে নির্ধারিত হয়। সি. পি. আই. (এম) প্রার্থী নির্বাচিত হতে থাকেন।

কেতুগ্রামের কান্দরাতে একবার কৃষকসভার জেলা সম্মেলনও অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি ছিলেন কমরেড হরেকৃষ্ণ কোঙার। আমিও উপস্থিত ছিলাম।

অতি বামপন্থী ঝোঁক ও আমাদের আন্দোলন

পার্টির অতি বামপন্থী ঝোঁকের কথা বারংবার উল্লেখ করেছি। আমরা প্রথম দিকে অতি বামপন্থার বিরোধিতা করেছিলাম। কিন্তু পি. সি-র নেতৃত্বের কাছ থেকে ক্রমোত্তর কড়া সুরে অতি বামপন্থী রণনীতি ও রণ-কৌশলে প্রতিফলিত নির্দেশ আসতে থাকে। এক ইণ্টারেস্টিং ঘটনা ঘটল, যার কথা আগেই বলেছি। বোম্বাই-এ নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস অধিবেশন আহূত হয়েছিল। পি. সি. থেকে নির্দেশ এলো আমাকে এবং কয়েকজন মজুর কমরেডদের প্রতিনিধি করে সম্মেলনে পাঠাতে। চমৎকৃতিটা হলো এখানেই। আমি বরাবর করে এসেছি কৃষক সমিতির কাজ। সংগঠন-গতভাবে উক্ত সমিতিরই কর্মী ছিলাম। অবশ্য কয়েকটি শ্রমিক সংগঠনের সঙ্গে বরাবর যুক্ত ছিলাম। বর্ধমান শহরের রিক্সা শ্রমিক ইউনিয়ন, মিউ-নিসিপ্যালিটির শ্রমিক ইউনিয়ন ও কর্মচারী সমিতি এবং জেলার প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি। শেষোক্তকে ঠিক মজুর ইউনিয়ন বলে গ্রহণ করা হতো না। পৌরসভার কর্মচারী সমিতিও সেইরূপ। বাকি দুটি অবশ্য মজুর ইউনিয়ন। কিন্তু আসানসোল মহকুমাতেই জেলার পনের আনা শ্রমিক আন্দোলন। তার তালিকার পাশে বর্ধমান শহরের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস গণ্য করার মতো কিছু বলে বিবেচিত হতো না। আর জেলা কমিটির মধ্যেও ট্রেড ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত সদস্য ছিলেন বিনয়দা ও কমরেড বিজয় পাল। সেক্ষেত্রে হঠাৎ আমাকে প্রতিনিধি করার অর্থ কী ?

পি. সি.-র নেতৃত্বের কাছ থেকে নির্দেশ এলো, প্রাদেশিক কমিটির একজন নেতা জেলায় আসবেন ও জেলা কমিটির সভায় যোগদান করবেন। আলোচনা হবে এবং তখন যা পি. সি-র চলছে তার সঙ্গে খাপ খাইয়ে জেলায় কাজ পরিচালনা করা যায় এমন ধরনের জেলা কমিটি গঠন করতে হবে। জেলা কমিটির সভা সড্যায় আহূত হলো। প্রাদেশিক কমিটির সদস্য কমরেড গোপেন চক্রবর্তী এলেন। জেলার কাজকর্মে তখনকার অতি বামপন্থী নজরে চমকদার কিছু প্রকট হচ্ছে না কেন, তা

জেলা কমিটির উক্ত সভায় আলোচনা হয়। প্রাদেশিক কমিটির সদস্যের নির্দেশ হলো, জেলা কমিটির তখনকার নেতাদের পদচ্যুত করতে হবে। জমিদার ও ধনিকশ্রেণীর সন্তান বলে আমি ও হরেকেষ্ট পদচ্যুত হলাম। ছাত্র আন্দোলনের জন্য বলা হল, লেখাপড়া ও পরীক্ষায় তৈরি হওয়া—এসব বুর্জোয়া বিলাসিতার ঝোঁক ছাড়তে হবে। বিপ্লবের কাজে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। অগ্রদ্বীপে কৃষকের পুলিশের সঙ্গে বীরত্বপূর্ণ মোকাবিলা হয়েছিল, সেইজন্য সুবোধ চৌধুরী রেহাই পেলেন। তাঁকে জেলা কমিটির সম্পাদক করা হলো। নতুন জেলা কমিটি শ্রমিক ও ক্ষেতমজুরদের নিয়ে গঠিত হলো। সভা-অন্তে প্রাদেশিক কমিটির সদস্য চলে গেলেন। নতুন কমিটির মধ্যে অন্যতম সদস্য হলেন বর্ধমানের রিক্সা-শ্রমিক নেতা কমরেড সেখ গুলু। ইনি সত্যই যোগ্য কর্মী ছিলেন। বুদ্ধি খুব তীক্ষ্ণ ছিল। নিরক্ষর হওয়া সত্ত্বেও নেতৃত্বের যোগ্য অংশই গ্রহণ করতেন। পঞ্চাশ দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত তিনি সক্রিয় কর্মী ছিলেন। তারপর রুজির প্রয়োজনে মোটর চালকের কাজ করেন। তবে পার্টির দিকেই আছেন। কমরেড সুবোধ চৌধুরী বললেন, আমাদের কমিটি যেমন ছিল তেমনিই রাখতে হবে তা না হলে কাজ চলবে না! যাঁদের নিয়ে আনুষ্ঠানিক ভাবে জেলা কমিটি গঠিত হলো, তাঁরা তো পদাধিকারে থাকবেনই, আমি হরেকেষ্ট প্রমুখ যাঁরা পদচ্যুত হয়েছিলাম, তাঁরাও প্রীতি সভায় আমন্ত্রিত হবো।

আসানসোল মহকুমায় আলাদা জেলা কমিটি গঠিত হলো। কমরেড বিনয় চৌধুরীকে বর্ধমান জেলা কমিটি থেকে নবগঠিত আসানসোল জেলা কমিটিতে বদলি করা হলো।

জেলা কমিটি পুনর্গঠনের পর প্রাদেশিক কমিটি যা নির্দেশ দিচ্ছিলেন তাই মেনে নিতে হচ্ছিল।

নির্দেশের নমুনা হিসাবে ক্ষেতমজুরদের দাবির কথা বলা যায়। ক্ষেতমজুরদের দৈনিক মজুরী ঠিক করা হয়েছিল ধানের দামে আধ মণ ধান অর্থাৎ মাসে ১৫ মণ। ক্ষেতমজুররা নিজেরাই একে খামখেয়ালী রকমের বেশি মনে করছিল। আমার মনে আছে হাটগোবিন্দপুরে ক্ষেতমজুরের সভা করছিলাম, তার একদিন কি দু'দিন আগে পি. সি থেকে ক্ষেত-মজুরের মজুরীর নির্দেশটি পেয়েছিলাম। আমি জানতাম তখনকার পরি-প্রেক্ষিতে ক্ষেতমজুররাই এটা বাস্তব ভাববে না, অথচ প্রাদেশিক কমিটির নির্দেশ মানতে আমি বাধ্য। সেইজন্য সভায় ঐ দাবি আমি তুললাম। কমরেড গণেশ দাস এবং অন্য কয়েকজন ক্ষেতমজুর আমার পাঞ্জাবীর

পেছন ধরে টানছেন, বলছেন, "এটা সম্ভব হবে না।" শেষে সভায় উক্ত দাবির সমর্থনে সংগ্রামের পক্ষে উৎসাহ সৃষ্টি করতে পারা গেল না। পরে ক্ষেতমজুরদের মধ্যে পার্টি সদস্যদের নিয়ে আলোচনা হলো। তাঁরা বললেন, মজুরী বৃদ্ধির একটা বাস্তব লক্ষ্য সামনে রাখলে তবুও খানিকটা আন্দোলন বাড়তো। জমির ফলন তখন কম ছিল এবং ধানের দামও কম ছিল। তার পরিপ্রেক্ষিতেই মজুরদের এই বক্তব্য। যাই হোক, তবু সেই অবস্থাতেই যৎকিঞ্চিৎ বৃদ্ধি করতে পারা গিয়েছিল। তা ঘোষিত লক্ষ্যের অনেক কম হলেও ক্ষেতমজুরদের মধ্যে কিছু চাঞ্চল্য এনেছিল। কিন্তু ঐ চাঞ্চল্য সীমিত রয়ে গেল, বাড়লো না। গরীব ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত কৃষক অসম্ভব দাবিতে কিছুটা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেন। সড্যাতেও এই বিক্ষোভ মধ্যবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্তদের মধ্যেও দেখা দিল। এ'দের মধ্যে অনেককেই পার্টি থেকে বহিষ্কার করা হলো। উদ্যোগটা করে হরেকেষ্ট, তৎসত্ত্বেও তাঁরা পার্টির সঙ্গে থাকলেন এবং নগণ্য সংখ্যাকে বাদ দিয়ে ধরলে এখনও আছেন। এতেই বোঝা যায় পার্টির তখনকার বামপন্থী নেতৃত্বের নির্দেশিত পন্থা সঙ্কীর্ণতার কোন পর্যায়ে গিয়েছিল। তবে বেশ কিছু ক্ষতি স্বীকার করতে হলো। অনেক যোগ্য কর্মী গ্রেপ্তার হলেন, তাঁদের বিনা বিচারে বন্দী করে রাখা হলো।

অতি বামপন্থার এক অদ্ভুত বিকার হলো আত্মনিধনের জন্য কমরেড-দের প্রেরণ। অদ্ভুত অদ্ভুত প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি করে ভবানী সেন, সোমনাথ লাহিড়ী প্রমুখ কমরেডদের বাধ্য করেছিলেন। জেলে শত্রুর সঙ্গে সংগ্রাম করতে হবে। জেলে প্রতিবাদ করতে গেলে একমাত্র উপায় হচ্ছে হাঙ্গার স্ট্রাইক, এছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। কিন্তু এই অতি বামপন্থীদের লেখায় এসব নিরামিষ দাঁড়িয়ে গেল। এখন নির্দেশ হলো, জেলে আক্রমণাত্মক সশস্ত্র পুলিশের সামনে এগিয়ে যেতে হবে, পিছিয়ে ঘর ঢোকা চলবে না। পূর্ব পাকিস্তান অর্থাৎ পূর্ব বাংলায় রাজশাহী জেলে গুলি চলল। কমরেড সুধীন ধর ও আরও ছ'জন কমরেড গুলিতে মারা গেলেন। গুরুতর আহতদের মধ্যে ছিলেন বর্ধমান জেলার কমরেড আমার ভাই আবুল মনসুর হবিবুল্লাহ্। নিতান্ত ঘটনাচক্রে তিনি বেঁচে গেলেন। তাঁকে অনেকদিন হাসপাতালে কাটাতে হয়।

এখানে দমদম জেলে উক্ত অতি বামপন্থীদের হুকুমে ঐরূপভাবে কমরেডদের আক্রমণরত সশস্ত্র পুলিশের সম্মুখীন হতে হয়। পুলিশের গুলিতে আমাদের বর্ধমান জেলারই তিনজন কমরেড শহীদ হন। জেলার

উদীয়মান নেতা ও জেলা কমিটির সদস্য কমরেড প্রভাত কুণ্ডু শহীদ হন ও তাঁর সঙ্গে শহীদ হন আসানসোলের কমরেড সুমথ ও কমরেড মুকুল।

সংবাদপত্র মাধ্যমে সংবাদ প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা নিজ নিজ 'ডেন' অর্থাৎ গোপন থাকার জায়গায় এই বেদনাদায়ক খবর পেয়ে গেলাম। প্রভাতের হত্যার খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শহীদ শিবশংকরকে কলকাতা পাঠানো হলো। ক্ষোভ ও বেদনায় মুষড়ে না গিয়ে কীভাবে এর সঠিক প্রত্যাঘাত দেব তাই ভাবতে লাগলাম। আবার পথে নামতে হবে, জোর গলায় এর প্রতিবাদ করতে হবে, হরতাল-ধর্মঘট যা কিছু করতে হয় করতে হবে। বলা বাহুল্য, এর প্রধান দায়িত্ব পড়বে ছাত্র ও রিকশা ওয়ার্কার্সদের মধ্যে।

আমি অবিলম্বে গা-ঢাকা পথে বাড়ি ঢুকে আমার ছোটভাই আমানুল্লাহ্ ও ভাগ্নের সাথে সাক্ষাৎ করলাম। রিকশা ওয়ার্কার্সদের সাথে মীট করা হয়েছিল। আমার সঙ্গে কমরেড সুশীলও ছিলেন। ছাত্রবৃন্দ সমস্ত শিক্ষায়তনে ধর্মঘট সম্ভব করলেন। বেশ বড় ডেমনস্ট্রেশনও করেছিলেন। আমানুল্লাহ্ তখন ভাল বক্তৃতা দিতে পারতেন। স্কোয়াডে স্কোয়াডে দমদমের ঘটনার বর্ণনা করে স্বৈরাচারী কংগ্রেস সরকারের নিপীড়নের বিরুদ্ধে সোচ্চার হবার আহ্বান—এই ছিল বক্তব্যের সারমর্ম। এইসব সভায় কমরেড রাবিয়া প্রমুখ পার্টির মহিলা কর্মীরাও উপস্থিত থাকতেন। প্রচারে ফলও হয়েছিল।

এসবের ফলে পুলিশ আমানুল্লাহ্, কমরেড আবেদ আলি (পরে মন্তেশ্বরে নেতৃস্থানীয় কমরেড, এখন প্রয়াত) প্রমুখ আরও কয়েকজন ছাত্র গ্রেপ্তার হলেন ও বিনা বিচারে বন্দী হলেন। এর পরেও এক বড় ছাত্র ডেমনস্ট্রেশন করা হয়েছিল। পার্টির নির্দেশ ছিল পুলিশ আক্রমণ করতে গেলে না পিছিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। অতি বামপন্থী নেতাদের এই নির্দেশ পালন করতে হবে। নির্দেশ পালনে বাস্তবে দাঁড়ালো, জনতাকে পুলিশের সামনে ছুঁড়ে দেওয়া এবং নিজেরা—ভবানী সেন, সোমনাথ লাহিড়ীর মতো—'ডেনের' নিরাপত্তায় থাকা। এরকম ভাবতেও বিবেক দংশন হচ্ছিল। সুতরাং আমি ও কমরেড সুশীল মিছিলের সঙ্গে মিছিলের মধ্যে থাকলাম। উদ্দেশ্য, যা হয় সকলে এক সঙ্গেই তার সম্মুখীন হব। কিন্তু সেদিন পুলিশ মারমুখী হয়নি এবং মিছিল কোথাও আটকায়নি।

১লা আগস্ট, ১৯৪৯ সাল। সন্ধ্যায় ক্ষেতমজুর দিবসের সভায় হরেকেষ্ট ও আমি উভয়েই উপস্থিত ছিলাম এবং বক্তৃতা দিলাম। শহীদ প্রভাত, সুমথ, মুকুলের হত্যায় ক্ষোভ প্রকাশ করা হলো ও প্রতিবাদ করা

হলো। কংগ্রেসী স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে মানুষের বিক্ষোভ আরও সোচ্চার হলো এবং স্বৈরাচারের প্রতিরোধে মানুষের সংকল্প দৃঢ়তর হলো। লক্ষ্য করার বিষয় অতি বামপন্থী সিদ্ধান্তে সভ্যার পুরাতন পার্টি মেম্বারস্‌দের পার্টি থেকে বহিষ্কার করে দেওয়া সত্ত্বেও এই সভায় উপস্থিত থেকে বিক্ষোভ ও প্রতিবাদে তাঁরা অংশগ্রহণ করেছিলেন।

গ্রামে ও শহরে আমাদের আন্দোলন সজোরে চলতে লাগলো।

শহর ও পার্শ্ববর্তী এলাকার ভার মোটামুটি আমার উপর ছিল। এ ছাড়াও ছিলেন টাউন কমিটির সেক্রেটারি কমরেড সুশীল ভট্টাচার্য। প্রভাতের মৃত্যুর আঘাতে আন্দোলন চূড়ান্ত শীর্ষে উঠল। তবে বেশ কিছু ক্ষতি স্বীকার করতে হলো। অনেক যোগ্য কর্মী গ্রেপ্তার হলেন, তাঁদের বিনা বিচারে বন্দী করে রাখা হলো।

এরপর ভবানী সেন, সোমনাথ লাহিড়ী পরিচালিত প্রাদেশিক কমিটির বামপন্থী ঝোঁক আরও বাড়ছিল। স্মরণ রাখতে হবে, এই সময়ের কিছু আগে প্রাদেশিক কমিটির একজন সদস্য একটি নির্দেশপত্রে লিখে-ছিলেন, 'হিট এ্যাণ্ড রান'। সোমনাথ লাহিড়ী তার তীব্র সমালোচনা করে লিখলেন, 'হিট, হিট এ্যাণ্ড হিট।'

এর ফলে পার্টিকে একটি সুচিন্তিত পথে পরিচালনা করা কঠিন হয়ে দাঁড়াল। ছাত্রদের মধ্যে একদিকে শৃঙ্খলার অভাব এবং অন্যদিকে লাগাম ছাড়া বামপন্থার উত্তেজনা। বেশ কয়েকজন ছাত্র-কর্মীকে গা-ঢাকা দিতে হলো। এমন অবস্থা হলো যে, সাধারণ ছাত্রের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা, প্রকাশ্যে ঘোরাঘুরি কর্মীর অভাবে কঠিন হয়ে দাঁড়ালো। এদিকে কলকাতায় মহিলাদের সভায় যোগদান করতে গিয়ে কমরেড রাবিয়া (আমার স্ত্রী) এবং কমরেড মকসুদা (আমার ভাই মনসুরের স্ত্রী) গ্রেপ্তার হলেন। সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে সভা চলা কালে পুলিশ টিয়ার গ্যাস দিয়ে আক্রমণ করে। অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গে তাঁরা কোন রকমে একটা দোকানে আশ্রয় নেন। সবশেষে প্রবেশ করেন কমরেড রাবিয়া। এ'রা প্রবেশ করতে না করতেই পুলিশ গুলি চালনা করে, অর্থাৎ প্রবেশ করতে কয়েক মুহূর্ত বিলম্ব ঘটলে দু-একজনকে নিশ্চয়ই প্রাণ দিতে হতো। এ'রা গ্রেপ্তার হন। লালবাজারে নীত হন। পরে হাজত বন্দী। শেষে মামলায় কিন্তু খালাস হয়ে যান। বর্ধমানে এসে এ'দের গা-ঢাকা দিয়ে থাকতে হয়। শেষে গা-ঢাকা দেবার জন্য গ্রামে আত্মীয়-স্বজনের বাড়ি চলে যান।

আমি দু-একদিনের ছুটি নিয়ে আমার স্ত্রী এবং বাড়ির অন্যান্যদের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। ফিরে এসেই কমরেড হরেকেষ্টর চিঠি পেলাম. আমাকে ৩০শে মার্চ (১৯৫০) বর্ধমান কেষ্টসায়েরের পূর্বপারে এক বাড়িতে এক গোপন সভায় যোগদান করতে হবে। যোগ দিতে গেলাম. গিয়ে দেখলাম সভা ছাত্র-কর্মীদের। তার মধ্যে আমি. হরেকেষ্ট ছাড়া সুশীল ভট্টাচার্য ও বিভা কোঙারও আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। পরের দিন ৩১শে মার্চ ছাত্র-কর্মীদের ভিতর-বাহিরের যাওয়া-আসার মধ্যে পুলিশ টের পেয়ে যায় এবং ঘেরাও করে গ্রেপ্তার করে। হরেকেষ্ট পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। আমিও পালিয়ে গিয়েছিলাম. কিন্তু পায়ে কাপড় লেগে পড়ে যাই এবং ধরা পড়ে যাই। আমার পকেটে একটি টর্চ ছিল. সেটি রিভলভার মনে করে পুলিশ আমাকে প্রচণ্ড প্রহার দেয়। তাছাড়া ওরা আমাকে চিনতেও পারেনি। আমার চেহারা সামান্যতেই এমন বদলে ফেলতে পেরে-ছিলাম, যাতে তারা অনেকক্ষণ পর অনেক কষ্টে আমি কে তা বুঝল।

১৯৫০ সালের ৩১শে অক্টোবর হঠাৎ খবর পেলাম জামিনে আমাদের মুক্তি হয়েছে। আমি যে মামলায় ছিলাম, আমরা ১৪ জন আসামী, বেশির ভাগই ছাত্র-ছাত্রী. কারণ ছাত্রদের গোপনে আলোচনা সভা ছিল। সেই সময় অর্থাৎ ৩১ মে ১৯৫০ জেলে একজন ছাত্রী কমরেড সুশান্তা বসুকে হারিয়ে এলাম। তাঁকে যখন ধরে তখনই তাঁর জ্বর ছিল। জেলে সুচিকিৎসা ও যত্নের অভাবে তা খুব বেড়ে গেল। সহকর্মী কমরেড বিভা প্রমুখ মহিলা কমরেডরা একই সঙ্গে গ্রেপ্তার হয়ে জেলে ছিলেন। যতদূর সম্ভব যত্নের চেষ্টার কোন ত্রুটি তাঁরা করেন নি, কিন্তু রোগীর যত্নের জন্যও তো অনেক কিছুর প্রয়োজন হয়—আইস ব্যাগ. বরফ. আরও অনেক কিছু। বাইরে মুক্ত অবস্থায় উক্ত অভাব বোঝা যায় না। যাই হোক, জ্বর ক্রমোত্তর বেড়ে গেল এবং শেষ পর্যন্ত তাঁকে মৃত্যুবরণ করতে হলো। বাকি আমরা ১৩ জন তাঁকে হারিয়ে বেরিয়ে এলাম। সঙ্গে ছিলেন কমরেড সুশীল ভট্টাচার্য (বর্ধমান শহর কমিটির সম্পাদক). কমরেড বিভা কোঙার (কমরেড হরেকৃষ্ণ কোঙারের স্ত্রী). সুশীল দেবদাস (পরে প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির নেতা), কমরেড বীণা সেন চৌধুরী, অনঙ্গ রুদ্র (বর্তমানে পার্টিতে নেই, বিশ্বভারতীর অধ্যাপক), আর বাকি ছিলেন ছাত্রগণ।

সন্ধ্যাবেলায় বেরিয়েই বাড়িতে গেলাম। আমার স্ত্রী এবং আমার ভাইয়ের স্ত্রী—এঁদের পূর্বে জেল থেকে বেরিয়ে আসার পর পুলিশ পুনরায়

খোঁজ-খবর নিচ্ছিল। ও'রা সেজন্য গ্রামে আণ্ডারগ্রাউণ্ডে ছিলেন। আমাদের গ্রেপ্তারের সংবাদ পেয়ে পুনরায় বাড়ি এসেছিলেন। বাড়ি ফিরে তাঁদের সাথে দেখা হলো. বাড়ি ফিরে দেখলাম বাড়ির কর্তা দীর্ঘকাল বাড়িতে না থাকলে যা হয় সে রকম অনেক কিছুই হয়েছে. আর্থিক অবস্থাও বেশ কঠিন হয়েছে। অবশ্য আমার অনুপস্থিতিতে শহীদ কমরেড শিবশংকর চৌধুরী এক ব্যবস্থা করেছিলেন। আমি জেল থেকে বেরিয়েই তাতেই প্রথম মনোযোগ দিলাম. আর সঙ্গে সঙ্গে পার্টি এবং জনগণের মধ্যে ছিন্ন সূত্র কি করে আবার যুক্ত করা যায় তার চেষ্টা করতে লাগলাম।

জনগণের সাথে পার্টির যোগসূত্র বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল. তার একটা কারণ স্বৈরাচারী সরকারের সন্ত্রাস সৃষ্টি. অন্য কারণ আমাদের নিজেদের ভ্রমাত্মক অতি বামপন্থা। রাত্রে শুয়ে শুয়ে ঠিক করলাম. আমাদের পক্ষে বা বিপক্ষে যাঁরা ছিলেন অথচ আমাদের সঙ্গে বেশ ঘনিষ্ঠতা ছিল—পক্ষাপক্ষ নির্বিচারে তাঁদের সকলের সাথেই দেখা করব। সকালে উঠে চা খেয়ে সাইকেলে চড়ে শহরে উক্ত উদ্দেশ্যে ঘোরার জন্য রওনা দিলাম।

খোসবাগান মহল্লায় ঘুরতে ঘুরতে সুপরিচিত উকিল এবং অনেক-দিনের পরিচিত মিউনিসিপ্যাল কমিশনার শ্রীদুর্গা চট্টোপাধ্যায়. ডাক্তার চন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায় প্রমুখের বাড়ি গেলাম। তাঁদের সব ভাইয়ের সাথেই আমাদের খুবই ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল. অথচ রাজনীতিতে স্থানীয় রাজনীতির ঘোরপ্যাঁচে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল এবং তাঁরা হিন্দু মহাসভায় যোগদান করে আমাদের বিরোধী হয়ে গিয়েছিলেন। দুর্গাদা ও চন্দ্রদা পৌরসভা থেকে পদত্যাগ করেছিলেন। আমি অবশ্য আণ্ডার-গ্রাউণ্ডে যাবার কিছুদিন পরেই পদত্যাগ করেছিলাম। অবশ্য দুর্গাদাদের পদত্যাগের কারণ ভিন্ন ছিল। উপরোক্ত রাজনীতির ঘোরপ্যাঁচে তাঁরা হিন্দু মহাসভার সদস্য হয়েছিলেন এবং সেইভাবেই তাঁরা ও অশ্বিনীদা (অশ্বিনী হাজরা) আমাদের অনুপস্থিতির সময় পদত্যাগ করেছিলেন। স্থানীয় সংস্থায় যেমন পুরসভায় অনেক সময় দায়িত্ব এসে পড়ে. সেই কারণে আমি পদত্যাগ করেছিলাম। যাই হোক. অনেকদিন পর দেখা হওয়ায় এ'রা অত্যন্ত সমাদরে গ্রহণ করলেন এবং সেই সকালে যে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা দ্রুত রাজনৈতিক সম্পর্কে পরিণত হয়েছিল এবং তাঁদের মৃত্যুকাল পর্যন্ত এই যোগসূত্র ছিল। চন্দ্রদা গত হয়েছেন কয়েক মাস পূর্বে, উনি শহীদ শিবশংকর সেবা সদনের সম্পাদক ছিলেন এবং তার উন্নতি বিধানে প্রচুর সাহায্য করেছেন। অশ্বিনীদার ক্ষেত্রেও একই ঘটনা

ঘটেছিল। অর্থাৎ তাঁরও আমাদের সাথে নিবিড় রাজনৈতিক সম্পর্ক হয়েছিল এবং তার জন্য তাঁকে অনেক দুর্ভোগ সহ্য করতে হয়েছিল—এমন কি জেলে পর্যন্ত যেতে হয়েছিল। সেদিন অশ্বিনীদার বাড়িও গিয়েছিলাম, তিনি তখন নিজ গ্রামে গিয়েছিলেন। বাড়িতে একটি চিঠি লিখে এলাম। একান্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও সহায়ক বন্ধুবর সন্তোষ খাঁ এবং রবি কুণ্ডু উভয়ের সাথে দেখা করলাম। এছাড়া শহরের আরও বহু জায়গায় ঘুরলাম।

মোটামুটি শহরে ঘুরে যা বুঝলাম, মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক আমাদের সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়নি। পুরাতন সম্পর্কের সূত্র ধরে কাজে এগোলে শীঘ্রই আমরা হৃত সমর্থন উদ্ধার করতে পারব।

বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল নির্বাচন, ১৯৫০

জেল থেকে বেরিয়ে এসেই দেখলাম বর্ধমানে মিউনিসিপ্যাল নির্বাচন। তখন মনোনয়নপত্র দাখিলের তারিখ পার হয়ে গেছে। আমাদের প্রার্থী দাঁড় করানো বা উক্তরূপ প্রয়াসের কোনরূপ সম্ভাবনা ছিল না। একদিকে ভালই হয়েছিল, কারণ ভালভাবে নির্বাচন পরিচালনার অবস্থা তখন আমাদের ছিল না। সবাই স্বতন্ত্র ভূমিকায় দাঁড়িয়েছিলেন। অসুবিধার বিষয় হলো, এর মধ্যে কিছু প্রার্থী ছিলেন যাঁদের সঙ্গে আমাদের কোনরূপ বিরোধিতা ছিল না। বরং কারও কারও সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। টোগোদা এবং তাঁর পুরনো সঙ্গীদের মধ্যে বেশ কয়েকজন তাঁদের পুরনো সম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন। কোন কোন ক্ষেত্রে কমরেডদের আত্মীয় দাঁড়িয়েছিলেন, আবার কোন কমরেড উকিল হিসেবে যাঁর জুনিয়র সেই সিনিয়র প্রার্থী হয়েছিলেন।

আমাদের একান্ত দরদী শৈলেশদা (শ্রীশৈলেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পরবর্তী কালে আমাদের সমর্থিত পৌরপতি) এবং মথুরাদা (শ্রীমথুরানাথ ঘোষ)—এঁরা দু'জনও সকলের মতো স্বতন্ত্র প্রার্থী দাঁড়িয়েছিলেন। শৈলেশদার সঙ্গে আমাদের বিশেষ সম্পর্ক। তাঁর দেশে অজয় বাঁধের আন্দোলনে ও কাজে ও কৃষক সমিতিতে আমরা তাঁর মূল্যবান সাহায্য পেয়েছিলাম। এছাড়া ১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত পুলিশের যত আক্রমণ, গ্রেপ্তার প্রভৃতির বিরুদ্ধে মামলা-মোকদ্দমা ইত্যাদিতে সাহায্য করেছিলেন। উপরন্তু অন্যান্য উকিল, মোক্তার মহাশয়দের সাহায্যও সংগঠিত করেছিলেন। ১৯৩৬-৩৭ সাল থেকেই আমরা বর্ধমানের বেশ কিছু খ্যাতিসম্পন্ন উকিল, মোক্তার মহাশয়দের সাহায্য পাচ্ছিলাম—যেমন শ্রীভামিনী মজুমদার, শ্রীসরোজ মজুমদার, শ্রীবামাপতি ভট্টাচার্য প্রমুখ। এঁদের সঙ্গে থেকে মামলা-মোকদ্দমা তদ্বির ইত্যাদি করে আমরাও কয়েকজন—যেমন কমরেড শিবশংকর চৌধুরী, আমি, কমরেড দাশরথি চৌধুরী, কমরেড শিবপ্রসাদ দত্ত, বিনয়দা প্রমুখ, বেশ অবহিত হয়ে উঠেছিলাম। কিন্তু ১৯৪৮-৫০ সালে

আমরা সবাই জেলে না হয় গা-ঢাকা অবস্থায়। সুতরাং ভার পড়ল কিশোরদের উপর। তার মধ্যে কমরেড হেলারাম চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র স্নেহভাজন গোপাল চট্টোপাধ্যায়ের উপরই প্রধান ভার পড়ে। আমাদের মতো অভিজ্ঞ কর্মীরা অনুপস্থিত থাকায় শৈলেশদাকে খানিকটা আগে বেড়ে এইসব কিশোরদের হাতে-কলমে শেখাতে হয়েছে। আমরা পার্টিতে আলোচনা করে স্থির করলাম, শৈলেশদাকে পৌরসভায় আনতে পারলে আমাদের অনেক সাহায্য হবে। অনুরূপ সিদ্ধান্ত করলাম মথুরাদা সম্পর্কে। মথুরাদা রাজনীতিতে আমাদের অনেক পুরনো সাথী। সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সংগ্রামে তিনি বরাবর আমাদের সঙ্গে থাকতেন। ১৯৫০ সালের সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ও দাঙ্গা-হাঙ্গামে তিনি তাঁর বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে নিয়ে দাঙ্গা-হাঙ্গামা প্রতিরোধে সামনে এসে দাঁড়ালেন। এই কাজে অতুলনীয় সাহায্য করেছিলেন বোকাদা (শ্রীশ্রীরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়)। মথুরাদার কাছেও আমরা পৌরসভায় অনেক কিছু কল্যাণ কাজ আশা করেছিলাম। তিনি জীবিতকাল পর্যন্ত সেই আশা পূরণও করেছিলেন।

এই দুই প্রার্থীকে সাম্প্রদায়িকতা ও স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে জনগণকে সাহায্য করার জন্য আমরা সমর্থন করব বলে ঘোষণা করে দিলাম। দল হিসেবে আমরা আর কাউকে সমর্থন করব না। সবাই ছিলেন স্বতন্ত্র প্রার্থী, সুতরাং নীতিগত ভাবে এই দুইজন প্রার্থীকে সমর্থন ছাড়া কোন অবস্থান নেওয়াও কঠিন ছিল। আমরা আরও ঠিক করলাম, রাজনীতি যখন নেই, কেউ আত্মীয়তার কারণে, কেউ পেশাগত সম্পর্কের কারণে অনুরুদ্ধ হলে বিশেষ বিশেষ প্রার্থীকে সমর্থন করুন তাতে আপত্তি নেই, কিন্তু পার্টি হিসাবে আমরা ঘোষিত ভাবেই উল্লেখিত দু'জন অর্থাৎ মথুরাদা ও শৈলেশদাকে সংগঠিতভাবে সমর্থন করব। অন্য সবাইকে আমরা নিশ্চয়তা দিলাম, আমরা দল হিসাবে কারও পক্ষে বা বিপক্ষে যাব না। সন্তোষ খাঁ-এর কোন সাহায্যের প্রয়োজন ছিল না, কারণ 'D' ওয়ার্ডে তাঁর নিজস্ব সংগঠন ছিল—সেজন্য তাঁর জন্য আমাদিগকে ভাবতে হয়নি।

এখানে একটি কথা উল্লেখযোগ্য। কমিউনিস্ট-বিরোধিতার প্রচারে শৈলেশদাও কিছুটা ঘাবড়েছিলেন এবং আমাদের বলেছিলেন যাতে আমরা গোপনে বা চুপচাপ তাঁকে সাহায্য করি, কিন্তু প্রকাশ্যে যেন হৈ-হামারি না করি। একজন প্রার্থী লাল রঙের একটি পৃথক পতাকা নিয়ে প্রচার শুরু করেন। ফলে ভ্রান্তিপূর্ণভাবে তিনি কমিউনিস্ট পার্টির প্রার্থী হিসাবে বিবেচিত হতে থাকেন। হঠাৎ তিনদিন আগে শৈলেশদা এটা বুঝতে

পেরে আমাকে এসে অনুরোধ করলেন, পূর্বের স্থিরীকৃত রীতি পরিবর্তন করে আমাকে এবং অন্যান্য কর্মীদিগকে পতাকা হস্তে বা প্রকাশ্যে ঘোষিতভাবে তাঁর পক্ষে নামতে হবে। আমরা তাই করলাম। আমি আর কমরেড গুলু রক্তপতাকা নিয়ে আমরা বিভিন্ন মহল্লায় ঘুরে কমিউনিস্ট পার্টি কোন্ প্রার্থীর পক্ষে তা বুঝিয়ে দিয়ে এলাম। অবশ্য আমাদের গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুসারে কোন বিশেষ প্রার্থীর বিরোধিতা করলাম না।

আমি দেখলাম, পুরসভার নির্বাচনে একেবারে চুপচাপ ঘরে বসে থাকলে সেটা ভাল দেখাবে না। অথচ উল্লিখিত দু'জন ব্যতিরেকে কাউকে সমর্থন করতে পারি না। আমি 'B' ওয়ার্ডের পোলিং বুথে নিজে এক বই বিক্রীর আসর করলাম। তখন আমাদের কোন পত্রিকা বের হয়নি, কারণ সবাইতো জেলে ছিলাম। সোভিয়েত পত্রিকা ও সোভিয়েত কিছু পুস্তক-পুস্তিকা নিয়ে সাজিয়ে মাটির উপরে কাগজ পেতে বসে পড়লাম। অর্থাৎ একটা স্টলের মতো করলাম। মহল্লার বিশিষ্ট ব্যক্তি সব আমার পরিচিত এবং অনেকে ঘনিষ্ঠও। প্রার্থীদের পোলিং স্টেশনের ক্যাম্পগুলির মাঝখানে আমার এই স্টল খুলে বসা সবার কাছে কিছু অভিনব ঠেকছিল। সবাই জানতেন, জেলে আছি, জেল থেকে বেরিয়ে আসার পর প্রথম দেখা, সবাই একবার করে আমার সাথে দেখা করে গেলেন। আমার উদ্দেশ্য ছিল, এইভাবে অন্ততঃ নেতৃস্থানীয় মহল্লাবাসীদের সঙ্গে যোগাযোগ পুনঃ-প্রতিষ্ঠা করা। 'B' ওয়ার্ড (যেখানে বসেছিলাম) শহরের কেন্দ্রস্থল, সুতরাং আমার উদ্দেশ্য কিছু লক্ষণীয়ভাবে সফল হলো। এই প্রারম্ভিক পদক্ষেপ চালিয়ে গিয়েছিলাম। নিজেদের পত্রিকা অভাবে সোভিয়েত সংক্রান্ত বাংলা পত্রিকা বিক্রয়কেই উপলক্ষ করেছিলাম।

শৈলেশদা দাঁড়িয়েছিলেন 'B' ওয়ার্ডে। প্রত্যেক ভোটারের ভোট ছিল পাঁচটি। মথুরাদা দাঁড়িয়েছিলেন 'A' ওয়ার্ডে, সেখানে প্রত্যেক ভোটারের ভোট ছিল ছয়টি। যাই হোক, আমাদের সমর্থিত উভয় প্রার্থী জয়ী হলেন।

লেভি বিরোধী আন্দোলন

ইতিমধ্যে প্রাদেশিক কমিটির সাথে যোগাযোগ করেছিলাম। কমরেড সুবোধ চৌধুরী (জেলা কমিটির সেক্রেটারী), কমরেড হরেকৃষ্ণ কোঙার, কমরেড তারাপদ মোদক প্রমুখ আণ্ডারগ্রাউণ্ডে ছিলেন, তাঁদের সাথেও যোগাযোগ করলাম। আসানসোলের কমরেডও যাঁরা বাইরে ছিলেন তাঁদের সাথেও যোগাযোগ করলাম।

কয়েক সপ্তাহ কাটতেই কৃষকের এক সমস্যার সম্মুখীন হতে হলো। সরকার খাদ্য সংগ্রহের নামে ধনী নির্ধন নির্বিশেষে কৃষকের ধান লেভি করতে শুরু করল। অবিলম্বে আমাদিগকে এই যথেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করতে হলো। সমস্ত গ্রাম এলাকাতেই আমাদের যখন যেখানে যতটুকু শক্তি তাই নিয়ে আমরা আন্দোলন শুরু করলাম। এ নিয়ে দ্বিধাচিত্ততা ছিল না তা নয়, জেলা কমিটির সভায় কিছু বিরোধিতার সুরও এসেছিল। অতি বামপন্থার প্রভাবের জের তখন আমাদের মধ্যে বিদ্যমান। সুতরাং এইরূপ বিরোধিতা স্বাভাবিক। শেষে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সহজেই একমত হওয়া গেল এবং লেভির স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে আন্দোলন জোরদার সংগঠিত হলো।

আমরা জ্যোতিবাবুকে কলকাতা থেকে নিয়ে এলাম। তিনি তখন সাধারণ রাজনৈতিক ও ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের বাইরে কৃষক আন্দোলনের বিষয়ে বিশেষ কিছু করেন নি। হাটগোবিন্দপুরে জনসভা আহূত হলো। জ্যোতিবাবু আমাদের সাথে আলোচনা করে বিষয়টা জেনে নিয়েছিলেন। তাঁর বক্তৃতাও ভাল হলো ও সভাও সার্থক হলো।

লেভি বিরোধী আন্দোলনে বেশ কিছু ধনী চাষী আমাদের সমর্থন করেছিলেন, যদিও আমাদের মূল বক্তব্য ছিল এলো-পাথাড়ি লেভি এবং গরীব চাষীদের উপর লেভি ধার্যের বিরুদ্ধে। কি রকম পরিস্থিতি হতো তার একটি দৃষ্টান্ত হিসাবে আমি একটি সভার কথা বলবো। কাটোয়ার ভালুগ্রামে কৃষক সমিতি কর্তৃক লেভি বিরোধী এক সভা আহূত হয়েছিল।

যিনি সভাপতি হবেন বলে উল্লিখিত হয়েছিলেন, তাঁর নিজেরই নয় শত বিঘার উপর জমি। স্থানীয় নতুন কমরেডরা সভার উদ্যোগ আয়োজন করেছিলেন। কাটোয়ায় আমাদের নেতা কমরেড শশাঙ্ক চট্টোপাধ্যায় একেবারে দু'দিন আগে আহূত সভায় মনোনীত সভাপতির বিবরণ জানতে পারলেন। তিনি অবিলম্বে এক কমরেডকে আমার কাছে পাঠালেন, সভা বন্ধ করব কি না জানতে চাইলেন। আমি কিছুটা ভাবলাম, ভেবে স্থিরীকৃত ও ঘোষিত সভার অনুষ্ঠান হওয়াই উচিত ঠিক করলাম এবং তাই জানিয়ে দিলাম। স্বাধীনতার আগেই আমাদের অবস্থান ছিল জেলার মধ্যে খুব সঙ্কীর্ণ এলাকায়। পথ ও মত যাই ঠিক করি, এই সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকলে খুব কার্যকরী কিছু করতে পারব না এটা আমরা বুঝেছিলাম। সুতরাং সামনে যে আন্দোলন ঘটনাচক্রে পেয়েছি তারই মাধ্যমে বিস্তৃত যোগাযোগ সৃষ্টি করতে হবে, এটা ছিল আমাদের অন্যতম উদ্দেশ্য। সুতরাং স্থির করলাম, দ্রুত অগ্রসর হতে গেলে কিছু ভুল চুক হবেই—চলতে চলতে তা সংশোধন হয়ে যাবে, থমকে দাঁড়িয়ে গেলে চলবে না। শশাঙ্ককে এও জানিয়েছিলাম, জনসভা হয়ে যাবার পর এবং খাওয়া-দাওয়ার পর কর্মীদের এক সভা ডাকতে হবে, সেখানে কাজের আলোচনা হবে। যাঁরা কাজে থাকবেন না, তাঁদের থাকার প্রয়োজন নেই। একটু রাতে হলে অসুবিধা নেই, যাঁদের উৎসাহ এবং আন্তরিকতা বেশি তাঁরা উপস্থিত থাকবেন তাহলেই চলবে। সভা ভালই হলো। খাওয়া-দাওয়ার পর কর্মী-সমাবেশ যে চরিত্রের চেয়েছিলাম সে মতোই হলো।

আমি সেখানে খোলাখুলি ভাবেই কৃষক সমিতি ও কমিউনিস্ট পার্টির প্রোগ্রাম, নীতি ও কৌশল আলোচনা করলাম। দৃষ্টান্ত হিসাবে এই সভার কথা বিস্তৃত আলোচনা করলাম। আমরা জানতাম, সঠিক পদ্ধতিতে কাজ করলে শ্রীভোলা চৌধুরীর মত বড় জমির মালিক আমাদের থেকে সরে দাঁড়াবেন। কিছুদিনের মধ্যেই সেটা বাস্তবায়িত হলো।

জেলা বোর্ড নির্বাচন, ১৯৫১

এরপর আমাদের যা ভাবতে হলো তা হলো জেলা বোর্ডের নির্বাচন। আমি জেল থেকে বের হবার পরই কিছু কিছু আলাপ-আলোচনা শুরু হয়ে গিয়েছিল। কৃষক-মজদুর-প্রজা পার্টি, ফরোয়ার্ড ব্লক এবং শ্রীঅম্বুজাক্ষ বসু প্রমুখ কিছু সুপরিচিত স্বতন্ত্র ব্যক্তি কংগ্রেসের বিরোধিতা করা মনস্থ করেছিলেন। তাঁরা এটা বুঝেছিলেন যে কমিউনিস্ট পার্টির সাথে মিলে একটা মিলিত ফ্রন্টের মত কিছু না করলে উদ্দেশ্য সফল হবে না। সুতরাং অল্প অল্প কথাবার্তা শুরু হয়ে গিয়েছিল।

আমাদের এরূপ অল্প অল্প কথাবার্তা শুরু হয়েছে, এমন সময় আর একটা প্রয়াসের খবর পেলাম। জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান শ্রদ্ধেয় জিতেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় একটা কিছু লাইন নিয়ে থাকবেন এটা ভাবছিলাম। সামনে তিনি না এসে এলেন ভাইস চেয়ারম্যান আবুল হায়াত সাহেব। শোনা গেল এই প্রয়াস কংগ্রেসে কিছু উল্লাস সঞ্চারিত করেছে, কারণ ভোট ভাগ হলে তাদের জয়ের সুযোগ বেশি। আবুল হায়াত সাহেব জেলা বোর্ডের সদস্য হয়েছিলেন আমাদের চেষ্টায়, ভাইস-চেয়ারম্যানও হয়েছিলেন আমাদের প্রস্তাবে—অর্থাৎ সি. পি আই.-এর প্রস্তাব ও উদ্যোগে। এইটুকু মনে রাখলে তাঁর এই রাজনৈতিক পদক্ষেপের প্রকৃতি পরিষ্কার হবে। একদিন বন্ধুবর দাশরথি তা (কৃষক-মজদুর-প্রজা পার্টির নেতা) আমার সাথে দেখা করে বললেন, হায়াত সাহেব জেলা বোর্ড নির্বাচন সম্বন্ধে কথাবার্তার জন্য জেলা বোর্ড ভবনে একটি সভা ডেকেছেন। আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, সি পি. আই.-কে কিছু বলা হয়েছে কিনা? আমি জবাব দিলাম, না বলা হয়নি। তিনি বললেন, "আমি অবশ্য পূর্বেই তা জেনে নিয়েছি। তাদের উদ্দেশ্য সি. পি. আই.-কে বাদ দিয়ে একটা ফ্রন্ট গঠন।" শেষে দাশরথি বললেন, "সভা তাহলে পণ্ড করে দিয়ে আসি।" আমি তাতে সম্মতি জানালাম। পরের দিন এলেন অম্বুজদা। তিনিও ঐ একই কথা বললেন এবং একই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন।

বললেন, "তাহলে ভণ্ডুল করে দিয়ে আসি !" ফলে হায়াত সাহেবের এই কমিউনিস্ট-বিরোধী জেহাদ অঙ্কুরেই বিনষ্ট হলো।

এর কিছুদিন পর যখন আমাদের নির্বাচন সংগ্রাম সজোরে চলতে শুরু করেছে, তখন একদিন হায়াত সাহেব আমার সাথে সাক্ষাত করে প্রগতিশীল ব্লকের পক্ষে প্রচারে নামার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। কিন্তু মুশকিল হয়েছিল, তিনি তো কংগ্রেস থেকে পদত্যাগ করেন নি, সুতরাং কংগ্রেসের প্রতিকূলে যে জনমত ছিল তার ছায়া তাঁর উপরেও পড়তো। তাঁর প্রগতিশীল ব্লকের প্রচারে সাথী হওয়ায় ধীরে ধীরে সে ছায়া অপসারিত হলো।

জেলায় ফকিরদা এবং তাঁর সহকর্মীরা একটি বিশিষ্ট গ্রুপ। তাঁদের সঙ্গে আমাদের কখনও একটা কলহ-বিবাদ হয়নি। ফরওয়ার্ড ব্লকের নেতা শ্রীসুবিমান ঘোষ এবং কৃষক-মজদুর পার্টির নেতা শ্রীদাশরথি তা-র বক্তব্য ছিল, যাঁরা রাজনৈতিক পার্টিই নয়—স্বতন্ত্র ব্যক্তিমাত্র, তাঁদের মিলিত ফ্রন্টে নেবার প্রয়োজন নেই। আমি জেলা কমিটির সম্মতি নিয়ে গোড়া থেকেই উক্ত প্রস্তাবের বিরোধিতা করলাম। আমার বক্তব্য ছিল, ইউরোপের মতো এখানে রাজনীতিতে সব নাগরিক ভাগ হয়ে গেছে এমন নয় কিছু কিছু স্বতন্ত্র ব্যক্তির ওজন আছে। সেই ওজন মিলিত ফ্রন্টে যোগ হলে শক্তি বৃদ্ধি হয়। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, আমাদের মিলিত কর্মসূচী ও তার রূপায়ণে আমাদের ব্যবহারাদি এইসব স্বতন্ত্র ব্যক্তিকে আমাদের দিকে ঝুঁকিয়ে রাখবে। পরবর্তীকালে ঘটনাবলী যা ঘটেছে তাতে আমাদের ধারণার সঠিকতা প্রমাণিত হয়েছে।

আমাদের ছাড়া অন্যান্য রাজনৈতিক দলের উদ্দেশ্য ছিল, জেলার যেসব বিস্তৃত এলাকায় রাজনৈতিক দল ইত্যাদি নেই, সেখানেও তারা প্রার্থী দাঁড় করাবে, সিট ভাগাভাগির সময় সব জায়গায় সিটের ভাগ নেবে তারপর তাঁদের দলের স্ট্যাম্প মেরে দিয়ে যাকে নিজেদের সুবিধাজনক বুঝবে তাকেই প্রার্থী করে দেবে। তাঁরা মনে করতেন, এতেই দলের পুষ্টি হবে। কিন্তু ফাঁকা ময়দানে শুধু স্ট্যাম্প মেরে পুষ্টি সৃষ্টি করা যায় না, এ জ্ঞান তাঁদের হতো না।

আমি সমস্ত আলাপ-আলোচনায় এ ব্যাপারে দৃঢ় থাকতাম, এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীদের, বিশেষ করে ফকিরদার সহকর্মীদের, প্রার্থী হিসাবে নিতে হবে এটা তাঁদের রাজি করিয়ে নিলাম। যাই হোক, এভাবে নির্বাচনে প্রগতিশীল ব্লক গঠন করা সবাই মেনে নিলেন। এবার সিট ভাগের প্রশ্ন

এলো। সিট ভাগে খুব বেশি গণ্ডগোল হয়নি। কৃষক-মজদুর-প্রজা পার্টির কিছু দায়িত্বজ্ঞানহীন দাবি-দাওয়া ছিল। আমি সেটা পূর্বেই বুঝেছিলাম। পাঁচুদা এবং আমি রায়নায় প্রার্থী দেব বলে ঘোষণা করে দিয়েছিলাম, যদিচ মনে মনে আমাদের সিদ্ধান্ত ছিল, কৃষক-প্রজা পার্টির নেতা দাশরথি তা জেলার সামগ্রিক সমঝোতায় আমাদের কথা মেনে নিলে আমরা রায়নার সিট ছেড়ে দেব। ফকিরদার গ্রুপেরও একজন প্রার্থী রায়নায় ছিলেন। এইটেই শেষ পর্যন্ত খিঁচ রয়ে গেছিল। অনেক রাত ধরে দাশুর সাথে কথা বলে দাশু যখন সব মেনে নিলেন, তখন সেই ভোর রাতেই আমি ফকিরদার সেই প্রার্থীর সাথে দেখা করে তাঁকে বুঝিয়ে তাঁর দাবি প্রত্যাহার করতে সম্মত করালাম। এইরূপ সার্বিক সমঝোতার জন্য আমাকে খুব পরিশ্রম করতে হয়েছিল। বিভিন্ন দলের সাথে কথাবার্তা ছাড়া প্রতি প্রশ্নে আমি আণ্ডার-গ্রাউণ্ড জেলা কমিটির সাথে যোগাযোগ রেখে চলছিলাম। সারাদিন প্রকাশ্য কাজকর্ম করে রাত্রের অন্ধকারে সাইকেলে জেলা কমিটির অন্যান্য সহকর্মীদের সাথে দেখা করতাম এবং সর্ববিষয়ে তাঁদের ওয়াকিবহাল রাখতাম।

কৃষক-মজদুর-প্রজা পার্টির আসনের ব্যাপারে সাধারণের মধ্যে কিছু বিরোধিতা ছিল। রায়নায় এ'দের প্রার্থী ছিলেন শ্রীকৃষণ তা, ধনী ব্যবসায়ীর পুত্র। আমাদের কোন আপত্তি ছিল না কিন্তু সাধারণের মধ্যে, কী কারণে জানি না, কিছু বিরোধী প্রচার ছিল। সেহারাবাজারে জেলা প্রাথমিক শিক্ষক সম্মেলন ছিল, কর্মীরা সকলে আমাদের বাম দলের সমর্থক। আমি ও দাশরথি তা অতিথি হিসাবে আমন্ত্রিত হয়েছিলাম। কুশলী সংগঠক বিজয়দা, সেহারা গ্রামের প্রয়াত বিজয় সেন, অভ্যর্থনা আয়োজন ইত্যাদি ভালভাবেই করেছিলেন। আমাদের কথা হল, সম্মেলনের পর ঐ সভাস্থলেই নির্বাচনের প্রচার ও সংগঠন বিষয়ে কিছু আলাপ-পরিচয় হবে। ইতিমধ্যে রায়নার স্নেহভাজন বাসন্তী সরকার আমাকে ও পাঁচুদাকে এক সময় কিছু সহকর্মীর জমায়েতে নানা রকম প্রশ্নের সম্মুখীন করেছিলেন। তাঁর প্রশ্ন ছিল প্রধানতঃ দুটি—ধনীর ছেলেকে কেন প্রার্থী করা হলো? দ্বিতীয়ত, প্রগতিশীল ব্লকের কোন ম্যানিফেস্টো বা ঘোষণা-পত্র নেই, সুতরাং কিসের ভিত্তিতে মানুষ ভোট দেবে? আমি বললাম, "আপনি প্রশ্নগুলো আমাদের নির্বাচন আলোচনার সময় প্রকাশ্যে জনসভায় উপস্থিত করবেন, তখন আমি তার জবাব দেব।" জবাব সম্বন্ধে পাঁচুদার সাথে ইতিমধ্যে কিছু যুক্তি করে নিলাম। আলোচনার সময়

সভাপতির অনুমোদন নিয়ে উল্লিখিত প্রশ্নগুলি তুললেন। আমি বন্ধুবর দাশরথিকে বললাম, "প্রার্থী তো শুধু তোমার দলের নয় এখন আমাদের প্রগতিশীল ব্লকের, সুতরাং ফ্রন্টের অন্যতম নেতা হিসাবে আমি এর জবাব দেব।" এরপর আমি প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বললাম, "একথা সত্য, প্রার্থী এখনও পরীক্ষিত নয়, রাজনীতিতে প্রথম প্রবেশ করেছেন এমন এক যুবক মাত্র। ইতিমধ্যে তিনি সাইকেল চড়ে গ্রামে গ্রামে ঘোরার দক্ষতা দেখিয়েছেন, নির্বাচিত হলে এইরূপ কর্মকুশলতা তাঁর কাছে আশা করি। যদি আমাদের আশা পূরণ না হয়, তবে পরবর্তী নির্বাচনে তাঁকে আর প্রার্থী করবো না। নবীন সক্রিয় যুবকদের এইভাবে সুযোগ দেওয়া বাঞ্ছনীয়।" ছোট করে লিখলাম, কিন্তু বেশ বিস্তৃত ভাবে ব্যাখ্যা করেছিলাম। আমার জোর গলার সমর্থনের ফলে কৃংক মঃ দুর প্রজা দলের সমর্থকরা খুব উৎসাহিত হলেন। আমি এবার ম্যানিফেস্টো বা ঘোষণা-পত্র সম্বন্ধে বললাম, "ঘোষণা-পত্র আমি রচনা করেছি, ফরোয়ার্ড ব্লকের নেতাদের সমর্থন পেয়েছি, কিন্তু যেহেতু শ্রীদাশরথি তা সম্মত হননি সেহেতু সেই ঘোষণা-পত্র প্রকাশিত হয়নি। এখন তাঁর উপর নির্ভর করছে। তিনি সম্মতি দিলে এবং ঘোষণা-পত্রে স্বাক্ষর দিলে আমরা এখনই প্রচার করে দিতে পারি।" এসব বলায় আমার যা উদ্দেশ্য ছিল তা তখনই সার্থক হলো। কৃষক-মজদুর-প্রজা দলের সমস্ত সমর্থকরা দাশরথি তা মহাশয়কে ঘিরে ধরলেন এবং সকলে মিলে ঘোষণা-পত্রে স্বাক্ষর দিতে অনুরোধ করলেন। প্রগতিশীল ব্লকের সাধারণ সমর্থক যাঁরা সভায় উপস্থিত ছিলেন তাঁরাও যোগ দিলেন। ফলে দাশরথি তা মহাশয় তখনই তাঁর সম্মতি জ্ঞাপন করলেন এবং ঘোষণা করলেন, বর্ধমান ফিরেই ঘোষণা-পত্রে স্বাক্ষর করবেন। কানে কানে আমাকে বললেন, আমি যেন তার অবস্থানটা বুঝে দলিলটা ঠিক করে দিই। আরও বললেন, "জানোই তো, লেখাটা দেখে তো আমি সই করতে পারবো না, তাই আমি না দেখে সই করবো। আমার অবস্থাটা তোমার বিবেচনাতেই ছেড়ে দিলাম।" এর পরে তিনি দেওয়ামাত্রই স্বাক্ষর দিয়ে দিয়েছিলেন এবং এ নিয়ে কোন গণ্ডগোল হয়নি। ফ্রন্টের মিলিত ঘোষণা-পত্র প্রচার প্রচুর শক্তি জুগিয়েছিল। নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে এটা তাঁর উদারতাই বলবো।

দক্ষিণ মেমারীতেও কৃষক-মজদুর-প্রজা পার্টির আসনের ব্যাপারে আমাদের কর্মীদের খুব বিরোধিতা ছিল। যাকে তাঁরা প্রার্থী করবেন ঠিক

করেছিলেন তার সাম্প্রদায়িকতার বদনাম ছিল। তাছাড়াও অনেক কিছু ঘাটতি ছিল, যার ফলে সাধারণের বিভিন্ন অংশে তার সম্বন্ধে আপত্তি ছিল। আমাদের কমরেডরা বললেন, জনসাধারণের মধ্যে বিবেচ্যমান অংশে যদি এইরূপ বিরোধিতা থাকে তাহলে তাকে কি করে নির্বাচিত করা যাবে? দেখলাম, শ্রদ্ধেয় কিরণদা (বর্ধমানের সুপরিচিত উকিল প্রয়াত শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়) আমাদের কমরেডদের সাথে একমত এবং তিনি অনুগ্রহ করে সংগঠিত প্রতিরোধের ভার নিলেন। তাঁর ভাগ্নে মেমারীর নারানবাবু এবং মেমারীর আরও কিছু মানুষকে তিনি তাঁর প্রয়াসের সঙ্গী করলেন। আমি তাঁদের বললাম, "চলুন কলকাতায় ও'দের অফিসে যাওয়া যাক। আমি সামনে যাব না, তবে নীচে কোন বিশিষ্ট স্থানে উপস্থিত থাকবো। আলোচনায় কোন প্রয়োজন হলে পরামর্শের জন্য আমাকে নিকটেই পাবেন।" সকলে মিলে কলকাতায় রওনা দিলাম। খরচ বহন করলাম আমরাই। কলেজ স্ট্রীট মার্কেটের দোতলায় অভয় আশ্রমে তাঁদের অফিস ছিল। নীচে মার্কেটের ভিতর বসন্ত কেবিনে আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম। ও'রা উপরে অফিসে গেলেন।

একটা কথা বলা হয়নি, সেটা বলে নেওয়া যাক। হরেকেষ্টর মাসতুতো দাদা রাধারমণ সেন ছিলেন কৃষক-মজদুর প্রজা দলের নেতৃস্থানীয় কর্মী। তিনি তাঁর মেসোমশাই হরেকেষ্টর বাবা শ্রীশরৎচন্দ্র কোঙার মহাশয়কে কৃষক মজদুর-প্রজা পার্টির প্রার্থী করতে চাইছিলেন। দাশরথি তা-এর কাছে সেই মতো প্রস্তাব রেখেছিলেন এবং এদিকে কোঙার মহাশয়কে কোনমতে রাজি করিয়েছিলেন। তিনি কী ভাবছিলেন জানি না। তবে মনে হয় ভাবনাটা এই ছিল যে, কোঙার মশায়কে প্রার্থী করে জেতাতে পারলে তিনি একজন বড় লোক সমর্থক পদাধিকারী পেয়ে যাবেন, আর অন্যদিকে কোঙার মহাশয়ের ছেলেরা এবং তাঁদের সহকর্মীরা খেটে ভালভাবে জিতিয়ে দিতেও পারবেন। যাই হোক, তাঁর এই প্রস্তাবে আমাদের কোন আপত্তি ছিল না। আমরা জানতাম, নির্বাচনের পরিচালনা আমাদের হাতেই থাকবে, ফলে এই বিস্তৃত ও গুরুত্বপূর্ণ এলাকার মানুষের সাথে আমাদের সংস্পর্শ আরও নিবিড় ও ব্যাপক হবে। মেমারীর যে প্রতিনিধিদল এখন কৃষক-মজদুর-প্রজা পার্টির অফিসে গেলেন, তাঁরাও শরৎচন্দ্র কোঙার মহাশয়ের প্রার্থিত্ব সমর্থন করবেন বলে ঠিক করে গেলেন।

সৌভাগ্যবশতঃ, মেমারীর প্রতিনিধিদল কৃষক-মজদুর-প্রজা পার্টির অন্যতম এক প্রধান নেতা প্রয়াত নৃপেন বসু মহাশয়ের সাক্ষাত পেলেন।

বলা বাহুল্য কিরণদার যোগ্য ওকালতি সফল হলো এবং শরৎচন্দ্র কোঙার মহাশয়কেই প্রার্থী করার সিদ্ধান্ত কৃষক-মজদুর প্রজা পার্টি নিলেন। দাশরথি তা ভিতরে ভিতরে অসন্তুষ্ট হলেও কিছু আর প্রকাশ করলেন না। স্থানীয় নেতা রাধারমণ সেন খুশি হলেন।

এই অভিজ্ঞতা থেকে একটা শিক্ষা পাওয়া যায়। সম্মিলিত ফ্রন্টকে সার্থক করতে হলে শুধু ভিন্ন ভিন্ন দলের নেতাদের কথার উপর নির্ভর করলে চলে না, এইসব দলের মধ্যে যাতে সঠিক পথ বা আমাদের বাঞ্ছিত পথ গৃহীত হয় তার একটা চেষ্টা থাকা দরকার। অন্ততঃ ব্যক্তিগত পরিচিতি ও জনসাধারণের সাথে সংযোগ ইত্যাদির মাধ্যমে এদের প্রভাবিত করার সুযোগ কিছু থাকলে সেটা কাজে লাগাবার জন্য যত্নবান হওয়া উচিত।

চারটি মহকুমার মধ্যে বর্ধমান সদর, কালনা, কাটোয়া তিনটি মহকুমায় সব কেন্দ্রে প্রার্থী দেওয়া সম্ভব হলো। কিন্তু আসানসোল মহ-কুমায় একজন মাত্র কৃষক-মজদুর-প্রজা পার্টির প্রার্থী দুর্গাপুরে দেওয়া সম্ভব হলো। কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃস্থানীয় কর্মী কেউই বাইরে ছিলেন না, জেলে ছিলেন। তাছাড়া বেশ কিছু কর্মী, যাঁরা বিভিন্ন মামলায় জড়িত হয়ে জেলে ছিলেন এবং বেরিয়ে এলেন, তাঁরা সবাই রেলের আসানসোল ডিভিসনের কর্মী। স্থানীয় গ্রামাঞ্চলের সাথে তাঁদের কোন সম্পর্ক ছিল না। এছাড়া আর এক বিপত্তি ঘটেছিল। কমরেড রণেন সেন কর্তৃক ১৯৪৮ ও ১৯৫০ সালে আধিপত্যের দরুণ, বাইরে থেকে কমরেডদের নিয়োগ করা যায়নি। বিনয় বাগচী বলে এই সময় ডঃ সেনের নিয়োজিত একজন কমরেড ছিলেন, তাঁকেই তিনি আসানসোল কমিটির সেক্রেটারী করে দিয়েছিলেন। বলা বাহুল্য, তাঁর কোন স্থানীয় অভিজ্ঞতা ছিল না। এছাড়া পরবর্তীকালে তিনি পার্টি থেকে সরে যান। এজন্য মনে হয়, আসানসোলে পার্টির কাজে তার খুব একটা মন ছিল না। যাই হোক, এটা একটা ধারণা মাত্র। আমি তো তিনটা মহকুমা ছোটাছুটি করছি, এর ফাঁকে আসানসোলে আসা আমার পক্ষে খুব কঠিন ছিল। স্থানীয় বহু-দিনের সমর্থক ছিলেন বিনয়দার বন্ধু ডাঃ অমরেশ রায়, তাঁর বাড়ি বর্ধমানে বিনয়দাদের বাসার নিকট। আসানসোলে জনপ্রিয় ডাক্তার হয়ে বাড়ি ইত্যাদি করে বসবাস করছিলেন। আসানসোলে বিনয় বাগচীর মাধ্যমে কিছু চেষ্টা না করে আমি যদি একবার সোজাসুজি তাঁর সাথে গিয়ে

আলাপ করতে পারতাম, তাহলে হয়তো তাঁকে নিয়ামতপুর এলাকায় প্রার্থী করা যেত। আমি বিনয় বাগচীকে লিখলাম ডাক্তারের সঙ্গে আলাপ করে জানাতে। উনি আমাকে লিখলেন, ডাক্তারের সাথে আলাপ করে কোন লাভ হবে না। তখনও আমরা একটু ছদ্ম ভাষায় কোন কোন ক্ষেত্রে পত্রাদি লিখছি। পরে যখন আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "ডাক্তারের সাথে আলাপ করা হয়েছিল কি ?" তিনি উত্তর দিলেন, ডাক্তার আচার্যকে উল্লেখ করে, "তিনি তো কংগ্রেস প্রার্থী, তাঁর সাথে আলাপও নেই। সেজন্য আপনাকে লিখেছিলাম, কোন লাভ নেই।" আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, শুধু ডাক্তার বলতে আমাদের ডাক্তার বন্ধু ডাঃ রায়কেই আমরা বোঝাতাম, অথচ এঁর কথা বাদ দিয়ে হঠাৎ কংগ্রেস প্রার্থী ডাঃ আচার্যের কথা তাঁর কেন মনে হলো ? তাঁর কোন সন্তোষজনক উত্তর পাইনি। কয়েক মাসের মধ্যেই তিনি আসানসোল ছেড়ে যান।

দুর্গাপুরে কৃষক-মজদুর-প্রজা পার্টি কর্তৃক মনোনীত প্রার্থী ছিলেন এক স্থানীয় স্কুলের হেড-মাস্টার। এঁ'রা কথা পরে আবার আমায় লিখতে হবে। কৃষক-মজদুর-প্রজা পার্টি বললেন, তাঁরা প্রার্থী দিচ্ছেন কিন্তু কর্মী আমাদের দিতে হবে। সব সময় সংকট-ত্রাণে যাঁকে আহ্বান করা হতো এবং যিনি সব কাজেই প্রায় উপযুক্ত বলে বিবেচিত হতেন, তাঁরই উপরে দায়িত্ব চাপাতে হলো। অগত্যা কমরেড শিবপ্রসাদ দত্তকে (আলুকে) দায়িত্ব নিতে হলো এবং দুর্গাপুরে গিয়ে বসতে হলো। সব জায়গায় মনোনয়ন হয়ে যাবার পর নির্বাচনের প্রচার আরও জোরদার করা হলো।

দুটি সিটে আমরা অত্যন্ত অল্প ভোটে হেরেছিলাম—বোধহয় ৫০ ভোটের কমে। একটি আউসগ্রামে আমাদের সমর্থিত স্বতন্ত্র প্রার্থী কপিল চৌধুরীর আসন, অপরটি মেমারীতে কৃষক-মজদুর-প্রজা পার্টির প্রার্থী শ্রীশরৎচন্দ্র কোঙার মহাশয়ের আসন। নির্বাচন আরম্ভ হতেই কাটোয়া মহকুমার দুটি আসনে কংগ্রেস প্রার্থীদের মনোনয়ন নাকচ হওয়ায় আমরা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হলাম। ২৫টি আসনের মধ্যে ১৩টি আসন সম্মিলিত ফ্রন্ট পেয়ে বিজয়ী হলেন। একটা বিপদ হলো। একজন নির্বাচিত প্রার্থী দলত্যাগী হয়ে অন্যদিকে চলে গেলেই সেই পক্ষ জয়ী হয়ে যাবে। ১৩ বনাম ১২ হিসাবে তাই দাঁড়িয়ে গেল।

মাঝে একদিন বাদ দিয়ে তার পরের দিন বোর্ড নির্বাচন স্থির ছিল। দুপুরবেলা বাড়ি ফিরে স্নান করে খেতে যাব এমনাবস্থায় কৃষক-মজদুর-প্রজা

পার্টির অন্যতম নেতা শ্রীমৃত্যুঞ্জয় প্রামাণিক আমার কাছে এসে পড়লেন। বললেন, খুব বিপদ হয়ে গেছে। দুর্গাপুরে নির্বাচিত কৃষক-মজদুর-প্রজা পার্টির সদস্যকে শিয়ারসোলের রাজা পশুপতিনাথ মালিয়া ধরে পাকড়াও করে নিজের ঘরে আটকে রেখেছেন, এখন তাঁকে উদ্ধার করতে না পারলে আমাদের পরাজয়। কঠিন সমস্যা, কিন্তু এখনই শিয়ারসোল রওনা হতে হবে এটা বুঝলাম। পেশাদার গুণ্ডা নয়, আমাদেরই পার্টি-সদস্য এমন কিছু শক্তিমান ও সাহসী ছেলেকে ডেকে পাঠালাম। খাওয়া-দাওয়া সেরে বাইরে বেরিয়েছি এবং তাদের সাথে কথা বলছি, আমার সাথে শিয়ারসোল যেতে হবে—এমন সময় মৃত্যুঞ্জয়বাবুর বড় ছেলে শ্রীপুরঞ্জয় প্রামাণিক এসে পড়লেন এবং তিনি বললেন, পশুপতিনাথ মালিয়া উক্ত সদস্যকে নিয়ে মোটরে করে বর্ধমানে এসেছেন এবং একজন দলত্যাগীকে আরও দলত্যাগী সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে মোটরে করে ঘুরছেন। পশুপতিনাথ মালিয়া রিটায়ার্ড আই বি. ইন্সপেক্টার অপূর্ব মুখার্জীকে গার্ড এবং কর্মচারী নিযুক্ত করেছেন। পশুপতিনাথ মালিয়ার গাড়ি পোস্ট-অফিসের সামনে প্রতীক্ষমান ছিল। উক্ত দুর্গাপুরের সদস্য ও তাঁর সঙ্গী গাড়ির মধ্যে ছিলেন। অপূর্ব মুখার্জী গাড়ির সামনে গার্ড হিসাবে দাঁড়িয়ে ছিলেন। পুরঞ্জয় সাবধান করে দিলেন যে অপূর্ব মুখার্জীর কোমরে রিভলভার আছে।

পার্টির গাড়ি আমি আগেই আনিয়ে রেখেছিলাম। আমাদের যখন কুশলী কাজের প্রয়োজন হতো তখন কমরেড শান্তি ঘোষালকে স্টিয়ারিং ধরতে অনুরোধ করতাম। তিনিও উপস্থিত ছিলেন এবং উল্লিখিত জনা-তিনেক শক্তিমান ছেলেও উপস্থিত ছিলেন। এবার আমরা সবাই মিলে পার্টির গাড়িতে উঠলাম। শান্তি ঘোষাল ড্রাইভ করছিলেন। তাঁকে বললাম, "এমন স্পীডে যাবেন যাতে আচমকা দাঁড়াতে কোন কষ্ট না হয়, আর জোরে যেতে যেতে হঠাৎ স্লো করে দাঁড়াতে যাচ্ছি এরূপ দৃষ্টি আকর্ষণ না হয়।" আমরা দূর থেকেই দেখতে পেয়েছিলাম, মালিয়ার গাড়ির পাশে উক্ত সদস্য এবং তাঁর সহচর দাঁড়িয়ে ছিলেন। অপূর্ব মুখার্জীও দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমার সঙ্গে ছেলের মধ্যে মাহতাব ছিলেন শক্তিশালী এবং কুশলী। তাকে বললাম, "নেমেই বগলে হাত পুরে ঐ সদস্যকে টেনে গাড়িতে তুলবে। ওর সহচর নিশ্চয়ই সঙ্গে সঙ্গে আপনিই উঠবে।" আমরা চটপট প্ল্যান অনুযায়ী গাড়িতে তুলে ফেললাম। রিটায়ার্ড আই. বি. ইন্সপেক্টর হতভম্ব হয়ে রয়ে গেল। সোজা গাড়ি ছুটিয়ে দিলাম।

মৃত্যুঞ্জয়বাবু আমাকে তখন বলছেন, "হাটগোবিন্দপুরে নিয়ে চলুন।" আমি তখন হেসে বললাম, "লেবেল ক্রসিং-এ আটকে দিক।"

আমি ততক্ষণ ভেবে নিয়েছি। আমি সোজা গাড়ি ছুটিয়ে বি সি. রোড দিয়ে পিলখানার গলিতে ঢুকলাম। অম্বুজাদাকে দরজায় ডেকে চট করে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বললাম, "আপনি গড়গড়াঘাটে শৈলেশদার বাড়িতে চলে আসুন, এ'দের সাথে থাকবেন।" (শৈলেশদা অর্থে শ্রীশৈলেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি পরে পৌরপতি হয়েছিলেন।) আমি উইলবাড়ি ও সর্বমঙ্গলা মন্দিরের পাশ দিয়ে গড়গড়াঘাটে শৈলেশদার বাড়ির বৈঠকখানায় অতিথিদের বসিয়ে দিলাম। আমার সাথের দু'জন ছেলেকে তাদের পাহারাদার হিসাবে নিযুক্ত করে দিলাম। পকেট থেকে দশ টাকার নোট বার করে শৈলেশদার বড় ছেলেকে বললাম, "বউদিকে (অর্থাৎ তার মাকে) বল, শৈলেশদাই অতিথিদের পাঠিয়ে দিয়েছেন এবং এই টাকা দিয়েছেন কিছু খাবার, মিষ্টি ইত্যাদি আনিয়ে অতিথিদের খাওয়াতে।" ইতিমধ্যে অম্বুজাদাও এসে পড়লেন। ও'দের সঙ্গ দেবার জন্য তাঁকে বসিয়ে রাখলাম। আমি ওখান থেকে সোজা বেরিয়ে ভিন্ন রাস্তা দিয়ে বোর্ডে এসে শৈলেশদার সাথে দেখা করলাম সব ব্যাপার জানিয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে পাহারায় যোগ দিতে অনুরোধ করলাম। বললাম, কিছু রাত্রে আমি গোপনে সাইকেলে তাঁর বাড়ি যাব। রাত্রে খাওয়ার ব্যবস্থা অবশ্যই তিনি করবেন। (কাজের প্রয়োজন ছাড়াও শৈলেশদাও এমনিই ছিলেন অতিথিপরায়ণ।) শৈলেশদা তখনই রওনা হয়ে গেলেন।

এরপর কংগ্রেসীরা কি করছে তার একটু খোঁজ নেবার চেষ্টা করলাম। শুনলাম, ওরা শহরে তন্ন তন্ন করে খুঁজে বেড়াচ্ছে। যাই হোক, ওরা ব্যর্থ হলো। আমি রাত্রে শৈলেশদার বাড়ি গিয়ে আর এক সমস্যায় পড়লাম। নির্বাচিত সদস্য হেড-মাস্টারমশায় বললেন, কিছু অফিসের কাজ খুব জরুরী, তার জন্য তাঁকে একবার দুর্গাপুর যেতেই হবে। আয়রন সেফ খুলে কাগজ বার করে কিছু লিখে দিয়ে আসতেই হবে। তখন রাজি হতে হলো তাঁর দুর্গাপুর যাবার ব্যাপারে। আমি বললাম, "আমাদের গাড়িতে যাবেন এবং আমাদের গাড়িতে ফিরবেন, এবং নিতান্ত যে কয় মিনিট দরকার সেই কয় মিনিটে কাজ সেরে ফিরবেন।" আলুকে তাঁর সঙ্গে দিলাম। তিনি সেই মতোই ফিরলেন।

আমাদের মনে আগে থেকেই ঠিক করেছিলাম, কৃষক-মজদুর-প্রজা পার্টিকে তো একটা পদ দিতে হবে। সেই হিসাবে ভাইস-চেয়ারম্যানের

দুটি পদের মধ্যে একটি পদ এ'কেই দেওয়া হবে। সংকল্পটা অবশ্য আমাদের মনেই ছিল, তিনি জানতেন না। কিন্তু এখন তাঁকে জানিয়ে দেওয়া হলো। জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান করা হলো ফরোয়ার্ড ব্লকের শ্রীসুবিমান ঘোষকে। এর জন্য পরে অসুবিধায় পড়তে হয়েছিল। সুতরাং আমাদের সিদ্ধান্ত বোধ হয় ভুল হয়েছিল। যাক্গে, এই আলোচনার এখন কোন মূল্য নেই।

পরের দিন নির্বাচন হলো এবং আমরা জয়ী হলাম। কিন্তু পুরো টার্ম আমরা শেষ করতে পারিনি। কৃষক-মজদুর-প্রজা পার্টি ভেঙ্গে গেল। মৃত্যুঞ্জয় প্রামাণিক তাঁর দলবলদের নিয়ে কংগ্রেসে যোগদান করলেন, জেলা বোর্ডের দু'জন সদস্যও তাঁর সঙ্গী হয়ে কংগ্রেসে যোগদান করলেন। ফলে আমরা সংখ্যালঘু হয়ে পড়লাম। আমরা প্রগতিশীল ব্লকের সভায় চেয়ারম্যান, ভাইস-চেয়ারম্যান পদাধিকারীদের পদত্যাগের নির্দেশ দিলাম।

জেলা বোর্ড নির্বাচনে হুগলী জেলা থেকে আমরা ভাল সাহায্য পেয়েছিলাম। কমরেড বিনোদ দাস (এখন প্রাদেশিক কৃষকসভা ও হুগলী জেলা কৃষকসভার অন্যতম নেতা) এই কর্মীদের মধ্যে ছিলেন। তখন নির্বাচন-কেন্দ্র হিসাব করে আমাদের সর্বত্র প্রভাব ছিল না। সুতরাং যেমন জেলার কমরেডদের, তেমনি বাইরে থেকে যাঁরা এসেছিলেন তাঁদেরও অনেক অসুবিধায় পড়তে হয়েছিল। সে সব কষ্ট স্বীকার করেও তাঁরা নিষ্ঠার সাথে নির্বাচনের কাজ সমাপ্ত করেন।

এর মধ্যে একজনের নাম উল্লেখ করা উচিত। তিনি অনেকদিন হলো গত হয়েছেন—আরামবাগের প্রীতিভাজন মনোরঞ্জন রায়। তাঁর এক গাড়ি ছিল, সেই গাড়ি নিয়ে তিনি আমাদের নির্বাচনে যোগদান করেছিলেন। কমরেড গুলু পার্টির প্রয়োজনে সাড়া দিয়ে ড্রাইভারের চাকরি ছেড়ে দিয়ে নির্বাচনের কাজে নিযুক্ত মনোরঞ্জন রায়ের গাড়ির চালক হয়েছিলেন।

প্রথম বিধানসভা নির্বাচন, ১৯৫২

জেলা বোর্ড নির্বাচন হয় ১৯৫১ সালের মে মাসে। ১৯৫২ সালের জানুয়ারীতে বিধানসভার নির্বাচন। বলা বাহুল্য, এ নির্বাচনেও সম্মিলিত ফ্রন্টকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা হলো। কিন্তু ঝামেলা হলো এই যে. এক্ষেত্রে সারা রাজ্যের পটভূমিকার মধ্যে জেলার ফ্রন্টকে চলতে হবে।

১৯৫১-৫২ সালে বিনয়দা, কমরেড বিজয় পাল প্রমুখ জেলে। আমি কেসে ছাড়ান পেয়ে জেল থেকে বেরিয়ে আসার ফলেই কাজ করতে পারছিলাম। কমরেড সুবোধ চৌধুরী, কমরেড হরেকেষ্ট ও কমরেড তারাপদ মোদক আণ্ডারগ্রাউণ্ড থেকে আমাকে সমর্থন দিয়ে যাচ্ছিলেন। আমার দিক থেকে আমিও যত কাজই থাক তারই মধ্যে মাঝে মাঝে এবং ঘন ঘন এ'দের সঙ্গে দেখা করে যেতাম।

নির্বাচনের গোড়ার দিকটা পার্টির প্রকাশ্য দপ্তর খোলায় অসুবিধা ছিল। জেলা কমিটির প্রধান প্রধান সদস্য অনেকেই আণ্ডারগ্রাউণ্ডে, আমার নিজের পক্ষে এত দায়িত্ব বহন করা কঠিন বলে আমার অনুরোধে জেলা কমিটি আমার সাথে আরও দুজন—পাঁচুদা এবং তারাপদ মোদককে নিয়ে এক সাব-কমিটি করে দিয়েছিলেন। আমাকে তাঁর সম্পাদক করেন। অর্থাৎ নির্বাচনের সমস্ত দায়িত্ব আমার উপর পড়ে। অবশ্য অন্যান্য কমরেডরাও ছিলেন। কিন্তু তাঁরা ছিলেন এলাকায় এলাকায়। আমার কর্মক্ষেত্রের ব্যাপ্তি ছিল সমগ্র জেলা। ফলে গ্রামে ও শহরে সর্বত্র আমাকে ঘুরতে হচ্ছিল। পূর্বেই বলেছি, স্বাভাবিকভাবেই প্রধান দায়িত্ব ছিল শহরে।

আমি ঠিক করেছিলাম, নেতাদের বিরুদ্ধে প্রার্থী দাঁড় করাতে হবে. তা না হলে অন্য পার্টিগুলির অযৌক্তিক দাবির প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে না। যেমন জেলা বোর্ডের ক্ষেত্রে করেছিলাম, তেমনি এ নির্বাচনেও প্রথমেই দাশরথি তা-এর বিরুদ্ধে প্রার্থী ঘোষণা করে দিলাম। অবশ্য প্রকাশ্য কাগজপত্রে নয়, বন্ধুবর দাশরথিকে এবং তাঁর সহকর্মীদের জানিয়ে

দিলাম। আসানসোল মহকুমাতে দেবেন সেন-এর বিরুদ্ধে দাঁড় করাবার প্রার্থী নির্ণয় করার সময় পেলাম না। কিন্তু দেবেন সেন যে জায়গায় দাঁড়িয়েছিলেন সেখানে জোড়া সিটের একটিতে তখন তপশিলীভুক্ত শ্রেণীর প্রার্থী আর-একজন সাধারণ প্রার্থী—দুই মিলিয়ে একটি নির্বাচনক্ষেত্রে প্রার্থী দিতে হতো। দেবেন সেন-এর বিরুদ্ধে প্রার্থী দিতে না পারলেও সমঝোতার ঘুটি হিসাবে আমি কমরেড যোগিন রায়কে প্রার্থী হিসাবে তপশিলী আসনে ঘোষণা করে দিলাম। আমি যা আশা করেছিলাম তাই হলো।

আমি তখন আসানসোলে নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয়ে পার্টি কর্মীদের মিটিং করছি। কমরেড কালাচাঁদ ব্যানার্জীকে দাঁড় করিয়েছি। কিভাবে তাঁর নির্বাচন পরিচালনা করতে হবে তাই আলোচনার জন্য স্থানীয় কমরেডদের সভায় আহ্বান করেছি। আমরা আলোচনায় রত, এমন সময় কলকাতা থেকে জ্যোতিবাবুর নির্দেশে আমাকে নিয়ে যাবার জন্য কলকাতা প্রাদেশিক কমিটি অফিসের একজন কমরেড এসে পড়লেন। তখনই যেতে হবে, অথচ বম্বে মেল ছাড়া কোন গাড়ি নেই। উল্লিখিত কমরেড বর্ধমানে আমার খোঁজে নেমেছিলেন, সেখান থেকে নির্দেশিত হয়ে আসানসোলে আসেন। বোম্বে মেলের ভাড়া অনেক বেশি। আমার পকেটে অত নেই। কমরেড সুনীল বসুরায় তখনই টাকা জোগাড় করে আমাকে রওনা করে দিলেন। আমি বোম্বে মেল ধরলাম। বর্ধমানে উঠলেন আউস-গ্রামের স্বতন্ত্র নির্বাচনপ্রার্থী শ্রীঅনুজা চ্যাটার্জী। তিনি উৎসাহের সাথে তাঁর নির্বাচনে জনসমর্থনের কাহিনী আমাকে বলছিলেন। বলছিলেন এক ব্যক্তির কথা, যিনি তাঁকে খুব সজোরে সমর্থন করছেন। আমি আশ্চর্য হলাম। উক্ত ভদ্রলোককে যখন আমরা প্রার্থী করেছিলাম, তখন অনুজা-বাবু তাঁকে হারাবার জন্য উঠে-পড়ে লেগেছিলেন। যাই হোক, তিনি যা বললেন চুপ করে শুনলাম। পরে আমি জানতে পেরেছিলাম যে অনুজাবাবুর ধারণা ভুল। বলা বাহুল্য, অনুজা চ্যাটার্জী পরে ভালভাবেই পরাজিত হয়েছিলেন।

যাই হোক, কলকাতা পৌঁছে অবিলম্বে জ্যোতিবাবুর সাথে যোগাযোগ করলাম। তিনি বললেন, "চলুন আমার সাথে প্রফুল্ল ঘোষের ওখানে।" ও'দের প্রফুল্লবাবু, সুরেশবাবু ও অন্যেরা থাকবেন, আমাদের বঙ্কিমবাবুও থাকবেন। আমার কাছে কৃষক-মজদুর-প্রজা পার্টির সাথে কোথায় কি ব্যাপার, সেটা জ্যোতিবাবু জেনে নিলেন। উনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন,

"আপনার কি সবকটা সিটই সিরিয়াস ?" আমি বললাম, "আমার টার্মস্‌-এ যখন পর্যন্ত স্থির না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত প্রত্যেকটা সিটে আমি সিরিয়াস।"

যাই হোক, শেষ পর্যন্ত দাশু আমার চাপে সুবোধ চৌধুরীর বিরুদ্ধে প্রার্থী তুলে নিতে রাজি হওয়ায় এবং আরও দু-একটা সিটে আমার কথায় রাজি হওয়ায় দাশুর বিরুদ্ধে প্রার্থী তুলে নিলাম। এ অবশ্য আমাদের পূর্ব সিদ্ধান্ত ছিল। মেমারী, কালনায় হরেকেষ্ট এবং জমাদার সাঁওতালকে প্রার্থী করবো ঠিক করেছিলাম। কৃষক-মজদুর-প্রজা পার্টি আনন্দ কোঙারকে তাদের প্রার্থী করার সিদ্ধান্ত করেছিল। তারা প্রত্যাহার করতে কিছুতেই রাজি হলো না। আমাদের শক্তিও তখন তেমন কিছু ছিল না। যাই হোক, সমঝোতার স্বার্থে হরেকেষ্টর নাম প্রত্যাহার করতে বাধ্য হলাম। আনন্দ কোঙারের সমর্থনে নাম তুলে নেবার প্রস্তাবে জেলা কমিটি একমত হয়েছিলেন। জমাদার সাঁওতালের নাম থাকল। হরেকেষ্টকে প্রার্থী করতে পরবর্তী নির্বাচন ১৯৫৭ সালের জন্য অপেক্ষা করতে হলো। তিনি সেই নির্বাচনে সফলও হয়েছিলেন।

কৃষক-মজদুর-প্রজা দলের নেতাদের সঙ্গে এইসব আলোচনার সময় দেবেন সেন বললেন, "আমার বিরুদ্ধে আপনারা প্রার্থী দেননি বটে, কিন্তু আমার সাথে তপশিলী আসনে প্রার্থী দিয়েছেন। এতে আমার জেতা কঠিন হবে।" এই সূত্রে ভদ্রলোকের দক্ষতারও পরিচয় পেলাম। বললেন, "প্রথমে বুঝলাম না আপনি কোথা থেকে নাম পেয়েছেন। দেখলাম আপনাদের আসানসোলের কর্মীরাও তাঁকে চেনেন না। পরে বুঝলাম, আপনারা একসাথে জেলে ছিলেন, সেজন্য শুধু আপনারই পরিচয় আছে।" আমি বললাম, "আরও অনেকেরই আছে। আসানসোল শহরের কর্মীরা তো সব জায়গার কথা জানেন না।" তবে তাঁকে না বললেও এও সত্য কথা, যোগিন রায়কে আমি সিরিয়াস প্রার্থী করিনি। দেবেন সেনের আসনে নির্বিঘ্নতার ভাব দূর করতে না পারলে জেলার সবকটি আসনে আমাদের সিদ্ধান্তে তাঁদের মত পাওয়া কঠিন হতো। পূর্বেই বলেছি, পুনরায় বলতে দোষও নেই, কলকাতায় যাঁরা পরিচালনা করছিলেন, তাঁদের সাথেও এ বিষয়ে আমাদের কিছু পার্থক্য ছিল। অন্যত্র সদিচ্ছার প্রকাশ হিসাবে নেতাদের আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে না—এটা মেনে নিয়ে কথাবার্তা হতো। এখানে সুরটা ছিল বিপরীত। যতক্ষণ সমগ্র ব্যাপার স্থির না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা নেতাদের আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে না—এরূপ নিশ্চয়তা দিতে নারাজ ছিলাম। আমি শেষ পর্যন্ত হয়তো তুলে

নিতে হবে বুঝেও হরেকেষ্টর নামটা তুলতে চাইছিলাম না. সেজন্য দেবেন সেনের গলায় একটা বাঁধন দিয়ে রেখেছিলাম ! শেষকালে কিছুতেই সমঝোতা হচ্ছে না দেখে বঙ্কিমবাবু যোগিন রায়ের নামটা প্রত্যাহার করতে বললেন। ফলে শেষে সেই সমঝোতার খাতিরেই হরেকেষ্টর নামও প্রত্যাহার করতে হলো। প্রফুল্ল ঘোষ আমাকে ও দাশরথি তা-কে খুব উৎসাহ দিয়ে আশীর্বাদ দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে সুরেশবাবুর আশীর্বাদও পেলাম। যাই হোক, মোটমাট সমগ্র জেলাব্যাপী একটা বোঝাপড়া হয়ে গেল।

কিন্তু শেষে এক জায়গায় বাধল. আসানসোলে কালাচাঁদদা (কমরেড কালাচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায়)-কে দাঁড় করিয়েছিলাম। মুশকিল হয়েছিল. আসানসোল সম্বন্ধে আলাপ করার কেউই ছিল না। বিনয়দা, বিজয়দা প্রমুখ সবাই জেলে, অন্য সব বিচারের কোন রাস্তা না পেয়ে স্থানীয় পরিচয়ের ভিত্তিতেই প্রার্থী করেছিলাম। কালাচাঁদদা পুরানো রাজবন্দী ছিলেন, অথচ শহরে একজন প্রতিষ্ঠিত নাগরিক। তখন প্রয়াত আর. সি. ব্যানার্জীর পৌত্র হিসাবে পুরানো অধিবাসীদের মধ্যে সুপরিচিত। এই বুঝেই প্রার্থী করেছিলাম।

নির্বাচনের কাজ যখন আমাদের বেশ কিছু এগিয়েছে, তখন কমরেড রণেন সেন, কমরেড ভূপেশ গুপ্ত প্রমুখ মুক্ত হলেন। ১৯৫১ সালের অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে পার্টির প্রাদেশিক সম্মেলন শেষ হয় এবং সীমিত সংখ্যায় প্রাদেশিক কমিটি গঠিত হয়। তখন আমরা কয়েকজন মাত্র প্রাদেশিক কমিটিতে নির্বাচিত হই। এখন যাঁরা বেরিয়ে এলেন তাঁদের মধ্যে দক্ষিণপন্থীরা এবং কমরেড রণেন সেন. ভূপেশ গুপ্ত প্রমুখ তাঁদের কেন প্রাদেশিক কমিটিতে নেওয়া হয়নি—এই নিয়ে গণ্ডগোল বাধালেন। যাই হোক, অবস্থা শান্ত করার জন্য নির্বাচিত পি. সি এ'দের কো-অপট্ করে নিলেন। আমার উপরে দায়িত্ব ছিল বর্ধমান নির্বাচনের। এইসব দায়িত্ব ইত্যাদির রদবদল করা হয়নি। অথচ আমার সাথে আলোচনাও করা হলো না, জেলা কমিটিকে কোন মত দেবার সুযোগ দেওয়া হলো না. রণেন সেন-বিনয় বাগচী মিলে স্থির করলেন কালাচাঁদদার নাম তুলে নিতে হবে এবং ওখানে সুভাষবাদী ফরোয়ার্ড ব্লকের অতীন বসুকে প্রার্থী করতে হবে। স্মরণ রাখতে হবে যে, এ'রাই সবচেয়ে কমিউনিস্ট-বিরোধী। হঠাৎ কাগজে দেখলাম প্রাদেশিক কমিটির এই মর্মে সিদ্ধান্তও বেরিয়ে গেল। অর্থাৎ যা দাঁড়াল তা এই. পার্টির সম্মেলন হতে পারে, প্রাদেশিক কমিটি নির্বাচিত হতে পারে, একটি সক্রিয় জীবন্ত জেলা কমিটি থাকতে

পারে, কিন্তু পার্টি গঠনতন্ত্রের সব নিয়মকে অগ্রাহ্য করে একটা কাজ করা হলো। যাঁরা একবার দক্ষিণপন্থী আবার পরে অতি-বামপন্থীদের দিকে মাথা ঝুঁকিয়ে থাকেন, তাঁরা জেল থেকে বেরিয়েই 'তৌবা নাক খপ্‌তা' কিছু না করেই পার্টির কর্তা দাঁড়িয়ে যেতে পারেন। পার্টির গঠনতন্ত্রের নির্দেশের কোন প্রয়োজন হয় না। আমার এখনও বিশ্বাস, আসানসোলের কমরেডরা নেতৃত্ব-বঞ্চিত অবস্থাতেও যে কাজ করেছিলেন, নেতৃত্ব জেল থেকে বেরিয়ে আসার পর তাঁদের পরিচালনায় নিশ্চয়ই আরও ভালভাবে কাজ করতে পারতেন এবং পার্টির মনোনীত প্রার্থীকে জয়ী করতে পারতেন। যাই হোক, এ সুযোগ সুভাষবাদী ফরোয়ার্ড ব্লককে দেওয়া হলো এবং অতীন বসু জয়ী হলেন। জেলা কমিটি এবং ভারপ্রাপ্ত পি সি এম.-এর, অর্থাৎ আমার, অজ্ঞাতে এই রদবদল কেন করা হয়েছিল তা আজ পর্যন্ত জানি না ও বুঝিনি। মানিকতলা আসনে রণেন সেনকে প্রার্থী করা হয়েছিল। এর কিছু স্থানীয় প্রতিরোধ ছিল বলে শুনেছিলাম। সেই প্রতিরোধের সাথে সুভাষবাদী ফরোয়ার্ড ব্লকের কোন সম্পর্ক ছিল না। এবং তাঁদের বিরোধিতা প্রশমিত করার জন্য আসানসোলের আসন ছেড়ে দিতে হয়েছিল কি না জানি না। অবশ্য এ বিষয়ে আমি একমত যে যোগ্যতার কদরে রণেন সেনের প্রার্থিত্ব সঠিক ছিল এবং আসানসোলের আসনে প্রার্থী প্রত্যাহার না করলে তাঁর জয় বিঘ্নিত হতো, এরূপ অবস্থা জেলা কমিটি ও ভারপ্রাপ্ত পি. সি. সদস্য জানতে পারলে তাঁদেরও হয়তো আপত্তি হতো না। কিন্তু এ রকম পরিষ্কার কোন বক্তব্য কেউ রাখেন নি। বস্তুতঃ এই সমস্ত ব্যাপারটাই রহস্যজনক।

কালনা থানার কৃষক-মজদুর-প্রজা পার্টির সদস্য নবকুমারবাবুকে জেলা বোর্ডের প্রার্থী করতে হয়েছিল। সুতরাং তাঁরা এবার বিধানসভা নির্বাচনে কৃষক-মজদুর-প্রজা পার্টির প্রার্থীর জন্য আসন চাওয়ায় হরেকৃষ্ণ কোঙারের আসন ছেড়ে দিতে হলো। সে সময়ে প্রকাশ্যে আমাদের শক্তি বোঝা যেত না। এমন কি গ্রামে গ্রামে যোগাযোগ না থাকায় আমরাও বুঝতে পারতাম না। আমাদের সাথে যাঁরা যুক্ত আসনে প্রার্থী দিতেন, তাঁরা কিন্তু যুক্তভাবে নির্বাচন পরিচালনায় ভয় করতেন। তাঁরা মনে করতেন এটা হবে একটা বাঁধন। সুবিধাবাদী হিসাবে তাঁরা ভাবতেন, বাঁধনমুক্ত থাকলে নানান রকম সুবিধাবাদী যোগসাজস করে জেতা যাবে। এও মনে করতেন, কমিউনিস্টদের সাথে যোগ থাকলে কমিউনিস্ট-বিরোধিতার জন্য তাঁদেরকে হারতে হবে। সুতরাং তাঁরা যুক্ত আসনে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে

নির্বাচন পরিচালনা পছন্দ করতেন। আমরা বরং খানিকটা ভারমুক্ত হলাম। আমরা যুক্ত আসনে দুই প্রার্থীরই পক্ষে বলেছিলাম, কিন্তু একটি দায়িত্বের বোঝা থেকে মুক্ত থাকায় নিজেদের প্রার্থী জমাদার সাঁওতালের উপর মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করতে পেরেছিলাম। কালনায় প্রথম পার্টির নামে যে নির্বাচন মিটিং করি তাতে প্রায় ছয়-সাত হাজার মানুষের জমায়েত হয়েছিল। প্রধান বক্তা হতে হয়েছিল আমাকে। এতে আমাদের সকলের প্রচুর উৎসাহ হয়েছিল এবং স্থানীয় কর্মীদের মনোবল খুব বেড়েছিল।

জেলা কমিটির তরফ থেকে আণ্ডারগ্রাউণ্ড অবস্থাতেই হরেকেষ্টকে মেমারী, কালনার নির্বাচন কেন্দ্রের ভার দেওয়া হয়েছিল। তিনি সানন্দে সে দায়িত্ব ঘাড়ে নিয়েছিলেন। কালনা আমাদের পুরানো কর্মক্ষেত্র নয়। খাদ্য আন্দোলনের সময়ে ও ১৯৪৩ সালের বন্যা-রিলিফের সময়ে আমার ও বিশেষ করে শহীদ শিবশঙ্কর চৌধুরীর কিছু যোগাযোগ হয়েছিল। আমাদের সাথে বাগনাপাড়ার শহীদ কমরেড আবদুল গফুরও ছিলেন। এরপর কিন্তু আমরা কোন স্থায়ী সংযোগ স্থাপন করতে পারিনি। পরে পূর্ণদা (কমরেড পূর্ণ পাল) কুষ্টিয়া থেকে কালনায় আসেন ও ওখানেই থাকেন। এই থাকার সময় টিউশনি করে নিজের খরচ-পত্র চালাতেন আর পার্টির কাজ হিসাবে পার্টির ইংরাজী, বাংলা পত্রিকাগুলি নিয়মিতভাবে বিক্রী করতেন। এই পদ্ধতি এবং পত্রিকা বিতরণের নিয়মানুবর্তিতার দরুণ তার কিছু দৃঢ় যোগাযোগ হয়েছিল। আমরা যখন ১৯৪৮, ১৯৪৯ সালে আণ্ডারগ্রাউণ্ডে আছি, তখন পূর্ণদার নিয়ন্ত্রণে একটি ছোট ইউনিয়ন গঠন করা হয়। হরেকেষ্ট মেমারীর সাথে এই ইউনিটের দায়িত্বে ছিলেন। এবং আণ্ডারগ্রাউণ্ডে যেমন সম্ভব তেমনি নিয়মিত যোগাযোগ রাখতেন। বলা বাহুল্য, পরে আমি বাইরে আসার পর এবং জেলা বোর্ড নির্বাচনের জন্য কালনা, পূর্বস্থলী যাওয়া-আসার সময় এই ইউনিটের সব সদস্যদের সাথে আমারও যোগাযোগ হয়। জেলা বোর্ড নির্বাচনের সময় কালনা থানার অন্তর্গত বদ্যিপুরে কিছু পার্টির সমর্থক ও কিছু বামপন্থীদের সাথে মেমারীর কমরেড নিমাই-এর মাধ্যমে হরেকেষ্ট ও আমার যোগাযোগ হয়।

প্রথম আমি আর হরেকেষ্ট যাই পার্টির গাড়িতে করে। সারারাত বন্ধুদের সাথে কথাবার্তা বলে ভোরে আমরা ফেরার জন্য রওনা হই। হরেকেষ্টকে নিয়ে গিয়েছিলাম তাঁর পিত্রালয় থেকে। হরেকেষ্টকে সেখানে

ফিরিয়ে দিয়ে আমাকে বর্ধমানে আসতে হবে। হরেকেষ্ট তখনও আণ্ডার-গ্রাউণ্ডে, এবং আমি প্রকাশ্যে এসে পড়েছি। পার্টির গাড়ি হয়ে গেল অচল। পরে মেরামত সেরে বর্ধমানে এসেছিল। আমরা দুজন অগত্যা বাঁচিতে লোকাল ট্রেন ধরলাম। এখানে একটু সরস কথা আছে, না লিখে থাকতে পারছি না। মেমারীতে গাড়ি লাগতেই হরেকেষ্ট নেমে সোজা বামুন-পাড়ার পথ দিয়ে বাড়ি চলে গেল। গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতেই দেখছি হরেকেষ্টর বাবা কোঙার মশায় গাড়িতে এসে উঠলেন, হয়তো বর্ধমানে কোন কাজ আছে। আমি জানলার ধারে ছিলাম, তিনি সামনের বেঞ্চে এসে বসলেন। কোঙার মশায় উপর দিকে তাকিয়ে হঠাৎ বললেন, "এটা তো আমাদের মনে হচ্ছে।" উপরের বার্থে একটি সাইকেল লাইট ছিল, টর্চের অভাবে হরেকেষ্ট এটাই নিয়ে এসেছিলেন, যাবার সময় নিতে ভুলেছেন। কোঙার মহাশয় আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "বড়বাবু ছিল বুঝি?" আমি হ্যাঁ বললাম। জিজ্ঞাসা করলেন, "মেমারীতেই নামল বুঝি?" বললাম, "হ্যাঁ।" তখন আমাকে বললেন, "তোমরা এইভাবে বিপ্লব করবে? এরকম জিনিস ফেলে যাওয়া এবং এরূপ দিনের প্রকাশ্য আলোকে আসার অর্থই তো বিপদ আমন্ত্রণ করা।" কথাটা সত্য, সুতরাং আমি আর প্রতিবাদের চেষ্টা করলাম না। শুধু বললাম, "আমরা মোটর গাড়িতে গিয়েছিলাম, গাড়ি খারাপ হয়ে যাওয়ায় ট্রেনে ফিরতে বাধ্য হলাম।" বললেন, "যাই হোক বাবা, একটু সাবধানে চলা ফেরা করবে। বাড়িতে ফিরে না আসা পর্যন্ত চিন্তা থাকে।" আমি বললাম, "সকালের ট্রেন, তাছাড়া সে সোজাসুজি প্লাটফর্ম থেকেই বামুনপাড়ার রাস্তা দিয়ে গেছে, সুতরাং কেউ দেখতে পায়নি। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।"

বিধানসভার নির্বাচনকালে হরেকেষ্ট এইসব পুরানো পরিচয় সম্মিলিত করে এবং যোগসূত্র সংহত করে অল্পতেই ভোটের জন্য একটা শক্তিশালী সংগঠন গড়ে তুলতে পেরেছিল। ভোটে জমাদার সাঁওতালের আসনে আমরা জয়ী হয়েছিলাম।

কাটোয়াতে আমাদের প্রার্থী সুবোধ চৌধুরী জয়ী হন। সর্বমোট প্রার্থী ছিলেন ১১ জন, অর্থাৎ সুবোধ চৌধুরীর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন ১০ জন। এসব প্রার্থীরা নিজ নিজ অঞ্চলে খুব শক্তিশালী ছিলেন, কিন্তু নিজ অঞ্চলের বাইরে তাঁদের তেমন প্রভাব ছিল না। ফলে ভোট ছড়িয়ে গেল ও ভাগ হয়ে গেল। আমাদের প্রার্থী মাত্র তিন/চার হাজার ভোট পেয়েও জয়ী হলেন।

মঙ্গলকোটে আমাদের পরাজয় হয়। পরাজয়ের কারণ চৈতন্যপুরের জোতদার পরিবারের কংগ্রেসের অনুকূলে এক কুটিল কৌশল। এ'দের পরিবারের একজনকে এ'রা প্রার্থী করে দেন। ফলে কংগ্রেস-বিরোধী ভোট ভাগ হয়ে গেল। আমাদের ভোট অবশ্য তাদের চেয়ে অনেক বেশি ছিল। কিন্তু তাহলেও অনেকগুলো ভোট, প্রায় তিন হাজার, ওরা টানতে পারে। যার ফলে আমরা পরাজিত হই। আমাদের প্রার্থী ছিলেন অজয় বাঁধ আন্দোলনের অন্যতম নেতা, অজয়ের ধারে পালিগ্রাম ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট, বর্ধমান শহরেও জনপ্রিয় মিউনিসিপ্যাল কমিশনার ও পরবর্তী-কালে চেয়ারম্যান, বর্ধমান জেলা কৃষক সমিতির সহ-সভাপতি শৈলেশদা অর্থাৎ শ্রীশৈলেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলকোটে সে সময় আমাদের জন-প্রিয়তা সমস্ত থানা জুড়ে একরকম নয়। প্রকৃতিগত ভাবেও থানাটি দুটি অংশে বিভক্ত। পশ্চিমাংশে চারটি অঞ্চল - গতিষ্ঠা, পালিগ্রাম, চাণক ও লাকুড়িয়া। বাকিকে আমরা বলতাম পূর্বাঞ্চল। পশ্চিম অঞ্চলে ছিল বরাবর অজয় ও কুনুরের বন্যার পুনরাবৃত্তি। এ অঞ্চলে আমাদের জন-প্রিয়তা প্রথম থেকেই কিছু কিছু ছিল। পরে অজয় বাঁধ সংস্কার আন্দোলনে আমরা নিরন্তর অংশগ্রহণ করায় আমাদের জনপ্রিয়তা গভীরে ও ব্যাপ্তিতে প্রসারিত হয়।

পূর্ব মঙ্গলকোটে আমাদের যোগাযোগ ভালভাবে হয় দুর্ভিক্ষের রিলিফ ও খাদ্য আন্দোলনের সময়। আমরা সে সময়ে এখানে বেশ কিছু জন-সমর্থন অর্জন করি। কিন্তু জোতদার পরিবারগুলির, বিশেষ করে চৈতন্য-পুরের পরিবারের প্রভাবকে তখনও সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করতে পারিনি। পূর্বেই লিখেছি, জমি-জমা ও সুদী মহাজনী কারবারে এদের চরম প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্র থাকলেও ইংরেজ আমলে এরা নির্বাচন ইত্যাদি নির্দিষ্ট কার্যক্রমে কংগ্রেসের সমর্থক থাকতো। জেলা বোর্ড নির্বাচনে আমাদের আপত্তি সত্ত্বেও এই পরিবারের দু'জনকে কংগ্রেসের প্রার্থী করা হয়েছিল। তখনকার গৃহীত নীতি হিসাবে আমরা সব কংগ্রেস প্রার্থীকেই সমর্থন করেছিলাম। আমরা খাদ্য আন্দোলনের সময় থেকেই এই জোতদার পরিবারের বিরোধিতা করতে ও আলোচাকাল পর্যন্ত এদের প্রভাবকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করতে পারিনি। তাই আসনটি পেলাম না। পরে পেয়েছি এবং এখনও পেয়ে আসছি।

বর্ধমান ছাড়া আমাদের গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচন দাঁড়িয়েছিল গলসী, ভাতাড় কেন্দ্রে। কংগ্রেসের প্রার্থী দাঁড়িয়েছিলেন গলসী কেন্দ্রে প্রবীণ কংগ্রেস

নেতা শ্রীযাদবেন্দ্রনাথ পাঁজা এবং তপশিলী আসনে ছিলেন শ্রীমহীতোষ সাহা (সুপরিচিত ইঞ্জিনিয়র)। আমাদের সম্মিলিত ফ্রন্টের প্রার্থী ছিলেন শ্রীফকিরচন্দ্র রায় এবং কৃষ্ণচন্দ্র হালদার। আমরা অকাতর পরিশ্রম করে-ছিলাম, কিন্তু শেষে পরাজয় বরণ করতে হলো। পুরাতন ঐতিহ্যের মর্যাদা পাঁজা মহাশয়ের পক্ষে ছিল। নির্বাচন সম্পূর্ণ রাজনৈতিক ভিত্তিতে করতে হয়েছিল। পারস্পরিক ব্যক্তিগত অভিযোগ কিছু করারও ছিল না, যা উভয় পক্ষেই আমরা কিছু করিও নি। আসলে কংগ্রেসের সম্বন্ধে যে মোহ ছিল তা তখনও কাটেনি : পরবর্তী নির্বাচনে আমরা জয়ী হতে পেরেছিলাম, তবে তপশিলী আসনে সেবার প্রার্থী ছিলেন ফরোয়ার্ড ব্লকের প্রমথ ধীবর। আসানসোলে আমরা চিত্তরঞ্জন এলাকায় একজন প্রার্থী নির্বাচন করতে পেরেছিলাম।

বর্ধমান কেন্দ্রে কংগ্রেসের প্রার্থী ছিলেন বর্ধমানের মহারাজা। তাঁর বিরুদ্ধে আমরা প্রার্থী করেছিলাম কমরেড বিনয় চৌধুরীকে। গোড়ার দিকে বর্ধমানে আমাদের কর্মীর অভাব ছিল খুব বেশি। আমি ছাড়া আমার স্ত্রী রাবিয়া এবং আমার ছোট ভাই আমানুল্লাহ্ প্রধান অবলম্বন দাঁড়িয়েছিলেন। আমার ভাগ্নেও ছিলেন। কমরেড রাবিয়ার নেতৃত্বে মহিলাদের জন্য আলাদা সংগঠন করা হয়েছিল। আমানুল্লাহ্‌র বক্তৃতা শহর জুড়ে চিত্তাকর্ষক হয়েছিল। কর্মীর অভাবকে অনেকখানি পূরণ করতে হতো কমরেড শিবপ্রসাদ দত্তকে। কমরেড সুশীল ভট্টাচার্যকে বড় অংশের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। আর কমরেড কেষ্ট হালদার নিজেই গলসী-ভাতাড় কেন্দ্রে প্রার্থী ছিলেন, তবু যতটুকু শহরে থাকতেন ততক্ষণই "বি" ওয়ার্ডে আমাদের নির্বাচনের সংগঠন করতেন। আমি প্রতিদিন ভোরে উঠে বর্ধমান শহরে এক একটি পাড়া ধরে প্রতি ঘরে ভোটারদের সাথে দেখা করতাম। এইভাবে এক একটি পাড়া সেরে তাড়াতাড়ি স্নান করে খেয়ে জেলার অন্যান্য কেন্দ্রে চলে যেতাম। মোটরে, সাইকেলে, পায়ে হেঁটে সমস্ত রকমে সারা জেলা ঘুরতে হয়েছিল। যাই হোক, বিনয়দা প্রথম দিকটা জেলে ছিলেন, পরে জেল থেকে মুক্ত হওয়ায় অনেকটা বোঝা তিনি নিজে নিয়ে নিতে পারলেন। ফলে আমাদের, যাঁদের অন্য কেন্দ্রেও ছুটতে হতো, তাঁদের শহরের ভিতর পরিশ্রম একটু লাঘব হলো। বিনয়দা ও আমাতে দেখলাম যে শহরে যেরূপ নির্বাচনের উত্তেজনা হওয়া উচিৎ তা কিছুতেই সৃষ্টি করা যাচ্ছে না। তখন তিনি নির্বাচন-কেন্দ্রের গ্রাম

এলাকা থেকে স্বেচ্ছাসেবক সুসংগঠিত করে শহরের মধ্যে মিছিল করলেন। ব্যক্তিগতভাবে ঘরে ঘরে যে প্রচার চলছিল তার সুফল এই মিছিলের পর দেখা গেল। সমস্ত শহরের তরুণদের মধ্যে পার্টির প্রার্থীর পক্ষে উৎসাহের সঞ্চার হলো। শহরে আর এক বিরাট অসুবিধা দাঁড়িয়েছিল। এক একটা ওয়ার্ডে গোটা ওয়ার্ডের ভোটার তালিকায় নামের আদ্যক্ষর ধরে তালিকা ছিল। এতে তালিকা থেকে গ্রামে ভোটার বার করা ততো কঠিন হয় না, কিন্তু শহরে খুব কঠিন হয়। এক বাড়ির পিতা অমর হাজরার নাম এক জায়গায়, আর তার ছেলে যামিনী হাজরার নাম অন্য জায়গায়। পুরো বাড়ি অনুযায়ী সাজিয়ে ভোটার তালিকা তৈরি করতে প্রচণ্ড পরিশ্রম করতে হয়েছিল। বর্ধমান পুরসভার ট্যাক্স কালেক্‌টাররা শ্রীসুধাংশু সরকারের নেতৃত্বে এইরূপ তালিকা তৈরি করতে খুবই সাহায্য করেছিল। তাদের জন্য আলাদা অফিস করে দিয়েছিলাম। সেখানে সর্বদাই কাজ চলতো। ট্যাক্স কালেক্‌টাররা যখন সময় পেতেন সেখানে এসে অনেকখানি কাজ করে দিয়ে যেতেন। তাছাড়া যখন তাঁরা ডিউটিতে ঘুরতেন, তখনও ভোটারের নাম কোন্ বাড়ির তা খোঁজ করে আসতেন।

তখনকার নির্বাচন পদ্ধতিতে একটি ব্যবস্থা আমাদের খুব সহায়ক হয়েছিল। একই দিনে নির্বাচন হতো না। পশ্চিমে আসানসোল এলাকা থেকে শুরু করে পরপর প্রত্যেক নির্বাচন-কেন্দ্রে পোলিং-এর তারিখ পর্যায়ক্রমে ছিল। ফলে আমরা যে কেন্দ্রের পোলিং হয়ে যেত তার সব কর্মীদের অপর কেন্দ্রে নিয়ে আসতাম।

আসানসোলের বহু কর্মীদের আমরা বর্ধমান, গলসী, ভাতাড় নিয়ে আসি। সব শেষে হয় কালনা, মেমারীতে। পরে আবার সব কর্মীদের মেমারী, কালনায় নিয়ে এসেছিলাম। বস্তুতঃ এতেই বর্ধমান শহরে ভোটার নির্ণয় এবং পরিচিতি প্রায় সম্পূর্ণ করাতে আমরা সক্ষম হয়েছিলাম।

এইভাবে বর্ধমানে জনগণের বিভিন্ন শ্রেণীকে নির্বাচনের পক্ষে সংগঠিত করতে পারি। মহিলারা ও যুবকরা বেশ শক্তিশালী সংগঠন করতে পেরেছিলেন।

বিভিন্ন রাজনৈতিক মহলে বিনয়দার পরিচয় খুব ভালভাবেই ছিল। কিন্তু পাড়ায় পাড়ায় সাধারণ মানুষের মধ্যে স্বভাবতঃই সেরূপ পরিচয় ছিল না। নির্বাচনে প্রার্থী হলে সে হারলেও তার একটা পরিচয় সাধারণ মানুষের মধ্যে থাকে। কিন্তু রাজনৈতিকভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি হলেও প্রথম

প্রার্থী হয়ে সাধারণ মানুষের কাছে সেরূপ থাকে না, যদি না ব্যাপক কার্যক্রমে তিনি তাদের সাথে জড়িত থাকেন। বস্তুতঃ আমাদের যাঁরা খুবই শুভানুধ্যায়ী ছিলেন তাঁরাও জয়ের আশা করছিলেন না, এবং একটি নিশ্চিত পরাজয়ের আসনে দাঁড় করিয়ে বিনয়দাকে পরাজিত করা তাঁদের কাছে ভাল লাগছিল না। আমাদের একান্ত শুভার্থী নবাব দোস্ত কায়েম লেনের সুপরিচিত উকিল সরোজদা (শ্রীসরোজ চৌধুরী) একদিন আমাকে বললেন, মহারাজার বিরুদ্ধে যখন হারতেই হবে তখন বিনয়কে দাঁড় না করিয়ে আর কাউকে দাঁড় করিয়ে তামাশা করলে ভাল হতো। বর্ধমান শহরের সুপরিচিত ব্যবসায়ী ও পুরসভার সদস্য গৌরদা (শ্রীগৌর চৌধুরী) ছিলেন মহারাজার পক্ষে। তাঁর ছোট ভাই নিতাইদা (শ্রীনিতাই চৌধুরী) আমার অনুরোধের জবাবে আমাকে বললেন, "নির্বাচনের পোলিং-এর প্রাক্কালে আমাকে নিয়ে বের হবেন—তখন কয়েকদিনেই অনেক কাজ করে দিতে পারব।" অন্যান্য কারণ ছাড়া হাওয়া কিরূপ দাঁড়ায় তাই বোধহয় দেখছিলেন। বস্তুতঃ তাঁর নির্ণীত প্রোগ্রামে ভাল কাজ হয়েছিল। শেষে আমরা দু' হাজার চারশত ভোটে জয়লাভ করি। বুদ্ধিজীবী মহলে লক্ষণীয় সংখ্যার একদল মানুষ এতে স্তম্ভিত হয়ে যান।

এইখানে শহীদ কমরেড শিবশঙ্করের একটি নির্দেশ স্মরণ করতে হয়। তিনি বরাবর বলতেন এবং নিজ প্র্যাকটিসে তাই দেখাতেন যে শহরে ভোট সংগঠকদের ভোর ৬টার মধ্যে পথে নামতে হবে। কারণ সকালে কিছুক্ষণের মধ্যেই মানুষ কাজে বেরিয়ে পড়বে। ঐ ফাঁকে মানুষের সাথে দু'টো কথা কয়ে নেবার চেষ্টা করতে হবে। কেউ বাজার যাচ্ছেন, কেউ বাজার থেকে ফিরছেন—এরই মধ্যে কথা সারতে হবে। বেশি কথা না হোক, তাঁদের জানা থাকবে যে আমরা তাঁদের কাছে গেছি। দেখা করার সময় বিতরিত প্রচারপত্র তাঁর কাছে থাকবেই। তাছাড়া সভা, পথসভা প্রভৃতির উপর নির্ভর করতে হবে। কালো (শহীদ শিবশঙ্কর চৌধুরী)-র এই নির্দেশিত নীতি আমরা অনুসরণ করার চেষ্টা করতাম। ১৯৩৬ সাল থেকেই বিধান সভার নির্বাচন, পৌরসভার নির্বাচনে এইরূপ কর্মপন্থা গ্রহণ করে তিনি দক্ষ সংগঠক হয়েছিলেন। আমি দু-একটি নির্বাচন জানি, যেখানে আমাদের পরাজয় হবার মূল কারণের মধ্যে অন্যতম কারণ ছিল বেলায় বের হওয়া, যখন কাজের লোক ঘরে খুব কমই থাকেন। ঘরে টোকা মেরে ব্যর্থ হয়ে ফিরতে হয়।

আমি ভোর ৬টা সাড়ে-৬টার মধ্যে শহরের পথে বেরোতাম এবং নিয়মিতভাবে ঘরে ঘরে পাড়ার পর পাড়া ঘুরে যেতাম। বেলা ১০টার পরে বাড়ি এসে স্নান করে খেয়ে গ্রামে বেরিয়ে যেতাম। জেলা পার্টির সম্পাদক কমরেড সুবোধ চৌধুরী এক পুরনো মোটর গাড়ি যোগাড় করে-ছিলেন। গাড়িটা খুব পুরনো হলেও কার্যক্ষম ছিল, তার পেছনে সাইকেল বেঁধে নিতাম। যেখানে গাড়ি যাবে না সেখানে ৬-৭-৮ মাইল সাইকেলে ঘুরে আবার গাড়িতে এসে উঠতাম। অনেক ক্ষেত্রেই পায়ে হাঁটতে হতো। এইরূপে দু-একদিন গ্রামে ঘুরে রাত্রে শহরে চলে আসতাম। শহরে আবার উপরে বর্ণিত উপায়ে পাড়ার পর পাড়া ঘুরে আবার গ্রামের দিকে বেরিয়ে যেতাম। গ্রামের দিকে বর্ধমান সদর মহকুমায় গলসী, ভাতাড়েও আমাদের বামপন্থী প্রার্থী দাঁড় করানো হয়েছিল। পূর্বেই বলেছি, এখানে কংগ্রেসের প্রার্থী ছিলেন স্বয়ং পাঁজা মশায় এবং ইঞ্জিনিয়ার শ্রীমহীতোষ সাহা, এবং আমাদের প্রার্থী ছিলেন ফকিরদা (শ্রীফকিরচন্দ্র রায়) এবং তপশিলী আসনে কমরেড কৃষ্ণচন্দ্র হালদার। বলা বাহুল্য, ১৯৫১-৫২ সালের নির্বাচনে এই দুটি আসন সম্মিলিত আসন ছিল। প্রার্থীদিগকে এবং সংশ্লিষ্ট আমাদের সকলকে এই নির্বাচন কেন্দ্রে অকাতর পরিশ্রম করতে হয়েছিল। একদিনের কথা স্মরণ আছে। হঠাৎ মনে পড়ল, মহাচান্দার নিকট ধরমপুর-শিবপুর আমার যাওয়ার কথা ছিল। কাজের ভিড়ে বাদ পড়ে গেছে। পরের দিন ভোরে বাসে গিয়ে কাটোয়া রোডে নেমে পায়ে হেঁটে গ্রাম দুটি সেরে এলাম। এত পরিশ্রম সত্ত্বেও আমরা এই দুটি আসন পাইনি। একথা পূর্বেও বলেছি, পুনরাবৃত্তিতে দোষ নেই। নির্বাচনে পরাজয় ছাড়া কেষ্টর ব্যক্তিগত কিছু ক্ষতি হয়ে-ছিল। কারণ ব্যক্তিগতভাবে তাঁকেও বেশ কিছু খরচ করতে হয়েছিল।

নির্বাচনের ফলাফলে প্রত্যেকটি কেন্দ্রেই আমরা ভবিষ্যৎ সংগঠনের জন্য শক্তি লাভ করি। নির্বাচনের আসন ও প্রার্থী নিয়ে বোঝাপড়া করবার সময় পার্টির প্রবক্তা হিসাবে দুটি বিষয় আমি লক্ষ্য রেখেছিলাম। প্রত্যেকটি পুরসভা অঞ্চলে যেন আমরা প্রার্থী দিতে পারি, এবং বর্ধমান শহর থেকে চারটি মহকুমা কেন্দ্রে যোগাযোগ ব্যবস্থা ধরে যাতে আমাদের নির্বাচনের সংগ্রাম চলে সেদিকে লক্ষ্য রাখি। তবে আসানসোল কেন্দ্রে প্রত্যাহার করায় আমাদের চেন কিছুটা কেটে যায়।

বস্তুতঃ যে সুফল আশা করেছিলাম তাই হয়েছিল। মেমারী-কালনায় একটি আসন লাভ করলাম, কাটোয়াতেও আসন লাভ করলাম,

সুতরাং জেলার পূর্বদিকে তিনটি মহকুমা-কেন্দ্র এবং তিনটি প্রধান শহরই পার্টির শক্তিশালী কেন্দ্রে পরিণত হলো। যোগাযোগের মূল পথ ধরে সমস্ত জেলাটাই প্রায় পার্টির সংগঠনের অল্প-বিস্তর প্রভাবে এলো। বর্ধমান থেকে কাটোয়া বা বর্ধমান থেকে কালনা গোটা রাস্তাটাই পড়ল এমন এলাকা দিয়ে যেখানে আমাদের নির্বাচনের ভাল সংগঠন করতে হয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত তা সম্ভবও হয়েছিল। সেই এক কথা বলা চলে কিছু অংশ বাদ দিয়ে বর্ধমান থেকে আসানসোল পর্যন্ত। প্রথমকার এই সূচনা ত্বরিত সমগ্র জেলায় পার্টির প্রভাবের বিস্তৃতির সুযোগ করে দিয়েছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই।

গলসী

গোড়া থেকেই পার্টির সদস্য ও কর্মীরা পার্টির প্রসারের জন্য সারা জেলায় যখন যেখানে সম্ভব হতো, সম্পর্ক ও যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করতেন। তখনও পার্টি গঠন হয়নি। যুব সম্মেলন উপলক্ষে গলসী থানায় বিভিন্ন জায়গায় এমন কি পশ্চিম দিকে গলসী থানা পার হয়ে কাঁকসা পর্যন্ত গিয়েছি। ক্যানেল কর বিরোধী আন্দোলনের সময় কমরেড বিপদবারণ রায় গলসী থানার বিভিন্ন জায়গায় ক্যানেল কর আদায় বন্ধ করার প্রচারে যান। কয়েক দিন তাঁর খবর না পাওয়ায় ছাত্র-কর্মী কমরেড নাড়ুকে খুঁজতে পাঠাই। নাড়ুদের 'আনন্দ প্রেস' নামে এক সুপরিচিত প্রেস ছিল। এঁর দাদা সদানন্দ ও ইনি পার্টির ঘনিষ্ঠ সমর্থক ছিলেন। নাড়ু কিছুদিন সদস্যও ছিলেন। তাঁরা উভয়েই পার্টিকে সাহায্য করতেন। কমরেড কৃষ্ণানন্দ ব্যানার্জী ওরফে নাড়ুকে তাঁর খোঁজের জন্য গলসী থানায় পাঠাই। একের পর এক গ্রামে কমরেড বিপদের অনুসরণ করে তিনি উচ্চগ্রামে গিয়ে খবর পান, কমরেড বিপদ সেই গ্রামে গ্রেপ্তার হয়ে বর্ধমান জেলে নীত হয়েছেন। তালিতের কমরেড ধর্মদাস মিশ্র সাটিনন্দী অঞ্চল ও ভুড়ি অঞ্চলে যোগাযোগ রাখতেন। ছাত্র-কর্মী কমরেড ধর্মদাস রায় ছিলেন বেলগাঁয়ের অধিবাসী। কমরেড নাসেরের বাড়ি খানোগ্রাম। ত্রিশ দশকের শেষে তাঁদের মাধ্যমেও কিছু যোগাযোগ ছিল। ১৯৪৩-৪৪ সালে ইউনিয়ন ফুড কমিটি গঠিত হয়। কমরেড ক্ষুদিরাম মাঝি সাটিনন্দী ইউনিয়নের ফুড কমিটির সম্পাদক ছিলেন। শ্রীউমাপতি সাধু ছিলেন সভাপতি। উক্ত ইউনিয়নে আমাদের চরম বিরুদ্ধে ছিলেন জনবিরোধী শ্রীমহাদেব রায় ও তাঁর সমর্থকগণ। কমরেড ক্ষুদিরাম মাঝি ছিলেন সাঁকো স্কুলের শিক্ষক। তিনি নানানভাবে স্থানীয় জনমঙ্গলের কাজে লিপ্ত থাকতেন। আমি সদর মহকুমা ফুড কমিটির সম্পাদক থাকায় এঁদের সঙ্গে যোগাযোগ হয়। এই যোগাযোগ পরে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে পরিণত হয়। এঁদের জনমঙ্গলের কাজে জনপ্রিয়তা অর্জন

লক্ষ্য করে মহাদেব রায় ও তাঁর সাঙ্গপাঙ্গরা এ'দের কাজে বাধা ও বিঘ্ন দিতে থাকেন। আমাদের খুব বেশি কাজ না থাকলেও প্রয়াত কমরেড ধর্মদাস মিশ্র নিয়ত যে যোগাযোগ বৃদ্ধি করার চেষ্টা করতেন, তার বিরুদ্ধেও বাধা আসতো মহাদেব রায়ের। আমি ঠিক করলাম, কমরেড ক্ষুদিরাম মাঝি ও ঐ ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট উমাপতি সাধুর যে দল নিরবচ্ছিন্ন ভাবে মহাদেব রায়ের বিরোধিতা করতে বাধ্য হচ্ছেন—তাঁদের আমাদের সম্বন্ধে রাজনৈতিক ধ্যান ধারণা না থাকলেও জনমঙ্গলের কাজে তাঁদের সহযোগিতায় যুক্ত হলে গলসী এলাকায় পার্টি প্রসারের কাজ ভালভাবে হবে। সুতরাং কমরেড ধর্মদাস মিশ্রের সঙ্গে আমিও এ'দের সঙ্গে মিলিত হলাম।

এই সময় ফুড কমিটির হিসাবে অনভিপ্রেত এবং অসাবধানতার কারণে ঘটিত সামান্য গরমিলের সুযোগ নিয়ে মহাদেব রায়, উমাপতি সাধু ও ক্ষুদিরাম মাঝি দিগরের বিরুদ্ধে এক বিশেষ অপচেষ্টা শুরু করেন। তখনকার আইনে কিছু অভিযোগের বিচারে জেলা বোর্ড ইউনিয়ন বোর্ডকে বাতিল করতে পারতো। উপরে উল্লিখিত হিসাবের গরমিলকে মহাদেব রায় এই কাজে লাগাবার চেষ্টা করলেন এবং জেলা বোর্ডের সভায় এ বিষয় উপস্থিত করে তাঁর অভিপ্রায় সিদ্ধ করার চেষ্টা করলেন। আমি তথ্যগুলি দেখে বুঝলাম, হিসেবের ভুল অনবধানতায় ঘটেছে। এর সুযোগ কোন নিয়োজিত বেতনভোগী কর্মী নিয়ে থাকলেও উমাপতি সাধু বা ক্ষুদিরাম মাঝি যে তার জন্য দায়ী নয় এটা পরিষ্কার। সুতরাং মহাদেব রায়ের চক্রান্ত ব্যর্থ করার জন্য আমিও জেলা বোর্ডের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করলাম এবং উমাপতি সাধু ও ক্ষুদিরাম মাঝির বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ যে অভিসন্ধিমূলক তা বোঝাবার চেষ্টা করলাম। আমাদের সমবেত চেষ্টার ফল ভাল হলো এবং ইউনিয়ন বোর্ড বাতিলের অপপ্রয়াস বিফল হলো।

সাধারণের হিতার্থে যাঁদের কাজ করার উৎসাহ আছে, কমিউনিস্ট কর্মীদের সঙ্গে তাঁদের মিল হতে এবং ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি হতে দেরী হয় না। উপরোক্ত ঘটনার পর আমাদের সঙ্গে কমরেড ক্ষুদিরামের সম্পর্ক আরও গভীর হয়। ১৯৪৮-৪৯ সালে আমরা যখন আত্মগোপন করে আছি তখন তালিতের কমরেড ধর্মদাস মিশ্র ও অন্যান্যদের মাধ্যমে গলসীর সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রেখেছিলাম এবং নিরন্তর পার্টির প্রসারের চেষ্টায় ছিলাম। এই সময় কমরেড ধর্মদাস আমাকে সাটিনন্দীর ব্যগ্রক্ষত্রিয়ে পাড়ায় নিয়ে গিয়ে সেখানে থাকার ব্যবস্থা করেন। মাত্র দু-একদিন ছিলাম। খুব সযত্নেই ছিলাম। প্রত্যেকটা ঘর প্রাচীর দিয়ে আলাদা করা নয়, সুতরাং

আড়ালে থাকা সম্ভব ছিল না। কমরেড যিনি আশ্রয় দিয়েছিলেন, বললেন, "ভাববেন না, এখনই দেখবেন ভদ্রলোকেরা কেউ কেউ পাঁচুই খেতে আসবেন (অর্থাৎ পাড়ায় বে-আইনী চোলাই হতো)। ওরা যে উদ্দেশ্যে আসে ভাববে আপনিও সেই উদ্দেশ্যে এসেছেন।" এই সময় একদিন বোধ হয় উমাপতি সাধু মহাশয়ের বৈঠকখানাতেও ছিলাম। ধর্মদাস এ'র কাছ থেকে পার্টির কাজের জন্য একটা সাইকেল পেয়েছিলেন। তিনি অনেক জমির মালিক। সুতরাং, বলা বাহুল্য, পরে আমাদের বিরোধী হন। ১৯৬৭ সালে আমি যখন বিধানসভায় এই এলাকা থেকে নির্বাচনে দাঁড়াই, তখন শ্রীউমাপতি সাধু কংগ্রেস প্রার্থীর সমর্থনে আমার ঘোর বিরোধিতা করেন।

১৯৫০ সালে জেল থেকে বেরোবার পর পরিবর্তিত অবস্থায় যোগাযোগ সম্প্রসারণের চেষ্টা করতে থাকি। কমরেড ক্ষুদিরাম সক্রিয়ভাবে খুবই সাহায্য করতে থাকেন। এই সময়ে জেলা বোর্ডের নির্বাচন এসে পড়ে। গলসীর পূর্ব ও পশ্চিমে দু'টো আসনে প্রার্থী দেওয়ার প্রশ্ন ওঠে। পশ্চিম দিকটায় ফকিরদার প্রস্তাব অনুযায়ী শ্রীনীরদ শ্যাম বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রার্থী করা হয়। পূর্বদিকে আমাদের প্রার্থী দেওয়ার কথা ছিল। কমরেড ক্ষুদিরামের সঙ্গে আমার আলাপ হয়। সঙ্গে সঙ্গে অতুলদার অর্থাৎ চাননার শ্রীঅতুল সামন্তর কথা আলোচনা করি। কমরেড ক্ষুদিরাম বলেন, তাঁকে অর্থাৎ চাননার অতুলদাকে প্রার্থী করাই ঠিক হবে। অতুলদা পুরাতন কংগ্রেস কর্মী। ফকিরদার সহযোগী হিসাবে তিনি পরিচিত। মহকুমা ও জেলা কংগ্রেসে দক্ষিণপন্থীদের বিরুদ্ধে একজোট হওয়ার সময়েও তিনি আমাদের দিকে ছিলেন। অবিলম্বে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা হলো। তিনি প্রার্থী হতে সম্মত হলেন। তাঁর নির্বাচনী কাজকর্মের দায়িত্ব আমরাই গ্রহণ করলাম। অন্যতম প্রধান সংগঠক ছিলেন কমরেড ক্ষুদিরাম মাঝি। গলসীর দু'টো আসনেই আমরা কংগ্রেসকে পরাজিত করে জয়ী হলাম।

ছাত্র ফেডারেশনের কর্মী ওদুদ ও স্থানীয় উদ্যোগী সহায়ক কমরেড সাহাদতের কথা উল্লেখ করা উচিত। বোধ হয় এই সময়েই খেতুরার ওবেদুল বারি ও অন্যান্য যুবকদের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ হয়। বলা বাহুল্য, খানো, সাটিনন্দী প্রভৃতি অঞ্চলে পূর্ব থেকেই যাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল, জেলা বোর্ড নির্বাচনে তাঁরা পূর্ণ উদ্যমে সক্রিয় হন।

এর পরে আসে বিধানসভার নির্বাচন। গলসী, ভাতাড় মিলিত হয়েছিল যুক্ত কেন্দ্র। সাধারণ আসনে প্রার্থী হলেন ফকিরদা। তপশিলী আসনে আমাদের প্রার্থী করলাম কমরেড কৃষ্ণচন্দ্র হালদারকে। নির্বাচনের সংগ্রাম ছিল কঠোর। কংগ্রেসের পক্ষে প্রার্থী ছিলেন স্বয়ং শ্রীযাদবেন্দ্রনাথ পাঁজা এবং তপশিলী আসনে ইঞ্জিনিয়ার মহীতোষ সাহা। ব্যক্তিগতভাবে পাঁজা মশায় সকলের সম্মানিত। কংগ্রেসের মধ্যে থাকাকালে আমরা তাঁর বিরোধিতা করলেও ব্যক্তিগতভাবে তিনি আমাদের সকলেরই শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। আমরা মূল রাজনৈতিক প্রশ্নের উপর দাঁড়িয়েই নির্বাচনে সংগ্রাম করেছিলাম। পরাজিত হয়েছিলাম বটে, কিন্তু বেশি ভোটে নয়। উভয় নির্বাচনে আমাদের যোগাযোগ বেশ সম্প্রসারিত হলো। কৃষক সমিতি ও পার্টির সংগঠন ভালভাবে প্রতিষ্ঠিত হলো।

আউসগ্রাম

এর পূর্বেই কৃষক সমিতির দ্বিতীয় জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠান উপলক্ষে আউসগ্রামে আমাদের সংগঠন প্রসারের চেষ্টার কথা লিখেছি। তখন আমরা বিশেষ কিছু প্রসার করতে পারিনি। ১৯৩৩ সালে হাটগোবিন্দপুরে প্রথম জেলা কৃষক সম্মেলনে গুসকরার সুপরিচিত কংগ্রেস কর্মী মুক্তিদা (মুক্তি চট্টোপাধ্যায়) অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং কার্যকরী সমিতিতে নির্বাচিত হয়েছিলেন। আলুট সম্মেলন তার চার বৎসর পর। কমরেড হেলারাম মুক্তিদার সঙ্গে আলোচনা করেন। মুক্তিদা সম্মত হন ও দায়িত্ব গ্রহণ করেন। আউসগ্রামের পশ্চিমে আসানসোল মহকুমার কাঁকসা থানা (বর্তমানে দুর্গাপুর মহকুমা)। কাঁকসা থানায় সোঁয়াই গ্রামে তাঁর (কমরেড হেলারামের) বাড়ি। তাঁর আশা ছিল, এইভাবে পশ্চিম দিকে এগোতে পারলেই আউসগ্রামের পর কাঁকসা থানায় সংগঠন প্রসারিত করা যাবে। কিন্তু মুক্তিদা তেমন দৃঢ় অবলম্বন ছিলেন না। সম্মেলন অনুষ্ঠানের প্রারম্ভিক কাজ আরম্ভ করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর উৎসাহে ঘাটতি পড়ল। বর্ধমান কংগ্রেসের জেলা কেন্দ্রের দক্ষিণপন্থীরা তাঁর উপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করলেন। তখন তিনি এই প্রয়াস থেকে সরে দাঁড়াবার ইচ্ছা করলেন। কিন্তু যেহেতু কথা দিয়ে দিয়েছিলেন, সরতেও পারলেন না। এইরূপ দোটানায় পড়লে যা হয় তাই হলো। দু-এক জায়গায় পরিচয় ইত্যাদি করে দিচ্ছেন, অথচ আসল কাজে গা লাগাতে পারছেন না। প্রয়াত কমরেড দাশরথি চৌধুরী ও শহীদ কমরেড সুকুমারের উপরেই প্রধান দায়িত্ব পড়ে। মনসুরও পরে যোগ দেন। আমি নিজে অন্যত্র নিযুক্ত থাকায় লাগাতার থাকতে পারি না, মাঝে মাঝে আমি আসতাম। হুগলী জেলার এক কমরেড যতীনও এসে আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন। চাঁদা স্থানীয়ভাবে বিশেষ উঠেনি। সবই প্রায় জেলার অন্যত্র থেকে আনতে হয়েছিল। তখন পুরোদমে ক্যানেল কর বিরোধী আন্দোলন শুরু হয়ে গেছে। ভাল পরিমাণ চাল সংগ্রহ হলো সেখান থেকে। তেল, ডাল

প্রভৃতি বর্ধমানের ব্যবসাদারদের কাছ থেকে সংগৃহীত হয়েছিল। অন্যতম প্রধান উদ্যোগী ছিলেন কমরেড সন্তোষ খাঁ। অর্থ সংগ্রহ হয়েছিল বর্ধমান শহর ও অন্যান্য এলাকা থেকে। যাই হোক, মুক্তিদা মানুষের থাকা ইত্যাদির ব্যবস্থায় যেটুকু সাহায্য করেছিলেন তাই যথেষ্ট মূল্যবান হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এইভাবে কোন মতে সম্মেলনের অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা হয়। কমরেড মুজফ্ফর আহমদের সভাপতিত্বে সম্মেলনের কাজকর্ম ভালভাবেই সম্পাদিত হয়। কিন্তু এই অনুষ্ঠানে স্থায়ী কোন দাগ বসে না। কৃষক-সভার ন্যূনতম যে সংগঠন তা আমরা গড়ে তুলতে পারিনি।

অজয়ের বন্যার প্রতিকারের উদ্যোগ আগেই আরম্ভ হয়েছিল পশ্চিম মঙ্গলকোটে। এতে আমরা যোগ দিই। অজয়ের বন্যায় আউসগ্রামেরও বেশ কিছু অংশ প্লাবিত হতো। স্থানীয় নেতৃবৃন্দ এবং আমাদের মিলিত প্রয়াসে নদীর ডানদিক ধরে আউসগ্রামেও আমরা এগোতে থাকি। এইভাবে আমাদের কাজের গণ্ডীর মধ্যে এসে পড়ে গুসকরা, উক্তা, ভেদিয়া, বেরেণ্ডা ও রামনগর ইউনিয়নের বন্যা-প্লাবিত অংশসমূহ। সঙ্গে সঙ্গে কমরেড দাশরথি চৌধুরী ও কমরেড বিপদবারণ রায়ের নেতৃত্বে কৃষক সমিতির সংগঠন গড়ে উঠতে থাকে। আন্দোলন চলছিল, সমগ্র জনগণকে নিয়ে প্রতিষ্ঠিত অজয় বাঁধ কমিটির নেতৃত্বে। বলা বাহুল্য, প্রধান উদ্যোগী ছিলেন কৃষক সমিতি ও কমিউনিস্ট পার্টির কর্মীরা। পার্টির তরফ থেকে কমরেড দাশরথি চৌধুরী সংগঠিত প্রয়াস পরিচালিত করছিলেন। ১৯৪৫ সালে গুসকরায় বর্ধমানের মহারাজার সভাপতিত্বে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এর কথা পূর্বে বর্ণনা দিয়েছি। পশ্চিম মঙ্গলকোটের চারটি ইউনিয়ন— গতিষ্ঠা, লাকুড়িয়া, পালিগ্রাম ও চাণকের সঙ্গে যুক্ত হন উপরে উল্লিখিত আউসগ্রামের পাঁচটি ইউনিয়নের জনগণ।

আউসগ্রামে উল্লিখিত পাঁচটি ইউনিয়নে কৃষক সমিতি সংগঠিত রূপ গ্রহণ করে। কিন্তু ইতিমধ্যে ১৯৪৮ সালে পার্টি বেআইনী ঘোষিত হয়। ফলে যেমন আমাদের অন্য সকলকে তেমনি এখানকার নেতৃস্থানীয় কর্মী কমরেড দাশরথি চৌধুরী ও কমরেড বিপদবারণ রায়কেও গা ঢাকা দিতে হয়। আমাদের অর্থাৎ পার্টি-সভ্যদের সংখ্যা তখন কম। ফলে নেতৃত্বে যাঁরা ছিলেন তাঁদের সংখ্যাও কম। প্রত্যেককেই বড় বড় এলাকা ধরে কাজ চালাতে হতো। কমরেড অশ্বিনী মণ্ডল খুব অসুস্থ হওয়ায় ইতিমধ্যে গ্রামেই থাকছিলেন। সুতরাং কমরেড দাশরথি চৌধুরীকে কাটোয়া, মঙ্গল-কোট থেকে শুরু করে আউসগ্রাম পর্যন্ত ঘুরতে হতো। পার্টি বেআইনী

ঘোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের কাটোয়া অফিসে ভোরে পুলিশ রেড করে। থানার পুলিশ, যাদের আই বি. নিয়ে এসেছিল, তারা কড়া নাড়ে এবং জোর গলায় দরজা খোলার জন্য চেঁচামেচি করে। বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষাও করে। বোধ হয় স্থানীয় থানা অফিসারের উদ্দেশ্য ছিল ঘরের বাসিন্দাদের সামলে দেবার। কমরেড দাশরথি চৌধুরী ও অন্যান্য কর্মীরা এই সুযোগে ছাদে ছাদে লাগোয়া কাটোয়া শহরের ছাদ টপকে টপকে পালাতে পেরেছিলেন। পুলিশ কাউকে না পেয়ে ফিরে যায়। শহরের একজন কর্মী চাবি লাগিয়ে দিয়ে যান। গ্রামে এ খবর পেয়ে কমরেড অশ্বিনী মণ্ডল শরীরের অবস্থার কেয়ার না করে কাটোয়া চলে আসেন। শহরের কর্মীর কাছ থেকে চাবি নিয়ে ঘর খুলে অফিসের দায়িত্ব নেন। বলা বাহুল্য, কিছুদিনের মধ্যে তিনি গ্রেপ্তার হন।

কমরেড দাশরথি চৌধুরী গা ঢাকা দিয়ে থাকেন এবং ঘোরাঘুরি করতে থাকেন। একদিন ভোরে কাটোয়া-বর্ধমান রেলে বর্ধমানের দিকে আসছিলেন। ইতিমধ্যে দেখেন আই. বি-র নজরে পড়েছেন। তখন চলন্ত ট্রেন থেকে লাফিয়ে পড়েন। আহত হন।

যাই হোক, তিনি পার্টির কাজ চালাতে থাকেন। শেষে হাড়ে ক্যান্সার হয়। অপারেশনের পর মারা যান। এরপর আউসগ্রাম অঞ্চলে সংযোগ রাখা কঠিন হয়, কিন্তু দু-একজন কর্মীর উদ্যোগে সংগঠনের যোগা-যোগ বজায় রাখা সম্ভব হচ্ছিল।

আউসগ্রাম থানা বড় থানা। বোধ হয় তখনকার প্রশাসনিক ব্যবস্থায় ইউনিয়ন ছিল পনেরোটি এবং ছয়টি ছিল জঙ্গল মহল। তার এক কোণে মাত্র পাঁচটি ইউনিয়নে আমাদের সংগঠন।

১৯৫১ সালে জেলা বোর্ড নির্বাচনের সময় প্রার্থী মনোনয়ন করা, নির্বাচন সংগঠন করা, এসবের দায়িত্ব এসে উপস্থিত হলো। আমাদের যদিবা কিছু যোগাযোগ ছিল, অন্যদের তো কিছুই ছিল না। আমাদের সেই যোগাযোগে যোগ্য প্রার্থী মনোনয়ন করা এবং নির্বাচন সংগঠন করা কঠিন ছিল। প্রগতিশীল ব্লকের তরফ থেকে শৈলেশদা ও আমাকে ভাবনা-চিন্তা করতে হয়। বিপদদা তখন দামোদরের দক্ষিণে আণ্ডারগ্রাউণ্ডে। যাই হোক, তাঁকে খবর পাঠিয়ে আনিয়ে আউসগ্রামে পাঠানো হলো। আমরা ভাবছিলাম গুসকরার ডাক্তার বিজয় গড়াইকে দাঁড় করাবো। এমন সময় খবর পেলাম তাঁকে সাত্তার সাহেব কংগ্রেসের প্রার্থী করতে সমর্থ

হয়েছেন। ফলে আমাদিকে অন্য কথা ভাবতে হলো। ইতিমধ্যে কংগ্রেসের মধ্যে বিক্ষোভ দেখা দিয়েছিল। পুরাতন প্রয়াত কংগ্রেস কর্মী প্রীতিভাজন গোবর্ধন পাল (তাঁকে আমরা মাতুল বলতাম) সহ গুসকরার অনেক কংগ্রেস কর্মী সাত্তার সাহেবের এই মনোনয়নকে স্বৈরাচার মনে করছিলেন। সেইজন্যই এই প্রার্থীকে পরাজিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। আমরা তাঁদেরই একজন ডাঃ অনন্ত মিত্রকে প্রার্থী করার চেষ্টা করছিলাম। ব্যর্থ হলে অনন্যোপায়ে শৈলেশদাকে বাধ্য হয়ে দাঁড়াতে হবে এরকম ভাবছিলাম। যেদিন মনোনয়নের শেষ তারিখ, সব পক্ষই বর্ধমান কাছারি কম্পাউণ্ডে জড়ো হয়েছিলাম, এমন সময় বন্ধুবর গোবর্ধন পাল আমাকে এসে প্রস্তাব করলেন যে তাঁরা প্রার্থী ঠিক করে দেবেন। সেই প্রার্থী কংগ্রেসের বিরুদ্ধে প্রার্থী হবেন, কিন্তু প্রগতিশীল ব্লকে যোগদান করতে পারবেন না। তিনি বিক্ষুব্ধ কংগ্রেসীদের উল্লেখ করে বললেন, তিনি তাঁদের মনোনীত প্রার্থী হবেন—তাঁদেরই প্রার্থী। তিনি স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসাবে দাঁড়াবেন। আমাদের তাঁকে সমর্থন করতে হবে, এই তাঁর অনুরোধ। ইতিমধ্যে আউসগ্রামের উক্ত ইউনিয়নের প্রেসিডেণ্ট আবদুস সাত্তার কমরেড বিপদবারণ রায়ের চিঠি নিয়ে হাজির। বিপদদা সাত্তারের বাড়িতে থেকেই সেখান থেকে চিঠি দিয়েছেন। চিঠিতে তিনি লিখেছেন, সাত্তারের প্রস্তাব শৈলেশদাকে দাঁড় করানো হোক। তিনিও সেই প্রস্তাব সমর্থন করেছেন। সাত্তারের এত উদ্যোগ দেখে আমার সন্দেহ হয়েছিল। গা-ঢাকা কালে সাত্তারের সঙ্গে একদিন ট্রেনে দেখা হয়। শুনেছিলাম কংগ্রেসের নরেন চাটুজ্যের সঙ্গে তাঁর খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হয়েছে। নরেন চাটুজ্যে তাঁর সমবায় সমিতির জালে তাঁকেও গাঁথতে পেরেছেন। নরেন চাটুজ্যের সঙ্গে তাঁর জমেছে একথা তিনি স্বীকার করলেন না। বললেন, "নরেনবাবু বলেন, কমিউনিস্টরাই শেষকালে জিতবে, সবই চীনের মতো হবে। সুতরাং এখনই যা পারো পকেটে দু-পয়সা গুটিয়ে নাও।" ট্রেনের সেই কথা সাত্তারের মনে ছিল না, কিন্তু আমার মনে ছিল। সুতরাং আমি মনে মনে সিদ্ধান্ত করলাম, বিপদদা বুঝতে পারেন নি—এই প্রস্তাব সাত্তারের নয়, এই প্রস্তাব নরেন চাটুজ্যের। শৈলেশদা আউসগ্রামের বাসিন্দা নয়, শৈলেশদাকে সহজেই হারানো যাবে। এই ছিল নরেনবাবুর মনোভাব। সুতরাং আমি আর দ্বিধা করলাম না। আমি পরিষ্কার অস্বীকার করলাম এবং বললাম, "শৈলেশদা রাজি নয়।" সঙ্গে সঙ্গে গোবর্ধন পালের সিদ্ধান্তই মেনে নেব ঠিক করলাম। গোবর্ধন পালের প্রস্তাবিত প্রার্থী ডাঃ কপিল

চৌধুরী। আমি জানতাম, গোবর্ধন মাতুলের প্রস্তাব তাঁর একার নয়। এর পিছনে শ্রীনারায়ণ চৌধুরীও আছেন। ডাঃ অনন্ত মিত্রও ঐ প্রস্তাব সজোরে সমর্থন করলেন। ঘনিষ্ঠ না হলেও ডাঃ কপিল চৌধুরী আমার পরিচিত। বর্ধমানে আমার ঘনিষ্ঠ পরিবারের জামাই। উকিল ব্রজদা (শ্রীব্রজ চৌধুরী)-র ভগ্নিপতি। তিনি মনোনয়ন-পত্র দাখিল করলেন।

যাতে তাঁদের পরিচয় আমাদের সঙ্গে গাঁথা না হয়ে যায় তার জন্য বন্ধুবর গোবর্ধন পালের সতর্কতা ছিল খুব বেশি। নির্বাচনের দ্বন্দ্ব ক্রমোত্তর তাঁদের আমাদের দিকে ঠেলে দিচ্ছিল। সম্মিলিত ব্লকের সমর্থিত স্বতন্ত্র প্রার্থীদের সমর্থনে বিতরণের জন্য আমাদের এক পৃথক ঘোষণা-পত্র ছিল। একদিন বন্ধুবর গোবর্ধন হঠাৎ এসে আমাকে বললেন, তাঁদের প্রার্থী কপিল চৌধুরী এখন সম্মিলিত ব্লকের প্রার্থী হবেন। সেইরূপ কিছু ঘোষণা-পত্র থাকলে আমাকে দিতে বললেন। আমি তাই তাঁকে দিয়ে দিলাম। এর পরের ধাপে আর এক পা এগোলেন। নির্বাচনের প্রাক্কালে আমি মোটর নিয়ে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরে মানকর হয়ে গুসকরা পৌঁছালাম। গুসকরায় পৌঁছালে বন্ধুবর গোবর্ধন কর্তৃক সম্বর্ধিত হলাম। অনেক মানুষ জড়ো হয়েছিলেন। বন্ধুবর গোবর্ধন বললেন, "কমিউনিস্ট পার্টি সমর্থন করছে এই মর্মে একটি ভাষণ দেন।" আমি চকিত হইনি একথা বললে মিথ্যা বলা হবে। আমার গাড়িতে মাইক লাগানো ছিল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেই মাইকে প্রার্থীকে কমিউনিস্ট পার্টির সমর্থন এবং কমিউনিস্ট পার্টির সারা রাজনৈতিক বক্তব্য জোর গলায় বললাম। বুঝলাম, আমার সমর্থন তাঁদের সন্তোষ লাভ করেছে। দুঃখের বিষয় এই আসনটিতে আমরা মোট ৩৬ ভোটে হেরে যাই। শ্রীগোবর্ধন পাল জড়তা বর্জন করে প্রথম থেকেই কমিউনিস্ট সমর্থন ঘোষণা করলে নিশ্চয়ই জয় হতো। প্রার্থী দাঁড় করানোতে তাঁদের মনোনয়ন ও সমর্থন অবলম্বন যেমন প্রয়োজন ও মূল্যবান ছিল, তাঁদের পক্ষেও আমাদের সমর্থন ঘোষণা তেমনি প্রয়োজন ও মূল্যবান ছিল। তাঁদের সমর্থন করায় জড়তা বর্জন ও সমর্থন কার্যকর করা যে সঠিক হয়েছিল তা প্রমাণিত হলো। কংগ্রেসের বিকল্প কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব ও সহযোগিতায় বামফ্রন্টের সাফল্যের সম্ভাবনা তখনই দেখা দিয়েছিল। ঘটনা পরম্পরায় এই পরিণতির একটি ছবি তুলে ধরার জন্য এ বিষয়ে এতখানা লিখলাম।

এরপর এল বিধানসভার নির্বাচন। সম্মিলিত ফ্রন্টের সিদ্ধান্তে আউসগ্রামের আসন দেওয়া হয়েছিল ফরোয়ার্ড ব্লককে। জেলায় ফরোয়ার্ড

ব্লকের নেতা শ্রীশক্তি চট্টোপাধ্যায় তখনও প্রার্থী ঠিক করতে পারেন নি। একদিন কলকাতায় কাজে এসেছিলাম। সরোজদার বাড়ি আউসগ্রাম থানায়, বাহাদুরপুর। তাঁর সঙ্গে আলোচনা করছিলাম। তিনি ১৯৩০-৩২ সালের আন্দোলনের এক সহকর্মীর কথা বললেন। তিনি বললেন যে, সে দেখা করতে এসেছিল এবং কোথাও দাঁড়ানো যায় নাকি, তার এই মনের কথা তাঁকে বলছিল। ফরোয়ার্ড ব্লকের প্রার্থী হতে তার আপত্তি হবে না, এবং যেহেতু ব্যবসা করছে, নির্বাচনের ব্যয়ও করতে পারবে -এটা আন্দাজ করলাম। আমি প্রস্তাব লুফে নিয়ে শ্রীশক্তি চট্টোপাধ্যায়কে জানিয়ে দিলাম। কিন্তু জানানোর পরই আর এক সম্ভাবনা দেখা দিল। গোবর্ধন পালের সঙ্গে একদিন পথে দেখা হলো। তিনি বললেন, হায়াত সাহেবকে যদি দাঁড় করানো যায় তাহলে তাঁরা ভালভাবে সমর্থন করবেন। ইতিপূর্বেই জেলা বোর্ড নির্বাচনের অভিজ্ঞতায় দেখেছিলাম, কমিউনিস্ট পার্টির বেশ বিবেচ্য রকমের সমর্থন জনসাধারণের মধ্যে আছে। ফরোয়ার্ড ব্লকেরও কিছু সমর্থন থাকবে। তার সঙ্গে গুসকরার বিক্ষুব্ধ কংগ্রেস কর্মীদের সমর্থন থাকলে হায়াত সাহেবকে জয়ী করাও যেতে পারে, যদি নির্বাচনের খরচটা যোগাড় করা যায়। জেলা বোর্ড নির্বাচনের অভিজ্ঞতায় একথা মনে হলো। অবিলম্বে শ্রীচট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলোচনা করলাম। হায়াত সাহেবকে ফরোয়ার্ড ব্লকের সমর্থিত প্রার্থী হিসাবে দাঁড় করাতে বললাম। শক্তিবাবু রাজি হলেন এবং আমাকে যোগাযোগ করতে বললেন। হায়াত সাহেব তখন গ্রামে থাকতেন। আমি সেদিনই তাঁকে খবর দিলাম। তিনি পরের দিন এলেন। ইতিমধ্যেই, গোবর্ধন পালের সঙ্গে কথা হবার আগে সরোজদার প্রস্তাবিত যে প্রার্থীর কথা আমি শক্তিবাবুকে বলেছিলাম, তিনি শক্তিবাবুর সাথে দেখা করেছেন এবং প্রার্থী করা হয়ে গেছে। বুঝলাম, আসন নিশ্চিত হারাব। কিন্তু তখন আর উপায় নেই। আসনটি অন্য পার্টির অর্থাৎ ফরোয়ার্ড ব্লকের জন্য নির্ধারিত ছিল। সুতরাং আমাদের কিছু বক্তব্য বলার সুযোগ নেই।

বর্ধমানে মিউনিসিপ্যাল নির্বাচন, ১৯৫৫

১৯৫০-এর পর ১৯৫৫ সালের মিউনিসিপ্যাল নির্বাচন। ১৯৪৬ থেকে ১৯৫৫-র মধ্যে দেশে বড় বড় ঘটনা ঘটে গেছে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয়েছে। দেশ স্বাধীন হয়েছে ও খণ্ডিত হয়েছে। জেলায় ও রাজ্যেও উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছে। ১৯৫১ সালে জেলা বোর্ড নির্বাচন হয়েছে আমরা জিতেছি। ১৯৫২ সালে বিধানসভার নির্বাচন হয়েছে। বর্ধমান শহরে ও কাটোয়ায় আমরা জিতেছি। কালনা শহরে যুক্ত আসনের মধ্যে একটি আসনে আমরা জিতেছি। চিত্তরঞ্জনেও আমরা একটি আসনে জিতেছি। আসানসোল শহরে আমরা না হলেও অন্য কংগ্রেস-বিরোধী দল জিতেছে। এইভাবে বর্ধমান জেলায় শহরাঞ্চলে কংগ্রেসের বিপর্যয় ভালভাবেই হলো। সুতরাং ১৯৫৫ সালে মিউনিসিপ্যাল নির্বাচনে আমাদের এক বিশেষ দায়িত্ব পড়ে গেল।

বিনয়দা ও আমরা বর্ধমান শহরে নির্বাচনটা ভালভাবে সংগঠিত করতে সচেষ্ট হলাম। 'গণতান্ত্রিক নাগরিক সমিতি' নামে একটি সম্মিলিত ফ্রন্ট গঠিত করলাম। অনেক বাধা এবং জটিলতা অতিক্রম করে তবে এই সংস্থা গঠন করা সম্ভব হয়েছিল। প্রয়াত নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায় এর সম্পাদক হয়েছিলেন। এঁকে বিনয়দাই বেশ প্রভাবিত করে আনতে পেরেছিলেন।

আমি নির্বাচনের ঘোষণা-পত্র রচনা করেছিলাম। হরেকেষ্ট এই ঘোষণা-পত্র ছোট করতে সাহায্য করেছিলেন। বাংলাদেশে তখন পৌর-সভায় সার্বজনীন ভোট ছিল না। সুতরাং সার্বজনীন ভোটের দাবি আমাদের একটি প্রধান দাবি ছিল। তাছাড়া অর্থ-ব্যবস্থার দিক দিয়ে একটি বড় দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছিল। জনস্বাস্থ্য কোন বাউণ্ডারী দিয়ে ঠিক রাখা যায় না। সংক্রমণ যে কোন দিক থেকে হতে পারে। বাতাসও তো সংক্রমণের বাহক। সুতরাং এটি একটি জাতীয় কাজ, একটি এলাকার কাজ নয়। পৌরসভাগুলিকে, যার যেমন অর্থ

সঙ্কুলান হবে সে তেমনি স্বাস্থ্য-ব্যবস্থা রক্ষা করবে—একথা বললে গোটা দেশের স্বাস্থ্য রক্ষা করা সম্ভব নয়। সুতরাং জনস্বাস্থ্য সর্বত্র সঠিক রাখতে হলে সারা দেশের অর্থ-তহবিল থেকে তার দায়িত্ব নেওয়া উচিত, যদিও ব্যবস্থাপনা থাকবে স্থানীয় নির্বাচিত সংস্থার উপর। প্রাথমিক শিক্ষাও সেই রকম জাতীয়। ছেলে হয়তো গ্রামে মানুষ হচ্ছে, কিন্তু জাতি হয়তো তার কাছ থেকে কাজ পাবে কোন শহরে বা অন্য কোন গ্রামাঞ্চলে। সারা দেশে শিল্প ও কৃষির উন্নয়নের জন্য শিক্ষিত শ্রমিকের প্রয়োজন। সুতরাং প্রাথমিক শিক্ষার খরচও বহন করতে হবে কেন্দ্রীয় তহবিল থেকে। এইভাবে আর্থিক বিশ্লেষণ আমরা নাগরিকদের কাছে উপস্থিত করে-ছিলাম। ১৯৫৩ সালে মিউনিসিপ্যাল আইনে একটি সংশোধনী পাশ য়েছিল, তাতে কিছু গুরুত্বপূর্ণ ত্রুটি ছিল। তার বিরুদ্ধেও প্রতিকার দাবি করা হয়েছিল। মিউনিসিপ্যাল এলাকায় কারখানাগুলিতে ট্যাক্সে বড় রকমের ছাড় দেওয়া ছিল। কংগ্রেস গভর্ণমেণ্ট সেই ছাড়ের অবলুপ্তি করেন নি। সেই ছাড়ের অবলুপ্তির দাবি করা হয়। (বস্তুতঃ সেই ছাড়ের অবলুপ্তি হয় কংগ্রেস-বিরোধী ফ্রন্টের আমলে, বামপন্থীদের উদ্যোগে।)

শুধু আমাদের জেলায় নয়, সারা রাজ্যে এবং সারা দেশে হরেকেষ্ট ছিলেন আমাদের শ্রেষ্ঠ বক্তাদের অন্যতম। নির্বাচনের প্রধান বক্তব্য জনগণের সামনে রাখার জন্য আমরা কমরেড হরেকেষ্টকে ঠিক করি। বস্তুতঃ নির্বাচন ওপন করার দায়িত্ব পড়ল কমরেড হরেকেষ্টর উপর। এদিকে তিনি পূর্বে মিউনিসিপ্যালিটি সংক্রান্ত কোনও আলোচনায় না থাকায় তাঁর এক অসুবিধা ছিল। কিন্তু তাঁর মনোনিবেশ করবার ক্ষমতা ছিল। যেদিন বিকেলে বক্তৃতা দিতে হবে, সেদিন বেলা ১০টা নাগাদ পৌঁছেই সামান্য কিছু খেয়ে নিয়ে আমার নিকট আইন-কানুনের পুস্তক এবং আমার নোটস্ এবং ঘোষণা-পত্রের খসড়া নিয়ে বসে পড়লেন। বেলা ৪টা নাগাদ সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে গেলেন। অবিলম্বে বীরহাটার মিটিং-এ বক্তৃতা দিতে হলো, বীরহাটার পর শ্যামসায়রের পাড়ে ঈশ্বরীতলায়, এবং পরের দিন বোরহাট প্রভৃতিতে। সমস্ত সভা সার্থক সভা হলো। মানুষ মনোযোগ দিয়ে নীরবে শুনেছে। এর মধ্যে অনেক কথাই ছিল আইন ও তত্ত্বের কথা। তাকে মনোজ্ঞ করে পেশ করা কমরেড হরেকেষ্টর বড় কৃতিত্ব।

নির্বাচনে একটা বড় ভুল হয়েছিল, যার জন্য আমাদিগকে খেসারত দিতে হয়েছিল। তখনও পৌরসভায় ছিল 'প্লুর্যাল সীট', অর্থাৎ একাধিক আসনবিশিষ্ট। কোন ওয়ার্ডে ৬টি, কোন ওয়াডে ৫টি, কোন ওয়ার্ডে ৪টি,

কোন ওয়ার্ডে ৩টি—এই রকম। নির্বাচনে যে-কোন অবস্থায় জয়ের সুনিশ্চয়তা আছে এ রকম না হলে সব ক'টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করাই ভাল, অর্থাৎ ৬টির জায়গায় হয়তো ৫টিতে দাঁড় করালাম। কোন ভোটারের কোন বিশেষ প্রার্থীর উপর বিশেষ ঝোঁক থাকলে তিনি একটি ভোট সেই প্রার্থীকে দিন, কিন্তু বাকি ভোট আমাদের তালিকায় দিন -এই রকম বলা চলতো। এতে আমাদের বলারও সুযোগ থাকতো এবং ভোটারেরও তাঁর মনোনীত এক প্রার্থীকে খুশি করার রাস্তা থাকতো। কিন্তু এবারে আলোচনা না হওয়ায় শেষকালে দেখলাম সব আসনেই আমাদের প্রার্থী। আমাদের প্রচারকরা কমিউনিস্ট ছাড়াও অন্যান্য প্রার্থীদের ভোট দেবার জন্য প্রচার করছিলেন। কিন্তু সম্মিলিত ফ্রণ্টের ও অন্য প্রার্থীরা নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য নিয়ে প্রচার করে যাচ্ছিলেন। অবশ্য বেশি ক্ষতি হতে পারেনি, ফ্রণ্ট জয়ী হলো। কিন্তু আমাদের নিজস্ব প্রার্থী কয়েকটি আসনে হারলেন। আমাদের পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শৈলেশদা চেয়ারম্যান হলেন।

পরবর্তী বিধানসভা নির্বাচন

প্রথম বিধানসভা নির্বাচনের পর বেশ কিছু দায়িত্ব আমাদের উপর পড়লো। এসব দায়িত্ব অবশ্য আগেও ছিল, কিন্তু আইনসভার সদস্য হিসাবে রাষ্ট্রের কাঠামোর মধ্যে বিভিন্ন অংশে তা ধ্বনিত করার সুযোগ আমাদের হাতে এলো। স্বভাবতঃই সেইসব কাজ কি করছি না করছি, এর দিকে জনগণের নজর পড়লো বা আমরাও আন্দোলনের মাধ্যমে সেদিকে তাঁদের মনোযোগ আকর্ষণ করলাম। সব চেয়ে নিয়মিত দাঁড়িয়ে গেল খাদ্যের জন্য আন্দোলন এবং বান, খরা ইত্যাদির সময় রিলিফের জন্য আন্দোলন।

অনেকদিন আন্দোলন ও সংগ্রামের ফলে এখন সরকারী ব্যবস্থায় বেশ কিছু দায়িত্ব নেওয়াতে পারা গেছে। বর্তমানে রাজ্যের সরকারী ক্ষমতায় আমরা আসায় অনেক কিছু সমস্যাও সরল করতে পারা গেছে। পূর্ণ সমাধান অবশ্যই বিপ্লব সার্থক হওয়ার পর্যায়ে আশা করা যায়। কিন্তু এর মধ্যেই যেটুকু রিলিফ ভারতের বর্তমান গঠনতন্ত্রের আয়ত্তে থেকে উসুল করা যায়, তার জন্য আমাদের চেষ্টা চলছে বিরতিহীন এবং বেশ কিছু সুফল আদায় করা সম্ভব হচ্ছে। কিন্তু এই রাজ্যে আমরা শাসন ক্ষমতায় আসীন হবার পূর্বে ক্ষমতা ছিল কংগ্রেসের হাতে, এখন যেমন কেন্দ্রে আছে। অন্যায় অবিচার বিশৃংখলা -এই ছিল কেন্দ্র ছাড়াও রাজ্য সরকারগুলির চরিত্রে। এরই বিরুদ্ধে দিনের পর দিন আমাদের সংগ্রাম করে যেতে হয়েছে। ধান, চাল সংগ্রহ সরকারী ব্যবস্থায় ঠিকমত হতো না, দরে কৃষককে ঠকানো হতো, রেশন এলাকা এত প্রসারিত ছিল না। আর রেশন এলাকার বাইরে ক্রেতাদের জন্য খাদ্যের দাম পুরো নাগালের বাইরে চলে যেত। সুতরাং প্রতি বৎসর আমাদের খাদ্য আন্দোলন করতে হতো এবং তার জন্য বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করা হতো। সভা, শোভাযাত্রা, মিছিল, হরতাল, ধর্মঘট সবই করা হয়েছে। সঙ্গে স্বৈরাচারী কংগ্রেস-রাজ এইসব অহিংস আন্দোলনে নিরীহ, নিরস্ত্র মানুষের উপর গুলি চালাতে দ্বিধা করেনি। নানান সমস্যার উপর আমরা অবশ্য শহরে ও গ্রামে কংগ্রেসের

স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে নিরন্তর সংগ্রাম করে যাচ্ছিলাম। এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচন সংগ্রাম হয়েছে পুরসভাগুলিতে, এ বিষয়ে আমরা অন্যত্র আলোচনা করেছি। বর্ধমানে আমরা জয়ী হয়েছি এবং শ্রীশৈলেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে চেয়ারম্যান ও শ্রীচন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায়কে ভাইস-চেয়ারম্যান নির্বাচিত করি।

এরপর ১৯৫৭ সালের বিধানসভার নির্বাচন। এই নির্বাচনে আমাদের বিরুদ্ধে প্রার্থী ছিলেন কংগ্রেস সংগঠনের পদাধিকারী। তবু আমরা এই নির্বাচনে জয়ী হই এবং কমরেড বিনয় চৌধুরী নির্বাচিত হন। ইতিপূর্বে বলেছি, ১৯৫২ সালে আমরা কাটোয়ার আসন পেয়েছিলাম কম ভোটেই, ১০ জনের অধিক প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে ভোট ভাগ হয়ে যাওয়ায়। ১৯৫৭ সালে শুধু কংগ্রেসের সঙ্গে আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা হওয়ায় আসনটি আমাদের হারাতে হলো। অবশ্য ১৯৬২ সালে আমরা পুনরায় পাই এবং তারপর থেকেই পেয়ে আসছি।

কালনায় আমরা বেশ বড় ভোটে জয়ী হই এবং সাধারণ আসন ও তপশিলী আসন উভয়ই লাভ করি। সাধারণ আসনে কমরেড হরেকৃষ্ণ কোঙার এবং তপশিলী আসনে কমরেড সুচাঁদ সোরেন জয়ী হন। ৫২ সালে তপশিলী আসনে আমাদের প্রার্থী ছিলেন জমাদার সাঁওতাল। তিনি জয়ীও হয়েছিলেন। কিন্তু পরে মুশকিল হয়েছিল তাঁকে নিয়ে। একে তো নিরক্ষর, কোনো মতে স্বাক্ষর করাটা শিখিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কিছুদিন যেতে না যেতেই চিন্তার কারণ দেখা দিতে লাগল। গ্রামের আদিবাসী, ক্ষেতমজুর—বিধানসভায় যে অবস্থান দাঁড়াল তাতে খুব পরিপক্ক রাজনৈতিক মাথা না থাকলে এই আবহাওয়া হজম করা কঠিন। সর্বদাই তাঁকে নজরের উপর রাখতে হতো। কংগ্রেসীরা নিরন্তর তাঁকে দলে টানার চেষ্টা করে যেতো। তিনি অবশ্য সদস্য থাকাকালে চলে যাননি, যদিচ উপক্রম সেরূপ হয়েছিল। গ্রামের স্বজাতি এবং ক্ষেতমজুর শ্রেণীর ভয়েই তিনি বিপথে যেতে সাহস করেন নি। কিন্তু আমাদিগকে বরাবর উদ্বিগ্ন রেখেছিলেন। ফলে এবারে তাঁকে আর আমরা প্রার্থী করিনি। প্রার্থী করি সাধারণ আসনে কমরেড হরেকৃষ্ণ কোঙার ও তপশিলী আসনে কমরেড সুচাঁদ সোরেনকে। তাঁর বাড়ি নির্বাচন-কেন্দ্রের মধ্যেই, কিন্তু তিনি থাকতেন বাঁকুড়াতে, পড়াশুনাও সেখানে করেছিলেন। পার্টির সংস্পর্শে এসে পার্টিতে প্রবেশ করেন বাঁকুড়াতেই। এবারেও আমরা উপরোক্ত উভয় আসনেই বিজয়ী হই। এই নির্বাচন হরেকেষ্টর পক্ষে একটা বড় কৃতিত্ব।

গাড়ি ব্যতিরেকে শুধু সাইকেলে আর পায়ে হেঁটে হরেকেষ্ট মেমারী ও কালনা থানার সমস্ত গ্রাম ঘুরেছিলেন। এছাড়া পার্টির অন্যান্য নির্বাচন-কেন্দ্রে জেলার সর্বত্র তাঁকে বক্তৃতাও দিতে হয়েছিল।

যাই হোক, এবারে ফল আমাদের সবদিক থেকেই ভাল হয়। তবে কাটোয়াতে আমরা পরাজিত হই। বর্ধমানে আমরা মাত্র ৪০০ মতো ভোটের ব্যবধানে জিততে পারি, অর্থাৎ আর সামান্য হেরফের হলে আমরা হারতাম।

১৯৬২ সালে অন্যান্য নির্বাচন-কেন্দ্রে মনোযোগ দেওয়া সত্ত্বেও আমার প্রধান কর্মকেন্দ্র ছিল বর্ধমান শহর কেন্দ্র। নির্বাচন কেন্দ্রের বিভিন্ন গ্রাম এলাকার বেশ কিছু প্রধান প্রধান ব্যক্তি কাজ বা পেশার কারণে বর্ধমানেই থাকতেন। তাঁদের গ্রামের ভোটও অনেকখানা তাদের উপর নির্ভর করত। এই ধরণের মানুষ বেশির ভাগই আমার কিংবা আমার বন্ধুস্থানীয় ব্যক্তিদের পরিচিত। সুতরাং শুধু শহরের কাজ নয়, গ্রামের কাজেও আমাকে বর্ধমান শহরে প্রচুর ঘুরতে হতো। যেমন হয়তো কমরেড তারাপদ মোদক গ্রামে ঘুরতে ঘুরতে বলগনায় অজিত কুণ্ডুর কাছে খবর নিয়ে আমাকে লিখলেন, "গ্রামে বর্ধমানের সুপরিচিত উকিল শ্রীপ্রবোধ কোঙারকে ধরা হয়েছে। আপনি শহরে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করুন।" অবশ্য এই চিঠি পাওয়ার আগেই আমি প্রবোধবাবুর সঙ্গে দেখা করেছিলাম। তবুও আমি রাত্রে সেই চিঠি পেয়ে পরদিন সকালেই পুনরায় প্রবোধবাবুর কাছে ঘুরে এলাম। এইরূপ প্রয়াসের ফলে বলগনায় আমরা ভালভাবে ভোট পেলাম। আমাদের কাজের পদ্ধতি বোঝাবার জন্য এ দৃষ্টান্তটি দিলাম। অন্যান্য সংগঠকদের ক্ষেত্রেও এই ধরণের অভিজ্ঞতা পাওয়া যাবে।

মঙ্গলকোটে ১৯৫২ ও ১৯৫৭ সালে দু'বারই আমাদের প্রার্থী শ্রীশৈলেশ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীজ্যোতিষ সিংহ পরাজিত হন। এরপর ১৯৬২ সালে আসনটি তপশিলী আসন হয়ে যায় এবং আমরা ব্যবহারজীবী নারায়ণ দাসকে প্রার্থী করে ঐ আসনটি লাভ করি। ১৯৬৭ সালে জেলার অন্যতম কমিউনিস্ট নেতা শহীদ শিবশঙ্কর চৌধুরীকে প্রার্থী করেও আমরা পরাজিত হই। তখনও আমাদের পার্টির শক্তি এই কেন্দ্রটিতে আমাদের প্রার্থীকে অবশ্যম্ভাবী জয়ী করার মতো হয় নি। ১৯৬৭-৬৯-এর মধ্যে রাজনৈতিক অবস্থা আমাদের অনুকূলে আসে। ১৯৬৯ সালে আমরা কমরেড নিখিলানন্দ সরকে প্রার্থী করি এবং জয়লাভ করি। মঙ্গলকোট আসনটি এখনও আমরা পেয়ে আসছি।

খাদ্য আন্দোলন, ১৯৫৯

১৯৫১ সাল থেকে খাদ্যের দাবিতে আন্দোলন অবস্থার গতিকে প্রতি বৎসর নিয়মিত অনুষ্ঠান হয়ে দাঁড়ায়। সভা, শোভাযাত্রা, ভুখা মিছিল প্রতি বৎসরই আমাদের করতে হচ্ছিল। গরীবরা স্বল্প উৎপন্ন ফসলের দামেও মার খাচ্ছিল। গরীব ও মধ্যবিত্ত কৃষককে বৎসরের গোড়ার দিকে বাধ্য হয়ে কম দরে ফসল বিক্রী করতে হতো। ধানকলের মালিক ও ব্যবসায়ীরা গোড়ার দিকে সস্তায় ধান কিনে বাঁধি করতো। আর বড় বড় জমির মালিকরা ধান বাঁধি করে রেখে দিত। এইসব কারণে খাদ্য সংকট একটি নিয়মিত ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

এছাড়া খাদ্য ও কৃষিমন্ত্রী প্রফুল্ল সেন চাষীকে উৎপাদন ব্যবস্থায় সাহায্য করার দিকেও ছিলেন উদাসীন। ১৯৬৭-তে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিত্ব গঠন হবার আগে কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব সরকারী উদ্যোগে পাম্প দিয়ে জল সরবরাহ করার ব্যবস্থা করেনি এবং কৃষককেও পাম্প সরবরাহ করেনি। তাদের অন্যতম নীতি হিসাবেই পাম্প ব্যাপারে সাহায্য বন্ধ করে রেখেছিল। ১৯৬৭ সালে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিত্ব প্রথম পশ্চিমবাংলায় এই ব্যাপারে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন। যুক্তফ্রন্টের অর্থমন্ত্রী কমরেড জ্যোতি বসু বলেই দিয়েছিলেন, কৃষককে উৎপাদনে সাহায্য দান থাকবে তাঁর অন্যতম লক্ষ্য। কংগ্রেস আমলে খাদ্য ও কৃষিমন্ত্রী ধান ভাঙা কলের (হাস্কিং মেশিন) অনুমতিতে কার্পণ্য করেন নি, যদিচ পাম্প প্রয়োগের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন নিষ্ক্রিয়। অর্থাৎ গ্রামে যন্ত্র প্রবেশে তাঁর সমর্থন ছিল। কিন্তু চাষের সাহায্যে নয়। এইসবের ফলে একদিকে খাদ্য উৎপাদন ছিল বিঘ্নিত ও ব্যাহত, অন্যদিকে গরীব কৃষক, শ্রমিক ও মধ্যবিত্ত সাধারণ মানুষের মধ্যে ঘটছিল কঠিন খাদ্যাভাব।

১৯৫৯ সালে কমিউনিস্ট পার্টি সিদ্ধান্ত করেন, কংগ্রেস সরকারের সৃষ্ট খাদ্য সংকটের এই চক্রকে ভাঙতেই হবে। একই দিনে সারা পশ্চিম-বাংলার জেলায় ও মহকুমার সরকারী দপ্তরে এবং কলকাতায় রাজ্য

সরকারের দপ্তরে র‍্যালি করার সিদ্ধান্ত হয়। ঠিক হয় বর্ধমানে কমরেড বিনয় চৌধুরী র‍্যালির নেতৃত্ব করবেন। কিন্তু সেই ভোর রাতেই তাঁকে বাসস্থান থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। কমরেড বিনয় কোঙার নেতৃত্ব দেন এবং পুলিশের আক্রমণ সত্ত্বেও র‍্যালিকে সার্থক করেন। কমরেড বিনয় কোঙার এবং আরও কয়েকজন গ্রেপ্তার হন। কলকাতায় ঐদিন বিরাট মিছিল বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ বা লালদীঘির পথে আটকে পুলিশ গুলি চালনা করে। নিরীহ অপেক্ষমান জনতার উপর গুলি চালনায় আশি জনের উপর নিহত হন।

দক্ষিণ-বাম বিতর্ক, ভারত-চীন যুদ্ধ ও পার্টি

চল্লিশ দশকের শেষের দিকে অতি বামপন্থী মত পার্টিতে পরাজিত হয়। এই সময় আন্তর্জাতিক নেতৃবৃন্দ অনেকে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলেন এই জেনে যে ভারতের পার্টির কোন প্রোগ্রাম নেই। ১৯৫১ সালে অতি বাম এবং দক্ষিণপন্থীরা উভয়েই পরাজিত হয়। একটি সুস্থ রাজনৈতিক মত ও পথ গৃহীত হয়। যাঁরা একদিন দক্ষিণপন্থায় পার্টিকে সর্বনাশের পথে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং পরে সমভাবে বামপন্থী ঝোঁকে পার্টিকে বিধ্বস্ত করার ব্যবস্থা করেছিলেন সেই ভবানী সেন, সোমনাথ লাহিড়ী প্রমুখ আবার দক্ষিণ দিকের ঝোঁক নিয়ে উপদলীয় চক্রান্ত আরম্ভ করলেন। অবশ্য গৃহীত প্রোগ্রামের মধ্যেও কিছু ত্রুটি থেকে গিয়েছিল। দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থী উভয় ঝোঁকেরই অবকাশ ছিল। কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগে পার্টিকে অভিজ্ঞতার শিক্ষায় কিছু কিছু কর্মরীতি পরিবর্তন করে যেতে হচ্ছিল। কিন্তু সদ্য ডিগবাজী দেওয়া দক্ষিণপন্থীরা পুনরায় পার্টিকে ক্রমাগত বিভ্রান্তির পথে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছিলেন। পার্টিকে তাঁরা প্রায় কংগ্রেসের অনুগামী করার চেষ্টায় থাকলেন পার্টির সুস্থ নীতি ও কার্যক্রম থেকে তাঁদের মত ও পথের ব্যবধান বিরতিহীনভাবে বেড়ে যাচ্ছিল। বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী জাত্যভিমান ও পরিপূরক জাতি-বৈরিতায় তাঁরা নিমজ্জিত হয়েছিলেন। এর বিস্তৃত আলোচনা পার্টি পত্রিকা ও নানান পুস্তক-পুস্তিকায় আলোচিত হয়ে আছে। সুতরাং পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নেই।

ব্যবধান যেরূপ বেড়ে যাচ্ছিল তাতে পার্টির বিভক্তীকরণ আশু প্রয়োজন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। পার্টির নিরন্তর অগ্রগতির প্রয়াসে এঁরা প্রতি পদক্ষেপে বিঘ্ন উপস্থিত করছিলেন। বুর্জোয়া নেতৃত্ব চীনের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন এবং সমগ্র দেশকে জাতি-দম্ভ ও জাতি-বৈরিতায় মত্ত করার চেষ্টা করলেন। দক্ষিণপন্থীরা নির্লজ্জভাবে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকতার আদর্শকে বিসর্জন করে বুর্জোয়াদের এই মত্ত নৃত্যে যোগদান করলেন। সুখের বিষয়, তাঁরা পার্টি কাঠামোকে খুব কমই প্রভাবিত করতে পারলেন।

বিশেষ করে পশ্চিমবাংলায় তাঁদের আঘাত শুধু আঁচড়ে পরিণত হলো। জওহরলাল নেহরু চীনের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার পর অবস্থা চূড়ায় উঠল। যুদ্ধে বিপর্যয় ও আসামে তেজপুর বেদখলের পর কংগ্রেস ও শাসকশ্রেণী যুদ্ধ ও রাজনীতি উভয়েতেই ব্যর্থতা ঢাকার জন্য সি পি আই-র বিরুদ্ধে উন্মত্ত হুঙ্কার শুরু করলেন। শান্তির পক্ষে সি পি আই-এর অভিমতকে তাঁরা দেশদ্রোহিতার আখ্যা দিলেন এবং যখন চীনের সৈনিক যুদ্ধ থামিয়ে ফিরে গেছে তখন পশ্চিমবাংলায় কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দকে গ্রেপ্তার করে আটক করলেন। বলা বাহুল্য, এঁরা সব দক্ষিণপন্থীদের বিরোধী। গ্রেপ্তার হলেন কমরেড মুজফ্ফর আহ্মদ, কমরেড জ্যোতি বসু, কমরেড প্রমোদ দাশগুপ্ত, কমরেড হরেকৃষ্ণ কোঙার, কমরেড সরোজ মুখার্জী এবং আরও অনেকে। পশ্চিমবাংলার প্রাদেশিক ও জেলা কমিটির সদস্য যাঁরা গ্রেপ্তার হননি অথচ দক্ষিণপন্থীদের বিরুদ্ধে পার্টির মর্যাদা রাখতে বদ্ধপরিকর, তাঁদের সামনে কর্তব্যের আহ্বান এল।

আমাদের কয়েকজনকে দু-দিক ভাবতে হচ্ছিল। প্রাদেশিক স্তরে করণীয় এবং জেলাস্তরে করণীয়। একদিন রাত্রে আমরা জেলার কয়েকজন বিনয়দার বাসায় মীট করলাম। কালো, আমি এবং কমরেড সুবোধ চৌধুরী ছিলাম। আর কেউ ছিলেন কিনা মনে পড়ছে না। ঠিক হল, বিনয়দা ও কমরেড সুবোধ চৌধুরী আণ্ডারগ্রাউণ্ডে যাবেন। আণ্ডারগ্রাউণ্ডে যাবার বিশেষ সমস্যা হলো গোপনে থেকে কাজ করে যাওয়া। সাইকেলে বা পায়ে দ্রুত এক স্থান থেকে আর এক স্থান গমনাগমনের ক্ষমতা ছিল অপরি-হার্য প্রয়োজন। আমার অসুখ-বিসুখের পর শরীরের সে ক্ষমতা পূর্বের মত আর ছিল না। সুতরাং ১৯৪৮-৪৯ সালে যেমন আণ্ডারগ্রাউণ্ডে গিয়েছিলাম, এবার আর সে ক্ষমতা ছিল না। ঠিক হল যে আমি প্রকাশ্যে থেকে পার্টির কাজকর্ম ও সাংগঠনিক ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ করে যাব যতদিন না ধৃত হই। অবশ্য এরকম প্রকাশ্য কাজে গ্রেপ্তার এবং জেলে আটক অবধারিত সেটা জানা ছিল। কমরেড কালোও প্রকাশ্যে থাকলেন। বিনয়দা ও কমরেড সুবোধ চৌধুরী আণ্ডারগ্রাউণ্ডে গেলেন অর্থাৎ গা-ঢাকা দিলেন।

প্রাদেশিক কমিটির অফিস তখন দক্ষিণপন্থীরা দখল করেছেন। সেখানে অফিসের কর্মীদের মধ্যে কিছু কমরেড ছিলেন যাঁরা আমাদের সঙ্গে একমত। অফিসে কি হচ্ছে তার খবর মাঝে মাঝে তাঁদের মাধ্যমে পেতাম। আমার কাজ ঘটে পড়ল দু'দিকেই। প্রাদেশিক স্তরে কমরেড

সমর মুখার্জী এবং কমরেড বিনয় চৌধুরী গোপনে থেকেও যোগাযোগের চেষ্টা করেছিলেন। আমরা যারা বাইরে প্রকাশ্যে ছিলাম তারাও সক্রিয় হলাম। ওদিকে জেলান্তরেও যোগাযোগ রেখে যাচ্ছি। দু-দিকের ঘটনাই যা আমার স্মরণে আছে বলে যাচ্ছি, কিন্তু আলাদা আলাদাভাবে বলবো। যদিচ একই সময়ের মধ্যে দু-দিকের কাজেই অংশ নিতে হয়েছে।

একদিন কমরেড কমল সরকার আমার সঙ্গে বাসায় দেখা করলেন। তখন স্বাধীনতা পত্রিকা পরিচালনাতেও দুই ভাগ হয়ে গেছে। কমরেড অধীর চক্রবর্তী, কমরেড কমল সরকার, কমরেড সুধাংশু দাশগুপ্ত প্রমুখ যাঁরা দক্ষিণপন্থীদের বিরুদ্ধে—তাঁদেরও পত্রিকা ছাড়িয়ে পার্টির কথা ভাবতে হলো। কমরেড কমল সরকারের সঙ্গে কথায় আশু করণীয় কি তা আলাপ হয়েছিল কিন্তু এখন তা মনে নেই। কিছুদিনের মধ্যেই কমরেড কমল সরকার গ্রেপ্তার হলেন। ইতিমধ্যে দক্ষিণপন্থী নেতৃবৃন্দ যাঁরা প্রাদেশিক কমিটির স্টিয়ারিং হাতে নিয়েছিলেন, এস এ. ডাঙ্গেকে নিয়ে এসে পশ্চিমবাংলা ও কলকাতায় পার্টি সদস্যদের মিটিং ইত্যাদি করবেন ঠিক করলেন। তাঁদের প্রোগ্রাম নির্ধারিত হলো। হাওড়া-হুগলি জেলা কমিটির এবং কলকাতা ও ২৪-পরগণার সদস্য ও সভ্যদের নিয়ে সভা হবে, এবং প্রাদেশিক কমিটির সদস্যদের নিয়েও সভা হবে।

ও'দের এই প্রোগ্রামের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদেরও প্রোগ্রাম করতে হলো। কমরেড রাধিকা ব্যানার্জী ও কমরেড যামিনী সাহা আমার সঙ্গে দেখা করলেন। কলকাতা জেলা কমিটির কমরেড নরেশ পাল ও কমরেড সুধাংশু পালিতের সঙ্গেও দেখা হলো। ঠিক হলো যে, ডাঙ্গে আসার পূর্বেই কলকাতা, হাওড়া, ২৪-পরগণা জেলা কমিটির সমভাবাপন্ন প্রতিনিধি, কয়েকজন প্রাদেশিক কমিটির সভ্য, ও স্বাধীনতা পত্রিকার কয়েকজন কর্মী একটি গোপন সভায় মিলিত হব এবং করণীয় স্থির করবো। এই গোপন সভার জন্য ব্যবস্থা করেছিলেন কলকাতা জেলা কমিটিতে আমাদের সহযোগী নেতৃবৃন্দ—কমরেড নরেশ পাল ও কমরেড সুধাংশু পালিত। সভাস্থল স্থির হয়েছিল প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রীটের এক মেসে। আমাকে এবং সতীশদাকে (সতীশ পাকড়াশি) আমহার্স্ট স্ট্রীট দিয়ে যেতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। সতীশদা পৌঁছাতে পারেন নি। আমি জিজ্ঞাসাবাদ করে নির্ধারিত স্থানে পৌঁছে গেলাম।

যথা সময়ে কাজ আরম্ভ হলো। ২৪-পরগণার কমরেড রাধিকা, কমরেড যামিনী সাহা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। হাওড়ার ছিলেন কমরেড

হরিসাধন। 'স্বাধীনতা' পত্রিকার কর্মী কমরেড অধীর চক্রবর্তী ছিলেন। কলকাতা জেলা কমিটির নরেশ পাল আর সুধাংশু পালিত উপস্থিত ছিলেন। আমরা জন পনর বিশ উপস্থিত ছিলাম, নাম মনে পড়ছে না। সভা শুরু হলো। একজন বললেন, ডাঙ্গে ও স্থানীয় দক্ষিণপন্থী নেতাদের মুখে ডিম ছুড়তে হবে। এক কমরেড বললেন, মিটিং বয়কট করা হোক— সংগঠিতভাবে সমস্ত কমরেডদের অনুপস্থিত করা হোক। এই দুটি প্রস্তাবেই আমরা সবাই আপত্তি করলাম। ডিম ছোড়া ইত্যাদির কোন রাজনৈতিক মূল্য নেই। বয়কট সম্বন্ধে বলা হলো, দক্ষিণপন্থীরা সংখ্যালঘু হলেও তাঁদের কিছু সমর্থক আছে। তাঁদের কেউ সদস্য না হলেও এসে যায় না। তাঁদের সব দল বেঁধে উপস্থিত হলে ও'রা ও'দের জমায়েতের প্রচার করে দেবে।

শেষে ঠিক হলো, যাঁরা সদস্য ও সভ্য তাঁরা দল বেঁধে উপস্থিত হবেন। তারপর কয়েকটি প্রশ্নবাণ ডাঙ্গের উদ্দেশ্যে নিক্ষেপ করা হবে, এবং এই প্রশ্নগুলি সাইক্লোস্টাইল করে হলে উপস্থিত কমরেডদের মধ্যে বিতরণ করা হবে। এই প্রশ্নগুলির ড্রাফ্‌ট করার দায়িত্ব কাউকে নিতে হবে। আমাকে ও কমরেড অধীর চক্রবর্তীকে এর ভার দেওয়া হলো।

অতঃপর কমরেড অধীর চক্রবর্তীর বাসায় আমি গেলাম। কমরেড সুধাংশু দাশগুপ্ত সেখানে উপস্থিত ছিলেন। দু-একটা হয়তো কিছু আমরা বলে থাকবো, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমাকে বা আমাদিগকে কাউকে কিছু করতে হয়নি। বিষয়বস্তু এবং রচনা সবই কমরেড অধীর চক্রবর্তীর গ্রথিত। এত চমৎকার রচিত হয়েছিল যে আমরা তৎক্ষণাৎ তা অনুমোদন করে দিলাম। পরে সকলের অনুমোদন লাভ করে।

এই খসরাই সাইক্লোস্টাইল করে ডাঙ্গেকে দেওয়া হয় এবং উপস্থিত কমরেডদেরও বিতরণ করা হয়। চতুর্দিক থেকে প্রশ্নবাণ নিক্ষিপ্ত হতে থাকে। দক্ষিণপন্থীদের আত্মসমর্পণের বিরুদ্ধে শ্লোগান উঠতে থাকে। শেষে হৈ-হুল্লোড়ে সভা ভঙ্গ হয়। উপরি উপরি দু-দিনই এরকম হয়।

পরে প্রাদেশিক কমিটির সভাও হয়। প্রাদেশিক কমিটির সভায় ডাঙ্গে বলতে আরম্ভ করতেই আমাকে প্রতিবাদ করতে হয়। ডাঙ্গে চীন-ভারত যুদ্ধের ব্যাপারে ভারত গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টিভঙ্গি ও কার্যাবলী সমর্থন করে বললেন, "আমরা ১৯৪২ সালে ফ্যাসি-বিরোধী যুদ্ধের সময় আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি দেশবাসীকে বোঝাতে পারলাম না এবং তাদের কাছে বিশ্বাসঘাতক আখ্যা পেলাম। সেজন্য এবারে ঠিক করলাম, অনুরূপ নীতি আর গ্রহণ করবো না। এবারে ব্যতিক্রম করে বিপরীত করবো। সেই কারণেই আমরা

কংগ্রেসকে সমর্থন করে চীনের বিরুদ্ধে প্রস্তাব গ্রহণ করলাম।" আমি দেখলাম, এখনই এক থাবড়া দিয়ে ওঁর মুখ বন্ধ করে দিতে হবে। বলে উঠলাম, "On the contrary, your policy has been uniform. We have been right with the government of the day." অর্থাৎ আমি বললাম যে, আপনাদের পলিসি একই থেকেছে, যখন যে গভর্ণমেণ্ট থেকেছে তার পক্ষে আপনারা থেকেছেন। বলা বাহুল্য, ডাঙ্গের বলার পদ্ধতির কারণেই আমাকে এরূপ বলতে হলো। আমার বক্তব্য শুনে ডাঙ্গে থমকে কিছুক্ষণের জন্য নির্বাক হয়ে গেলেন। সভা এরপর আর বেশিক্ষণ চলল না। অতঃপর বর্ধমানে দরকার ছিল, বর্ধমানে গেলাম।

১৪ই ফেব্রুয়ারী (১৯৬৩) কলকাতা ফিরলাম। ১৬ই ফেব্রুয়ারী এক প্রবন্ধের জন্য তথ্য সংগ্রহ করতে ন্যাশনাল লাইব্রেরী গিয়েছিলাম। ফিরতেই বাড়ির কাছেই দুই প্লেন-ক্লোদ্‌জ্‌ পথেই বললেন, "আপনাকে একটু থানায় যেতে হবে।" আমি বললাম, "গ্রেপ্তার করছেন? আমি বাসায় না গিয়ে যাব না।" আমি ঘরে ঢুকেই আমার স্ত্রীকে জানিয়ে দিলাম। ওঁরাও আমার পেছন পেছন মুহূর্তের মধ্যেই আমার বসার ঘরে ঢুকে পড়ল। ওরা অর্থাৎ ছয়-সাত জন আই. বি. ও এস. বি-র কর্মচারী। ওদের তাগিদের ফলে বাড়িতে বেশিক্ষণ কথা বলতে পারলাম না। ওদের গাড়িতে করে লর্ড সিন্‌হা রোডে ওদের অফিসে নিয়ে এলো। বড় অফিসারটিকে আমি একটু হেসে বললাম, "এটি কি রকম তামাশা হলো? ভোরবেলা বাড়ি থেকে নেওয়ারই তো কথা। পথে ধরার চেষ্টা কেন?" অফিসার উত্তর দিল, "পাছে আণ্ডারগ্রাউণ্ড যান, সেইজন্যে।" আমি বললাম, "তা গেলে আপনি কি আমাকে পেতেন?"

আমার ধারণা ছিল এবার দমদম জেলে নিয়ে যাবে। খাওয়া-দাওয়ার পর ওরা এসে জানালো পুরুলিয়া জেলে যেতে হবে। ওরা আরও বলল, ট্রেনে সীট পাওয়া যায়নি সেইজন্য একটু কষ্ট করতে হবে মোটরে। বুঝলাম মিথ্যা বলছে। কিছু একটা গাফিলতি হয়েছে বা সিদ্ধান্ত করতে দেরি হয়েছে। সারারাত মোটরেই গেল, কিন্তু সঙ্গের অফিসারটি আমার একটা অনুরোধ রক্ষা করেছিল। যাবার পথে বর্ধমানে আমার বাড়ি থেকে কিছু টাকা নিয়ে নিতে হবে। (এ সময় গান্ধীবাদী প্রফুল্ল সেন হৃদয়-হীনতায় সবাইকে ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন। বন্দীদের অর্থের বরাদ্দ বন্ধ করে

দিয়েছিলেন। ব্লেড, সাবান, টুথপেস্ট ইত্যাদি কিনতেও ঘর থেকে পয়সা আনতে হতো।) যাই হোক, আইনের কিছু ব্যতিরেক করে অফিসার আমাকে বর্ধমানের বাড়িতে নিয়ে গেলেন। বাড়ির তত্ত্বাবধায়ক যিনি ছিলেন তাঁকে বলে দিলাম আমাকে দমদম জেলে নিয়ে যায়নি, পুরুলিয়া জেলে নিয়ে যাচ্ছে। তিনি যেন সেইমতো খবর আমার কলকাতার বাসায় পৌঁছে দেন। কাপড়-চোপড় ইত্যাদি ও কিছু টাকা তাঁরা যেন পুরুলিয়া জেল গেটে পাঠিয়ে দেন, এ নির্দেশও দিয়ে দিলাম। প্রফুল্ল সেন সরকারের স্বৈরাচারী দুর্ব্যবহারের দৃষ্টান্ত দেখাবার জন্য গ্রেপ্তারের বিষয় এতখানি লিখলাম।

ভোরে পুরুলিয়া জেলগেটে পৌঁছালাম। আমার সঙ্গে যিনি অফিসার ছিলেন তিনি চেঁচামেচি করতে লাগলেন। বেশ কিছুক্ষণ বাদ ডেপুটি জেলার এলেন। বেশ মজা হলো। আমার সঙ্গে যে আই. বি. অফিসারটি এসেছিলেন, তিনি ডেপুটি জেলারের বিরুদ্ধে নালিশ করতে লাগলেন এবং আমাকে বললেন, জেলের আই. জি.-কে আমি যেন কড়া করে লিখে দিই। অর্থাৎ তাড়াতাড়ি আমাকে কেন জেলের ভিতর নেওয়া হলো না, সেইজন্য অভিযোগ করি।

তখন পুরুলিয়া জেলে একমাত্র রাজনৈতিক বন্দী ছিলেন কমরেড কমল সরকার। ভোরে এই হৈ চৈ-র মধ্যে তিনি শুনেছেন আর-একজন রাজনৈতিক বন্দী এসেছেন, কে তা তিনি খবর পাননি। জেলের কম্পাউণ্ডে ঢুকতেই তিনি আমাকে দেখতে পেলেন। প্রায় বৎসর খানেক থেকে ১৯৬৪ সালে জানুয়ারী মাসে মুক্তি পাই। দু'জনেই পরে প্রেসিডেন্সী জেলে স্থানান্তরিত হয়েছিলাম। তবে আমার কিছুদিন পর কমলবাবু। ফলে কমলবাবুকে পুরুলিয়ায় আগের মতো কিছুদিন একলা থাকতে হয়।

জেল-জীবন সাধারণতঃ বৈচিত্র্যহীন। প্রেসিডেন্সী জেলে আগেই আমাদের দলের অনেক বন্দী ছিলেন। কমরেড স্নেহাংশু আচার্যও প্রেসিডেন্সী জেলে ছিলেন। কমরেড স্নেহাংশু আচার্য ব্যতিরেকে অন্য কেউ ডিভিশন পাননি। তাঁরা পৃথক ওয়ার্ডে আবদ্ধ ছিলেন। আমার ও কমরেড কমল সরকারের ডিভিশন ছিল, আমরা তাঁর ওয়ার্ডেই নীত হলাম। বাইরে তখন বন্দীদের প্রতি অসৎ ব্যবহারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ চলছিল এবং সব রাজনৈতিক বন্দীকেই ডিভিশন দেওয়ার দাবি জোরদার হচ্ছিল। তার ফলে

সমস্ত রাজবন্দীদের ওয়ার্ডগুলিতে পারস্পরিক যাতায়াতে আর কোন বাধা রইল না।

জেলে থাকতে একটা মহা মিলনের ঢেউ বইতে থাকে। নানান ধরণের কমরেডের কাছ থেকে নানান রকমের আনন্দ পাওয়া যায়। কমরেড স্নেহাংশু আচার্যের প্রতিদিনের আনন্দময় খেলাধূলা ইত্যাদি সকলকে সংক্রমিত করতো এবং জেলের বিরক্তিকর একঘেয়েমি কাটাতে সাহায্য করতো।

সরকারী দমনের বিরুদ্ধে জেলের বাইরে আন্দোলন চলছিল। সাধারণ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দাবি-দাওয়া নিয়ে প্রচার ও সংগঠন চলছিল। জেলের ভিতর রাজনৈতিক উৎসাহ-উদ্দীপনা যাই থাকুক (ছিলও যথেষ্ট), বাহ্যিক জীবনধারা ছিল নিস্তরঙ্গ। কিন্তু একদিন বাধ্য হয়ে সচকিত হতে হলো। অনেক কর্মীসহ নেতারা ছিলেন দমদম জেলে, সেখানে তাঁদের মধ্যে কিছু মতবিরোধ ঘটেছিল। হাওড়া জেলার একজন কমরেড গোবিন্দ কাঁড়ার মুক্তি পেয়ে সেই বিতর্ক নানাভাবে অলংকৃত করে খবরের কাগজে প্রকাশ করে দেন। এর ফল ভাল হয় না। জেলের বাইরের কমরেডদেরও বিব্রত হতে হয় এবং আমরা যাঁরা অন্যান্য জেলে ছিলাম তাঁদেরও বিব্রত হতে হয়। পার্টি তো তখন আনুষ্ঠানিকভাবে ভাগ হয়নি, অথচ দক্ষিণ ও বাম গোষ্ঠীর সীমারেখা বেশ সুস্পষ্ট ছিল। ব্যবধান আরও বাড়িয়ে তুলেছিল দক্ষিণপন্থীরা। যখন বামপন্থী কমিউনিস্ট কর্মীসহ জনগণ কংগ্রেস গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক অত্যাচারিত ও নিপীড়িত, তখন দক্ষিণপন্থীরা নির্লজ্জভাবে কংগ্রেসী শাসকদের চরণে গড়িয়ে পড়ছিল। ফলে তারা খুব দ্রুতগতিতে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হচ্ছিল। (তার ফল এখন আরও সুস্পষ্ট হয়েছে)। এইরূপ সময়ে দমদম জেলের ঘটনার বিবৃতি আমাদের বেশ বিড়ম্বিত করেছিল। অবশ্য জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পর একত্রে নানান সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়ার ফলে বামপন্থী সমাবেশে যাঁরা সংশ্লিষ্ট হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে গভীরে ও ব্যাপ্তিতে ঐক্য প্রসারিত হয়ে চলছিল।

বর্ধমান শহরে বিধানসভার শূন্য আসনে উপনির্বাচন শক্তি পরীক্ষার প্রথম ক্ষেত্র হলো। আমরা অনেক কমরেড অব্যবহিত পূর্বে জেল থেকে মুক্তি পেলাম। আমি মুক্তির পরই অবিলম্বে বর্ধমান আসার জন্য, বর্ধমান থেকে একটি টেলিগ্রাম পেলাম। আমি বর্ধমান এলাম বটে, কিন্তু তখন মাত্র পোলিং-এর একদিন বাকি। একদিনে আমাদের বিশেষ কিছু

করণীয় ছিল না। দেখলাম, কমরেডরা অকাতর পরিশ্রম করে নির্বাচনের বেশ শক্তিশালী সংগঠন করতে পেরেছেন। পরিচালনার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন কমরেড বিজয় পাল, শহীদ কমরেড শিবশঙ্কর চৌধুরী, কমরেড সুশীল ভট্টাচার্য প্রমুখ। পোলিং বুথ সমূহে সাহায্য করার জন্য বেশ বড় সংখ্যায় কমরেড কলকাতা ও নিকটবর্তী জেলা থেকে উপস্থিত হয়েছেন। আমাদের পার্কাস রোডস্থ বাড়ির ভিতর ও বাহির তখন এই বহিরাগত কমরেডদের আশ্রয়ের কাজে লেগেছিল। নির্বাচনে আমরা জয়ী হলাম। এই সাফল্য সমগ্র রাজ্যব্যাপী জনগণের মধ্যে উৎসাহের সঞ্চার করলো।

প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি

ঠিক তারিখ মনে পড়ে না, তবে ১৯৪০ দশকের গোড়ায় আমি প্রাথমিক শিক্ষকদের সমিতির কাজে সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়ি। বর্ধমান পৌর-সভার নিজের কিছু প্রাইমারী স্কুল ছিল। খোসবাগান, বোরহাট, পুরাতন চক, নীলপুরের স্কুলগুলি সুপরিচিত। এছাড়া বোধ হয় দুইটি দাতাদের প্রতিষ্ঠিত দাতা এবং উদ্যোগী নাগরিকদের দ্বারা পরিচালিত। ব্যক্তিগত উদ্যোগে বিশেষ করে শিক্ষক মহাশয়দের উদ্যোগে বিভিন্ন পাড়ায় কিছু স্কুল ছিল। এই শেষোক্ত পাঠশালাগুলির মধ্যে কিছু সংখ্যকের সম্পহারে যৎকিঞ্চিৎ সরকারী সাহায্য মিলত। এ সাহায্যের পরিমাণ নগণ্য। শিক্ষকের বেতন নির্ভর করতো প্রধানতঃ ছাত্রদের বেতনের উপর। পৌর-সভার পরিচালিত স্কুলের শিক্ষক এবং উল্লিখিত ব্যক্তিগত উদ্যোগে পরি-চালিত স্কুলসমূহের শিক্ষকদের প্রতিষ্ঠান ছিল বর্ধমান শহরের প্রাথমিক শিক্ষক সংস্থা। বলা বাহুল্য, এর মধ্যে পৌরসভা পরিচালিত স্কুলের শিক্ষকদেরই কিছু উদ্যোগ, প্রধানতঃ তাঁরাই আমাকে এই সংগঠনের কাজে যুক্ত করেন।

এঁদের সঙ্গে সংস্রব হওয়ার পর ক্রমোত্তর এঁদের জেলা সমিতির কর্মী ও পদাধিকারীদের সঙ্গেও পরিচয় হয়। কিন্তু সত্য কথা বলতে, গোড়াতে সংস্রব ছিল উল্লিখিত পরিচয়ে সীমিত। বেশ ভাল করে কাজে নেমে পড়তে হলো কিছুদিন পরেই। প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির প্রাদেশিক সম্মেলনে তুল্যভাঁড়ারপুরের শিক্ষক বন্ধুবর প্রয়াত নাঁকর চৌধুরী সংবাদ দিলেন, প্রাদেশিক সম্মেলনে তিনি এবং বর্ধমান জেলার কিছু শিক্ষকের প্রস্তাবে আমি অন্যতম সহ-সভাপতি নির্বাচিত হয়েছি। শ্রীমহীতোষ চৌধুরী ছিলেন সভাপতি এবং ললিত সিং সম্পাদক। সম্মেলনের পর প্রস্তাবাদি এবং পদাধিকারীদের নামের তালিকা সহ একটি পুস্তিকা মুদ্রিত হয়ে বিতরিত হয়। দেখলাম তাতে আমার নাম নেই। এই ত্রুটি বর্ধমান জেলার শিক্ষকদের নজরে আনলাম। সবাই বুঝলেন, এ ত্রুটি সাধারণ ত্রুটি

নয়,—পরিকল্পিতভাবে বাদ দেওয়া। বাংলাদেশে (তৎকালীন অবিভক্ত বাংলায়) গ্রামাঞ্চলে কমিউনিস্টদের প্রভাব বাড়তে শুরু করেছে। প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির ব্যাপারে পার্টিগতভাবে কোন উদ্যোগ তখন হয়নি, কিন্তু তাহলেও বিভিন্ন স্থানীয় এলাকায় স্থানীয় কর্মীদের মধ্যে বা তাদের সংস্পর্শে কমিউনিস্ট পার্টির কিছু কর্মী বা অনুগামীদের যোগাযোগ হয়েছিল। ফলে শ্রীমহীতোষ চৌধুরী কমিউনিস্ট অনুপ্রবেশের সংখ্যায় বেশ শঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন। এমত অবস্থায় বর্ধমান জেলা থেকে আমার নাম প্রস্তাবিত হওয়ায় তিনি বেশ আতঙ্কিত হয়েছিলেন। তিনি সহজ পন্থা নিলেন। ছাপানো কাগজে নামটা শুধু বাদ দিয়ে দিলেন। বর্ধমান জেলার শিক্ষকের এক অংশ প্রতিবাদ করলেন। অন্যান্য জেলাতে যাঁরা অবহিত তাঁরাও কিছু বললেন। ফলে মহীতোষবাবুকে পিছপা হতে হলো। তিনি কৈফিয়ত দিলেন, এটা শুধু ছাপার ভুল। পার্টির মধ্যে তখন কেবল মুর্শিদাবাদের জেলা কমিটি ও তাঁদের কর্মী কমরেড ফৈজুদ্দিন এই সমিতি সম্বন্ধে ইণ্টারেস্ট রাখতেন এবং মনোযোগ দিতেন। পরবর্তীকালে কমরেড নির্মাল্য বাগচীকেও ইণ্টারেস্ট নিতে দেখলাম। ইতিমধ্যে আমি সভা-সম্মেলন প্রভৃতিতে যোগদান করতে আরম্ভ করেছি।

আমরা কয়েকজন কিছুটা সক্রিয় হওয়ার পরেই এই সংস্থার মধ্যে সারা বাংলাদেশে বিচ্ছিন্নভাবে যেসব কমিউনিস্ট পার্টির অনুগামীরা ছিলেন, ক্রমোত্তর পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে লাগলেন। প্রস্তাবাদি আলোচনা প্রভৃতিতে চিন্তাধারার পিছনে কার উপর কি রাজনৈতিক প্রভাব আছে তা সহজেই ধরা পড়তো। একটু এগোবার পর পার্টির ফ্রাক্‌শন্‌ গঠিত হয়, তাতে শক্তিও বাড়লো এবং দ্রুত অগ্রগতির সম্ভাবনা দেখা গেল।

দাবি-দাওয়া ইত্যাদি নিয়ে যেসব সমস্যা, সেসব তো ছিলই, কিন্তু প্রধান সমস্যা দেখা গেল সংগঠনের প্রকৃতি নিয়ে। চরম শৃঙ্খলাবিহীন সংগঠন। গঠনতন্ত্র বলে কিছু ছিল না। কাগজে নোটিশ দিলেই বেশ কিছু প্রতিনিধি এসে উপস্থিত হতেন। এ'দের প্রতিনিধিত্বের ভিত্তি শুধু তাঁদের ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিতি। এবার সংগঠনের মধ্যে কমিউনিস্ট প্রভাবিত শক্তি মিলিত হওয়ায় কিছুটা বিধি-ব্যবস্থা গড়ে উঠছিল, এখন গঠনতন্ত্রের দাবি জোরদার হয়ে উঠল।

শিক্ষকদের বেতন ইত্যাদি খুবই নিম্নহারে ছিল। এত নিম্ন যে হাস্যোদ্দীপক বলা যেত, যদি ব্যাপারটা বেশ বেদনাদায়ক না হতো।

স্বভাবতই শিক্ষকদের নানান উপায়ে অধিকন্তু কিছু আয় করার চেষ্টা থাকতো। টিউশনি একটা অবলম্বন ছিল. কিন্তু যে দরিদ্র স্তর থেকে ছাত্ররা প্রাথমিক পাঠশালায় আসতো তাতে টিউশনির সুযোগ কম। অগত্যা প্রাথমিক শিক্ষার পুস্তক বিক্রয় থেকে একটা আয় করতে হতো। সুতরাং বেশ কিছু শিক্ষক এই ব্যাপারে জড়িত হয়ে পড়তেন। স্বয়ং সভাপতি এবং কিছু পদাধিকারীদের ইণ্টারেস্ট কম ছিল না। সুতরাং বেতন ইত্যাদির দাবিতে শিক্ষকদের মধ্যে সংগঠিত শক্তি বিকাশের কামনা তীব্র ও ব্যাপক হয়ে উঠছিল।

আমাদের জেলার সংগঠনের চেহারা কিছুটা ছিল বর্ধমান শহর, কাটোয়া এবং রায়নায়। আমরা শেষে সাংগঠনিক অবয়বকে দৃঢ় করার জন্য সচেষ্ট হলাম। প্রাথমিক শিক্ষক আন্দোলনের জন্য আমাদের নিজেদের পার্টির সদস্য-কর্মী খুবই কম ছিলেন। কিন্তু সমিতির উৎসাহী কর্মীরা এবং নবীন যুবক প্রাথমিক শিক্ষকরা সাধারণতঃ আমাদের কথাবার্তার উপরে গুরুত্ব দিতেন। আমাদের সঙ্গে তাঁদের সহযোগিতা খুব ভাল ছিল এবং এই সহযোগিতা ক্রমোত্তর বাড়তে লাগল। রায়নায় আমাদের পুরাতন কর্মী পঞ্চানন মণ্ডল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সংগঠনে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি এখনও নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত। কাটোয়ায় ছিলেন কমরেড নৃসিংহ ঘোষ, কমরেড পান্না ও কমরেড ঋষি দাস। পরবর্তীকালে সদরে যোগ দিয়েছিলেন কমরেড সুশীল দেবদাস। কমরেড পঞ্চানন এবং সুশীল দেবদাস শীঘ্রই প্রাদেশিক নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হন। এছাড়া সহযোগী কর্মী অনেকেই ছিলেন কমিটির মধ্যে। পুরাতন পরিচিত কর্মীদের সঙ্গে নতুন যোগ্য কর্মীদের সম্মিলিত করে সেই অবস্থায় যতটা সম্ভব শক্তিশালী কমিটি গঠন করা হলো। গলসী থানার মোগলসীমার কালীচরণ ঘোষ মশায় সম্পাদক ছিলেন। যে ধরণের প্রতিষ্ঠান আমরা করতে চাচ্ছিলাম, তাঁর সম্পাদকত্বে তা সফল হওয়া কঠিন ছিল। কিন্তু পদাধিকারীদের পদ নিয়ে বিতর্ক তুললে বিশৃঙ্খলা আরো বাড়বে। সুতরাং তাঁর পদ নিয়ে কোন মতান্তরের অবকাশ হতে দিলাম না। জেলা বোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যান আবুল হায়াত সাহেবকে সভাপতি করে আমরা সাব-কমিটিতে থাকলাম।

বাংলার গভর্ণমেণ্ট তখন মুসলিম লীগ মন্ত্রিত্বের হাতে। উপর্যুপরি ডেপুটেশন ইত্যাদিতে তাদের কোন সাড়া পাওয়া গেল না। প্রাথমিক

শিক্ষার উপর অবহেলা এবং তাচ্ছিল্য কংগ্রেসে বরাবর ছিল। ১৯২৯-৩০ সালে তাদের প্রবল প্রতিরোধকে চূর্ণ করে প্রাথমিক শিক্ষা বিল পাশ করানো গিয়েছিল। (এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা আমার লেখা "শিক্ষা ও শ্রেণী সম্পর্ক" পুস্তকে পাওয়া যাবে।) সুতরাং তাঁদের কাছ থেকে কিছু সমর্থন আশা করা প্রাথমিক শিক্ষকগণ ছেড়েই দিয়েছিলেন। কমিউনিস্ট পার্টি কর্তৃক গ্রামে ও শহরে যে ব্যাপক গণ-আন্দোলন চলছিল, তার প্রভাব প্রাথমিক শিক্ষকগণের উপর পড়েছিল। এই প্রভাব তাঁদের সংগ্রামমুখী করছিল এবং ঐক্যের আগ্রহ বাড়িয়েছিল। মুসলিম লীগ মন্ত্রিত্বর আমলে সাম্প্রদায়িক ভেদ-বিভেদের চেষ্টা শীর্ষে উঠেছিল। সমস্ত প্রতিষ্ঠানেই এই ঐক্য-বিনাশী শক্তির প্রভাব বেশ তীব্র হয়েছিল। সুখের বিষয়, প্রাথমিক শিক্ষক আন্দোলনে তা কার্যকরী হয়নি। এতেই সমিতির বর্দ্ধিমান শক্তির পরিচয় পাওয়া যাচ্ছিল।

এও মনে রাখতে হবে, স্বাধীনতার আগে পর্যন্ত অবিভক্ত বাংলায় প্রাথমিক শিক্ষক শ্রেণীর মধ্যে মুসলমান শিক্ষকের সংখ্যাই ছিল বেশি। এ'দেরই শক্তি ১৯২৯ সালের প্রাথমিক শিক্ষার আইন পাশের ব্যাপারে অনেকখানি ছিল। আবার উক্ত আইন প্রয়োগে জেলা বোর্ডের সম্মতির শর্ত প্রভৃতি যে প্রতিবন্ধকতা ছিল, তা দূর করার ব্যাপারে জনগণের আন্দোলনে এ'দের দান ছিল লক্ষণীয়। উল্লিখিত প্রতিবন্ধকতা কিরূপ ক্ষতি করছিল তা বুঝতে একটি দৃষ্টান্তই যথেষ্ট। উক্ত আইন পাশ হবার পর তিরিশ দশকের গোড়াতেই পূর্ববঙ্গের অনেক জেলাতেই স্কুল বোর্ড গঠিত হয়েছিল এবং নতুন নতুন প্রাথমিক শিক্ষার স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু বর্ধমান প্রভৃতি জেলায় উল্লিখিত প্রতিবন্ধকতার কারণে সম্ভব হয়নি। চকদীঘির রাজা মণি সিং এর জেলা বোর্ড সম্মতি দেয়নি। কংগ্রেস কর্তৃক মণি সিং গোষ্ঠীকে অপসারণ করার পরই বর্ধমান জেলায় পরিপূর্ণভাবে উল্লিখিত আইন প্রয়োগ করা সম্ভব হলো। পূর্বেই বলেছি, অবিভক্ত বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষকের মধ্যে মুসলমানের সংখ্যাই ছিল বেশি। এই কারণে মুসলিম লীগের মন্ত্রণার ফলে বিভেদের শঙ্কা অনেকের মনে ছিল। কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ দেখা গেল, সমস্ত বিভেদের চেষ্টাকে এরই ফলে ব্যর্থ করা সম্ভব হলো।

দাবির উপর আবেদন-নিবেদনের সমস্ত রকমের চেষ্টা ব্যর্থ হবার পর শক্তিশালী সংগ্রামের পথ গ্রহণ করতে হবে, প্রাথমিক শিক্ষকগণের মনে এ বোধ স্বতঃই এসে পড়ছিল। অবশ্য এরই পাশাপাশি কমিউনিস্ট পার্টির

নেতৃত্বে কৃষকের দাবি-দাওয়ার সংগ্রাম, শ্রমিকের দাবি-দাওয়ার সংগ্রাম—এসবের নিদর্শন প্রাথমিক শিক্ষকগণকে প্রভাবিত করছিল।

এদিকে বিচ্ছিন্ন অস্তিত্বের কারণে প্রাথমিক শিক্ষকের পিছিয়ে-পড়া শ্রেণীর পশ্চাৎপদতা ও কার্যক্ষেত্রে পিছটানও ছিল বেশি। এর ফলে পুরাতন নেতৃত্ব, যেমন মহীতোষ রায়চৌধুরী প্রমুখ, নানানভাবে সাংগঠনিক প্রয়াসকে শিথিল করতে পারতেন এবং সংগ্রামের সিদ্ধান্তে বিলম্ব ঘটিয়ে দিতে পারতেন। মুসলিম লীগ নেতৃত্বের বিরোধিতা নানান অছিলায় প্রাথমিক শিক্ষকদের সমিতির দাবি অগ্রাহ্য করে যাচ্ছিল। কংগ্রেসের কাছ থেকেও যথোচিত উৎসাহ পাওয়া যাচ্ছিল না। সুতরাং প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির পশ্চাৎপদ অংশকে বুঝতে হলো, সংগ্রাম ছাড়া পথ নেই।

এই পরিপ্রেক্ষিতে কুষ্টিয়ার প্রাথমিক শিক্ষক সম্মেলন উল্লেখযোগ্য।

এখানে সম্মেলনের আগে একটি ছোট্ট ঘটনার বর্ণনা পাঠকদের কাছে উপভোগ্য হবে। সম্মেলনের কিছুদিন আগে আমি কাজে কলকাতা এসেছিলাম, লেনিন সরণী ধরে বোধহয় এসপ্ল্যানেডে কোন কাজে আসছিলাম। হঠাৎ মহীতোষবাবুর সঙ্গে দেখা। মহীতোষবাবু আমাকে দেখেই প্রীতি- সম্ভাষণের পর আমাকে চিত্তরঞ্জন এভিনিউ-এর দিকে টেনে নিয়ে যেতে চাইলেন। বললেন, "চলুন না, এই তো ৩নং-এ অমৃতবাজারের অফিস। তুষারকান্তি কোন কাজে আমাকে ডেকেছে। এই সুযোগে আমরা আমাদের কাজ সেরে নেব। আমাদের বিবৃতিটা যাতে অমৃতবাজারে ভালভাবে প্রকাশিত হয় তার চেষ্টা করবো।" আমি বললাম, "তিনি তো আমাকে চেনেনই না, আমাকে নিয়ে গিয়ে লাভ কি ?" উনি বললেন, "আপনি তো যাচ্ছেন সমিতির তরফ থেকে। আমাকে সমর্থন করবেন।" পীড়াপীড়িতে শেষে আমি রাজি হলাম এবং তাঁর সঙ্গে ৩নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউয়ে অমৃতবাজারের শাখা অফিসে গেলাম। তুষারবাবু একাই ছিলেন। বোঝা গেল মহীতোষবাবু প্রত্যাশিত। স্বভাবতঃই আমার পরিচয় একটা দিতে হলো। কিন্তু তিনি আমাকে যেভাবে তুঙ্গে তুললেন তা আশা করিনি। হাবেভাবে বুঝিয়ে দিলেন, আমি শুধু সমিতির সহ-সভাপতি নই—বর্ধমানের এবং সঙ্গে সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব। এ আমার সইছিল না। কিন্তু এ নিয়ে বাদ-প্রতিবাদেরও কোন রাস্তা ছিল না। ঘোষ মহাশয় আমাদের স্ট্রাইক করা সম্বন্ধে কিছু মন্তব্য করেছিলেন এবং আমি

তার প্রতিবাদে কিছু বলেছিলাম। আমরা পরস্পরের উদ্দেশ্যে কি বলেছিলাম তা মনে নেই। ঘোষ মশায়ের কাজ ছিল মহীতোষবাবুকে দিয়ে কিছু লেখানো। তাঁদের কথাবার্তা সরলই ছিল, কিন্তু তাঁদের উল্লিখিত বিষয় সম্বন্ধে অবহিত ছিলাম না বলে আমি বুঝলাম না। মহীতোষবাবু কথা দিলেন, তিনি লিখে দেবেন। মহীতোষবাবু পথে বেরিয়ে আমাকে বললেন, "ভালোই হয়েছে, ওরা বাইরে আপনাদের বিরুদ্ধে যাই বলুক, আপনাদের ভয়ও করে। এখন সম্মেলন বিষয়ের বিবৃতি আদি অমৃতবাজারে অন্তত পাবলিসিটিতে বাধা হবে না।" আমাকে জোর করে টেনে নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যটাও কিছুটা বুঝলাম।

কুষ্টিয়ার সম্মেলনে আমরা সবাই উপস্থিত হলাম। স্ট্রাইকের প্রশ্নই এখন সামনে। ইতিমধ্যে জেলায় জেলায় এবং সংবাদপত্রে স্ট্রাইক সম্বন্ধে শিক্ষকদের মনে বেশ কিছু দৃঢ়তা এসেছে। সব জেলা থেকেই ভাল সংখ্যায় প্রতিনিধি এসেছিলেন। কুষ্টিয়া স্টেশনে নামতেই দেখি মহীতোষবাবু আরও দু-একজনকে সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত হলেন। তিনি আগেই কুষ্টিয়া এসেছিলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন কুষ্টিয়ার কাপড়কল 'মোহিনী মিলস্'-এর ম্যানেজার। প্রীতি-সম্ভাষণ আদান-প্রদানের পর আমাকে একদিকে টেনে নিয়ে মহীতোষবাবু বললেন, "আমি মুস্কিলে পড়েছি, আপনাকে উদ্ধার করতে হবে।" আমি পরেছিলাম লুঙ্গি-পাঞ্জাবী। বললেন, "আপনার শিরেওয়ানির জোড় আছে? তখন এই পোশাক খুবই প্রচলিত ছিল এবং আমিও পরতাম। শুধু পায়জামা-কুর্তা পরা তখন বেখাপ্পা মনে হতো। তাঁর প্রশ্নে আমি হকচকিয়ে গেলাম, কিন্তু পরেই বুঝলাম। তিনি বললেন, "মুসলিম লীগ মন্ত্রীরা আসবেন বলেছিলেন, কিন্তু কেউ এলেন না। এদিকে ম্যানেজার আমার অনুরোধে সব আয়োজন করেছেন। সুতরাং এখন আপনার ডেলিগেট ক্যাম্পে থাকা চলবে না, জোড় জামা নিয়ে এদের গেস্ট হাউসে থাকতে হবে।" প্রতিনিধিদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাব বলে আমি আপত্তি করলাম। কিন্তু শেষে অবস্থা বুঝে সম্মত হলাম। মহীতোষবাবু এখানেও ম্যানেজারের কাছে আমাকে একটু তুললেন। বললেন, "ইনি এমনি সাধারণ পোশাকে এসেছেন, কিন্তু সভায় যোগদানের জন্য পোশাক-পরিচ্ছদ আছে।" অর্থাৎ ম্যানেজারের গেস্ট হাউসের কর্মীদের কাছে ম্যানেজারের মান থাকবে, এটা বুঝিয়ে দিলেন। ম্যানেজারের বুঝতে বাকি রইল না। একজন অতিথি থাকলেন, তাতেই সন্তুষ্ট হয়ে তিনি চলে গেলেন।

আমি গেস্ট হাউসে উঠলাম. কিন্তু খাওয়া-শোওয়া ছাড়া সময় পেলেই প্রতিনিধি শিবিরে চলে যেতাম। পরের দিন সম্মেলনে কমরেড গোলাম কুদ্দুসের সঙ্গে দেখা হওয়ায় তাঁকে শুদ্ধ গেস্ট হাউসে নিয়ে গেলাম। একদিন পর সকালে খাওয়া-দাওয়ার সময় গেস্ট হাউসের মুসলমান বাবুর্চি ও খানসামা আমাকে সসঙ্কোচে জিজ্ঞেস করল, আমার বর্ধমানে কোথায় বাড়ি ? আমি শহরের কথা বললাম। সে আবার গ্রামের কথা জিজ্ঞাসা করল। আমি বললাম. চৌঘুরিয়া। বলতেই সে সালাম করল। আমি 'থ' মেরে গেছি। বলল. "বোহারে আমি অনেক দিন ছিলাম। আমি ওয়ারিশ মিঞার কাছে ছিলাম। আমি আপনাদেরই লোক।" আমার গ্রামের পাশেই বোহার। ওয়ারেন হেস্টিংস্ যাঁকে জমিদার করে গিয়েছিলেন. তাঁরই উত্তরাধিকারীদের অন্যতম হলেন ওয়ারিশ মিঞা। কথায় সে যোগ দিল ! তার গ্রাম কাছেই। ওয়ারিশ মিঞার মৃত্যুর পর গ্রামে বাস করছিল। মিল কর্তৃপক্ষ তাঁকে ডেকে এনে অতিথি-পরায়ণতার ভার দিয়েছেন। আগেই আমাদের যত্নআত্তি হচ্ছিল। বলা বাহুল্য. পরিচয়ের পর আরও বেশি করে হলো।

সম্মেলনে স্ট্রাইকের সিদ্ধান্ত গ্রহণকে বানচাল করার জন্যে মুসলিম লীগের ওপরকার নেতাদের নিরন্তর প্রয়াস ছিল। বহরমপুরের একজন মুসলিম উকিল ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য। মুসলমান প্রতিনিধিদের বোঝাবার জন্য কলকাতায় মুসলিম লীগ নেতারা তাঁর উপর ভার দিয়েছিলেন। তিনি মুসলমান ডেলিগেটদের বলতে লাগলেন, "আপনাদের যা দাবি-দাওয়া তা বাংলা সরকার মেটাতে পারবে না। আংশিক যদি কিছু বা সম্ভব হয়, স্ট্রাইকের পদ্ধতিতে হবে না। পুনরায় আবেদন-নিবেদনের পথই ধরুন। হিন্দুরা মুসলিম লীগ মন্ত্রিত্বের বিরুদ্ধে যেতে পারে। তাঁরা তার পতন চান ! কিন্তু আপনারা মুসলমান, আপনারা মুসলিম লীগ মন্ত্রিত্বের বিরুদ্ধে এরকম খাড়া হচ্ছেন কেন ?" মুসলমান প্রতিনিধিরা একযোগে উত্তর দিলেন. "এখানে মুসলিম লীগ. কংগ্রেস, কমিউনিস্ট এসব কোন ব্যাপার নেই. এখানে হিন্দু মুসলমান প্রশ্নও নেই—এখানে আমরা শুধু প্রাথমিক শিক্ষক. অন্য পরিচয় নেই।" ভদ্রলোককে বিফল মনোরথ হয়ে ফিরতে হলো। বলা বাহুল্য, সম্মেলনে স্ট্রাইকের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো এবং নানান ছোটখাটো বিষয়ে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জিত হলো।

জেলায় ফিরে স্ট্রাইকের চেষ্টায় নামলাম, কিন্তু দেখলাম এ এক দুরূহ সমস্যা। ভয় করবার কিছু নেই, অথচ প্রাথমিক শিক্ষকদের চরম

ভয়। সবচেয়ে আশ্চর্য কথা, যে-দলের হাতে তখন মিউনিসিপ্যালিটি, কিছু তরি-তফাতের কথা বাদ দিলে মিউনিসিপ্যাল কমিশনার হিসাবে আমি সেই দলেরই অন্তর্ভুক্ত। চেয়ারম্যান টোগোদা (শ্রীপ্রণবেশ্বর সরকার)। কিছু শিক্ষককে সঙ্গে নিয়ে প্রথমে বোরহাট গেলাম। কথাবার্তায় হাব-ভাবে বুঝলাম, স্ট্রাইকটা হোক সেটা সবাই চান—কিন্তু কেউই প্রথমে পা বাড়াতে সাহস করছেন না। নিমাইবাবুকে আমি চিনতাম। তাঁকে বললাম, "নিমাইবাবু, আপনি উঠে বলুন, আমার অনুরোধ আপনি রক্ষা করবেন। আপনি স্ট্রাইক করছেন এবং অন্যদেরও আহ্বান করুন।" নিমাইবাবু আমার কথা শুনে উঠে দাঁড়িয়ে যেমন বললাম তেমনি বললেন। ইচ্ছা তো বেশির ভাগ শিক্ষকের ছিলই, কেবল ভয়জনিত সঙ্কোচ কাটছিল না। নিমাইবাবুর ঘোষণায় সেটা কেটে গেল এবং অনেক শিক্ষকই স্ট্রাইকের পক্ষে মত ঘোষণা করলেন। এইভাবে একের পর এক বোরহাট, পুরাতন-চক, খোসবাগান এবং নীলপুর—সব জায়গায় ঘুরলাম এবং সাফল্য সুনিশ্চিত করলাম। এর সঙ্গে সঙ্গে একটা কাজ অবশ্য করেছিলাম। প্রত্যেক স্কুলের তত্ত্বাবধানের জন্য মিউনিসিপ্যালিটি কর্তৃক নিযুক্ত একটি কমিটি ছিল এবং মিউনিসিপ্যালিটির একজন সদস্য সেই কমিটির সম্পাদক ছিলেন। এঁদের সবারই সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা ছিল। আমি পূর্ব থেকে এঁদের সঙ্গে দেখা করে সমস্ত ব্যাপারটা বুঝিয়ে রেখেছিলাম। বললাম, দাবি প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের কাছে, আর সংগ্রামও তাঁদের বিরুদ্ধে। এঁদের সংগ্রামের ফলে যদি সরকারী ব্যবস্থায় এঁদের বেতন বাড়ে তাহলে মিউনিসিপ্যালিটিরই সুবিধা। অযথা ন্যায্য সংগ্রামের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে অপবাদ গ্রহণ করে এবং কর্মচারীদের অসন্তোষ অর্জন করে মিউনিসি-প্যালিটির কোন লাভ নেই। তাঁরা প্রায় সবাই সম্মতি দিলেন। দু-চার জন অবশ্য বললেন, "যা করবে করো। কিন্তু বাপু আমাদের নামটা জড়িও না।" পাছে মিউনিসিপ্যালিটি থেকে স্ট্রাইক সংগঠিত করা হয়েছে, সরকারী খাতে এই রকম অভিযোগ হয়—এ রকম আশঙ্কা তাঁদের মনে ছিল। যাই হোক, বর্ধমান জেলায় মোটামোট স্ট্রাইক সফলই হলো। সারা বাংলাদেশেই সফল হয়েছিল। পূর্ববঙ্গে বেশি।

স্ট্রাইকের সাফল্যের পর দাবিও আংশিকভাবে কিছু পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু সবচেয়ে বড় লাভ হলো সংগঠনের শক্তি বৃদ্ধিতে। কিছুদিন ধরে নিমাইবাবু বর্ধমান শহরে সমিতির একটি অফিস প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করছিলেন। একটা ছোটখাটো ঘরও ভাড়া নেওয়া হয়েছিল।

কিন্তু সাধারণ শিক্ষক মহাশয়দের আগ্রহ তেমন জোরদার না থাকায় চালু অফিসে পরিণত করা যায়নি। স্ট্রাইকের পর উৎসাহ, উদ্দীপনা ও আগ্রহ বেশ কিছু বৃদ্ধি পেল।

ধীরে মন্থরে আমাদের এইসব যে কাজ চলছিল, এর মধ্যে দেশে অনেক শোচনীয় ঘটনা ঘটল। সাম্প্রদায়িক বিভেদ শীর্ষে উঠল। কলকাতায় ১৬ই আগস্ট, ১৯৪৬ হৃদয়হীন হত্যাকাণ্ড ঘটল। এর প্রতিফল হলো বিহারে ও নোয়াখালিতে। আমরা অর্থাৎ কমিউনিস্ট পার্টি ও তার পরিচালিত গণ-প্রতিষ্ঠানগুলি দাঙ্গার প্রতিরোধে এবং শান্তির চেষ্টায় অবিরাম আন্দোলন ও সংগ্রাম করে গেলাম। স্বাধীনতা আন্দোলনে বুর্জোয়াজীর যা কর্তব্য এবং করণীয় ছিল তার একটা বড় অংশে তারা ব্যর্থ হলো। স্বাধীনতার দাবির পেছনে এবং তার জন্য সংগ্রামে সমগ্র জাতিকে ঐক্যবদ্ধ রাখতে পারল না। শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে ঐক্যের শক্তি ছিল প্রবল। বৃটিশ চক্রান্ত ও বুর্জোয়া উন্মত্ততায় সৃষ্ট দাঙ্গা-হাঙ্গামা সত্ত্বেও শ্রমিকের ঐক্যের শক্তির অনুভূতি একেবারে লুপ্ত হয়নি। ১৬ই আগস্টের মাত্র ১৭-১৮ দিন আগে ২৯শে জুলাই, ১৯৪৬ সারা ভারত ডাক-তার বিভাগের স্ট্রাইক এবং সমর্থনে সাধারণ হরতালে বিরাট সাফল্য হয়েছিল। শ্রমিক ও গরীব মানুষের এই ঐক্য সজীব ছিল বলেই বাংলাদেশে সহজেই শান্তির দিকে মোড় ঘোরানো গেল। কিন্তু রাজনৈতিক ঘটনাবলীর মোড় আর ঘোরানো যায়নি। দেশ খণ্ডিত হলো।

প্রাথমিক শিক্ষকদের মধ্যে তখনও ঐক্যের প্রেরণা বেশ শক্তিশালী ছিল। কলকাতায় পুরাতন সমিতির শেষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে। কর্মসূচীর মধ্যে দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল। একটি ছিল, দেশ বিভক্ত হওয়ায় প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির বিভক্তীকরণ। নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি এখন দুই ভাগে ভাগ হবে। এক ভাগের কর্মক্ষেত্র থাকবে পূর্ব পাকিস্তান বা সহজ ভাষায় পূর্ববঙ্গে, বাকি এধারের সমিতির কর্মক্ষেত্র থাকবে পশ্চিমবঙ্গে। প্রস্তাব যেমনি উত্থিত হলো, প্রাথমিক শিক্ষক প্রতিনিধির মধ্য থেকে প্রবল প্রতিবাদ উঠল। তাঁদের বক্তব্য, দেশ ভাগ হলো তো কী হয়েছে? আমরা একসঙ্গে থাকবো। বেশ কয়েক ঘণ্টা ধরে আলোচনা চলল, আবেগের একটা বড় ঢেউকে যেন প্রতিরোধ করতে হচ্ছে এমন অবস্থা দাঁড়াল। এই আবেগে আমরা অনস্পর্শিত ছিলাম না। যাই হোক, আমরা কমিউনিস্ট পার্টির বক্তারা

ভাল শুনানী পাচ্ছিলাম। আমরা শেষে বোঝালাম, দেশ মানে তো শুধু ভূগোলের ভূমি ভাগ হওয়া নয়। পৃথক গভর্ণমেন্ট, পৃথক রাষ্ট্র হয়েছে। ভবিষ্যতে শিক্ষা জগতে, যেমন অন্যান্য বিষয়ে, কি পরিবর্তন হবে জানা নেই। অবস্থা বুঝে সেখানকার শিক্ষকরা এবং তাঁদের সমিতি নিজ নিজ গভর্ণমেন্টের কাছে দাবি-দাওয়া পেশ করবেন এবং অবস্থা বুঝে যেমন যেমন প্রয়োজন আন্দোলন করবেন। সুতরাং উভয় বঙ্গের সমিতি এক থাকলে কাজেও অসুবিধা হবে এবং বিড়ম্বনাও প্রচুর হতে পারে। অনেক কষ্টে সবাইকে বুঝিয়ে সমিতি দ্বিখণ্ডনে রাজী করানো গেল। আবেগের অনু-ভূতিতে বেশ কয়েকজনের চোখে জল বেরিয়ে গিয়েছিল। শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্যের অনুভূতির একটা স্বাদ পেলাম।

দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল, সমিতির একটা পুরোদস্তুর গঠনতন্ত্র। মহীতোষবাবু এতদিন এটা চাপাচুপি দিয়ে চালাচ্ছিলেন। এখন আর চাপাচুপি দেবার উপায় ছিল না। তিনি চাইলেন একটি কমিটি, যে গঠনতন্ত্র প্রণয়ন করে তার খসড়া কার্যকরী সমিতিতে দেবে এবং কার্যকরী সমিতি পরবর্তী সম্মেলনে তা পাশ করিয়ে নেবে। গঠনতন্ত্র প্রণয়নে প্রস্তাবিত এই বিলম্বিত কার্যসূচীতে গোটা সম্মেলনে বিক্ষোভের ঢেউ বয়ে গেল। উত্তেজিত প্রতিনিধিমণ্ডলী অবিলম্বে গঠনতন্ত্র দাবি করলেন। আমরা কমিউনিস্টরাই এতদিন ধরে গঠনতন্ত্র ও কার্য-পদ্ধতির নির্দেশ চাচ্ছিলাম। অন্যদিকে উপলব্ধি করছিলাম যে, চাইবা মাত্র একটা গঠনতন্ত্র সামনে উপস্থিত করা যায় না। নেতাদের মধ্যে এক-আধ মিনিট আলোচনা হয়েছে এমন সময় একজন প্রতিনিধি উঠে প্রস্তাব করে দিলেন, এই সম্মেলন প্রস্তাব করছে যে জনাব শাহেদুল্লাহ্ গঠনতন্ত্র প্রণয়ন করবেন এবং তিনি যা গঠনতন্ত্র প্রণয়ন করবেন তা-ই পরবর্তী কোন সম্মেলনে সংশোধিত না হওয়া পর্যন্ত সমিতির গঠনতন্ত্র বলে বিবেচিত হবে। অর্থাৎ গঠনতন্ত্র রচনার ক্ষমতা আমার হাতে দেওয়া হলো এবং তা পূর্ব থেকে অনুমোদন করে দেওয়া হলো।

মুহূর্তেই সমস্ত প্রতিনিধি প্রস্তাব সমর্থন করলেন। মহীতোষবাবু উঠে প্রতিবাদ করার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তাঁকে চিৎকার করে সবাই থামিয়ে দিলেন। আমি দেখলাম, এরকম প্রস্তাব থাকলে সমিতির ঐক্য বিপন্ন হতে পারে। সুতরাং আমি উঠে বুঝিয়ে বললাম, কার্যকরী সমিতির একবার দেখার সুযোগ থাকা দরকার। ভাষারও সংশোধন দরকার হতে পারে। রচিত গঠনতন্ত্রের মূল বক্তব্য ঠিক রেখে ভাষা ইত্যাদি সংশোধনের অধিকার কমিটিকে দেওয়া হোক। আমার প্রস্তাবও পাশ হয়ে গেল।

এখানে দু-চারদিন আগের ঘটনারও কিছু বলতে হবে। আমি কয়েকদিন আগে থেকেই পি. সি অফিসে সরোজদাকে বলছিলাম. আমার পক্ষে বর্ধমানের এত রকমের কাজের দায়িত্ব রেখে তার উপর প্রাদেশিক প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির নেতৃত্ব দেওয়া খুবই কঠিন হয়ে পড়ছে। কলকাতায় থাকতে হয় বা ঘন ঘন আসা-যাওয়া করতে হয়। বর্ধমানের কাজের ভার রেখে তা আমার পক্ষে অসম্ভব। অন্য কাউকে ভার দিতে বললাম। অনেক কষ্টে অধ্যাপক নীহার রায়, মিহির প্রমুখ কয়েকজনের নাম পেলাম। সরোজদার অমত ছিল. তিনি চাচ্ছিলেন প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির ভারটা আমিই রাখি। কেমনভাবে অসম্ভব হয়ে যাচ্ছে তা তাঁকে বুঝিয়ে বললাম। শেষে তিনি উপরি-উক্ত কয়েকজনের নাম দিয়ে দিলেন। কমিটির তালিকায় এ'দের নামও সম্মেলনে পাশ করিয়ে নেওয়া হলো। আমি একদিকে সম্পাদক কমরেড ললিত সিং-কে এবং অন্যদিকে পার্টি থেকে নতুন করে যাঁদের দায়িত্ব দেওয়া হলো তাঁদের বললাম. "আপনারা গঠনতন্ত্র রচনা করে আমাকে খবর দেবেন। আমি এসে খসড়া নিয়ে আপনাদের সাথে বসবো। কিছু সংশোধন প্রয়োজন হলে আমরা তা করবো এবং শেষে তার ভাল একটা শুদ্ধ কপি করে তাই স্বাক্ষর করে দিয়ে যাব।

দুঃখের বিষয়, তা সম্ভব হয়নি। এরপরেই ফেব্রুয়ারীতে পার্টি বে-আইনী ঘোষিত হয়। ভবানী সেন, সোমনাথ লাহিড়ী প্রমুখ অতি-বামপন্থার পথ গ্রহণ করেন। সমিতির নেতৃত্বের কিছু অংশ আণ্ডারগ্রাউণ্ডে যান এবং পরে ধৃত হন। এই সময় বর্ধমানে প্রাদেশিক সম্মেলন হয়।

১৯৫১ সালের নির্বাচনের প্রাক্কালে পার্টি ও গণ-প্রতিষ্ঠানগুলির কাজকর্ম ভালভাবে শুরু হয়। তখন জেলার প্রাথমিক শিক্ষক সমিতিতে কার্যতঃ দুটি শক্তি—সি পি. আই.-এর অনুগামী এবং কৃষক-মজদুর-প্রজা পার্টির। শেষোক্ত পার্টি অবলুপ্তির আগে কতবার নাম পাল্টিয়েছে তার হিসেব ও ভিন্ন ভিন্ন নামকরণ এখানে দেওয়া সম্ভব নয়। একই পার্টি কিছু যোগ-বিয়োগ করে রূপ পাল্টায়। বস্তুতঃ অভয় আশ্রমের শ্রীপ্রফুল্ল ঘোষ, সুরেশ ব্যানার্জী. দেবেন সেন প্রমুখ এর নেতা। জেলায় বরাবর নেতৃত্ব করেছেন শ্রীদাশরথি তা। আলোচ্য সময়ে মৃত্যুঞ্জয় প্রামাণিক ও পুরঞ্জয় প্রামাণিক প্রমুখ তাঁর সঙ্গী। রায়না থানায় প্রাথমিক শিক্ষক সমিতিতে এ'দের কিছু শক্তি ছিল। বর্ধমান সদর থানায় এ'দের সুপরিচিত

ছিলেন শ্রীরাম কার্ফা। অন্য কর্মীদের কথা বলি। বর্ধমান পৌরসভায় শ্রীনিমাই সরকার তখনও সক্রিয় ছিলেন। কাটোয়ায় সকলের নাম পূর্বেই করেছি। এর মধ্যে পার্টির জেলা কমিটির অনুমোদিত ফ্রাক্‌শন্‌ তৈরি হয়েছে। এ সময় অবিচ্ছিন্ন ভাবে সক্রিয় ছিলেন বড়বৈনানের কমরেড পঞ্চানন মণ্ডল, কাটোয়ার নিশু ঘোষ, পান্না প্রমুখ। পার্টির সদস্য ও পার্টির অনুগামী আরও কিছু এলেন, সকলের নাম আমার স্মরণে নেই। রায়না অঞ্চলে তখন সক্রিয় ছিলেন কমরেড বিজয় সেন ও বাসন্তী সরকার।

পূর্বেই বলেছি, সব গণ-প্রতিষ্ঠানের কাজ প্রকাশ্যভাবে আরম্ভ হলো। প্রাথমিক শিক্ষক প্রতিষ্ঠানেরও তাই হলো। এ সময় নানান দিকে পার্টির কাজ বেড়েছে। তার মধ্যে গ্রাম এলাকায় একটা বড় কাজ দাঁড়াল জেলা বোর্ড নির্বাচন। পার্টিকে সব কাজই একসঙ্গে চালিয়ে যেতে হয়। এই নির্বাচনের জন্য আমরা সম্মিলিত প্রগতিশীল ব্লক গঠন করলাম। রায়নার আসনটি কৃষক-মজদুর-প্রজা পার্টিকে দেওয়া হয়েছিল। আসন বণ্টনের নির্ধারণ সম্বন্ধে প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির নেতৃত্বে আমাদের অংশ ছিল, আর অংশ ছিল কৃষক-মজদুর-প্রজা পার্টির।

১৯৫১ সালের মার্চ বা এপ্রিল মাসে রায়নার সেহারাবাজারে জেলা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সম্মেলন হয়েছিল। প্রবীণ শিক্ষক এবং সমিতির নেতৃস্থানীয় সদস্য সেহারার বিজয়দা (শ্রীবিজয় সেন) এবং তাঁর স্থানীয় সহকর্মীরা অভ্যর্থনার খুব ভাল আয়োজন করেছিলেন। বিজয়দা কংগ্রেস-বিরোধী। আমাদের সকলেরই শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন এবং তাঁর স্বভাবসুলভ রীতিতে ত্রুটির কোন অবকাশ রাখেন নি। এই সম্মেলনের সমাপ্তির পর জেলা বোর্ড নির্বাচন সম্বন্ধে আলোচনা ও সভা হবে এইরূপ সিদ্ধান্ত ছিল। এই সভা বসার আগে বিরতির সময় প্রীতিভাজন বাসন্তী সরকার দুটি প্রশ্ন নিয়ে আমার ও পাঁচুদার কাছে বিতর্ক তুললেন। আমাদের মনোনীত প্রার্থী ছিলেন কৃষক-মজদুর-প্রজা দলের শ্রীকৃষ্ণ তা, তরুণ যুবক। তিনি রায়নার নামকরা ধনপতি ও ব্যবসায়ীর ছেলে। ধনীর সন্তানকে কেন প্রার্থী করা হবে, এই ছিল তাঁর অভিযোগ। তাছাড়া তাঁর আর একটি বড় অভিযোগ, নির্বাচনে আমাদের সম্মিলিত ফ্রন্টের কোন ম্যানিফেস্টো বা ঘোষণা-পত্র নেই। প্রথম বিষয়ে আমি যে ব্যাখ্যা দিয়েছিলাম এবং কীভাবে কৌশলে দাশরথি তা-কে দিয়ে ম্যানিফেস্টোতে স্বাক্ষর করার প্রতিশ্রুতি সর্বসমক্ষে আদায় করেছিলাম, সেকথা জেলা বোর্ড নির্বাচন প্রসঙ্গে আগেই বলেছি।

এই সম্মেলনের পর প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির একতাবদ্ধ শক্তি ও সংগঠন বাড়তে থাকে। গোকুলানন্দ রায় প্রভৃতি নতুন নতুন উৎসাহী কর্মীর আগমনে বেশ একটি ভাল টিম তৈরি হয়। কমরেড পঞ্চানন মণ্ডল তো ছিলেনই. কমরেড সুশীল দেবদাস আমাদের সঙ্গে জেল থেকে বেরিয়ে আসার পর প্রাথমিক শিক্ষক হন এবং সমিতির যোগ্য কর্মী হিসাবে কাজ করতে থাকেন। পরে পরে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আরও সব কর্মী আসতে থাকেন। আসানসোল থেকে আসেন কমরেড ব্যোমকেশ চক্রবর্তী. কাঁকসা-পানাগড় থেকে কমরেড কাশীনাথ. খণ্ডঘোষ থেকে কমরেড গোকুলানন্দ রায় ও কমরেড জগবন্ধু। সমুদ্রগড়ের পূর্বস্থলী থেকে মনোরঞ্জন নাথ এবং জেলার বিভিন্ন অংশ থেকে আরও অনেকে। হালের অনেকের সঙ্গে হয়তো আমার পরিচয়ের সৌভাগ্য হয়নি. যাঁদের সঙ্গে পরিচয় আছে. এই বৃদ্ধ বয়সে লেখার সময় তাঁদেরও সকলের নাম মনে পড়ছে না। বার্ধক্যের স্মৃতিলোপ তো অনভিপ্রেত। এঁদের আবার অনেকেই প্রাদেশিক নেতৃত্বে এসেছেন। আমি নিজে জলপাইগুড়ির সম্মেলনের পূর্ব পর্যন্ত কার্যকরী সমিতিতে ছিলাম। এখন আনুষ্ঠানিকভাবে সংগঠনের অংশ হিসাবে সম্পর্ক না থাকলেও আন্তরিক সম্পর্ক থেকে গেছে। সুখের বিষয়. বর্তমানের নেতারাও আমাদের স্মরণে রেখেছেন। তার পরিচয় হিসাবে পঞ্চাশ বছরের (১৯৮৫) পূর্তি উৎসবের সময় জেলা ও প্রদেশ উভয় কমিটি থেকে প্রবীণ সহকর্মী হিসাবে উপঢৌকন পেয়েছি। তাঁদের এই সৌজন্য কৃতজ্ঞতার সঙ্গে বুকে তুলে নিয়েছি।

মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি

আমি মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি ও তার কর্মীদের সম্বন্ধে মাঝে মাঝে বিচ্ছিন্নভাবে উল্লেখ করেছি কিন্তু সম্যক বিবরণ দিতে পারিনি, কারণ এ'দের কাজকর্মের ব্যাপারে আমি সংশ্লিষ্ট ছিলাম না। ফলে সবিস্তারে ওয়াকি-বহালও নই। কমরেড রাবিয়া বেগম (আমার স্ত্রী) পার্টির সঙ্গে যুক্ত হয়ে ১৯৪২ সাল থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে অনেকদিন দায়িত্বে ছিলেন। গোড়ার দিককার এই ইতিহাস 'একসাথে' পত্রিকার তাঁর রচিত প্রবন্ধে ১৩৯৫-এর অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। আমি এখানে সেই প্রবন্ধই উদ্ধৃত করছি।

বর্ধমান মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির গোড়ার কথা

১৯৪৩ সাল। এখনও যেন শুনতে পাচ্ছি সেই দুর্ভিক্ষ মহামারীর হাহাকার, শিশুর ক্ষুধার্ত ক্রন্দন, রুগ্ন, পীড়িত মানুষের চিৎকার—ফেন দাও, খেতে দাও, কাপড় দাও। দেশের যখন এই অবস্থা, তখন শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ চুপ করে থাকতে পারেন না। দলে দলে মানুষ হাত প্রসারিত করে এগিয়ে এলেন, কি পুরুষ কি মহিলা। এমতাবস্থায় আমরা কয়েকজন মেয়েও এগিয়ে এসেছিলাম। তার মধ্যে আমি (রাবিয়া) ও শামশুন্নেশা (বাদশা), নির্মলা সেন, বিভা কোঙার, রেণু অধিকারী, জ্যোৎস্না সেন— এই কয়েকজন মিলে আমরা একটি মহিলা সমিতি করি।

তখন ১৯৪২-৪৩ সাল। 'মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি' নামে তৎকালীন বাংলাদেশে একটি মহিলা সমিতি গঠিত হয়েছিল, তাঁরাই এই দুর্ভিক্ষের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন। আমরা বর্ধমানে সেই সংবাদ পেয়ে তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করি ও আমাদের সমিতির নাম 'মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি' রাখি।

প্রথমে আমরা বর্ধমান টাউন হলে একটি মহিলা জমায়েত করি। ঐ সভায় বেশি মহিলা জমায়েত করতে পারি নাই, কারণ বর্ধমানের ধনী ও

মধ্যবিত্ত মহিলারা বাইরের জগতের খুব বেশি সংবাদাদি রাখতেন না. সেটা যেন তাঁদের কাছে বে-পরদা মনে হতো। এই অবস্থায় সব থেকে প্রথম আমি ও বাদশা বাড়ির বাইরে আসি। সেও যেন তখন একটা বিপ্লবের কাজ। ঘরে বাইরে তখন গালমন্দ খাচ্ছি। বৃহত্তর সমাজের সঙ্গে মিশতে গিয়ে নিজ সমাজের গণ্ডিতে পেলাম প্রবল বাধা। তাকে অগ্রাহ্য করে আমাদের এগোতে হলো। বিশেষ করে মুসলমান সমাজে প্রতিক্রিয়া হলো খুব বেশি। বে-পরদাই আখ্যা দিয়ে আমাদের সব কাজের (তা সে যত ভাল কাজ হোক) নিন্দা করত। ফলে নিজ সমাজ-গণ্ডি থেকে তখনকার মতো বিচ্ছিন্নই হয়ে গেলাম। বিশেষ করে মুসলমান সমাজের একটি বিশেষ অংশ থেকে। অবশ্য তবু আমরা আমাদের চেষ্টা ছাড়িনি।

বর্ধমান শহরে আমরা প্রথম যে মহিলা সভা ডাকি সেখানে আমরা একটি অস্থায়ী কমিটি গঠন করি। এই কমিটি শামশুন্নেশা (ওরফে বাদশা) সম্পাদিকা. আমি (রাবিয়া) সভানেত্রী ও জ্যোৎস্না সেন. নির্মলা সেন. বিভা কোঙার. রেণু অধিকারী প্রমুখ কয়েকজনকে নিয়ে গঠিত হয়. এবং সমিতির নামকরণ করা হয় 'মহিলা সমিতি'। পরে প্রাদেশিক মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির সঙ্গে যোগাযোগ করি ও আমাদের ঐ সমিতির নাম দিই 'মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি'।

এই সময় সাধ্যমতো জনসেবা করে আমরা আমাদের সমিতিকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলাম। তখন আমাদের সমিতির কাজ ছিল হস্ত-শিল্প. কুটির-শিল্প. রিলিফ বিতরণ করা. সমিতির সভা বাড়ানো. চাঁদা তোলা ইত্যাদি। কিন্তু তখন পর্যন্ত আমরা সমিতির একটা অফিস করতে পারি নাই। রিলিফের কাজ আমরা প্রথম আরম্ভ করি চাল বিতরণ—পরে দুগ্ধ বিতরণ কাজের দ্বারা।

১৯৪৩ সালে দুর্ভিক্ষের সংকেত দেখা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টি জনগণের সার্বিক ঐক্যের মিলিত প্রতিষ্ঠান ফুড কমিটি গঠনের চেষ্টা করে। এই চেষ্টা সফল হয়। সরকারের নিকট হতে খাদ্য আদায়. সম্ভব মতো রিলিফ সংগ্রহ এবং সুচারু বণ্টন ছিল এই কমিটির কাজ। আমরা 'মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি'ও তাতে অংশ নিয়েছিলাম। ফুড কমিটির কাছ থেকে আমরা বিতরণের জন্য একটা ব্যবস্থা করেছিলাম। আমাদের কাজ ছিল, শত শত দুস্থ মেয়েদের সুশৃঙ্খলভাবে লাইন বাঁধা এবং তাদের টিকিট দেওয়া ও সেই টিকিট দেখে চাল দেওয়া। আমি টিকিট দিতাম এবং সেই টিকিট দেখালে বাদশা চাল মেপে দিতেন। চালের কোটা শেষ হয়ে

গেলে আর টিকিট দিতে পারতাম না। ফলে টিকিট নেওয়ার সময় হুড়োহুড়ি ধাক্কাধাক্কি হতো। শৃঙ্খলা বজায় রাখা কঠিন হতো। যাঁরা টিকিট পেতেন না, তাঁদের গালমন্দ আমার উপরেই বর্ষিত হোত। আমাদের অবস্থা অনুকূল ছিল না। পথে-ঘাটে এমন কি বাড়িতেও রেহাই পেতাম না— তাঁরা বলতেন পরের দিনের টিকিটের জন্য। ব্যবস্থা করা অত্যন্ত কঠিন কাজ ছিল। যার ফলে আমাকে খুব সকালে বাড়ি থেকে বের হতে হতো। সকাল ৭টায় চার বছরের ও দেড় বছরের শিশুকে রেখে যেতাম এবং ফিরতে বেলা ২/৩টা বেজে যেত। আমার বাচ্চা খুব কষ্ট পেত এবং আমিও খুব পরিশ্রান্ত হয়ে ফিরতাম।

তখন সারা দেশে খাদ্যাভাব। যুদ্ধের বিভীষিকা, মানুষের কঠিন জীবনযাত্রা। সেই সময় কালনা রোডে ও কেশবগঞ্জে রিলিফ কিচেন খোলা হয়েছিল। সমস্ত দিন হাজার হাজার বুভুক্ষু মানুষদের রিলিফ দেওয়া হতো। মহিলা আত্মরক্ষার কর্মীরা খিচুড়ি পরিবেশন করতেন, পালা করে দায়িত্ব ভাগ করে নেওয়া হয়েছিল। এই সময় কলকাতায় জাপানী বোমা পড়ার দরুণ হাজার হাজার লোক দেশের পথে জি টি রোড ধরে বর্ধমানে আসেন। তাঁদের কিচেনে খাওয়ান হয়। এর ফলে এখানে কাজের ভার অনেক বেড়ে যায়।

সেই সময় রেডক্রশ থেকে অসহায় বাচ্চাদের, রোগীদের জন্য দুধ দেওয়া হচ্ছিল। আমরা রেডক্রশ থেকে দুধ সংগ্রহ করি। আমার নামেই দুধ দেওয়া হতো। বর্ধমান শহরের তিনটি পাড়ায়, তিনটি দুগ্ধ-কেন্দ্র খোলা হয়। কেন্দ্র তিনটি যথাক্রমে রাধানগর, খোসবাগান ও গড়গড়ার ঘাটে। রাধানগরের দায়িত্বে ছিলেন নির্মলা সেন, খোসবাগানে আভা বসু, গড়গড়ার ঘাটে রেণু অধিকারী। এ'রাই প্রত্যেকে নিজ নিজ পাড়ার দায়িত্বে কাজ করতেন। আমি ও শ্যামশুভ্রেশা প্রত্যেক পাড়ার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতাম ও নতুন নতুন পাড়া কমিটি গঠন করতাম। বিভা কোঙারও সঙ্গে ছিলেন।

এখানে একটু বলে রাখি, এই সময় বর্ধমানে অবস্থাপন্ন এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর হিন্দু-মুসলমান কোন মহিলাই কোনদিন বাড়ির বাইরে বের হতেন না। কিন্তু আমাদের আপ্রাণ চেষ্টার ফলে তাঁদের সমিতিতে আনতে পেরেছিলাম। আমরা তখন প্রত্যেকটি পাড়ার প্রত্যেকটি ঘরে ঘরে গিয়ে বোঝাতাম বাহির জগতেও তাদের কাজ আছে, এবং সমিতির সভ্যা করতাম। অনেক বাড়ির অভিভাবকরা বাধা দিতেন। কিন্তু মহিলাদের মধ্যে

আত্মবিশ্বাস এসেছিল, তাই তাঁরা এগিয়ে এসেছিলেন ও সমিতির আদর্শ ও নীতিতে বিশ্বাস রেখে সমিতিতে যোগ দিয়েছিলেন। পরে পাড়ার সভাতে, বড় বড় সভাতে, তাঁদের আনতে সক্ষম হয়েছিলাম।

এই রকম নানান কাজের মাধ্যমে আমরা সমিতিকে জনপ্রিয় করতে পেরেছিলাম। বছর দু'য়ের মধ্যে আমরা তিন হাজারেরও বেশি সভ্যা করতে পেরেছিলাম।

বর্ধমানে কনকদি-কে ও মণিকুন্তলা সেনকে কয়েকবার আমন্ত্রণ করেছিলাম। তাঁদের বক্তৃতা শুনতে অনেক মহিলা জমায়েত হতেন ও খুব উৎসাহ পেতেন।

আমরা শহর ছাড়িয়ে গ্রামাঞ্চলেও সমিতির সভ্যা সংগ্রহ করেছিলাম, এবং দুগ্ধ বিতরণ ও নানান রিলিফের কাজে তাদের নামিয়েছিলাম। হাট-গোবিন্দপুর, বাঘাড়, শিমডাল প্রভৃতি গ্রামে সভ্যা সংগ্রহ করা হয়েছিল। মনে পড়ে এই উপলক্ষে আমি ও বাদশা বাঘাড়-শিমডাল গিয়েছিলাম। সেখানে মহিলাদের একটি সভাও করেছিলাম। এইভাবে গ্রামাঞ্চলেও কিছু শাখা সমিতি গঠিত হয়েছিল। এই সময় একটি ঘটনা উপলক্ষে 'মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি'র তরফ থেকে মঙ্গলকোট থানার কালানপুর গ্রামে আমাকে যেতে হয়। পুলিশের নিগ্রহ ইত্যাদি ঘটনা ঘটেছিল। নিপীড়িত মেয়েদের বক্তব্য তদন্তকারী অফিসারের সামনে রেখেছিলাম এবং বিহিত দাবি করেছিলাম।

১৯৪৪ সালে আমরা বর্ধমান শহরে টাউন হলে জেলা সম্মেলন ডাকি। এই সম্মেলনে শহর ছাড়া গ্রামাঞ্চলেরও প্রতিনিধি যোগদান করেছিলেন। সম্মেলনে আমরা জেলা কমিটি গঠন করি। নতুন সভানেত্রী করা হয়েছিল শ্রীমতী শিবরাণী মুখার্জীকে। ইনি বর্ধমানে এক সুপরিচিত ঘরের গৃহকর্ত্রী, তিনি কোনও দিন বাড়ির বাহির হন নাই। তাঁকে সভ্যা ও সভানেত্রী করতে পারায় বর্ধমানের রক্ষণশীল মহিলা সমাজের আড়ষ্টতা ও সংকোচ কাটাতে সাহায্য করেছিল। সেই সময় তার প্রয়োজন ছিল।

সম্পাদিকা করা হয়েছিল শ্রীমতী বিভা দত্তকে। ইনি কোনদিন ঘরের বাইরে যেতেন না। আমাদের ১০/১২ জন নিয়ে কমিটি গঠিত হয়। পরে কো-অপ্‌শান-এর মাধ্যমে মাঝে মাঝে নতুন কর্মীদেরও কমিটিতে নিয়ে নেওয়া হয়। তালিকা স্মৃতি থেকে উদ্ধার করা কঠিন হবে। যাঁদের নাম মনে পড়ছে লিখছি—রাবিয়া, বাদশা, নির্মলা সেন, জ্যোৎস্না সেন, রেণু অধিকারী, বিভা কোঙার, অর্চনা সেন, সবিতাদি, জ্যোতি দাশগুপ্ত, ভারতী

দেবী, শেফালী চৌধুরী প্রমুখ। এই 'মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি'র কমিটি ১৯৪৯ সালে কংগ্রেস সরকার কর্তৃক বে-আইনী ঘোষিত হওয়া পর্যন্ত ছিল।

অনেক বিচ্ছিন্ন ঘটনা আমার মনে আসছে—যা লিখে উঠতে পারছি না। সারা বর্ধমান জেলায় অনেক রিলিফের কাজ করেছিলাম। রিলিফ আদায় করা, রিলিফের চাল বিলি করা, ডাক্তার দেখানো, হাসপাতালে রোগী ভর্তি করা, তাঁদের খোঁজ-খবর নেওয়া ইত্যাদি। তারপর সবচেয়ে বড় কাজ ছিল, সমিতির প্রচার ও মহিলাদের রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন করা।

১৯৪৪ সালে বরিশালে আমাদের দ্বিতীয় প্রাদেশিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলন নারীসমাজের মুক্তি ও পুরুষের সাথে সমান অধিকারের আন্দোলনের আহ্বান দেয়। বরিশাল সম্মেলনে অন্যতম বিশেষ প্রস্তাব ছিল— নারীর স্বত্বাধিকার বিষয়ে 'রাও কমিটি'কে সমর্থন। এই উপলক্ষে আমাদের কাজ ছিল 'রাও বিল' নিয়ে ঘরে ঘরে বোঝানো, সভা ইত্যাদি করা। বর্ধমান শহরে আমরা একটি বড় মহিলা সভা করি। ঐ সভায় বর্ধমানের স্বনামখ্যাত উকিল প্রয়াত পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে আমন্ত্রণ করেছিলাম। তিনি 'রাও বিল'-এর উপর এবং তার সমর্থনে সব কিছু পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে বলেছিলেন।

এর কিছুদিন পর বর্ধমান শহরে কো-অপারেটিভ থেকে একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তাতে বিভিন্ন সংগঠন স্টল নিয়েছিল। আমরাও 'মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি'র তরফ থেকে একটি স্টল খুলেছিলাম। মেয়েদের তৈরি নানান রকম হস্তশিল্প, ফ্রক, জামা সেলাই, গরিব মেয়েদের তৈরি ঝুড়ি, ডালি ইত্যাদি ও সমিতির সভানেত্রীর নিজ হাতে তৈরি ভাল চানাচুর বিক্রী করা হয়েছিল। সমিতি লাভবান হয়েছিল। এই ধরণের অনেক ঘটনা আছে- যার বিস্তৃত উল্লেখ সম্ভব হচ্ছে না।

কিছুদিন পর বাদশা কলকাতায় চলে এলেন। তখন আমরা কয়জন সমিতির কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলাম। প্রধান দায়িত্ব ছিল আমার উপর। এছাড়াও সভানেত্রী ও সম্পাদিকা সমিতি থেকে পদত্যাগ করেছিলেন। সমিতি বে-আইনী হওয়ায় তখন সমিতির কাজ কিছুটা গুটিয়ে গিয়েছিল। 'মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি' বে-আইনী হওয়ার পর বর্ধমানে নতুন নতুন কর্মী যাঁরা সমিতিতে পরে এসেছিলেন, যেমন শ্রীমতী বীণা সেন, শ্রীমতী রেণু ঘোষ, অঞ্জলি বোস, অর্চনা গুহ—এ'দের নিয়েই সমিতির অল্প অল্প কাজ চলছিল।

সমিতি বে-আইনী হওয়ার পর কলকাতা প্রাদেশিক কমিটি থেকে একটি বড় সভা কলকাতার ময়দানে ডাকা হয়। সমস্ত জেলা থেকে প্রতিনিধি হয়ে মহিলারা গিয়েছিলেন। আমি ও মকসুদা গিয়েছিলাম। সভা আরম্ভ হওয়ার কিছুক্ষণ পরেই কংগ্রেস সরকারের পুলিশবাহিনী সভার উপর ঘোড়-সওয়ার পুলিশ ছুটিয়ে দেয়। তখন মহিলা জমায়েত ভেঙ্গে যায় এবং যে যেখানে পেরেছিল ছুটে চলে গিয়েছিল। আমরাও ছুটে গিয়ে একটা দোকানে আ.য় নিয়েছিলাম. এবং আমার যেতে একটু বিলম্ব হওয়ার পুলিশের নিক্ষিপ্ত টিয়ার গ্যাস ভীষণভাবে আমার মুখে লেগেছিল এবং ভীষণ জ্বালা-যন্ত্রণা করছিল। এই অবস্থায় দোকানটায় ঢুকলাম। দেখলাম আগেই ঢুকেছে মমতা. অশ্রু হালিম মকসুদা এবং আরও ২/৩ জন। তাঁদের নাম মনে পড়ছে না। আমি ঢোকামাত্র রাস্তায় পুলিশের গুলি চলল। সবাই বলে উঠলেন, খুব বেঁচে গেলে, তা না হলে এখনি শেষ হয়ে যেতে।

অবিলম্বে পুলিশ দোকানে প্রবেশ করে ও আমাদের সকলকে গ্রেপ্তার করে। অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালি দিতে দিতে ধাক্কাধাক্কি করে আমাদের পুলিশ-ভ্যানে তুললো। ঐ সঙ্গে অনেক ছেলেদেরও তুলেছিল। তাদের এত প্রহার করেছিল যে একটি ছেলের কপাল ফেটে রক্তপাত হচ্ছিল। ঐ দেখে আমি একটু জল চাইলাম তখন পুলিশ আমাকে অশ্রাব্য ভাষায় গাল দিল. বললো. "মরতে এসেছে মরুক।" তারপর আমাদের নিয়ে সোজা লালবাজার থানায়। সেখানে অত্যন্ত কষ্ট দিয়েছিল। খাবার ভাল দেয় নাই. এমন কি জলকষ্ট দিয়েছিল। পৌষ মাসের শীতে গায়ে দিতে কিছু পাইনি। অনেক চেঁচামেচি করে আমাদের সব আদায় করতে হয়েছিল। পরের দিন আমাদের প্রেসিডেন্সি জেলে নিয়ে যায়। সেখানেই আমরা বিচারাধীন বন্দী থাকি এবং আমাদের খুবই কষ্ট দেয়। কিন্তু সেখানে একটা সুবিধা হয়েছিল। সেখানে আমাদের মহিলা কমরেডরা. নেতৃস্থানীয়েরাও বিনা বিচারে বন্দী ছিলেন। তাঁরা অপেক্ষাকৃত কিছুটা সুবিধা পেতেন। তাঁরাই আমাদের খাওয়া-পরা সমস্ত জিনিস সাহায্য করেছিলেন। আমাদের ও তাঁদের মধ্যে লোহার রড দেওয়া জানালা বসানো ছিল। সেই জানালা দিয়ে আমাদের সবকিছু যোগাযোগ 'দেওয়া-নেওয়া' চলছিল। তখন ঐ জেলে অনেকেই বিনা-বিচারে বন্দী ছিলেন। তার মধ্যে মনে পড়ছে মণিদি. কনকদি. মঞ্জুশ্রীদি (চট্টোপাধ্যায়)-কে। এই জেলে আট দিন থাকার পর আমাদের ব্যাঙ্কশাল কোর্টে নিয়ে যাওয়া হয়। কোর্টে লোক ধরে না, এত লোক ছিল। অনেকে আমাদের জামিনের জন্য

এসেছিলেন। ছেলেমেয়ে মিলে আমরা প্রায় ৭৫-৮০ জন ছিলাম। তার মধ্যে সব থেকে প্রথমেই ছিল আমার নাম। ম্যাজিস্ট্রেট প্রথমেই আমাকে কাঠগড়ায় হাজির হতে ডাক দেন এবং পর পর সকলকেই হাজির হতে হয়। অনেক জেরা করার পর আমাদের জামিন দেওয়া হয়। তিন মাস এই কেস চলে। বর্ধমান থেকে কোর্টে হাজিরার দিন আমার খুব হয়রানি হতো। শেষে কেসে আমাদের ছাড় হয়ে যায়। কিন্তু কেসে ছাড়া পেয়েও আমাকে গোপনে চলে যেতে হয়। কারণ আশঙ্কা হয়, পুনরায় বিনা বিচারে আমাকে আটক করতে পারে।

আমার তিনটি শিশু সন্তান নিয়ে আমি যখন সমিতি করতে আরম্ভ করি তখন তাদের ও আমার খুবই কষ্ট হতো। সমস্ত দিন শহরে ঘুরে ঘুরে বাড়ি ফিরতাম। আমার খাওয়া-দাওয়ার ঠিক ছিল না, শিশুদের বাড়ির অন্য লোকেরা দেখত। অবশ্য কেবল আমাকে যে এরকম করতে হয়েছে সে কথা বলছি না। এই রকম দায়িত্ব নিয়ে যেসব মহিলাদের কাজ করতে হয়েছে তাঁদেরই এই সমস্ত কষ্ট ভোগ করতে হয়েছে।

১৯৫১-৫২ সালে প্রথম সাধারণ নির্বাচন হয়। কমিউনিস্ট পার্টি থেকে বর্ধমান শহর কেন্দ্রে বিনয় চৌধুরীকে প্রার্থী করা হয়। তখন আমরা মহিলা পার্টি সভ্যা ও সমর্থকগণ নির্বাচনের কাজে সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ করি। তখন মহিলাদের পৃথক পোলিং বুথ হতো। পার্টির জেলা কমিটির অনুমতি নিয়ে আমরা মহিলাদের পৃথক নির্বাচন অফিস করে-ছিলাম এবং সংগঠিতভাবে প্রত্যেক পাড়ায়, প্রত্যেকটি ঘরে, প্রচার ও ভোটার তালিকায় নাম মিলাতাম, স্লিপ্ দিতাম, ছোট ছোট বৈঠক সভা করতাম। আমরা মহিলা কর্মীদের বিভিন্ন গ্রুপে ভাগ করেছিলাম। এক একটি এলাকায় দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। সমস্ত পরিচালনার ভার আমার উপর ছিল। প্রত্যেকটি পোলিং বুথের জন্য আমরা স্বেচ্ছাসেবিকা ও পোলিং এজেণ্ট পূর্বেই ঠিক করে নিয়েছিলাম। পোলিং-এর দিন সংগঠিতভাবে সমস্ত শহর ধরে এই মহিলা স্বেচ্ছাসেবিকাবাহিনী কাজ করে-ছিল। এই স্বেচ্ছাসেবিকারা এসেছিলেন শহরের বিভিন্ন পাড়া থেকে, যেমন—টাউন হল পাড়া, পার্কাস রোড, রাধানগর, নীলপুর, ভাতছালা ইত্যাদি পাড়া থেকে। এঁরা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন। নির্বাচনের সাফল্যে মহিলা-কর্মীদের অনেকখানি অবদান ছিল। তখন আমার নিয়মিত

খাওয়া-দাওয়া হতো না। অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে আমার স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটে। তা সত্ত্বেও আমি সাধ্যমতো মহিলা সমিতির কাজ চালিয়ে যাই।

সমিতি করতে গিয়ে আমরা সমিতির সভ্যাদের নিকট অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও প্রাণঢালা ভালবাসা পেয়েছি। সে সব অনেক ছোট ছোট ঘটনা। সব তো লেখা সম্ভব নয়। দৃষ্টান্ত হিসাবে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা দু-একটি স্মরণ করছি।

যেমন একবার আমি ভাতছালার উদ্বাস্তু মহিলাদের মধ্যে প্রচার করতে গিয়েছিলাম। সঙ্গে বীণা সেন-রা ছিলেন। প্রথমে আমাকে দেখে পাড়ার মহিলারা একটু সরে সরে যাচ্ছিলেন। পরে আমি যখন তাঁদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে এবং বোঝাতে লাগলাম—তখন অনেকে আগ্রহ করে এগিয়ে এসেছিলেন। শেষ পর্যন্ত এমন হলো যে তাঁদের মধ্যে একজন বললেন, "ও মেয়ে, তোমার সিঁদুর পরতে না হলে কি হয়, সাদা সিথ্যা ভাল লাগে না, আজ আমরা সিঁদুর পরায়ে দিমু।" এই বলে আমাকে সিঁদুর পরিয়ে দিলেন ও অনেক কিছু খাইয়ে দিলেন।

এমনি আর এক জায়গার কথা মনে পড়ছে। একটি গ্রাম। গ্রামের নাম শশঙ্গা। গ্রামের অধিকাংশ গ্রামবাসী মুসলমান। গ্রামের একজন সুজন (ইকবাল সাহেব) মহিলা সমিতির প্রচার ও সমিতি প্রতিষ্ঠা করার জন্য আমাকে শশঙ্গা নিয়ে গিয়েছিলেন। বাসে গিয়ে গ্রামে নামলাম, সেখান থেকে গরুর গাড়ি করে গ্রামের ভিতরে গেলাম। গ্রামের মহিলারা আমাকে সাদর-আপ্যায়ন করলেন। একটি বাড়িতে অনেকে জমায়েত হয়েছিলেন। আমি মহিলা সমিতির উদ্দেশ্য সম্পর্কে বোঝাই। তখন ঐ স্থানেই প্রায় দেড়শত সভ্যা করতে পেরেছিলাম। মনে আছে, ফেরার সময় কয়েকজন কৃষক-রমণী ও ছোট মেয়েরা স্লোগান দিতে দিতে এসেছিলেন, "মহিলা সমিতি জিন্দাবাদ" ইত্যাদি। তখনকার দিনে একটি মুসলমান গ্রামে, মুসলমান মহিলাদের মধ্যে এরূপ অনুষ্ঠান উল্লেখযোগ্য।

মানুষ ঘাত-প্রতিঘাতে জীবনে অনেক কিছু শিখতে পায়। তাই আমিও সামাজিক এবং রাজনৈতিক কর্মে লিপ্ত থেকে কিছু শিখেছি ও উপলব্ধি করতে পেরেছি। মানুষের সঙ্গে মেলামেশা এইটাই তো বাঁচার বড় অবলম্বন। তাই আজ আমার অনেক মুখ মনে ভেসে উঠছে। যাঁরা মারা গিয়েছেন ও শহীদ হয়েছেন, তাঁদের স্মরণ করে এবং তাঁদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে এই লেখা শেষ করছি।

বর্ধমান রিক্সা ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন

পার্টি বর্ধমানে ভিত গড়ার পর থেকে রিক্সা ওয়ার্কারদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পেরেছিল এবং সক্রিয়ভাবে তাদের সাহায্য ও সহযোগিতা অর্জন করতে পেরেছিল। ১৯৪২ সালে একদিন সকালে আমরা রাজ পাবলিক লাইব্রেরীর ময়দানে (মধ্যে, এখন যেখানে রূপমহল সিনেমা) শ্রমিকদের সভা আহ্বান করি। ঘটনাচক্রে আগের দিন কমরেড বিজয় পাল এখানে এসেছিলেন। তাকেও সঙ্গে নিয়ে গেলাম। তাছাড়া আমরা স্থানীয় সবাই ছিলাম। টিকেপাড়ার রিক্সা-শ্রমিকদের সঙ্গে মেলা-মেশা ঘনিষ্ঠতা করে কমরেড বিশু সেন তাদের অনেককেই জড়ো করতে পেরেছিলেন। এছাড়া তেঁতুলতলা, লস্করদীঘি, বহিলাপড়া, বাদামতলা, খোসবাগান, মহাজনটুলিরও কিছু শ্রমিক ছিলেন। শ্রমিকদের মধ্যেই যাঁরা তখন এগিয়ে এসেছিলেন—সেখ গুলু মিঞা, সেখ ভোলা, শ্রীঅনাদি প্রমুখ।

সভায় তিন খাতে শ্রমিকদের অভাব-অভিযোগগুলি বিচার করা হলো। মালিকদের জমার হার, পুলিশের পাঁচ-আইনের জুলুম ও পৌরসভার নানান রকম জঞ্জাল। তিন খাতে আন্দোলন তাহলে দাঁড়াল—মালিক বিরোধী, সরকারী আমলাদের বিরোধী ও পৌরসভার বিশৃঙ্খল ব্যবস্থা বিরোধী। এইসব অভিযোগের প্রতিকারের দাবি করা হলো। কমরেড বিজয় পাল প্রমুখ বক্তারা ভাল করে বুঝিয়ে দিলেন, স্থায়ী সক্রিয় ট্রেড ইউনিয়ন ছাড়া এসবের সমাধান সম্ভব নয়। সুতরাং ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন করার সিদ্ধান্ত হলো। আমাকে সভাপতি এবং কমরেড বিশ্বনাথ সেনকে সম্পাদক করে অস্থায়ী কমিটি গঠিত হলো।

সেই সময় থেকেই লাগাতার ট্রেড ইউনিয়নের কাজ চলেছিল। টিকে-পাড়া, পাকমারা গলির অংশে একটি ঘর-ভাড়া করে অফিস নেওয়া হলো। এই অফিস বহুদিন ধরে নিয়মিত চালু ছিল। ঊর্ধ্বমুখী জমার বিরুদ্ধে প্রস্তাব নেওয়া হলো। জমা বাড়ানো তো চলবেই না, বরং কমাতে হবে। শহরে শ্রমিকের কাজের সুযোগ ছিল খুবই সীমিত। ছিলেন বিড়ি শ্রমিক,

গরুর গাড়ীর গাড়োয়ান আর রিক্সা-শ্রমিক। ঘোড়ার গাড়ীর কোচম্যানের কাজ তখন অবলুপ্তির পথে। যে কাজ ঘোড়ার দ্বারা হচ্ছিল এখন তা মানুষের দ্বারা করার ব্যবস্থা হলো। ফলে এলেন রিক্সা-শ্রমিক। ৩০ দশকের সঙ্কটের আঘাত তখন চলছে। বেকারের সংখ্যা বাড়ছে। শহরের ক্ষুদ্র কারবারী সাইকেল-রিক্সা কিনে রিক্সা-শ্রমিকদের জমার বদলে ঐ রিক্সাকে ভাড়া দিতেন। রিক্সা-শ্রমিকদের পক্ষে ভাড়া সংগ্রহ করাই একটা সমস্যা দাঁড়াল। সুযোগ খুবই সীমিত। সুতরাং তাদের নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতায় মালিকগণ কর্তৃক জমার হার বাড়ানোর প্রবৃত্তি হতো। তারপর ছিল ব্যবহৃত রিক্সাগুলির অবস্থা। মালিকরা যাদের ভাল শ্রমিক মনে করতো তাদেরই ভাল রিক্সাগুলি প্রাপ্য হতো। সুতরাং এতেও একটা প্রতিযোগিতা এসে পড়ত।

পুলিশরা এক জায়গা থেকে আর-এক জায়গায় যেতে হলে খালি রিক্সা পেলেই তাতে চড়ে বসত, আর, বলা বাহুল্য, ভাড়া দিত না। রিক্সা শ্রমিক অস্বীকার করলেই একটা কিংবা আর একটা ত্রুটির অছিলায় পাঁচ-আইনের ফাঁসে ফেলত।

প্রথম দিকে রিক্সা-শ্রমিকদের লাইসেন্স বলে কিছু ছিল না। শুধু মালিকদের রিক্সার লাইসেন্স করতে হতো। পরে রিক্সা-শ্রমিকদেরও লাইসেন্সের ব্যবস্থা করা হলো। ফলে রিক্সা-শ্রমিকদের উপর পৌরসভার কর্মচারীদের একটা আধিপত্যের সুযোগ হলো। এখন সঠিক তারিখ স্মরণ করতে পারবো না. মাঝে মাঝে রিক্সা-শ্রমিকদের প্রতিবাদ সভা ও মিছিল গঠিত হয়েছে। তাছাড়া কখনও কখনও স্ট্রাইকও করতে হয়েছে। কিছু কিছু দাবি আদায় ও সাফল্য অর্জিত হয়েছে।

স্ট্রাইক করার সময় আমরা বিশেষ একটি সমস্যায় পড়তাম। ডাক্তারের কাছে রুগীর আসার, বিশেষ করে রেল স্টেশন ও বাসস্ট্যাণ্ড থেকে—এর ব্যবস্থার দাবি অগ্রাহ্য করা যেত না। ফলে এইসব প্রয়োজনের জন্য আমাদের কয়েকটা রিক্সা রিজার্ভ করতে হতো। ডাক্তারদের বলে আসা হতো, তাদের দরকার হলে আমাদের রিক্সা ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন অফিসে খবর দিলে আমরা রিক্সা পাঠিয়ে দেব। কোন কোন সময় অনবহিত থাকার কারণেই হোক কিংবা ইচ্ছাকৃতই হোক, কোন কোন ডাক্তার রিক্সা-শ্রমিককে স্ট্রাইক ভেঙ্গে কাজ করায় প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করত। দু-এক ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা ভঙ্গকারী রিক্সা-শ্রমিককে শৃঙ্খলাভঙ্গের অপরাধে শাস্তিও দিতে হতো। একদিন এক স্ট্রাইকের সময় বর্ধমানের এক সুপরিচিত ডাক্তার

নিয়ে যাবেন এই জেদ করলেন। স্বেচ্ছাসেবক এসে আমাদিগকে খবর দিল। আমি তখনই বেরিয়ে মঙ্গলাপাড়ার মোড়ে তাঁর রিক্সার সামনে দাঁড়িয়ে হ্যাণ্ডেল ধরে আটকে দিলাম, আর বুঝিয়ে বললাম, "আপনি শিক্ষিত মানুষ, আপনার বোঝা উচিৎ। আপনি আমাদের কাছে রিক্সা চেয়ে পাঠালেই পারতেন।" যাই হোক, তিনি রিক্সা থেকে নেমে পড়ে হেঁটে চলে গেলেন। এখন তাঁর ব্যবহারে নিন্দনীয় কিছু থাকল না।

একবার পৌরসভার চেয়ারম্যান শ্রীসন্তোষ বসু রাগান্বিত হয়ে একটি রিক্সা-শ্রমিকের গায়ে হাত তোলেন। রিক্সা-শ্রমিকের অভিযোগ শোনার পরই আমরা স্ট্রাইক ঘোষণা করি। আমি এবং কমরেড গুলু তখন শহরের বিভিন্ন শ্রেণীর মহাজন, ব্যবসাদার, ডাক্তার, উকিল প্রমুখের কাছে আমাদের সাথীর প্রতি লাঞ্ছনার বিবরণ দিই এবং তাঁদের অনুরোধ করি যে তাঁরা যেন চেয়ারম্যানের উপর চাপ সৃষ্টি করেন, যেন তাঁকে বলেন, তিনি যেন শ্রমিকদের সঙ্গে আপস ব্যবহার করেন, তা না হলে স্ট্রাইকের কারণে সাধারণের খুবই অসুবিধা হচ্ছে। সন্তোষবাবু ইংরাজীতে যাকে বলে practical minded ছিলেন। তিনি আমাদের সঙ্গে কথা বলতে চান। আমি, গুলু আর বিশু সেন গেলাম, তারপর বললাম, "সমাধান শুধু তো আমাদের সাথে হবে না, লাঞ্ছিত শ্রমিকের সঙ্গেও আপনাকে কথা বলতে হবে।" তারপর আমরা সেই শ্রমিক ও অন্যান্য সহকর্মীকে নিয়ে তাঁর কাছে গেলাম। তিনি যা বললেন তা ক্ষমা প্রার্থনাই দাঁড়াল। আমি, বিশু ও গুলু তাঁর সামনেই শ্রমিকদের জিজ্ঞেস করলাম, "কি করা হবে?" তাঁরা বলল, "মুরুব্বী মানুষ- শহরেরও মুরুব্বী, আমাদেরও মুরুব্বী। তিনি যখন এতটা বলেছেন আর এ নিয়ে কোন বাড়াবাড়ির প্রয়োজন নেই।

পৌরসভায় আমরা তাঁর বিপক্ষে ছিলাম। যে গ্রুপের সঙ্গে আমাদের সখ্য, তাঁরা স্ট্রাইক চালু রাখার জন্য আমাদেরকে পীড়াপীড়ি করছিলেন। আমরা বললাম, "স্ট্রাইক তো কোন দলীয় স্বার্থে হয়নি, স্ট্রাইক হয়েছে শ্রমিকদের নিজস্ব দাবিতে। তার সমাধান হলে তারা অবশ্যই স্ট্রাইক তুলে নেবে।"

ঘটনার বিবরণে পাঠক সহজেই বুঝবেন, শহরে একরকম যানবাহনের ইউনিয়ন পরিচালনা করতে হলে নিজস্ব রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে চতুর্দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। রিক্সা-শ্রমিকদের রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধি করার জন্য কোন সম্মিলিত রাজনৈতিক সভায় যোগদান করতে হলে আমরা তার অব্যবহিত পূর্বে রিক্সা-শ্রমিকদের সভা করে রাজনৈতিক সমস্যাটা কি এবং

আমরা কেন তাতে যোগদান করছি তা ব্যাখ্যা করে দিতাম। তারপর সেখান থেকে ইউনিয়নের পতাকা ও ফেস্টুন নিয়ে রিক্সা-শ্রমিকদের শোভা-যাত্রা করে সভায় নিয়ে যেতাম। এর ফলে অন্যান্য নাগরিকদের মধ্যে ইউনিয়নের প্রভাবও হতো। ইউনিয়নের দাবি-দাওয়া সাধারণের সহানু-ভূতি অর্জন করত।

পাঁচ-আইনের ব্যতিক্রমের ক্ষেত্রও বেশি ঘটতো রেল স্টেশন প্রভৃতি জায়গায়। এ জন্য রিক্সা-শ্রমিকদের মধ্যে শৃঙ্খলা বজায় রাখবার জন্য দু'জন বা তিনজনের একটা স্বেচ্ছাসেবক গ্রুপ রাখা হতো। এতে ভালও ঘটতো, কিন্তু মন্দ ঘটেনি এমন নয়। কয়েকজন শ্রমিক মোড়লে পরিবর্তিত হয়ে যেত এবং এর মাধ্যমেই কিছু অর্থ উপার্জন করবার চেষ্টা করতো।

খাদ্য-সংকট যখন তীব্র হলো তখন পাড়ায় ফুড কমিটি গঠনে আমাদের চেষ্টায় যোগ দিতে রিক্সা-শ্রমিকদের বিশেষভাবে উৎসাহিত করলাম। সঙ্গে সঙ্গে রিক্সা-শ্রমিক এবং পাড়ার অন্যান্য গরীবদের রেশন কার্ড দেওয়ার ব্যবস্থায় তাদের উদ্যোগী করা সম্ভব হলো। এইভাবে শহরে গরীব মানুষদের মধ্যে আমাদের সংযোগ আরও গভীর ও ব্যাপক হলো।

১৯৪৮ সালে পার্টি বে-আইনী হবার সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল আমরা সব সামনের কর্মী ছাড়াও কমরেড গুলু-র উপরে পুলিশের বিশেষ তাক থাকল। সাধারণভাবে কমরেড গুলু বক্তৃতা ও নিয়ত কাজে যেমন সক্রিয় ছিলেন, তাতেই তাঁর উপর নজর পড়ল।

অবশ্য কমরেড গুলু আমাদের টেকনিক্যাল কাজে অর্থাৎ গোপন ব্যবস্থাদিতে গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করেছিলেন। সেটা অবশ্য তারা বুঝতে পারে নি। তবে তাঁর নেতৃত্বের কারণেই তাঁর উপরে লক্ষ্য স্থির করল। সুতরাং আমরা তাঁকে আণ্ডারগ্রাউণ্ডে নিয়ে এলাম।

ইতিমধ্যে আর এক সঙ্কট দেখা দিল। স্টেশনে 'মোড়লী' করে যারা শীর্ষে উঠেছিল তাদেরকে কংগ্রেসীরা তাদের দলে টানার চেষ্টা করতে লাগল। গুলুতে আমাতে তাদের একজনকে নিয়ে এসে আমাদের আণ্ডার-গ্রাউণ্ডে বন্দী করার সিদ্ধান্ত করলাম। কমরেড বিশু সেনের চেষ্টায় আমরা কালনা রোডের কাছে একটা ঘর-ভাড়ার ব্যবস্থা করলাম। যে রিক্সা-শ্রমিক বিশ্বাসভঙ্গ করে কংগ্রেসে যাবার চেষ্টা করছিল, তার নাম রহমান। তাকে গুলু ধরে নিয়ে এসে আমাদের সঙ্গে রাখল। গুলু আর আমি পালাপালি করে তাকে পাহারা দিতাম। আমাদের খাবার ব্যবস্থা করা মুশকিল হয়ে পড়ল, কেননা গুলুকেই গিয়ে চাল, ডাল কিনে আনতে হতো। বেশ

পরিবর্তন করে গন্নু এই কাজ করে যাচ্ছিলেন, এই দিকে রান্নাও করে যাচ্ছিলেন। একদিন আঁইজা (কচুর ডাঁটা) রান্না করে খাইয়েছিলেন। তার স্বাদ আমার এখনো মনে আছে। যাই হোক, পরে আমাদের এ আস্তানা ভাঙ্গতে হয়। কারণ খাবার এই কষ্ট ইত্যাদিতে রহমানের আকর্ষণের কিছু ছিল না। সে একদিন কেটে পড়ল। কিছুদিন পর গন্নু গ্রেপ্তার হন। তারপর আমিও গ্রেপ্তার হই। জেলে কমরেড গন্নু বন্দীদের প্রতিনিধি হিসাবে নির্বাচিত হন। জেল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে প্রতিনিধি হিসাবে যা করণীয় তা দক্ষতার সঙ্গে করতেন। এতে কমরেডদের সঙ্গে তার অন্তরঙ্গতাও হয়েছিল এবং সে সম্মান পেয়েছিল।

রিক্সা-শ্রমিকরা অনেকেই আমাদের নানান রাজনৈতিক কার্যক্রমে সাহায্য করেছেন। পৌরসভার নির্বাচনে এক সময় বহিলাপাড়ার কমরেড শঙ্কর মুখার্জী, অন্য এক সময় কমরেড প্রকাশের কথা মনে পড়ে। ১৯৫৫ সালের মিউনিসিপ্যাল ইলেকশনে প্রকাশ আমার রিক্সা চালাতেন। নানান কৌশলে তিনি আমাকে পাড়ায় পাড়ায় নিয়ে যেতেন। একদিন রসিকপুরে নির্বাচকদের সভার কথা শুনলাম। অনাহূতভাবে সেখানে কি করে যাই! প্রকাশ বললেন, "চলুন আমি আপনাকে নিয়ে যাচ্ছি।" একটা ফাঁকা জায়গায় হ্যাচাক লাইট দিয়ে ওরা সভা করছিল। ফাঁকা জায়গার আশ-পাশে খালি গরুর-গাড়িগুলি রাখা ছিল। প্রকাশ কৌশলে আমাকে অন্ধকারে সেই গরুর-গাড়ীর তলায় আমার রিক্সা ঢুকিয়ে দিল। আমি সেইখানে বসে বিপক্ষ প্রার্থীদের সমস্ত চক্রান্ত শুনলাম। প্রকাশকে বললাম, "চল, সময়ে কেটে পড়ি।" প্রকাশ যেমন কৌশলে অন্ধকারে ঢুকেছিলেন, তেমনি কৌশলে বেরিয়ে এলেন। দুঃখের বিষয়, কিছুকালের মধ্যেই এই মূল্যবান কমরেডের মৃত্যু হলো। কলকাতা গিয়েছিলাম। কলকাতা থেকে ফেরার সময় স্টেশনে নেমেই শুনলাম কমরেড সুশীল ভট্টাচার্য (পার্টি টাউন কমিটির সম্পাদক) সহ রিক্সা ট্রেড ইউনিয়নের আরও নেতৃস্থানীয় কর্মী প্রকাশের দেহ নিয়ে শ্মশানে গেছেন। আমিও তখনই সোজা শ্মশানে দৌড়ালাম এবং শেষ বিদায়ে অংশগ্রহণ করলাম ব্যথিত হৃদয়ে। তখন কমরেড সুশীল ভট্টাচার্য রিক্সা ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সম্পাদক, চারু চট্টোপাধ্যায় তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা করতেন।

কর্মীদের মধ্যে প্রয়াত কমরেড অধরের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কমরেড বিনয় প্রমুখ কর্মীদের মধ্যে ছিলেন।

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট ১ □ 'গণনায়ক' সাপ্তাহিকের ফাইল থেকে

বর্দ্ধমান জেলা কৃষক সম্মেলন

প্রথম অধিবেশন

স্থান ঃ হাটগোবিন্দপুর

২১শে জ্যৈষ্ঠ, রবিবার, ১৩৪০

বর্দ্ধমান জেলার কৃষকগণের প্রতি নিবেদন

ভাইসব,

আজ ক'বছর আমাদের জমির ফসলের দাম কমে গেছে, মজুরি কমে গেছে, কিন্তু খাটুনি, জমির খাজনা, মহাজনের আসল ও সুদ কমেনি। আজ জমিদারী-খাজনা ও মহাজনের সুদের টাকা জোগাতে আমাদের পেটে ভাত নেই, পরণে কাপড় নেই, অসুখে ওষুধ নেই -বেঁচে থাকা ভার হয়ে উঠেছে। অথচ এই অবস্থায় জমিদার ও মহাজনের দাবি মিটাই কি করে? দিন দিন আরও দেনায় জড়িয়ে পড়চি। এ থেকে বাঁচার উপায় কি? একমাত্র উপায় হচ্ছে সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া, গ্রামে গ্রামে কৃষক সমিতি স্থাপনা করা। তবেই না এতদিনকার জমিদার ও মহাজনের অত্যাচার বন্ধ হবে। তবেই না ফসলের দাম অনুযায়ী জমিদারের খাজনা ও মহাজনের সুদ কমবে, আর উচিত মত আমাদের মজুরী বাড়বে। দলে দলে আমাদের 'বর্দ্ধমান জেলা কৃষক সমিতি'-র সভ্য হতে হবে। এ ছাড়া পরিত্রাণের আর কোন উপায় নেই। চাষী-ভাইসব! এই উদ্দেশ্যে আগামী ২১শে জ্যৈষ্ঠ সদর মহকুমার হাটগোবিন্দপুর গ্রামে বর্দ্ধমান জেলা কৃষক সম্মেলনের অধিবেশন হবে। সকলে সদলে এই সম্মেলনে যোগদান করুন।

শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ রায়, সম্পাদক
হাটগোবিন্দপুর কৃষক সমিতি
ও অস্থায়ী সম্পাদক
বর্দ্ধমান জেলা কৃষক সম্মেলন

হাটগোবিন্দপুর
২৫শে বৈশাখ, ১৩৪০

১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৩ই মে ১৯৩৩, পৃষ্ঠা-১০

বৰ্দ্ধমান জেলা কৃষক সম্মেলন

আগামী ২১শে জ্যৈষ্ঠ হাটগোবিন্দপুরে এই অধিবেশনের দিন স্থির হইয়াছে। দলে দলে কৃষক-কর্মীগণ সারা জেলায় প্রচার-কার্য চালাইতেছেন ও কৃষক-ভাইদের অভ্যর্থনা সমিতির সভ্য তালিকাভুক্ত করিতেছেন। চতুর্দ্দিকে যথেষ্ট উত্তেজনা পরিলক্ষিত হয়। আমরা এই সম্মেলনের সাফল্য কামনা করি।

১ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা. ২০শে মে ১৯৩৩, পৃষ্ঠা-১০

□

বর্দ্ধমান জেলা কৃষক সমিতির নোটিশ

আগামী ২১ জ্যৈষ্ঠ হাটগোবিন্দপুরে যে বর্দ্ধমান জেলা কৃষক সম্মেলন হইবে তাহাতে সম্মেলনের কার্য্য-সমাপনান্তে বর্দ্ধমান জেলা কৃষক সমিতির দ্বিতীয় বাৰ্ষিক সাধারণ সভার অধিবেশন হইবে।

কার্য্যসূচী ঃ (১) সম্পাদক কর্ত্তৃক বাৎসরিক কার্য্য-বিবরণী পাঠ (২) আগামী বৎসরের জন্য কর্ম্মকর্ত্তা নির্বাচন (৩) কর্ম্ম সংকল্প গ্রহণ (৪) বিবিধ

এতদ্দ্বারা জেলার সমস্ত শাখা কৃষক সমিতির ও জেলা কৃষক সমিতির সভ্যদের এ অধিবেশনে যোগদান করিতে আহ্বান করা যাইতেছে। পৃথক নিমন্ত্রণ-পত্র দেওয়া হইবে না। জেলা কৃষক সমিতি সভ্য ব্যতিরেকে অপর কেহ এই অধিবেশনে যোগদান করিতে পারিবেন না।

শ্রীহেলারাম চট্টোপাধ্যায়
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর চৌধুরী
যুগ্ম-সম্পাদক
বর্দ্ধমান জেলা কৃষক সমিতি

তারিখ ঃ ৭ই জ্যৈষ্ঠ
বর্দ্ধমান, ১৩৪০

১ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ২৭শে মে ১৯৩৩, পৃষ্ঠা-১

বৰ্দ্ধমান জেলা কৃষক সম্মেলন

আগামী ২১ জ্যৈষ্ঠ বৰ্দ্ধমান জেলা কৃষক সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন হইবে। ইহাতে জেলার কৃষককুলের উপর জমিদার, মহাজনদের যে অত্যাচার চলিতেছে তাহা বন্ধ করিবার উপায় উদ্ভাবন করা হইবে। যাহাতে কৃষকশ্রেণী, কংগ্রেস, প্রজা-পার্টি প্রভৃতি বুর্জোয়া প্রতিষ্ঠানের ধাপ্পায় পড়িয়া ভ্রান্তপথে চালিত না হয় এবং তাহারা যাহাতে প্রকৃত শ্রেণী-স্বার্থ সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইতে পারে তাহার বিষয় কৃষকদের সচেতন করিয়া দেওয়াই এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য। গত ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ অভ্যর্থনা সমিতির এক সভায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি স্থিরীকৃত হইয়াছে। (১) ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত সম্মেলনের সভাপতি নির্বাচিত হইলেন। (২) কমরেড বঙ্কিমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় রক্ত-পতাকা উত্তোলন করিয়া অধিবেশন উদ্বোধন করিবার জন্য নির্বাচিত হইলেন। (৩) ২০শে জ্যৈষ্ঠ সন্ধ্যা ৬টা হইতে বিষয় নির্বাচনী সমিতির অধিবেশন আরম্ভ হইবে। (৪) ২১শে জ্যৈষ্ঠ বেলা ৪টার সময় রক্ত-পতাকা উত্তোলন ও তৎপরে সাধারণ অধিবেশন আরম্ভ হইবে। (৫) প্রত্যেক গ্রাম্য শাখা সমিতি হইতে বিষয় নির্বাচনী সভায় ৫ জন করিয়া প্রতিনিধি আসিতে পারিবেন। বাংলার তথা ভারতের কৃষক নেতাগণকে এই সম্মেলনে যোগদান করিয়া কৃষকদের পথ-নির্দ্দেশ করিবার জন্য আহ্বান করা হইতেছে। ই. আই. আর. লাইনের শক্তিগড় ষ্টেশনে নামিয়া উত্তরে ৪ মাইল দূরে হাটগোবিন্দপুর গ্রামের সম্মেলনের মণ্ডপে আসা যাইবে অথবা বর্ধমান ষ্টেশনে নামিয়া বৰ্দ্ধমান-কালনা বাসে হাটগোবিন্দপুরে পৌঁছিতে পারিবেন।

শ্রীচন্দ্রশেখর কোঙার
সভাপতি
অভ্যর্থনা সমিতি
বৰ্দ্ধমান জেলা কৃষক সম্মেলন

হাটগোবিন্দপুর সম্মেলন কার্য্যালয়
পোঃ—হাটগোবিন্দপুর
তারিখ—৭ই জ্যৈষ্ঠ

১ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ২৭ মে ১৯৩৩, পৃষ্ঠা-১০

বর্দ্ধমান জেলা কৃষক সম্মেলনের সভাপতি ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের অভিভাষণ

আমাকে বর্দ্ধমান জেলা কৃষক সম্মেলনের সভাপতির পদে বরণ করার জন্য সম্মেলনীর অভ্যর্থনা সমিতিকে বিশেষ ধন্যবাদ দিতেছি। এই পদে একজন আমার কৃষক বা কৃষিজীবী-ভাই মনোনীত হইলে ভালই হইত। কিন্তু তাহা যখন সম্ভব হয় নাই, তখন আর উপায় নাই, অভ্যর্থনা সমিতির ইচ্ছা পূর্ণ করিতে আমি বাধ্য। আমি নিজে কৃষিজীবী নই, কিন্তু নিজে "শ্রেণী-বিহীন" বলিয়া এবং গরীব শ্রেণীর স্বার্থ সংরক্ষণের চেষ্টার সহিত সংশ্লিষ্ট বলিয়া আপনাদের সেবা করিতে সাহস করিতেছি।

ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ, তন্মধ্যে বাঙ্গলা প্রদেশ চিরকালই কৃষির জন্য বিখ্যাত। বঙ্গদেশের কৃষিজাত পণ্যের মধ্যে ধান ও পাট প্রধান। ইহার মধ্যে পাট জগতের অন্য স্থানে জন্মায় না। কিন্তু এ হেন বঙ্গপ্রদেশে আজ কৃষিজীবীদের মধ্যে হাহাকার পড়িয়াছে। আর কৃষকের কষ্ট হইয়াছে বলিয়াই সমাজের অন্যান্য শ্রেণীর লোকদের মধ্যে বিষম অর্থকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। অবশ্য এই অর্থকষ্ট জগতব্যাপী অর্থসঙ্কটের একটি অংশমাত্র। কিন্তু ইহা বলিলেই পর্য্যাপ্ত হয় না। জগতের যে যে স্থানে অর্থসঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে তথাকার গভর্ণমেণ্ট ও নেতৃস্থানীয়েরা তাহার নিরাকরণ বা লাঘবের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু এদেশে কোন চেষ্টাই হইতেছে না। আজ বাঙ্গলার কৃষকের হাহাকারের ঢেউ পশ্চিমেও গিয়া লাগিয়াছে। তথাকার কৃষকও অর্থসঙ্কটে পতিত হইয়াছে। ইহার অর্থ, পঞ্জাব ব্যতীত সমগ্র উত্তর ভারতে কৃষকের অর্থসঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে। সে তার জমিদারের খাজনা ও মহাজনের সুদ দিতে অপারগ হইতেছে। পঞ্জাবে ইহার ব্যতিক্রম হইয়াছে, কারণ তথাকার কৃষক স্বয়ংই ভূ-স্বামী, সে কাহাকেও খাজনা দেয় না।

এক্ষণে কথা হইতেছে বাঙ্গলায় কেন এরূপ হইল? নদীমাতৃক ও শস্য-শ্যামলা বঙ্গপ্রদেশের কৃষকের আজ এইরূপ অবস্থা কেন হয়? এইরূপ অবস্থা বাঙ্গলার ইতিহাসে ঘুরিয়া ফিরিয়া কেন বার বার আসে? ইতিহাসে তাহার অনেক নজীর আছে। "ছিয়াত্তরের মন্বন্তর" জনশ্রুতিরূপে লোকের মনে এখনও জাগরিত আছে।

বাঙ্গলা প্রদেশে ৭ কোটি ৩৪ লক্ষ ২০ হাজার বিঘা চাষের জমি আছে। আর পুরাতন আদম-সুমারীর গণনামতে পোষ্যবাদে সর্ব্বাধিক কৃষকের

সংখ্যা ১ কোটি ১৪ লক্ষ ৯১ হাজার ৭ শত। ইহার মানে এই প্রদেশের প্রত্যেক কৃষকের চাষের জমি গড়-পড়তায় ৬ বিঘা (কেহ কেহ বলেন ৫ বিঘা)। এই জমিটুকুর উপর প্রত্যেক কৃষক-পরিবারকে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হয়। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, সম্বৎসরের অর্থ-ব্যয় ও কায়িক-শ্রম করিয়া কৃষক তাহার জমিতে যাহা উৎপন্ন করে, তাহাতে খাজনা ও অন্যান্য খরচা দিয়া জীবনধারণের জন্য তাহার কিছু থাকে না। সে চিরকালই অন্নকষ্টে ও দারিদ্র্যে থাকে। তৎপর, তাহার জমিতে অর্থনীতির "আয় কমার আইন" দ্বারা আয় ক্রমাগত কমিতে থাকে, অথচ সেই জমির উপর পূর্ব্বের আয়ের হারে নির্দ্ধারিত খাজনা বরাবর চলিতে থাকে। এই সঙ্গে এই অর্থসঙ্কটের দিনেও পূর্ব্বের হারের সুদের নিয়ম চলিতেছে ও তাহা না দিতে পারিলে সুদের সুদ বরাবর চলিতেছে।

অর্থনীতির নিয়ম এই যে, স্বাভাবিক সময়ে অর্থ প্রাচুর্য্যের কালে আয়ের হার অনুযায়ী সুদ বা ভাড়া বা খাজনা লোকে দেয়। সাদা কথা এই, একটা জমির খাজনা তাহার আয়ের উপর নির্দ্ধারিত হয়, যখন কারবারীর লাভ হয় তখন সে বেশী সুদে ধারও নেয়। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই বাঙ্গলা প্রদেশের কৃষকের এই অর্থসঙ্কট কালে তাহার ব্যতিক্রম হইতেছে। তাহাকে এখনও পূর্ব্বের হারে খাজনা ও সুদ দিতে হইতেছে। ইহার কারণ অতীত-কালে সে লেখাপড়া করিয়া খাজনা ও সুদের হার ঠিক করিয়াছিল। কিন্তু তারপর যে দেশব্যাপী অর্থসঙ্কট হইয়াছে তাহাতে সকলের আয় কমিয়া গিয়াছে, সকলেরই দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে, উত্তমর্ণ তাহা বুঝিতে পারিতেছেন না। তিনি তাঁহার টাকা আদায় করিবেনই করিবেন। আর গভর্ণমেণ্ট ও সমাজ নির্ব্বিকারে তাহা দাঁড়াইয়া দেখিতেছেন। এই বিষয়ে ব্যবস্থাপক সভায় বিশেষ কোন আন্দোলন হইতেছে না। অথচ আদম-সুমারীর মতে বাঙ্গলার কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধ ৪ কোটি লোকের মধ্যে কায়িক পরিশ্রম করিয়া খায় এমন লোকের সংখ্যা প্রায় ৪ কোটি, আর ভূ-স্বামীর সংখ্যা ১৩ লক্ষ ১ হাজার ৭ শত: আর তাদের ম্যানেজার, নায়েব, মুহুরী প্রভৃতির সংখ্যা ১ লক্ষ ৩২ হাজার ৬ শত। ইহার অর্থ প্রাঞ্জল; সমাজের বেশীর ভাগ লোক কৃষিজীবী বা অন্য কোন কায়িক পরিশ্রম করে। পর-গাছার দল সমাজে মুষ্টিমেয়। অথচ সমাজের বেশীর ভাগ লোকের উন্নতির জন্য কোন আন্দোলন নাই, তাঁহাদের দাবী-দাওয়া সাধারণের নিকট সমুপস্থিত করিবার জন্য কোন আন্দোলন আজ পর্য্যন্ত হয় নাই। শুনা যায় একটা জাতীয় আন্দোলন আছে: জাতীয় কংগ্রেস সেই আন্দোলন

পরিচালিত করেন। শুনা যায় তাঁহারা দেশের জন্য স্বরাজ চান কিন্তু গরীবের অভাব ও অভিযোগের প্রতিকার করিতে তাঁহাদের দেখা যায় না ; বরং মূর্খ ও গরীব কৃষকদের দুঃখের দিনে তাহাদের হাতে "মাকাল ফল দিব" বলিয়া ভুলাইয়া "ট্যাক্স বন্ধ" আন্দোলন চালাইয়া এই অজ্ঞ লোকদের আরও বিপদে ফেলান হয়, অথচ তাঁহাদের জমিদার ও মহাজনের খাজনা এবং সুদের হাত হইতে এই সঙ্কট সময়ে পরিত্রাণ পাইবার কোন চেষ্টা করা হয় না। বরং যাহারা গরীব শ্রমিক ও কৃষকদের সপক্ষে কিছু বলিতে চেষ্টা করেন, তাঁহাদের এই কংগ্রেসওয়ালারা "স্বদেশদ্রোহী" বলিয়া অভিশপ্ত করেন। ইহার কারণ কি? কারণ অতি পরিষ্কার ; জমিদার ও মহাজন এবং সাধারণ ধনীরাই কংগ্রেসের ও জাতীয় আন্দোলনের নেতা, তাঁহাদের অর্থেই এইসব আন্দোলন চলে, কাজেই তাঁহাদের চটাইতে কোন "স্বদেশী কর্ম্মী" সাহস করেন না ; আবার ধনীরা কোন স্বার্থ ত্যাগ করিবেন না অথচ গরীবদের দ্বারা নিজেদের কার্য্যোদ্ধার করিতে হইবে। কাজেই ধর্ম্মের ক্ষেপান দিয়া অজ্ঞ কৃষক ও শ্রমিকদের দিয়া স্বকার্য সাধন করার নাম হইতেছে "জাতীয় আন্দোলন"।

ইহা হইল স্বদেশ-প্রেমিকদের কার্য্য ; এখন "গোদের উপর বিষ-ফোঁড়ার" ন্যায় আর একদল বাহির হইয়াছেন যাঁহারা কৃষকের হিতৈষী বলিয়া পরিচয় দিয়া কৃষকদের মধ্যে আসিতেছেন। তাঁহারা হইতেছেন জমিদার, তালুকদার, জোতদার, উকিল, ব্যারিষ্টারের দল। মাছ মরিলে বেড়াল যেমন কাঁদে, তদ্রূপ এই ধনীর দল হঠাৎ কৃষকের বন্ধু সাজিয়া উঠিয়াছেন। কেহ তাঁহাদের গরীবের বন্ধু হইতে দেখেন নাই। গরীবদের নামে তাঁহারা আগে নাক শিটকাইতেন, এতদিন তাঁহারা সাম্প্রদায়িক কলহ বা সরকারের ধামা ধরিয়া বা কেহ কেহ কংগ্রেস দ্বারা নিজেদের জাহির করিতেছিলেন ; কিন্তু কংগ্রেস ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত হওয়ায় এই দল, এই ফাঁকে আসরে নামিয়া গরীবের বন্ধু, দীন-দয়াল বলিয়া নিজেদের ঢাক পিটাইতেছেন। এই ব্যাপার দেখিয়া মূর্খ চাষী হয়তো ভাবিতেছেন, "আমার কপাল বুঝি ফিরিল, জমিদারবাবু বুঝি আমার প্রতি সদয় হইলেন।" কিন্তু আমার অজ্ঞ চাষী-ভাই জানে না যে ইহার পশ্চাতে কি মতলব লুক্কায়িত রহিয়াছে। সকলেই জানেন যে আগামী বৎসরে গভর্ণমেণ্ট নূতন আইন দ্বারা শাসন-প্রণালীর সংস্কার-সাধন করিতেছেন। এই শাসন সংস্কারটি কাহার সুবিধানুযায়ী হইবে তাহা লইয়াই কংগ্রেসের এতদিন আইন-অমান্য আন্দোলন চলিতেছিল। কিন্তু উভয়পক্ষে রক্ষা হইবার

কোন লক্ষণ আজ পর্যন্ত দেখা যাইতেছে না। আর কংগ্রেসকে আইন-সঙ্গত প্রতিষ্ঠান বলিয়া ঘোষণা করিলেও কংগ্রেস যে ব্যবস্থাপক সভায় যোগদান করিবে বা মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করিবে তাহার কোন স্থিরতা নেই। অথচ গভর্ণমেন্ট লোকের ভোটাধিকার সংখ্যা বাড়াইয়া দিতেছে। শ্রমিক ও কৃষকেরা বহু সংখ্যায় ভোটাধিকার পাইবে। এই মহাসুযোগ কে ছাড়ে? এইজন্য যাঁহারা গাঁয়ে কোন আন্দোলনে এতদিন ছিলেন না, যাঁহারা গায়ে কোন প্রকারে আচড় লাগান নাই, এই সুযোগে ব্যবস্থাপক সভায় গিয়া "মালসী" সাজিবার সখ করিতেছেন। এই জনাই যত ধনীর দল কৃষক ও শ্রমিকের দরদী সাজিয়া উঠিতেছেন। এই জন্যই রায়ত সভা, খাতক সভা, জোতদার সভা প্রভৃতি গজাইয়া উঠিতেছে। কিন্তু কৃষক শ্রেণীকেও উপরোক্ত দুই দল হইতে সাবধান হইতে হইবে। তাঁহাদের দুঃখ লাঘব জন্য নিজেদের দল হইতে মনোনীত বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে আইন সভায় পাঠাইতে হইবে যিনি কৃষকের স্বার্থরক্ষার জন্য চেষ্টা করিবেন। মনীব ও চাকর, শোষক ও শোষিতের এক স্বার্থ নয়, চাকরকে চাকর রাখিব অথচ তাহার স্বার্থ দেখিয়া তাহাকে উচ্চপদে বসাইব ইহা জগতে সম্ভব হয় না। সেইজন্য ভূস্বামী ও উত্তমর্ণ কখন রায়ত ও খাতকের স্বার্থ সংরক্ষণ করিতে পারেন না। বিগত কয়েক বৎসর ধরিয়া বাঙ্গলায় কৃষকের যে দুর্দ্দশা যাইতেছে, তাহাতে জমিদার ও মহাজনেরা কৃষক ও খাতকের দুঃখ লাঘবের জন্য কি করিয়াছেন যে আজ তাঁরা এইসব লোকের স্বার্থ রক্ষা করিবেন বা তাঁহাদের প্রতিনিধি সাজিবেন? ইহার জবাবে, জমিদার ও ধনীরা বলেন, তাঁহাদের ঘরে টাকা কোথায় যে, সরকারের খাজনা দিবেন বা বিনা সুদ আদায়ে ঘরে বসিয়া খাইবেন? কিন্তু প্রত্যুত্তরে বলা যায় যে, "ওগো মহাপ্রভুরা, তোমরা পুরুষানুক্রমিক গরীবদের শোষণ করিয়াছ, আজ গরীবদের দুর্দ্দিনে নিজেদের থলে খুলিয়া কিছু টাকা বাহির কর না, কিছু সঞ্চিত অর্থ বাহির করিয়া খাজনা দাও না বা নবাবীর খরচ চালাও না?" যদি ইহাতে ধনী রাগিয়া উঠিয়া বলেন, "আমার ঘরে কি টাকা সঞ্চিত আছে যে খরচ করিব, তোমার কাছ হইতে আদায় না করিলে আমি খরচ করিব কি করে?" ইহার জবাবে ইহা বলা যায় যে, "হে মহাপ্রভুরা, এতদিন তোমরা আমাদের শোষণ করিয়া নবাবী করিয়াছ, গরীবের রক্ত জল করিয়া অর্থ লইয়া তাহা বিলাস ও ব্যসনে উড়াইয়াছ, তাহার দায়ী কি আমরা?"

"তোমরা কি ভাবিয়া রাখিয়াছ যে আমরা চিরকালই পদদলিত হইয়া থাকিব আর তোমরা আমাদের রক্ত জল করিয়া নিজেদের ভোগ-বিলাসের

পাকা ব্যবস্থা করিয়া রাখিবে? আমাদের ধারা কি চিরকালই সনাতন অক্ষয় হইয়া থাকে? তোমরাও যদি স্বরাজ চাও তাহা হইলে আমরাও কি স্বরাজ চাই না? ইতিহাস কি বলে না যে একদিন আমরাই জমির মালিক ছিলাম? আমরা কি আমাদের দাবী-দাওয়া লোক সমাজে প্রকাশ করিব না? আমরা চিরকাল পদদলিত ও শোষিত হইয়া থাকিলে কি সমাজের ও দেশের মঙ্গল হইবে?"

এই দেশের কৃষকের এরূপ দুর্দ্দশা কেন হইল তাহার একটু ঐতিহাসিক অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। সমাজতত্ত্ববিদেরা বলেন, যখন মানুষ অসভ্যাবস্থায় দলবদ্ধ হইয়া যাযাবররূপে যখন গরু-বাছুর লইয়া এক মাঠ হইতে অন্য মাঠে বিচরণ করিত, তখন সমস্ত সম্পত্তি পশু-চারণের মাঠ এই দলের যৌথ সম্পত্তি ছিল। তৎপর, যখন মানুষ যাযাবর বৃত্তি ত্যাগ করিয়া একস্থানে স্থায়ী হইয়া কৃষিকর্ম্ম করিতে আরম্ভ করে তখন সেই কৃষিক্ষেত্র সমাজের সমস্ত লোকের যৌথ সম্পত্তি ছিল। তখন জমি জাতীয় সম্পত্তি ছিল। তৎকালে জাতি ও কৌমগত সাম্যবাদ প্রচলিত ছিল। অতঃপর সমাজের জনকতক লোক ক্ষমতাশালী হইয়া এই জাতীয় জমিকে কাড়িয়া লইয়া নিজের গোষ্ঠীর সম্পত্তি করিয়াছে। ইহাকে গোষ্ঠীগত সম্পত্তির সাম্যবাদ বলে। পরে গোষ্ঠী-যৌথ সম্পত্তির অধিকার ভাঙ্গিয়া ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত হইয়াছে, ইহাকে সম্পত্তির ব্যক্তিত্ববাদ বলে। জগতের সমস্ত সভ্য দেশে সমাজের এই বিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে; এখন সভ্য দেশের চাষীরা নিজেরাই ভূ-স্বামী। কিন্তু এক্ষণে সমাজসাম্যবাদীরা সমাজে সর্ব বিষয়ে সাম্যবাদ আনিবার চেষ্টা করিতেছেন। তাহার অগ্রদূত রুশদেশে সেই পরীক্ষার চেষ্টা চলিতেছে। তথায় জমি জাতীয় সম্পত্তি করা হইয়াছে এবং কৃষকদের যৌথ উপায়ে চাষ করিবার শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। এই প্রণালীতে দেখান যাইতেছে প্রত্যেক কৃষকের টুকরা টুকরা জমিতে নিজে চাষ করার চেয়ে সকলে মিলিয়া যৌথভাবে চাষ করিলে লাভ বেশী হয়।

দুই-এক কথায় কৃষকের ও তাহার জমির বিবর্ত্তনের ইতিহাস বলা হইল। এক্ষণে দেখা যাউক ভারতবর্ষে কি বিবর্ত্তন হইয়াছে। ভারতের ঐতিহাসিক যুগ বেদের সময় হইতে আরম্ভ হইয়াছে। তখনকার প্রথমাবস্থায় লোক যাযাবর অবস্থায় ছিল, পরে কৃষিকর্ম্মে ব্যাপৃত হইয়া স্থায়ী বসবাস নির্ম্মাণ করিতে শিখিয়াছিল। এই সময়ে জমি একটি কৌম ও কুলের যৌথ সম্পত্তি ছিল। পরে রামায়ণ, মহাভারতের যুগে এবং পরবর্ত্তী

বৌদ্ধযুগেও জমি একটি কুলের যৌথ হইয়া জাতীয় সম্পত্তি ছিল। যতদিন কুলপ্রথা ভারতের বিভিন্ন স্থানে ছিল ততদিন এই বন্দোবস্ত ছিল। এখন ভারতের পূর্ব্ব সীমায় খাসিয়াদের মধ্যে ও পশ্চিম সীমানায় পাঠান জাতিদের মধ্যে জমি কুলের হইয়া আছে, যথা আফ্রিদি স্থানের জমি আফ্রিদি কৌম বা জাতির, ওয়াজিরি স্থানের জমি, ওয়াজিরি জাতির জমি ইত্যাদি। কিন্তু ভারতের অর্থনীতিক ও রাজনীতিক পরিবর্ত্তনের সঙ্গে কুলগত জমি ভাঙ্গিয়া বংশগত হইয়া যায়। এখন হইতে জমি একটি বংশের যৌথ পরিবারভুক্ত হয়। ইহ'তে কুলগত সাম্যবাদ ভাঙ্গিয়া বংশগত সাম্যবাদ প্রচলিত হয়। বাঙ্গলার বাহিরে হিন্দুদের "মিতাক্ষরা" আইন তাহার প্রমাণ। কিন্তু বাঙ্গলায় এই যৌথ পরিবারভুক্ত সাম্যবাদ প্রচলিত হইলেও জীমূতবাহনের দায়ভাগ আইন যাহা বাঙ্গলায় প্রচলিত রীতির সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া প্রণয়ন করা হইয়াছিল, তদ্দ্বারা বঙ্গবাসী হিন্দুকে আইনের ব্যক্তিত্ববাদ অধিকার প্রদান করা হইয়াছে। ইহার অর্থ, মিতাক্ষরা আইনের ফলে লোকের পৈতৃক সম্পত্তিতে তাহার ব্যক্তিগত অধিকার নাই। পৈতৃক সম্পত্তি তাহার ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়; কিন্তু দায়ভাগ আইনে পৈতৃক সম্পত্তিতে ব্যক্তিগত অধিকার আছে। দায়ভাগের ফলে বাঙ্গলার লোকের বিষয় টুকরা টুকরা হয়। মুসলমান সরিয়াত আইনানুযায়ী সম্পত্তি পুত্র ও কন্যাদের মধ্যে টুকরা টুকরা হয়। বাঙ্গলার হিন্দু ও মুসলমান এই উভয় সম্প্রদায়ের আইন, সম্পত্তিতে ব্যক্তিগত অধিকার দিয়াছে এবং টুকরা টুকরা করিয়া ভাগ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছে বলিয়া এতদিন এই প্রদেশে অতি ধনী ও অতি গরীব এই উভয় শ্রেণী তেমন বিদ্যমান নাই। প্রত্যেকের কিঞ্চিৎ চাষ করিবার জমি আছে। কিন্তু এই টুকরা করিয়া ভাগ করিবার ব্যবস্থার জন্য বাঙ্গলার চাষীর বেশী জমি নাই; গড়-পড়তা ৫-৬ বিঘা জমি প্রত্যেকের ভাগে পড়ে। তাহাতে একটা পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদন কি প্রকারে সম্ভব হয়? আর এই প্রদেশে চাষের জমির পরিমাণ এত ক্ষুদ্র হওয়ায় চাষের কার্য্যে লাভও তেমন নাই। ক্ষুদ্র চাষের জমি আখেরে লাভজনক নহে; তাহার জ্বলন্ত প্রমাণ ফ্রান্স দেশ। তথায় বিপ্লবের পর সমাজে সাম্য অনয়ন জন্য প্রত্যেকের বিষয় তাহার পুত্র-কন্যাদের মধ্যে টুকরা টুকরা করিয়া ভাগ করিয়া দেওয়া হয়। ইহার ফলে ফ্রান্সে একদিকে যেমন অতি ধনী ও অতি গরীব এই দুই শ্রেণী সৃষ্টি হয় নাই, তদ্রুপ দেশ-ব্যাপী ক্ষুদ্র চাষী সৃষ্টি করিয়া চাষেরও উন্নতি সাধিত হয় নাই। সেই দেশের কৃষক চাষ সংক্রান্ত ব্যাপারে ও অর্থের দিক দিয়া তাহাদের

প্রতিবেশীদের অপেক্ষা নিঃস্তরে রহিয়াছে। এই জন্যই রুশের যৌথ চাষের প্রণালীর প্রতি অনেকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে।

এক্ষণে বাঙ্গলার কৃষকের ভাগ্য বিবর্ত্তনের ইতিহাসের অনুসন্ধান করা হউক। বাঙ্গলার ইতিহাস যে স্থান হইতে আরম্ভ, সেই স্থল হইতে আমরা কুলপ্রথা পাই না। বোধহয় বাঙ্গালী জাতি তখন এক জাতীয়তা লাভ করিয়াছে। সমাজে ধর্ম্ম ও বর্ণভেদ থাকা সত্ত্বেও সকলে একটা জাতি এই ভাব সকলে পাইয়াছে। রাঢ়, বঙ্গ, বারেন্দ্র, সমতট এই চার রাজত্বের লোক বঙ্গবাসী হইয়াছে। ইহার মধ্যে ধর্ম্মভেদ ও বর্ণভেদ থাকা সত্ত্বেও সকলে অনুভব করেন—তাঁহারা গৌড়ীয় বা বঙ্গবাসী বা বাঙ্গালী। এই বাঙ্গালী চাষী মধ্যে কৌম বা কুল প্রথা দেখিতে পাই না। সর্ব্বলোকের পক্ষে যে আইন প্রচলিত আছে, ইহাদের মধ্যেও তাহাই। বাঙ্গলার চাষী সম্পত্তি বিষয়ে কুলগত ও বংশগত সাম্যবাদের স্তর হইতে নির্গমন করিয়া ব্যক্তিত্ববাদের স্তরে আসিয়াছে।

পৃথিবীর সুসভ্য দেশসমূহে এবং বিশেষতঃ ইউরোপ ও আমেরিকাতে কৃষকেরা ব্যক্তিত্ববাদের স্তরে আসিয়া নিজের চাষের জমীর মালিক নিজে হইয়াছেন। তাঁহারা নিজেরাই ভূ-স্বামী : কিন্তু বাঙ্গলায় তাহার ব্যতিক্রম কেন হইল ? বাঙ্গলায় আজ কৃষকের এই দুর্দ্দশা কেন হইল তাহার অনুসন্ধান প্রয়োজন।

পূর্ব্বোক্ত হইয়াছে, ভারতবর্ষে পূর্ব্বকালে জমি একটি কুলের যৌথ ছিল, পরে কুল ভাঙ্গিয়া গোষ্ঠী বা বংশের ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকে। কিন্তু নানা বিজাতীয় লোকদের আক্রমণের ফলে এবং মোগল ও মহারাষ্ট্র সুবেদারেরা জোর করিয়া জমি কাড়িয়া লওয়াতে জমি অনেক গোষ্ঠীর হস্তান্তর হয়। জায়গীরদার ও তালুকদার শ্রেণী সৃষ্টি হয়। কিন্তু বাকি জমি চাষীর নিজের হাতে থাকাতে সেই ভূ-স্বামী ছিল। তারপর ইংরেজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সারা ভারতে রাজ্য স্থাপন সময়ে জমির তজ্জন্য চাষীর ভাগ্যে আবার পরিবর্ত্তন ঘটে। জমি কৃষকের হস্ত হইতে এক কলমের খোঁচায় বাহির হইয়া যায়।

এক্ষণে বিচার্য্য জমির মালিক কে ? হিন্দু শাস্ত্রে বলে, যে জঙ্গল কাটিয়া আবাদ করে জমি তাহার। এইজন্য একটি কুল যে স্থানে বসবাস করিয়া আবাদ করিত, জমি সেই কুলেরই হইত। হিন্দু আইনে জমিতে রাজার কোন অধিকার নাই। কিন্তু দেশে শান্তি রাখিবার জন্য প্রজারা রাজাকে উৎপন্ন শস্যের ষষ্ঠাংশ বা অষ্টমাংশ স্বেচ্ছায় প্রদান করিত;

ইহাকে রাজস্ব বলিত। পরে মুসলমান যুগে এই রাজস্বের পরিমাণ আরও বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হয়; কিন্তু তখনও জমি কৃষকের নিজের ছিল। এই দুই যুগে ভূমির অধিকারী ছিল কৃষক, আর রাজা ও কৃষকের মধ্যবর্ত্তী উপস্বত্বভোগী কেহ ছিল না। কিন্তু ইদানীং মোগল শাসনের সময়ে নবাব প্রজাদের কাছ হইতে রাজস্ব আদায় করিবার জন্য ঠিকেদার নিযুক্ত করিতেন। তাহাদের "জমিদার" বলিত। ইহারা সরকার হইতে বাৎসরিক হিসাবে চুক্তি করিয়া পরগণার খাজনা আদায়ের ভার লইত। কিন্তু ইংরেজ কোম্পানীর বড়লাট লর্ড কর্ণওয়ালিশ রাজস্ব আদায়ের সুব্যবস্থার জন্য এইসব ঠিকেদারদের সহিত পাকা বন্দোবস্ত করিলেন। ইহাকে "দশশালা বন্দোবস্ত" বলে। ইহাই ১৭৯৩ খৃঃ অব্দে চিরস্থায়ী করিয়া দেওয়া হয়। ইহাতে, জমির উপর খাজনা আদায় করিবার অধিকারী ঠিকেদার, যিনি এখন "জমিদার" হইলেন, তাঁহাকে ও তাঁহার উত্তরাধিকারীদের চিরকালের জন্য দেওয়া হইল। এই বন্দোবস্তে গভর্ণমেণ্ট হইলেন জমির খোদ মালিক। ইহা দ্বারা একপ্রকারে জমিকে রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি করা হয়, তৎপর গভর্ণমেণ্ট জমিদারকে জমি খাজনা বিলি করিয়া দিলেন। জমিতে গবর্ণমেণ্টের হক, এবং জমিদারের হক কোথা হইতে আসিল, তাহার সন্ধান কেহ করিল না। এই আইন প্রণয়নের সময় লর্ড কর্ণওয়ালিশ বলিয়াছেন "জমিদারের স্বত্ব কোন ভিত্তির উপর স্থাপিত তা নিয়ে আমি তর্ক করা অনাবশ্যক মনে করি।" আবার বেডেন পাওয়েল নামক একজন ইংরেজ কর্ম্মচারী তাঁহার "Land Tenure System of India" নামক পুস্তকে বলিয়াছিলেন "জমিতে গভর্ণমেণ্টের কোন পরিষ্কার অধিকার নাই।" ইহার মানে ইউরোপে, প্রাচীন কালে চাষীরা নিজের জমির ভূস্বামী ছিল; পরে মধ্যযুগে বর্ব্বরদের আক্রমণের ফলে বিজিত জাতিরা জমি হারাইয়া অর্দ্ধ গোলাম কৃষকে পরিণত হয়। আর কিছু উর্দ্ধ একশত বৎসর আগে হইতে বর্ত্তমানের বুর্জোয়া সভ্যতার প্রচলন হওয়াতে সেই ভূ-খণ্ডের চাষীরা অধীনতা মুক্ত হইয়া নিজে জমির মালিক হইতেছে। আর ভারতে, প্রাচীন ও মধ্য বা মুসলমান যুগে কৃষক নিজের জমির মালিক ছিল, পরে ইংরেজ দ্বারা ভারত বিজয়ের পর তার ভাগ্য বিপর্যয় হইয়াছে। সে এখন "নিজ গৃহে পরবাসী" হইয়াছে। সে তাহার পৈতৃক জমিতে এখন চাষের গোলাম হইয়াছে, ভোগের মালিক আর নয়।

এই প্রকারে এক কলমের খোঁচায় বাঙ্গলার কৃষিজীবী তাহার পূর্ব্বপুরুষের জমিতে স্বত্ব হারাইয়া এখন "চাষীতে" পরিণত হইল। এই বিপদের

উপর নবাবী আমলের "আবওয়াব" প্রথা তাহার ঘাড়ে পড়িয়াছে। তারপর নানা করজালে প্রপীড়িত হইয়া সে ব্যতিব্যস্ত হইয়াছে। ইহার উপর "গোদের উপর বিষ ফোড়ার ন্যায়" কয় বৎসর জগতব্যাপী অর্থসঙ্কট উপস্থিত হওয়ায় বাঙ্গলার চাষী মৃতপ্রায় হইয়াছে। আবার ইহার উপর জমিদার তাহার খাজনা ছাড়ে না, মহাজন তাহার সুদ ছাড়ে না, গভর্ণমেণ্ট তাহার ট্যাক্স ছাড়ে না, পুরোহিত তাহার প্রাপ্য ছাড়ে না। এক্ষণে কথা এই, এই অবস্থায় গরীব কৃষক কি করিবে? স্বদেশপ্রেমিক ও দেশপ্রাণ ব্যক্তিরা তাহাদের দিকে তাকায় না, কারণ তাহা হইলে এই জমিদার এবং মহাজন ও ধনীরা আর তাঁহাদের জাতীয় আন্দোলনে টাকা দিবে না। এই জন্য কংগ্রেসী নেতারা "সাপও মরিবে, লাঠিও ভাঙ্গিবে না" এরূপ ব্যবস্থা করিয়া চাষীর দুঃখ লাঘব জন্য "চৌকিদারী ট্যাক্স বন্ধ আন্দোলন" জন্য মূর্খ চাষীদের ক্ষেপাইতে লাগান, আর কোন কোন স্থানের মূর্খ চাষীরা দুঃখে জর্জ্জরিত হইয়া "বুঝি ইহাতেই মুস্কিল আসান হইবে" বলিয়া দৌড়িয়া গিয়া তাহাই করিয়াছে কিন্তু এই আন্দোলনে কৃষকগণের কি সুবিধা হইয়াছে তাহা তাহারাই বলিবে।

ইহাই হইতেছে বাঙ্গলার চাষীর বর্ত্তমান কালের অবস্থার আদ্যকাণ্ড। ভবিষ্যতে কি হইবে তাহা কে জানে? কিন্তু আমরা এই জানি যদি কৃষক শ্রেণীকে উঠিতে হয়, যদি তাহাদের ঋণমুক্ত হইয়া স্বাধীন মানুষ হইবার ইচ্ছা হয়, যদি তাহাদের ভাগ্য নিজেদের হাতে লইতে হয়, তাহা হইলে পরমুখাপেক্ষী হইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। তাহাদের সংঘবদ্ধ হইয়া কার্য্য করিতে হইবে। নিজের ভাগ্য পরিবর্ত্তনের জন্য শিক্ষা, দীক্ষা এবং তদনুযায়ী সাধনা প্রয়োজন। এখন সংঘশক্তির যুগ। যেমন বাবুরা সংহত শক্তির দ্বারা নিজেদের কার্য্য সম্পাদন করিতে উদ্যত, তদ্রূপ কৃষক শ্রেণীকেও সংঘবদ্ধ হইয়া কার্য্য করিয়া নিজেদের উদ্ধার করিতে হইবে। তাহাদের বিচার করিয়া দেখিতে হইবে যে, বর্ত্তমানের সমাজ ও অর্থনীতিক পদ্ধতি তাহার উন্নতির অন্তরায়। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের কৃষকেরা যেমন নিজেদের মুক্ত করিয়া নিজেদের শ্রমজাত দ্রব্যের মালিক নিজেরা হইতেছেন, বাঙ্গলার চাষীকে তদ্রূপ করিতে হইবে। এই জন্য চাই জ্ঞান, চাই শিক্ষা এবং চাই সংঘবদ্ধ কার্য্য। এই কারণবশতঃ আমাদের কৃষক-ভাইয়েরা বর্ণগত ও ধর্ম্মগত বিভেদ ভুলিয়া গিয়া এক হইয়া নিজেদের উন্নত করিবার চেষ্টা করুক। তাহাদের মনে রাখা দরকার পেটের সবের চেয়ে বেশী মিল। এই জন্য অর্থনীতিক মিলনের দ্বারা এই জেলায় সকল

কৃষককে একত্রিত করিয়া তাহারা কৃষক আন্দোলন সৃষ্ট করিয়া নিজের ভাগ্য নিজের হাতে লইবার চেষ্টা করুক। এই চেষ্টায় সফল হইলে বেদের সেই পুরাতন প্রার্থনা "বলীবর্দ্দসমূহ সুখে বহন করুক; মনুষ্যগণ সুখে কার্য্য করুক, লাঙ্গল সুখে কর্ষণ করুক। প্রগ্রহসমূহ সুখে বদ্ধ হউক এবং প্রভেদ সুখে প্রেরণ কর।" তাহা সফল হইবে।

১ম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ৩রা জুন ১৯৩৩, পৃষ্ঠা-১, ২, ৩, ৪, ৫. ৬

□

বর্দ্ধমান জেলা কৃষক সম্মেলন

গত ২১শে জ্যৈষ্ঠ সদর মহকুমার হাটগোবিন্দপুর গ্রামে ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের সভাপতিত্বে বর্দ্ধমান জেলা কৃষক সম্মেলনের অধিবেশনে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হইয়াছিল ঃ

১। দেশের বর্ত্তমান আর্থিক দুরবস্থা লক্ষ্য করিয়া এবং এই আর্থিক দুরবস্থায় কৃষকদের শোচনীয় অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এই সম্মেলন সরকারকে অনুরোধ করিতেছে যে, যে অনুপাতে কৃষিজাত পণ্যাদির মূল্য হ্রাস পাইয়াছে, অন্ততঃ সেই অনুপাতে কৃষকদের খাজনা হ্রাস করা হউক এবং কৃষকদের বর্ত্তমান অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়া অন্ততঃ তিন বৎসরের জন্য খাজনা আদায় বিনাসুদে স্থগিত রাখা হউক।

২। বর্দ্ধমান জেলার কৃষকদের এই সম্মেলন জেলার বাসস্থানে জমিদার কর্ত্তৃক পুনঃপুন খাজনা বৃদ্ধির তীব্র প্রতিবাদ করিতেছে ও খণ্ডেশ্বরের কৃষকেরা খাজনা বৃদ্ধি বন্ধের জন্য যে ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন, তাহার প্রশংসা করিতেছে। আশা করা যায় যে সরকার এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়া চাষীদের স্বার্থরক্ষা করিবেন।

৩। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে কৃষকেরা তাহাদের জমির মালিকানা স্বত্ব হইতে চ্যুত হইয়া বর্ত্তমানে যে অবস্থায় আসিয়া পড়িয়াছে, তাহাতে জমি সম্বন্ধে তাহাদিগকে বহুবিধ অসুবিধা ভোগ করিতে হইতেছে। এই সম্মেলন কৃষকদের জমি সংক্রান্ত অসুবিধাগুলিকে দূর করিবার জন্য দেশব্যাপী আন্দোলন করা স্থির করিতেছে এবং সরকারকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত তুলিয়া দিতে ও সকল প্রকার মধ্যস্বত্বাদির লোপ করিতে অনুরোধ করিতেছে।

৪। জমিদার ও তৎকর্ম্মচারীগণ কর্ত্তৃক আবওয়াব, তহুরী, মাথট প্রভৃতি বাবদ প্রজাগণের নিকট হইতে অন্যায়ভাবে যে সমস্ত টাকা আদায় করা হয়, এই সম্মেলন তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিতেছে এবং এইরূপ অন্যায় শোষণের বিরুদ্ধে চাষীগণকে দৃঢ়ভাবে দাঁড়াইতে অনুরোধ করিতেছে।

৫। যে জমির উর্বরতা বৃদ্ধি করিতে জমিদার কোনরূপ সাহায্য করেন নাই, এই সম্মেলনের মতে জমিদার সেই জমির খাজনা বৃদ্ধি করিতে পারিবেন না।

৬। বর্ধমান জেলা কৃষক সম্মেলনের এই অধিবেশন নোয়াখালির কৃষক আন্দোলনের বিরুদ্ধে জমিদার, মহাজন শ্রেণীর পৃষ্ঠপোষিত জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রসমূহ যে মিথ্যা প্রচার করিতেছে এবং হিন্দু মহাসভা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান এই আন্দোলনের যে সাম্প্রদায়িক রূপ দিতেছে—তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিতেছে এবং নোয়াখালির চাষীদিগকে আন্তরিক সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছে, তাহাদের সকল প্রচেষ্টা সমর্থন করিতেছে।

৭। বর্দ্ধমান জেলা কৃষক সম্মেলনের এই অধিবেশনে কৃষক সমিতির পক্ষ হইতে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য ইউনিয়ন বোর্ড, ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড, ব্যবস্থাপক সভা প্রভৃতির সদস্যপদ অধিকার করা স্থির করিতেছে।

৮। কৃষকদের বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এই সম্মেলন সরকারকে অনুরোধ করিতেছে যে, অন্ততঃ তিন বৎসরের জন্য চাষীদিগের নিকট হইতে যাহাতে সুদ, আসল প্রভৃতি আদায় বন্ধ থাকে সেই ব্যবস্থা অবলম্বন করা হউক। যে যে স্থানে সুদ আসল টাকার সমান হইয়াছে বা ছাপাইয়া গিয়াছে সেই সেই স্থানে সুদ সম্পূর্ণ বাতিল করিয়া পাঁচ বৎসরের কিস্তিবন্দীতে মাত্র আসল আদায় হইবে।

৯। সেচ বিভাগের নূতন নিয়ম অনুযায়ী নদীর বাঁধ বাঁধিয়া পুষ্করিণীতে জল লওয়ার জন্য যে নূতন ট্যাক্স ধার্য্য করা হইয়াছে, এই সম্মেলন তাহার প্রতিবাদ করিতেছে এবং তাহা তুলিয়া লইবার জন্য সরকারকে অনুরোধ করিতেছে।

১০। বর্দ্ধমান জেলার কৃষকদের এই সম্মেলন ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে চাষী মজুর স্বার্থ সম্পন্ন কর্ম্মীগণকে বন্দী করিয়া দীর্ঘ চারি বৎসর ব্যাপী মীরাটে যে ষড়যন্ত্র মামলা হইয়াছে ও ফলে তাহাদের উপর যে কঠোর কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে তাহার প্রতিবাদ করিতেছে এবং সরকারের নিকট অবিলম্বে এই বন্দীগণকে মুক্তি দিবার দাবী করিতেছে।

ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, আশুতোষ দাস, জগন্নাথ সেন, স্মৃতিশ ব্যানার্জী, আনন্দ পাল, হেলারাম চট্টোপাধ্যায়, রমেন চৌধুরী, সরোজ মুখার্জী প্রভৃতি বহু কৃষককর্ম্মী উপরিউক্ত প্রস্তাবগুলি সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন ও বিশদভাবে কৃষক আন্দোলনের ধারা বুঝাইয়া দেন।

জেলা সম্মেলনের অধিবেশন সমাপ্ত হইলে আগামী বৎসরের জন্য জেলা কৃষক সমিতির সভায় নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ কার্য্যকরী সমিতির সভ্য নিযুক্ত হইয়াছেন ঃ

জগন্নাথ সেন (সভাপতি)। হেলারাম চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদক), অশ্বিনী মণ্ডল ও চন্দ্রশেখর কোঙার (সহ-সম্পাদক), রমেন চৌধুরী (কোষাধ্যক্ষ)।

কার্য্যকরী সমিতির সভ্য ঃ

ভোলানাথ কোঙার, মহানন্দ দত্ত খাঁ, হৃষীকেশ গুহ, সরোজ মুখার্জী, সাদুল্লা খাঁ, শশিপদ দাঁ, তারাপদ মোদক, গদাধর কোঙার, গোপীকৃষ্ণ রায়, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, হেমকেশ হাজরা, বিভূতি দত্ত, মুক্তি চট্টোপাধ্যায়, হীরালাল দে, অতুল সামন্ত প্রভৃতি।

১ম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ১৭ই জুন ১৯৩৩, পৃষ্ঠা-৩, ৪

□

বর্দ্ধমান জেলা কৃষক সমিতি

গত ৯ই সেপ্টেম্বর হাটগোবিন্দপুর কৃষক সমিতির কার্য্যালয়ে বর্দ্ধমান জেলা কৃষক সমিতির কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির অধিবেশন হয়।

১। জেলা কৃষক সমিতির হেড অফিস বর্দ্ধমান সহরেই রাখা স্থির হয়।

২। শ্রীযুক্তা নির্ম্মলা স্যান্যাল (কাটোয়া), শ্রীযুক্ত ধীরেন চট্টোপাধ্যায় (পাটুলী), শ্রীযুক্ত বসন্ত রায় (বর্দ্ধমান) এবং বাসাগ্রামের ঘোষ মহাশয়কে কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সদস্যভুক্ত করা হয়।

৩। গত ৪ঠা জুন তারিখে হাটগোবিন্দপুর গ্রামে যে জেলা কৃষক সম্মেলন হয় তাহার হিসাবপত্র অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি কর্ত্তৃক উত্থাপিত ও গৃহীত হয়।

৪। জেলা সমিতির কর্ম্মীগণকে অবিলম্বে ইউনিয়নে ইউনিয়নে কৃষক সমিতি গঠন করিয়া মহকুমা কৃষক সমিতিগুলিকে গঠিত করিতে অনুরোধ করা হয়।

৫। আগামী কার্ত্তিক মাসে রায়না থানায় বর্দ্ধমান সদর মহকুমা কৃষক সম্মেলন আহ্বান করা স্থির হয়।

৬। বর্দ্ধমান জেলায় স্থানে স্থানে জমিদারগণ কর্ত্তৃক খাজনা বৃদ্ধির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করা হয়। এবং ঐ ঐ স্থানের কৃষকগণকে অবিলম্বে কৃষক সমিতি প্রতিষ্ঠা করিয়া সঙ্ঘবদ্ধভাবে খাজনা বৃদ্ধির বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে অনুরোধ করা হয়। জেলা কৃষক সমিতির কর্ম্মীগণকে ঐ ঐ স্থানে পাঠাইয়া অবিলম্বে কার্য্যকরী পন্থা গ্রহণ করার স্থির হয়।

৭। বর্দ্ধমান জেলায় স্থানে স্থানে ভীষণ বন্যার ফলে গ্রামবাসীদের দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে—গ্রামবাসীদের সেই দুর্দ্দশায় সহানুভূতি জ্ঞাপন এবং অবিলম্বে সাহায্য সমিতি স্থাপন করিয়া গ্রামবাসীদের সাহায্য করা স্থির হয়।

৮। সম্প্রতি বঙ্গীয় আইনসভা কর্ত্তৃক যে মহাজন বিল পাশ হইয়াছে সেই বিল সম্বন্ধে অভিমত এই যে উহা অপর্য্যাপ্ত এবং সম্পূর্ণ কৃষক স্বার্থের অনুকূল হইবে না বলিয়া মনে করে।

১ম বর্ষ, ২২শ সংখ্যা, ১৬ই সেপ্টেম্বর ১৯৩৩, পৃষ্ঠা-৭

□

বর্দ্ধমান জেলা কৃষক সম্মেলন

বর্দ্ধমান জেলা কৃষক সমিতির সম্পাদক হেলারাম চট্টোপাধ্যায় ও অন্যতম কর্ম্মী হেমকেশ বর্দ্ধমান জেলায় গ্রামে গ্রামে পরিভ্রমণ করিয়া কৃষকদের অবস্থা পরিদর্শন করেন ও বিভিন্ন মহাজনের নিকট হইতে কৃষকদের ঋণভার লাঘব করিবার চেষ্টা করেন। তাঁহাদের প্রচেষ্টার ফলে মহাজন শ্রীযতীন হুই খাতক হেমকেশ হাজরার ঋণ ৪৪৮ টাকা হইতে ৩৬০ টাকায় নিষ্পত্তি করেন। মহাজন শ্রীবগলা চট্টোপাধ্যায় খাতক বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঋণ ২৮০ টাকা হইতে ৮০ টাকায় নিষ্পত্তি করেন, মহাজন শ্রীমঙ্গলাচরণ রায় খাতক যামিনী গুই ২৭৬ টাকা ঋণ ১৯০ টাকায়

নিষ্পত্তি করেন. মহাজন শ্রীকুলদা রায় খাতক বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়-এর ৬০০ ̣টাকা ঋণ ২৫০ ̣টাকায় ও আর এক দফা ১২০ ̣টাকা ঋণ প্রতি বৎসর ১০ ̣টাকা কিস্তিবন্দী করিয়া লইতে রাজী হইয়াছেন। আমরা আশা করি যে জেলার অন্যান্য মহাজনগণও তাঁহাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিবেন।

১ম বর্ষ, ২৩শ সংখ্যা, ২৩শে সেপ্টেম্বর ১৯৩৩, পৃষ্ঠা-১১

□

বেলুনিয়ায় সভা

গত ৩০শে সেপ্টেম্বর বেলুনিয়া গ্রামে বেঙ্গল পেপার মিল ধর্ম্মঘট-কারীদের এক সভা হইয়া গিয়াছে। কমরেড ননীগোপাল মুখার্জী সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি সভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

১। বেঙ্গল পেপার মিলের ধর্ম্মঘটকারীদের এই সভা মিল কর্ত্তৃপক্ষের যথেচ্ছ ব্যবহারের তীব্র প্রতিবাদ করিতেছে কেন না যথারীতি নোটিশ দিয়া কার্য্য ত্যাগ করার পর এখনও পুরাতন ফিনিসারদের সকল পাওনা চুকাইয়া দেওয়া হয় নাই।

২। অন্যায়ভাবে জোর প্রদর্শনপূর্ব্বক পুরাতন ফিনিসারগণকে বণ্ড সহি করান হইয়াছে ও তাহাদের প্রদত্ত গচ্ছিত টাকা এখনও ফেরত দেওয়া হয় নাই--এই সভা মিল কর্ত্তৃপক্ষের এই ব্যবহারের প্রতিবাদ করিতেছে।

৩। এই সভা আসানসোলের এস. ডি. ও. কর্ত্তৃক মিঃ ননীগোপাল মুখার্জী ও মিঃ এস সেনের উপরে ১৪৪ ধারার নোটিশ ও ১২ ঘণ্টার মধ্যে তাহাদিগকে আসানসোল মহকুমা ত্যাগ করার হুকুম দেওয়ার তীব্র প্রতিবাদ করিতেছে ও এই সভা উপরন্তু মনে করে—যে, ঐরূপ হুকুমজারী করার কোন উপযুক্ত কারণ ছিল না।

১৪৪ ধারা জারী—বাংলা অর্থ :

যেহেতু আপনি বাবু ননীগোপাল মুখার্জী রাণীগঞ্জ পুলিশ ষ্টেশনে বেঙ্গল পেপার মিলের বর্ত্তমানকার ও পূর্ব্বনিযুক্ত মজুরদের কার্য্যে সহায়তা করিতেছেন ও আন্দোলন বৃদ্ধি করিতেছেন, যাহাতে সাধারণের শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা আছে ;

সেই হেতু আমি আপনাকে বার ঘণ্টার মধ্যে আসানসোল মহকুমার বাহিরে যাইতে ও আজ ৩০শে সেপ্টেম্বর '৩৩ হইতে আগামী দুই মাসের মধ্যে ঐ স্থানে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিয়া হুকুমজারী করিতেছি।

ক্যাম্প বল্লভপুর, টি. এস. এচ. স্যাটক
পুলিশ ষ্টেশন, রাণীগঞ্জ এস. ডি. ও.
জেলা—বর্দ্ধমান আসানসোল
সময়—২-৩০ মিঃ

১ম বর্ষ, ২৪শ সংখ্যা, ১৪ই অক্টোবর ১৯৩৩, পৃষ্ঠা-১২

□

সম্পাদক 'গণনায়ক' সমীপেষু,

মহাশয়,

"মার্ক্স-পন্থী" ২য় সংখ্যা পড়িয়া আমরা স্তম্ভিত হইয়াছি। সম্পাদক মশাই তাঁর পত্রিকায় 'গণনায়কের গরম' দেখাইতে গিয়া নিজের গরমই প্রকাশ করিয়াছেন ও তাঁহার পেটী বুর্জ্জোয়া রূপ সর্বসমক্ষে ধরা পড়িয়াছে। 'গণনায়ক' সম্পাদকের সত্য ও নির্ভীক উক্তি অসহ্য হওয়াতে বোধ হয় তিনি এইরূপ কোমর বাঁধিয়া পেটী বুর্জ্জোয়া শ্রেণী সুলভ কলহে প্রবৃত্ত হইয়াছেন ও অনর্থক নোংরামির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। অযথা ব্যক্তিগত আক্রমণ, 'গণনায়ক' সংশ্লিষ্ট কর্ম্মিগণকে হীন করার প্রচেষ্টা ও সত্যের অপলাপ আমরা তাঁহার লেখার অনেকস্থলে লক্ষ্য করিয়া অতিশয় দুঃখিত হইয়াছি। (যদিও তিনি প্রবন্ধের প্রারম্ভে লিখিয়াছেন, "ব্যক্তিগত আক্রমণ করা আমাদের স্বভাব নয়" ইত্যাদি।) তিনি লিখিয়াছেন যে, 'গণনায়ক' সংশ্লিষ্ট কর্ম্মিগণ নাকি টিটাগড় ষ্ট্রাইকে কোন অংশগ্রহণ করেন নাই ও তাঁহারা নাকি 'হুগলী কৃষক সম্মেলনে' ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে দিয়া বক্তৃতা দেওয়াইয়াছিলেন ইত্যাদি। সম্পাদক মশায়ের এরূপ মিথ্যা রটনার সার্থকতা কি? হয় তিনি ইচ্ছা করিয়াই সত্যের অপলাপ করিয়াছেন নতুবা তাঁহার স্মৃতিভ্রংশ ঘটিয়াছে। টিটাগড় ষ্ট্রাইক সম্বন্ধে তিনি যথেষ্ট সংবাদও রাখেন না দেখিলাম—যাহা হউক এ সম্বন্ধে তাঁহাদের এক্স-কমরেড চৌধুরী (Holy Trinity'র অন্যতম) ও বেঙ্গল ওয়ার্কার্স পার্টির কমরেড জামাল আলোকদান করিতে সক্ষম হইবেন। আর হুগলী কৃষক সম্মেলন সম্বন্ধে তাঁহার উর্বর মস্তিষ্কের

উদ্ভট আবিষ্কারের আমরা প্রতিবাদও করিতে চাই না. কেন না সুখের বিষয় যে. এরূপ নিঃসঙ্কোচে মিথ্যা রটনায় কেহই বিশ্বাস স্থাপন করে নাই। 'মজুর ও চাষীদের গণতান্ত্রিক একাধিপত্য' নামক প্রবন্ধে তাঁহারা কোন দল বিশেষকে যে কটূক্তি করিয়াছেন. আমরা বহু চেষ্টাতেও তাহার ভিত্তির কোন হদিস পাইলাম না। আমাদের কমরেড বনস্পতিও দেখিতেছি সম্পাদক ভায়ায় মতই স্বকপোলকল্পিত তথ্য প্রচারে যত্নশীল। যাহা হউক. পত্রিকায় প্রকাশিত আরও বহু স্থানের প্রতিবাদ করিয়া আর পাতা বাড়াইতে চাহি না। তবে আমাদের মনে হয় যে. সবন্ধু সম্পাদক মহাশয় যেরূপ উৎসাহ সহকারে—'তৈলাধার পাত্র কি পাত্রাধার তৈল'—'কে কত আদি ও অকৃমে মার্ক্সপন্থী'—'কোন্ কাগজের কোন লাইনটী পেটী বুর্জ্জোয়া মনোভাব সম্পন্ন'—এইসব প্রমাণ করিতেই তাঁহার মূল্যবান সময়ের অধিকাংশ ব্যয়িত করিতেছেন. এইভাবে চলিলে যে তাঁহারা "কম্যুনিষ্ট"দের বিপ্লবী কর্ত্তব্য থেকে বিচ্যুত হইবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। অনুগ্রহ করিয়া এই পত্রখানি আপনাদের সাপ্তাহিকে প্রকাশ করিলে বাধিত হইব।

ইতি

বর্দ্ধমান. ১২-১-৩৪ — শ্রীহেলারাম চট্টোপাধ্যায়

১ম বর্ষ. ৩৭শ সংখ্যা. ২০শে জানুয়ারী ১৯৩৪. পৃষ্ঠা-১২

পরিশিষ্ট ২ □ ক্যানেল কর বিরোধী আন্দোলন সংক্রান্ত কয়েকটি নথি

২৪ ২. ১৯৩৯ তারিখে মিছিলের অনুমতি চেয়ে পুলিশ সুপারের কাছে বর্ধমান জেলা কিষাণসভার সম্পাদক দাশরথি চৌধুরীর চিঠি, ৭ ২. ১৯৩৯।

Dated 7th February 1939

Sir,

I have the honour to inform you that a demonstration and march of the peasants of the Canal area will take place at Burdwan town on the 14th February, 1939. The procession will consist of 5000 men carrying 25 flags (Tricolour and Red). The procession will start from Bajepratappur Bazar at 11 A. M. and will pass through G. T. Road to Sir Bejoy Chand Road via Curzon Gate & will return through the same route terminating in the Town Hall Maidan.

The procession will shout the following slogans: (1) Canal Kar Rs. 1/8 chai, (2) Bandemataram, (3) Inquilab Zindabad, (4) Dunyar Kishan Majdur Ek ho, (5) Kishan Majdur Ki Jai, (6) Canal Karmacharl Boycott Karo, (7) Samrajyabad Dhansa Karo, (8) Canal Atyachara Rahit Karo.

I, therefore, pray and hope you would kindly grant my application for allowing the peasants' demonstration organised by the Burdwan District Kishan Sabha.

I have the honour to be, etc...etc.

Sd/- Dasarathi Chaudhuri
Secretary
Burdwan District Kishan Sabha

□

বর্ধমান জেলার সর্বত্র (আসানসোল মহকুমা ব্যতীত) ফৌজদারী সংশোধন আইন, ১৯৩২-এর ৭ ধারা প্রয়োগের কারণসহ বিজ্ঞপ্তি—ক্যালকাটা গেজেট, ১০. ২. ১৯৩৯।

The Calcutta Gazette
Extraordinary
Published by Authority
Friday, Feb. 10, 1939

Part—I

Orders & Notifications by the Governor of West Bengal, the High Court, Government Treasury, etc.

Government of Bengal Home, Political

NOTIFICATION

Burdwan. No. 656 P. 10th February 1939.

In exercise of the power conferred by sub-section (4) of section 1 of the Criminal Law Amendment Act, 1932 (XXIII of 1932), the Governor is pleased to direct that section 7 of the said Act shall come into force in the whole of the district of Burdwan except the sub-division of Asansol on the date of publication of this notification in the Calcutta Gazette.

By Order of the Governor,
Sd/- H. J. Twynam
Secretary to the Govt. of Bengal

The Damodar Canal which was designed ultimately to irrigate about 2,00,000 acres of land in the districts of Burdwan and Hooghly was constructed between the years 1926 and 1936 and irrigation of a part of this area to be commanded began in 1933. Holders of land who desired to have water from the Canal could take leases under the

Irrigation Act at the rate of Rs. 4-8 and Rs. 3-8 per acre for annual and long term agreements respectively. In 1935 the Bengal Legislative Council passed the Development Act, the object of which was, in the words of the preamble, "to provide for the development of lands in Bengal and for that purpose to impose a levy in respect of increased profits resulting from improvement works constructed by Government." Section 10 of the Act provides that the levy, which is payable by all occupiers of lands benefited, shall not exceed one-half of the estimated benefit derived and that in respect of the Damodar Canal, the maximum charge shall be Rs. 5-8 per acre. The area commanded by the Canal was actually brought under the operation of the Development Act in the year 1936-37 and the charge of Rs. 5-8 per acre was imposed on all occupiers except those whose leases under the Irrigation Act had not expired. Many representations were made to the effect that the rate of Rs. 5-8 per acre was excessive, and at the end of 1937 Government appointed a Committee to enquire into the equity of the charge. This Committee reported that having regard to the principles of the Act they were of the opinion that the charge of Rs. 5-8 was not excessive. They recommended, however, that in view of bad conditions prevailing in the area, the rate should be fixed at Rs. 2-9 per acre. On the basis of this recommendation the Government decided that the levy should be at that rate for 1936-37 and 1937-38. It is to be noted that if this rate were realised in full from the maximum area hitherto irrigated, namely 1,35,000 acres, the revenue would be less than 3 percent of the capital cost of the Canal which is about 1,22,00,000. It must also be kept in mind that even in normal years it is likely that remissions would have to be allowed under the Act. Not only, however, did Government decide to reduce the rate chargeable under the Development Act, but they also decided that with effect from the year 1938-39 that Act should not govern the rates for the supply of water from the Canal.

Charges are now made only from persons who take leases under the Irrigation Act, the rates being Rs. 4 per acre for annual leases and Rs. 3-8 per acre for long-term leases.

In spite of these concessions agitators continued their endeavours to induce people to default in the payment of their dues. They have also tried to prevent those who wanted water from applying for leases under the Irrigation Act. At the beginning of the current financial year the arrears of water charges in the Damodar area payable at the reduced rate of Rs. 2-9 per acre under the Development Act, or at the rates agreed to under the voluntary leases under the Irrigation Act were about Rs. 6,42,000. Out of that amount and a further sum of about Rs. 71,500 added during the year, the collections upto the 28th January were less than Rs. 32 000. The activities of agitators have recently increased in consequence of the attempt on the part of Government officers to recover by means of the certificate procedure dues which were about to become time-barred. Officers have been obstructed in the performance of their duty and subjected to various forms of boycott, and attempts have been made to prevent the sale of property attached in execution of certificates. Government are of opinion that if this agitation is not checked at once, an out-break of disorder over a wide area is inevitable and have therefore decided to bring section 7 of the Criminal Law Amendment Act of 1932 into force in the whole of the Burdwan district with the exception of the Asansol sub-division.

Sd/- J. R. Blair

Secretary to the Govt. of Bengal

(Communication & Works Dept.)

□

নিষেধাজ্ঞা জারির জন্য বর্ধমানের জেলা শাসককে পুলিশ সুপারের চিঠি, ১১ ২. ১৯৩৯।

Sir,

I have the honour to report that the people of Damodar Canal area have stopped payment of Canal rates and they are holding both private and public meetings at different centres in the jurisdiction of Galsi, Ausgram, Burdwan, Bhatar, Memari, Monteswar and Mongalkote police stations in which leaders and members of Krishak Samities, Students' Federation, Labour Organisations and Congress Committees are taking part and inciting the rate payers to offer resistance to the removal of the movable properties attached in execution of the Distress Warrants for the realisation of the arrear of such rates.... They are also intimidating those who are willing to pay the rates.

As a result of this agitation, people from the jurisdictions of the thanas named above have assembled at Ausha in P. S. Memari in huge numbers and surrounded the pound in which eight cows have been impounded and have offered resistance to their removal for putting them into auction sale.

It is being preached that similar resistance will be offered at every place within the Canal area where any movable properties will be attached in execution of Distress Warrants for realisation of arrear Canal rates. The people in these areas have made a common cause in the matter of non-payment of arrear rates, as a result of which they are hindering the proper execution of the Distress Warrants and offering resistance to the removal of the attached properties.

These agitators have gone to the length of intimidating the Canal officers and by unlawful means have forced the local shopkeepers to stop selling to them their daily necessities of life and are also threatening the owners of houses where canal office etc. have been situated.

I therefore request you the favour of your issuing orders under Section 144 Cr. P. C. prohibiting the under-mentioned things in the areas defined below for two months :

a) Prohibiting holding of meetings and organising and taking out processions in the jurisdictions of the Police Stations of Galsi, Ausgram, Burdwan, Bhatar, Memari, Monteswar and Mongalkote, and Union No. I of Kalna and 10 of Purbasthali P. S.s.

b) Prohibiting carrying of lathis and other weapons of offence and things which can be used as weapons of offence in Union Nos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 of Memari P. S. and Union Nos. 3, 4, 6, 7 of Burdwan P. S.

Sd/-
S. P., Burdwan
11. 2. 39

□

পুলিশী অত্যাচার সম্পর্কে 'বর্দ্ধমান বার্ত্তা' সাপ্তাহিক পত্রিকায় কয়েকটি সংবাদের শিরোনাম ঃ

ক্যানেল অঞ্চলে অমানুষিক অত্যাচার

ঘরভাঙ্গা, প্রহার ও অকথ্য ভাষায় গালাগালি করিবার অভিযোগ

ভীতসন্ত্রস্ত হইয়া মুখের গ্রাস পর্য্যন্ত বিক্রয়

গ্রামে গ্রামে কংগ্রেস কর্ম্মীগণের যাত্রা

সামন্তী গ্রামে ৫০ জন সশস্ত্র পুলিশ

পুলিশ মাতাল অবস্থায় ছিল

জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট অভিযোগ

৬. ৩. ১৯৩৯

সম্ভ্রান্ত ঘরের স্ত্রীলোকদিগকে ডাকাইয়া অকথ্য গালাগালি

"বিনোদবাবু দারোগা স্ত্রীলোকদিগকে অপমান করিতে অগ্রণী"

ক্যানেল করে আড়ম্বর ক্রোকের নমুনা

"ভাস্করের স্ত্রীকে রৌদ্রে দাঁড় করান হয়"

মুসলমান প্রজাদের উপর অকথ্য অত্যাচার

জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট অভিযোগ

২০. ৩. ১৯৩৯

□

'বর্দ্ধমান বার্ত্তা' পত্রিকার ১৩. ৩ ১৯৩৯ সংখ্যায় প্রকাশিত বিজয়কুমার ভট্টাচার্যের একটি নিবন্ধ

বর্ধমানে বর্গীরাজত্ব

জলকর আদায় উপলক্ষ করিয়া বর্ধমানের ক্যানাল অঞ্চলে যে বিভীষিকার সৃষ্টি করা হইয়াছে তাহা চোখে না দেখিলে আজিকার দিনে বিশ্বাস করা কঠিন। গোরা সৈন্য আসিয়া ক্যানাল অঞ্চলে টহল দিয়া গেল। গ্রামের লোক সৈন্য দেখে নাই, গোরা সৈন্য দেখিয়া ভয় পাইল। দলে দলে গুর্খা-পুলিশ আসিয়া ক্যানাল অঞ্চলের গ্রামে গ্রামে তাঁবু পাতিল। গুর্খা-পুলিশও পল্লী অঞ্চলে লোকে নূতন দেখিতেছে। গ্রামের পাশে একদল গুর্খা-পুলিশ আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করিল দেখিয়া লোকে বিপদের আশঙ্কায় আতঙ্কিত হইয়া উঠিল। এইভাবে একটি ভয়ের পটভূমি সৃষ্টি করিয়া আরম্ভ হইল আদায়ের অভিযান।

ক্যানাল কর্ম্মচারীগণ দারোগা-পুলিশ সঙ্গে লইয়া আদায়ে বাহির হইলেন। ৫০/১০০ লোক মার্চ করিয়া গ্রামে উপস্থিত। গ্রামের পুরুষেরা ভয়ে গ্রাম ছাড়িয়া পলাইয়া গেল। মেয়েরা দুয়ারে খিল লাগাইয়া রুদ্ধ নিশ্বাসে দুর্গানাম জপ করিতে লাগিল। আদায়কারীগণ একটি প্রকাশ্য

স্থানে গিয়া বসিলেন। গ্রামের লোককে তলব করা হইল। যাহারা গ্রাম ছাড়িয়া পলায় নাই পুলিশ গিয়া তাহাদিগকে ধরিয়া আনিল। যাহারা পলাইয়া গিয়াছে, তাহাদের দুয়ারে ধাক্কা দিয়া লাথি মারিয়া খিল ভাঙ্গিয়া দিল, অকথ্য অশ্লিল ভাষায় মেয়েদের গালাগালি করিতে লাগিল। যাহারা হাজির হইয়াছিল তাহাদের যাহার যা সাধ্য দিতে গেল। যাহাদের কোন সংস্থান নাই তাহারা ধান-খড় বেচিয়া দিবার জন্য সময় চাহিল। আংশিক কর লওয়া হইবে না। দারোগাবাবুরা গালমন্দ করিলেন। কাহারও কাহারও পিঠে দু-চার ঘা পড়িল। যাহারা দিয়াছিল তাহাদিগকে রসিদ দেওয়া হইল না। বলা হইল--পুরা দাও, তবে রসিদ পাইবে। যাহারা সময় চাহিয়াছিল, চড়টা চাপড়টা খাইয়া কেহ দু-দিন কেহ চারদিন সময় পাইল। যাইবার সময় দারোগাবাবুরা শাসাইয়া গেলেন, নির্দ্দিষ্ট দিনে কর না দিলে গ্রাম জ্বালাইয়া দেওয়া হইবে। যে যেখানে ছিল টাকার চেষ্টায় ছুটিল। কেহ বা গহনাপত্র ঘড়া-ঘটি বাঁধা দিয়া যৎকিঞ্চিৎ সংগ্রহ করিল। কেহ বা ধান বিক্রয় করিবার জন্য বাজারে ছুটিল। এ বছর অল্প বৃষ্টির জন্য ধান হয় নাই। কাহারও বছরের খোরাকটা কোন রকমে হইয়াছে, কাহারও না। ধান বেচিয়াই সংসার চালাইতে হয়, রাজা মহাজনের দেনা মিটাইতে হয়। কিছু ধান ইহারই মধ্যে বেচা হইয়া গিয়াছে। বাকীটুকু লইয়া চাষী বেচিতে বাহির হইল। ব্যবসাদারেরা সময় পাইয়াছে। ধানের দর ১ টাকা ১৪ আনা ২ পয়সা হইতে একদিনে ১ টাকা ১০ আনা ২ পয়সা নামিয়া গেল। মণ করা চার আনা লোকসান দিয়াও চাষী যাহা পাইল তাহাতে তার পুরা কর মেটে না। নির্দ্দিষ্ট দিনের পূর্ব্বেই হয়তো আদায়কারীরা উপস্থিত হইলেন। যে যাহা সংগ্রহ করিয়াছিল সব আনিয়া ধরিয়া দিল। আর একবার গালাগালি এবং মার-পিট চলিল। যাহাদের নামে সার্টিফিকেট ছিল ৫০ বা ৬০ টাকার জন্য তাহাদের যথাসর্ব্বস্ব ক্রোক করা হইল। থালা, বাটি, হাঁড়িকুঁড়ি মায় কেরোসীন তেলের টিনটাও পর্যন্ত বাদ গেল না। অবশেষে কর্ম্মচারীরা বিদায় লইলেন। এই দৃশ্য আজ বর্ধমানের ক্যানাল অঞ্চলের গ্রামে গ্রামে অভিনীত হইতেছে। ক্যানাল কর্ম্মচারীর জুলুম আজ কাবুলীওয়ালার জুলুমকে ছাড়াইয়া গিয়াছে। ক্যানাল অঞ্চলের গ্রামের দিকে চাহিয়া, বিংশ শতাব্দীর সুসভ্য ইংরেজ রাজত্বে বাস করিতেছি, না দুইশত বৎসর পূর্ব্বে বর্গীর আমলে ফিরিয়া গিয়াছি, তাহা বোঝা শক্ত হইয়া উঠিয়াছে।

□

২ টাকা ৯ আনা করের সমর্থনে 'বৰ্দ্ধমান বাৰ্ত্তা'র সম্পদকীয়, ২০. ৩. ১৯৩৯।

ক্যানেল ও কংগ্রেস

দামোদর ক্যানেল অঞ্চলের সিংহপাড়া ও করোরী প্রাথমিক কংগ্রেস কমিটির নাম দিয়া জেলা কংগ্রেস কমিটির প্রতি অনাস্থা প্রস্তাব আসিয়াছে। প্রস্তাবের মৰ্ম্ম জেলা কংগ্রেস কমিটি বর্তমানে একর প্রতি ২ টাকা ৯ আনা হারে সাধ্যমত ক্যানেল কর আদায় দিতে নির্দ্দেশ দিয়া অন্যায় করিয়াছেন. সেই হেতু এই অনাস্থা। ......বর্ধমান মহকুমা কংগ্রেস কমিটির রামপুর অধিবেশনের প্রস্তাবে ক্যানেল অঞ্চলের প্রজাগণকে ২ টাকা ৯ আনা হারে সাধ্যমত কতক পরিমাণে আদায় দিবার নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছিল। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে প্রচারকারীদের কথায় না ভুলিয়া সেই নির্দ্দেশ অনুযায়ী চলিলে বর্ত্তমান মন্ত্রীশাসিত গবর্ণমেণ্ট কোন অজুহাতই খুঁজিয়া পাইতেন না। রামপুর অধিবেশনের প্রস্তাব যে কিরূপ যুক্তিযুক্ত হইয়াছিল দেশবাসী. বিশেষ করিয়া ক্যানেল পীড়িত প্রজাগণ মৰ্ম্মে মৰ্ম্মে অনুভব করিতেছেন। আমাদের বিশ্বাস কংগ্রেসের এই নির্দ্দেশ মানিয়া চলিলে হঠাৎ এত নিগ্রহ সহ্য করিতে হইত না। কংগ্রেসের হস্তক্ষেপের, বিশেষ করিয়া নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির কলিকাতা অধিবেশনে ক্যানেল সম্বন্ধীয় প্রস্তাব গৃহীত হইবার ফলেই আজ একর প্রতি ৫ টাকা ৮ আনা হইতে এতদূর নামিয়া আসিয়াছে। ......ভবিষ্যতে যাহাতে প্রতিপক্ষ দল এইরূপ অত্যাচার করিবার সুযোগ না পায়. তাহার জন্য জেলা কংগ্রেস কমিটি দীর্ঘ মেয়াদী কবুলতিতে সহি করিতে নিষেধ করিয়াছেন। আমরা প্রজাদিগকে কংগ্রেসের এই নির্দ্দেশ মানিয়া লইতে অনুরোধ করি।

□

দেড় টাকা করের সমর্থনে সুভাষচন্দ্র বসু

রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্রের বাণী

বৰ্দ্ধমান জেলার দামোদর ক্যানেল অঞ্চলের কৃষকগণ অতিরিক্ত ক্যানেল করের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিয়া আসিতেছেন। এই আন্দোলনের সহিত আমার আন্তরিক সহানুভূতি আছে। গত বৎসর আমি এই ক্যানেল কর একর প্রতি দেড় টাকা ধার্য্য হওয়ার পক্ষে মত প্রকাশ করিয়াছিলাম।

আমি জানিয়া সুখী হইলাম যে সম্প্রতি বর্দ্ধমানে এক ক্যানেল কনফারেন্সেও সর্ত্তমূলকভাবে ক্যানেল কর একর প্রতি দেড় টাকা স্বীকার করিয়া লওয়ার সিদ্ধান্ত হইয়াছে এবং আরো স্থির হইয়াছে যে গভর্ণমেণ্ট দেড় টাকার অধিক ধার্য্য রাখিলে তাহার বিরুদ্ধে আবার সংগ্রাম চালান হইবে।* আমি আশা করি গভর্ণমেণ্ট কৃষকদের দেড় টাকার দাবী মানিয়া লইতে বিলম্ব করিবেন না। আরো আশা করি গভর্ণমেণ্ট উহা মানিয়া না লইলে এবং আন্দোলনের প্রয়োজন হইলে সকলে উহাতে যোগদান করিবে।

আনন্দ প্রেস, বর্ধমান (স্বাঃ) শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু

৫. ২. ৩৯

---

* কংগ্রেসের ক্যানেল কর এনকোয়ারী কমিটি একর প্রতি এক পণ খড় ও ১ মণ ধানের দাম কর হিসেবে অনুমোদন করে। কৃষকসভা এক টাকা আট আনার দাবিতে অনড় থাকে। ২৮. ৫. ১৯৩৮ তারিখে সুভাষ-চন্দ্র বসু বর্ধমানে আসেন এ বিষয়ে আলোচনার জন্য। তিনি উভয় পক্ষকে সমঝোতায় আনার চেষ্টা করছিলেন। ১৯৩৮-এর নভেম্বর মাসের শেষের দিকে তৎকালীন কংগ্রেস সম্পাদক আসরাফউদ্দিন চৌধুরী বর্ধমানে আসেন এবং উভয় পক্ষকে নিয়ে টাউন হলে সভা করেন। উক্ত সভায় কংগ্রেসের বামপন্থী সংগঠনের মতামত প্রতিষ্ঠিত হয়। সভাপতি মহাশয়ও উক্ত বিষয়ে একমত হন এবং কৃষকসভার একর প্রতি এক টাকা আট আনা করের প্রস্তাব মেনে নেন। —সৈয়দ শাহেদুল্লাহ্-র ব্যক্তিগত নোট থেকে।

এই পরিশিষ্টে বর্ধমান রাজ কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক ভাস্কর দাশগুপ্তের সংগৃহীত অপ্রকাশিত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে। —সম্পাদক

পরিশিষ্ট ৩ □ 'সাপ্তাহিক জনযুদ্ধ'-এর ফাইল থেকে

৪২ সালে পার্টি আইনসঙ্গত হওয়ার পর

জামালপুর থানার পর্বতপুরগ্রামে ফ্যাসিস্ট-বিরোধী সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। কৃষক নেতা কম্. জাহেদ আলি সভাপতি হইয়াছিলেন এবং পার্শ্ববর্ত্তী ১০/১৫ খানা গ্রামের লোক উহাতে যোগদান করিয়াছিল। কম্. রাধাশ্যাম মুখার্জী, ফকীর রায়, ভুজঙ্গ সেন ও অশ্বিনী মণ্ডল ফ্যাসিস্ট নীতির জঘন্যতা, জনযুদ্ধের প্রয়োজনীয়তা, বন্দী-মুক্তি, পণ্যদ্রব্যের মূল্য নির্দ্ধারণ প্রভৃতি বিষয়ে বক্তৃতা করেন এবং এই সকল বিষয়ে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ৯ই মে ১৯৪২

□

মে দিবস

বর্দ্ধমান জেলার বনপাশ গ্রামে 'মে দিবস' এক বৃহৎ সভা হয়। জেলা সোভিয়েট সুহৃদ সঙ্ঘের সম্পাদক, জেলা কৃষক সমিতির সম্পাদক ও অনেক কৃষক ও কংগ্রেস কর্ম্মী সভায় বক্তৃতা করেন। ফ্যাসিস্টবাদের বিরুদ্ধে বিশ্ব-জনযুদ্ধে সোভিয়েট ও চীনের ভূমিকা, আমাদেরই মুক্তিযুদ্ধ হিসাবে আমাদের এই যুদ্ধে যোগ দিয়া বর্ব্বর ফ্যাসিস্টবাদকে দৃঢ়ভাবে বাধা দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতি বিষয়ে বক্তাগণ বলেন। জনসাধারণের মধ্যে বিশেষ দৃঢ়তা দেখা যায়।

১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ৯ মে ১৯৪২

□

বর্দ্ধমানের রায়না থানার পাষণ্ডা, কামারগড়, বড়বৈনান ও রামবাটী গ্রামে ফ্যাসিস্ট-বিরোধী জনসভা যথাক্রমে ৭, ৮, ৯, ১১ মে তারিখে হইয়া গিয়াছে। কমরেড অশ্বিনীকুমার মণ্ডল, ভুজঙ্গভূষণ সেন প্রভৃতি জাপানী

আক্রমণের স্বরূপ, জাতীয় গভর্ণমেণ্টের প্রয়োজনীয়তা ও ফ্যাসিস্ট-বিরোধী বন্দীদের মুক্তির দাবী জনগণকে বুঝাইয়া দেন। এই সভাগুলির ফলে জনগণের নিষ্ক্রিয়তা দূর হইতেছে—জনযুদ্ধ জনগণের প্রিয় হইতেছে।

১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ২৩শে মে ১৯৪২

□

নিখিল ভারত রাজনৈতিক বন্দী মুক্তি দিবস বর্দ্ধমানে রাজ পাবলিক লাইব্রেরী ময়দানে রাজবন্দী মুক্তি-দিবস পালিত হইয়াছে। কমরেড শচিনন্দন অধিকারী সভাপতিত্ব করেন এবং নিখিল ভারত কৃষাণ সভার যুগ্ম-সম্পাদক মনসুর হাবিব বক্তৃতা করেন। সভা শেষে একটি শোভাযাত্রা বাহির হইয়া বিভিন্ন ধ্বনি ও জাপ-বিরোধী গান গাহিতে গাহিতে প্রধান ঝাণ্ডা প্রদক্ষিণ করিয়া কংগ্রেস অফিসের সামনে আসিয়া শেষ হয়।

১ম বর্ষ, ১২ সংখ্যা, ২২শে জুলাই ১৯৪২

□

৫ই আগষ্ট বর্দ্ধমানে স্থানীয় বংশগোপাল টাউন হলে এক বিরাট ফ্যাসি-বিরোধী সভা হয়। প্রায় ৫ হাজার মজুর, কৃষক, ছাত্র-যুবক উপস্থিত ছিল। কম্‌ বঙ্কিম মুখার্জী বক্তৃতা করেন।

১ম বর্ষ, ১৪ সংখ্যা, ৫ই আগষ্ট ১৯৪২

□

রায়না (বর্দ্ধমান) কম্‌ কালিপদ মণ্ডলের নেতৃত্বে রায়না জনরক্ষা কমিটি ও বাহিনী গঠিত হইয়াছে।

১ম বর্ষ, ১৬ সংখ্যা, ১৯শে আগষ্ট ১৯৪২

□

কমিউনিষ্ট পার্টি দিবস

রায়না (বর্দ্ধমান) গত ১লা আগষ্ট কমিউনিষ্ট পার্টি দিবস পালিত হয়। বিকাল ৫টায় কর্তৃপক্ষের অনুমতি পাওয়া যায়। তৎক্ষণাৎ কর্মীদের অক্লান্ত চেষ্টায় স্থানীয় হাটতলায় শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র কোঙার মহাশয়ের

সভাপতিত্বে এক জনসভা হয়। বাংলা তথা ভারতের সমস্ত কমিউনিষ্ট ও ফ্যাসিস্ট-বিরোধী কর্মীদের উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের দাবী করিয়া, সস্তর গণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ দাবী করিয়া ও কমিউনিষ্ট পার্টি বৈধ হওয়ায় আনন্দ প্রকাশ করিয়া কম্‌ কালিপদ মণ্ডল কয়েকটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন।

১ম বর্ষ, ১৬ সংখ্যা, ১৯শে আগষ্ট ১৯৪২

□

কৃষক দিবস

বর্দ্ধমান গোবিন্দপুর হাটতলায় কৃষক দিবস পালিত হয়। কম্‌ অজিত সেন সভাপতিত্ব করেন।

১ম বর্ষ, ২০ সংখ্যা, ১৬ই সেপ্টেম্বর ১৯৪২

□

কেরোসিন, চিনি, চাল প্রভৃতি দুষ্প্রাপ্য ও দুর্ম্মূল্য জিনিষের জন্য সহরের সরকারী দোকান খুলিবার দাবী করিয়া প্রতি মহল্লায় সভা করা হইতেছে ও ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট গণ-দরখাস্ত পেশ করা হইতেছে।

রায়নার কমরেড বিপদবরণ রায়, পাঁচু গুহ, কালিপদ মণ্ডল বন্দী কমরেডদের মুক্তি দাবী করা হইয়াছে।

১ম বর্ষ, ২২ সংখ্যা, ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৪২

□

একতায় আন্দোলন

জনসাধারণ ক্রমশঃই তাহাদের নিজস্ব দাবী-দাওয়া আদায় ও সাধারণ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সক্রিয় অংশগ্রহণ করিতেছে জিলায় জিলায় গণ-দরখাস্ত আন্দোলন গড়িয়া তুলিতেছে।

দামোদর ক্যানেল অঞ্চলের কৃষকেরাও কৃষক সমিতির নেতৃত্বে চারিশত স্বাক্ষরযুক্ত এক দরখাস্ত প্রাদেশিক সরকারের কাছে প্রেরণ করিয়াছেন। এই দরখাস্তে সরকারকে যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত বকেয়া করের জন্য সার্টিফিকেট ও নিলামজারীর ব্যবস্থা স্থগিত রাখিতে অনুরোধ করা হইয়াছে।

১ম বর্ষ, ২৫ সংখ্যা, ২৮ অক্টোবর ১৯৪২

□

কাটোয়া মহকুমায় ১লা নভেম্বর বামুনগ্রাম, যবগ্রাম, ধারসোনা প্রভৃতি গ্রামে স্কোয়াড বাহির হয় ও বৈঠকী মিটিং করে। ২রা ও ৩রা তারিখে স্কোয়াড ক্ষিরগ্রাম, কারুলিয়া, করুই, পাঁজেয়া, মেজিয়ারী প্রভৃতি গ্রামে প্রচার করে। জনসাধারণের মাঝে ভীতি ও হতাশার ভাব ছাইয়া গিয়াছে কিন্তু স্কোয়াডের প্রচারের ফলে ধীরে ধীরে জনসাধারণ একতার ডাকে সাড়া দিতেছে।

১ম বর্ষ, ২৭ সংখ্যা, ১১ নভেম্বর ১৯৪২

☐

বর্দ্ধমান সহরে চারিশতের উপর বিড়ী কারিগর কাজ করে। যুদ্ধের জন্য জিনিষপত্রের দাম বাড়িয়া যাওয়াতে কিছুদিন হইতে মজুরীর হার বাড়াইবার জন্য তাহারা আন্দোলন সুরু করে এবং মালিকদের নিকট দাবী পেশ করে। কিন্তু মালিকরা তাহা অগ্রাহ্য করায় গত ২৮শে সেপ্টেম্বর সকালবেলা হইতে সমস্ত বিড়ী শ্রমিকেরা প্রতি হাজার বিড়ীর জন্য ১ টাকা ১ আনা ২ পয়সা মজুরী দাবী করিয়া ধর্মঘট করে। মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস চেয়ারম্যান মহঃ আজেম, ডাঃ নাজেম এবং কমরেড হরেকৃষ্ণ কোঙার, অজিত সেন, শশধর পাল প্রভৃতি স্থানীয় কমিউনিষ্ট নেতা ও কর্ম্মীরা কারিগরদের পরিচালিত করেন। ২৯শে সেপ্টেম্বর মালিকদের সাথে আলাপ-আলোচনার পর মালিকরা সমস্ত কারিগরদের ২ আনা ২ পয়সা হিসাবে বাড়াইতে রাজি হয়, পরের দিন সকালে মজুররা কাজে যোগ দেয়।

২৯শে রাত্রে সমস্ত কারিগরদের এক সাধারণ সভা হয়। 'বর্দ্ধমান বিড়ি কারিগর সমিতি' নাম দিয়া শ্রমিকদের একটি ইউনিয়ন গঠিত হইয়াছে। ইউনিয়নের সভাপতি হইয়াছেন ডাঃ নাজেম ও সম্পাদক হইয়াছেন কমরেড শশধর পাল।

বর্দ্ধমান জেলার রায়নায় কমিউনিষ্ট কর্ম্মী কমরেড অজিত দাসকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

১ম বর্ষ, ২৪শ সংখ্যা, ১৪ই অক্টোবর ১৯৪২

☐

যুদ্ধের জন্য অভাব অনটন চারিদিকে বাড়িয়াই চলিয়াছে। বর্দ্ধমানের ধাঙ্গড়দের ভিতর এই সমস্যা লইয়া আন্দোলন চলিতে থাকে। স্থানীয় কমিউনিষ্ট কর্ম্মীরা ধাঙ্গড়দের সংগঠন গড়িয়া তোলে। কিছুদিনের ভিতরই সমবেতভাবে ধাঙ্গড় শ্রমিকেরা মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যানের নিকট মাগ্গী ভাতা কর্ম্মচ্যুত শ্রমিকদের পুনর্নিয়োগ ও মিউনিসিপ্যালিটি কর্ত্তৃক শ্রমিকদের জন্য দোকান খোলা—প্রধানতঃ এই তিনটি দাবী নিয়া একটি দরখাস্ত করে। ইহাতে কোন ফল না হওয়াতে তাহারা ১২ই সেপ্টেম্বর হইতে ধর্ম্মঘট শুরু করিয়া দেয়। কমিউনিষ্টকর্ম্মীরা ধাঙ্গড়দের দাবী লইয়া চেয়ারম্যানের সাথে আলাপ-আলোচনা চালান। তিনি যথাসম্ভব ধাঙ্গড়দের দাবী পূরণ করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দেন। চেয়ারম্যানের প্রতিশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া ধর্ম্মঘট তুলিয়া লওয়া হয়। ৩০ টাকা বা তাহার কম বেতনের শ্রমিকেরা বর্ত্তমানে মাসিক ১ টাকা করিয়া মাগ্গী ভাতা পাইবে।

১ম বর্ষ, ২৩শ সংখ্যা, ৭ অক্টোবর ১৯৪২

□

বর্ধমান জেলার কর্ম্মী গণদরখাস্তে সহি সংগ্রহ করিতেছেন। কংগ্রেস-লীগ আপোষের পথে সমস্ত আমলাতান্ত্রিক বাধা দূর করার দাবী ইহাতে আছে। ইতিমধ্যেই বহুশ্রেণীর লোক ইহাতে সহি করিয়াছেন। বহু সহিযুক্ত একখানি স্মারকপত্র বড়লাটের কাছে পাঠানো হইয়াছে।

১ম বর্ষ, ২৫ সংখ্যা, ২৮ অক্টোবর ১৯৪২

□

একতার পথই একমাত্র পথ
জনসাধারণ এই পথেই আগাইয়া আসিতেছে।

বর্দ্ধমান লীগের সভাপতি একতা আন্দোলনের কথা সহানুভূতির সহিত শোনেন ও জাতীয় দাবী সম্বলিত প্রচারপত্র চাহিয়া নেন। বর্ত্তমানে সুস্পষ্ট মত না দিলেও দিল্লী লীগ কাউন্সিলের অধিবেশনে একতার জন্য চেষ্টা করিবেন বলেন।

১ম বর্ষ, ২৯ সংখ্যা, ২৫ নভেম্বর ১৯৪২

□

বন্যাত্রাণে

ঐক্যসভা

বর্দ্ধমানে কমিউনিষ্ট পার্টির জেলা কমিটি, কৃষক সমিতি, ছাত্র ফেডারেশন ও ধাঙ্গড় ইউনিয়নের উদ্যোগে ও জেলা মুস্লিম লীগ, হিন্দু মহাসভা, রামকৃষ্ণ আশ্রম, উকীল ও মোক্তার বারের সহযোগে বন্যায় সাহায্য দানের ব্যবস্থা করার জন্য এক জনসভা হয়। সেবা কার্য্যে সরকারী বিধি-নিষেধ তুলিয়া নিবার দাবী করিয়া ও বর্দ্ধমান কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক আদায়ী ফাণ্ড বে-সরকারী সেবা প্রতিষ্ঠানকে দিবার অনুরোধ করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়।

১ম বর্ষ, ৩০ সংখ্যা, ২রা ডিসেম্বর ১৯৪২

☐

কমিউনিষ্টদের উপরই প্রধান আঘাত বর্দ্ধমানে—পার্টির হ্যাণ্ডবিল বিলি করিবার অপরাধে কমরেড কালিপদ মণ্ডলকে গ্রেফতার করিয়া পরে ছাড়িয়া দেয়।

১ম বর্ষ, ৩১ সংখ্যা, ৯ ডিসেম্বর ১৯৪২

☐

কমিউনিষ্টদের উপর আঘাত

বর্দ্ধমানের রায়না কৃষক সমিতি ও পার্টির শাখা অফিস খানাতল্লাশী করিয়া কমরেড শিবপ্রসাদ দত্ত, পাঁচু গুহ ও কালিপদ মণ্ডলকে পোষ্ট অফিস পোড়াইবার চার্জে গ্রেফতার করিয়াছে। পরে পার্টির জেলা কমিটির সভ্য কম্ বিপদবারণ রায় ও স্থানীয় কম্ নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্যকে থানায় ডাকাইয়া লইয়া তাহাদিগকে ঐ স্থান ত্যাগ করিতে বলা হয়। এবং জানানো হয় এ অঞ্চলে কমিউনিষ্টদের কাজ করিতে দেওয়া হইবে না—চেষ্টা করিলে গ্রেফতার করা হইবে। ধ্বংসমূলক আন্দোলনে কমিউনিষ্টদের বিরোধিতার কথা জানিয়াও আমলাতন্ত্র এই ধরণের কাজ সর্বত্র করিতেছে।

১ম বর্ষ, ৩২ সংখ্যা, ১৬ ডিসেম্বর ১৯৪২

☐

মজুর আন্দোলন

ধাঙ্গড়, মেথরের জয়

বর্দ্ধমান মিউনিসিপ্যাল মজুররা একজোট হইয়া তাহাদের দাবী আদায় করিয়াছে। বহুদিন হইতে তাহারা কর্ত্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানাইতেছিল। কিন্তু শুধু আবেদনে কোন ফলই হয় নাই। তাই তাহারা ১৫ ডিসেম্বর সমস্ত মজুরের এক মিলিত সভা ডাকিয়া স্থানীয় কমিউনিষ্টদের নেতৃত্বে চেয়ারম্যানের কাছে মাহিনা বৃদ্ধি ও বাঁধা দরে খাদ্যদ্রব্যাদি সরবরাহের দাবী জানাইয়া ২ শত প্রতিনিধির এক ডেপুটেশন পাঠাইল। কিন্তু ইহাতেও কর্ত্তৃপক্ষ কান দিল না। তখন সমস্ত মজুর মিলিয়া ১ দিনের ধর্ম্মঘটেই তাহাদের দাবী মানিতে চেয়ারম্যানকে বাধ্য করে। কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে মিউনিসিপ্যাল মজুররা শুধু নিজেদের মাহিনাই বৃদ্ধি করে নাই, সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য কর্ম্মচারীদের মাহিনাও বাড়াইয়াছে। বর্দ্ধমানের মেথর, ধাঙ্গড়রা তাহাদের দাবী আদায়ের মধ্য দিয়া বুঝিয়াছে, একতাই মজুরদের এক হাতিয়ার।

১ম বর্ষ, ৩৪ সংখ্যা, ৩০ ডিসেম্বর ১৯৪২

জেলায় জেলায় খাদ্য আন্দোলন

ঐক্যবদ্ধ সম্মেলন

গত ২১শে ডিসেম্বর বিকালে বর্দ্ধমান টাউন হলে এক বিরাট খাদ্য সম্মেলন হয়। কমিউনিষ্ট পার্টি, কৃষক সমিতি ও ছাত্র ফেডারেশনের উদ্যোগে ও জিলা মুস্লিম লীগ, হিন্দু মহাসভা এবং বিশিষ্ট নাগরিকগণের সহযোগিতায় এই সম্মেলন হয়। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে প্রায় ছয় শতাধিক লোক সম্মেলনে যোগ দেয়। সভাপতি ছিলেন স্থানীয় প্রবীণ নেতা শ্রীযুক্ত ভবানী দাস মজুমদার। জেলা জনরক্ষা সমিতির সম্পাদক কমরেড সাহেদুল্লা সভার উদ্দেশ্য বর্ণনা করেন এবং খাদ্য সংকট সমাধানে জনরক্ষা সমিতি এতদিন যাহা করিয়াছে তাহার বিবৃতি দেন। জেলা মুস্লিম লীগের সভাপতি মোঃ আবুল হাসেম বর্ত্তমান সংকটে জনগণের কর্ত্তব্য বুঝাইয়া দেন। তিনি সরকারী ঔদাসিন্য ও অব্যবস্থা এবং মোটা

ব্যবসায়ীদের অতি লোভ ও অসাধুতার তীব্র নিন্দা করেন এবং খাদ্য সংকট সমাধারণের জন্য তিনি জনসাধারণকে সংঘবদ্ধ হইয়া অগ্রসর হইতে বলেন। মোঃ আবুল হায়াৎ প্রভৃতি বক্তৃতা দিবার পর সম্মেলনে ১১টি প্রস্তাব গৃহিত হয়। জেলা হইতে ধান চাল রপ্তানী বন্ধ, ধান-চালের সাথে অন্যান্য জিনিষের সামঞ্জস্যমূলক দাম বাঁধা, বর্ত্তমান মূল্য নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের বদলে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিমূলক বোর্ড গঠন প্রভৃতির দাবী করা হয়। কংগ্রেস, লীগ, মহাসভা, কমিউনিষ্ট পার্টি প্রভৃতি প্রতিনিধি লইয়া একটি সংগঠন কমিটি গঠিত হয়।

১ম বর্ষ, ৩৪ সংখ্যা, ৩০ ডিসেম্বর ১৯৪২

□

বর্দ্ধমান জেলায় কমিউনিষ্ট পার্টি সম্মেলন উপলক্ষ্যে ২৩শে ডিসেম্বর হাটগোবিন্দপুরে এক জনসভা হয়। নিষেধাজ্ঞা উঠিয়া যাইবার পর ইহাই প্রথম প্রকাশ্য সম্মেলন ও সমাবেশ। বীর শহীদ সুকুমার ব্যানার্জীর নামানুসারে সম্মেলনস্থলের নাম হয় 'সুকুমার ময়দান'। কম্‌ হারীস ও নিরোদ দাসের নামে তোরণ হয়। বাঁকুড়ার প্রমথ ঘোষ রক্তপতাকা উত্তোলন করেন। আবুল হায়াত সাহেব সভা উদ্বোধন করেন। ৩৪ জন পার্টি সভ্য, ২৮ জন একটিভিষ্ট ও পার্টি সমর্থক ২ জন মহিলা কমরেড সম্মেলনে যোগ দেন। জেলা সম্পাদক বিনয় চৌধুরী রিপোর্ট পেশ করেন।

১ম বর্ষ, ৩৬শ সংখ্যা, ১৩ জানুয়ারী ১৯৪৩

□

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভা

মোট ৮৩ হাজার সভ্য সংগ্রহ

বর্দ্ধমান—২,২৫১

স্থান—দ্বাদশ

প্রথম রংপুর—২১,১১৯

সর্ব্বনিম্ন—বাঁকুড়া ৫১২

মোট জেলা—২৫টি

১ বর্ষ, ৩৮শ সংখ্যা, ২৭ জানুয়ারী ১৯৪৩

□

লেনিন দিবসের শপথ
বর্দ্ধমানে মজুর, নাগরিকের সভা

বর্দ্ধমানে কৃষক সমিতি ও কমিউনিষ্ট পার্টির উদ্যোগে লেনিন দিবসে সন্ধ্যায় ধাঙ্গড়, মজুর ও নাগরিকদের একটি বৈঠক হয়। সভায় কম্‌ বলাই মল্লিক, কম্‌ শান্তব্রত চ্যাটার্জী প্রভৃতি বক্তৃতা করেন। কম্‌ শাহেদুল্লা ও কম্‌ মহেন্দ্র উর্দ্দু ভাষায় ধাঙ্গড়দের কাছে লেনিন দিবসের তাৎপর্য্য বুঝাইয়া দেন। লেনিন দিবস যে বীরপূজা নয়, বিপ্লবী শপথ গ্রহণের দিন প্রত্যেকের বক্তৃতায় এই কথাটি স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠে।

কৃষক আন্দোলনে বাধা

বর্দ্ধমান জেলায় রায়নায় কৃষক সমিতির কর্ম্মী রামসহায় ভট্টাচার্য্যকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

১ম বর্ষ, ৩৯ সংখ্যা, ৩ ফেব্রুয়ারী ১৯৪৩

□

কৃষক সম্মেলন

৭ই ও ৮ই ফেব্রুয়ারী ঃ রায়না থানার অন্তর্গত আলামপুর গ্রামে অমলেন্দু মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে বর্ধমান জেলা কৃষক সম্মেলন হয়। ছয় হাজারেরও বেশী জনসমাগম হয়। ৫০০ কৃষক মহিলা উপস্থিত ছিল।

১ম বর্ষ, ৪৩ সংখ্যা, ৩রা মার্চ ১৯৪৩

□

ভুখ-মিছিল

বর্দ্ধমান জিলার রায়না অঞ্চলে ব্যাপক খাদ্যাভাব দেখা দিয়েছে। ৬ই মার্চ রায়না থানা হইতে প্রায় ৭৫০ জন কৃষক (তন্মধ্যে ২১ স্ত্রীলোক) সদর ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট দাবী জানাইতে আসে।

২১শে মার্চ কাটোয়া মহকুমার গতিষ্ঠা ইউনিয়নে ৩৫০ জন ক্ষুধিত কৃষক জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট যায়।

১ম বর্ষ, ৪৭ সংখ্যা, ৩১শে মার্চ ১৯৪৩

□

পরিশিষ্ট ৪ □ ১৯৪২-এর দুটি সাম্প্রদায়িক ঘটনা : সৈয়দ শাহেদুল্লাহ্

। নতুন চিঠি'র ১৯৮৬ ও ১৯৮৭ শারদ সংখ্যা থেকে ।

সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে বর্ধমানের মানুষ

সময়টা ১৯৪২ সালের মে মাস।

কংগ্রেসের যে আন্দোলন '৪২-এর আন্দোলন বলে পরিচিত তা তখনও ঘোষিত হয়নি। তখন পর্যন্ত কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত ছিল জাপান কর্তৃক আক্রান্ত হলে দেশবাসীদের নিজেদের চেষ্টায় আত্মরক্ষা করতে হবে। কমিউনিস্ট পার্টির ইতিপূর্বে সিদ্ধান্ত ছিল : এ যুদ্ধ সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ, সুতরাং তার বিরোধিতা করতে হবে। কিন্তু হিটলার কর্তৃক রাশিয়া আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধের চরিত্র পরিবর্তন হয়ে গেল। সারা জগৎ জুড়ে শ্রমিক, কৃষক ও সমস্ত জনগণের দৃঢ় পণ হয়ে উঠল—ফ্যাসিজম্‌কে পরাজিত করতে হবে এবং তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও যুদ্ধজয়ের মধ্য দিয়েই সাম্রাজ্যবাদকে ক্ষুণ্ণ করে উৎপীড়িত জাতিসমূহকে স্বাধীন করা যাবে। যাঁরা পিছন দিকে তাকিয়ে অতীতের ইতিহাস একটু দেখবেন, তাঁরা বুঝবেন আমাদের ধারণাই সঠিক প্রমাণিত হয়েছে। আমরা তখন এই সিদ্ধান্তকে জনগণের মধ্যে প্রচার করছি; কংগ্রেসের আত্মরক্ষার প্রয়াসের প্রস্তাব যাতে প্রসারিত হয়ে ফ্যাসী-বিরোধী যুদ্ধের অনুকূলে নির্দেশিত হয় তার চেষ্টা করছি।

কংগ্রেসের প্রস্তাব অনুযায়ী আত্মরক্ষার জন্য গ্রামে ও শহরে পল্লীতে-পল্লীতে 'জনরক্ষা কমিটি' গঠন করার চেষ্টা করছি। এই উদ্দেশ্যে সভা, সমিতি, প্রচার ইত্যাদি করছি। জেলা কংগ্রেস কমিটি তখন অন্যান্য বামপন্থীসহ আমাদেরই নেতৃত্বে পরিচালিত।

আমরা পরিবর্তিত অবস্থায় আমাদের নীতি ব্যাখ্যা করে সভা ইত্যাদি করছিলাম। কংগ্রেসের জনরক্ষা কমিটির সভা হয়েছিল, কর্মসূচী গৃহীত হয়েছিল। আমি কমিটির আহ্বায়ক ছিলাম। এখানে একটা সভা করতে গিয়ে অপ্রত্যাশিতভাবে এক ঘটনার সম্মুখীন হতে হয়, আমাদের কর্মসূচীর সঙ্গে যার কোন প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই। মেমারী থানার উত্তরাংশে বড়-

পলাশন অঞ্চলে মণ্ডলগ্রাম একটি সুপরিচিত বড় গ্রাম। জেলার বিভিন্ন স্থানে সভা করার সিদ্ধান্ত হয়। কমরেড হেলারাম চট্টোপাধ্যায়ের প্রস্তাবে মণ্ডলগ্রামে একটি সভা করা স্থির হয়। শেষোক্ত সভা সম্বন্ধে একটু বিস্তৃত লিখতে হবে। কারণ আমরা উভয়ে একটা বৃহত্তর ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে পড়ি। কথা ঠিক হয় যে সভার আগের দিন কমরেড হেলারাম সভ্যা, ফরিদপুর, ন্যাড়াগোয়াল, নিতিনপুর হয়ে ভগবানপুর-মণ্ডলগ্রাম পৌঁছাবেন। আর আমিও ঐদিন মাঝের-গাঁ (বিনয় চৌধুরী-দের গ্রাম), সিহিগ্রাম, বড়-পলাশন হয়ে মণ্ডলগ্রাম-ভগবানপুর পৌঁছাব। ভগবানপুরেই আমাদের সাময়িক থাকতে হবে। ওখানে বিনয়দার পিসতুতো ভাই (এখন কলকাতায় সুপরিচিত ডাক্তার ও কমিউনিস্ট পার্টির পুরাতন সভ্য ছিলেন। পার্টি ভাগ হবার পর তিনি আমাদের সাথে সি. পি. আই. (এম)-এর সমর্থক হিসাবে আছেন।) সমর চৌধুরীর নেতৃত্বে ছাত্র-ফেডারেশন সংগঠিত হয়েছে। আমি সমরকে আগে জানিয়ে দিলাম যে রাত্রে আমি সিহিগ্রামে থাকবো। সমর যেন সন্ধ্যায় সিহিগ্রামে আসেন। সকালে উভয়ে একসঙ্গে মণ্ডলগ্রামে আসব। সন্ধ্যারাত্রে সমর এলেন না। চিন্তিত হলাম। কিন্তু পরদিন ভোরেই তিনি উপস্থিত। অত্যন্ত চিন্তাদায়ক সংবাদ নিয়ে উপস্থিত হলেন। বললেন, "মিটিং তো হবেই না, এখন কী করা যায় তাই ঠিক করুন।"

আগের দিনই হাটতলায় মেলার মাঝে কিছু স্থানীয় হিন্দু ও কিছু স্থানীয় মুসলমানের কথা কাটাকাটি শেষ পর্যন্ত মারামারিতে পর্যবসিত হয়। হাটতলায় মেলার বাজার। এখানে একজন মুসলমানের মিষ্টি ও খাবারের দোকান বসেছিল। মুসলমানের দোকান থেকে কিছু মিষ্টি বা খাবার বিক্রী করা নিয়ে ঝগড়া হয়। আবার কারও কারও মতে, বলির স্থানে একজন মুসলমানের গায়ে রক্ত লাগায় তা নিয়ে ঝগড়াঝাঁটি শেষ পর্যন্ত মারপিটে পর্যবসিত হয় এবং সাম্প্রদায়িক রূপ নেয়। অর্থাৎ হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গায় পর্যবসিত হয়। উত্তেজনা খুব বাড়তে থাকে। স্থানীয় গ্রাম্য রাজনীতির কিছু ধুরন্ধর জোটেন এবং দাঙ্গা আরও বিস্তৃত করার জন্য ঘোট পাকাতে থাকেন। কিন্তু সুস্থবুদ্ধির মানুষ হিন্দু-মুসলমান যথেষ্ট ছিলেন। তাঁদের প্রভাবে স্থির হয়, পরের দিন সকালে হাটতলার বিভিন্ন গ্রামের প্রতিনিধিরা মিলে একটা মিটমাট করা হবে। সেইরূপ উদ্দেশ্যে সকালে সমাবেশও হয়েছিল। ইতিমধ্যে আলোচনা চলছে এবং সব চুকে যাবে বলে ভরসাও এসেছে, এমন সময় হাটতলার মধ্যে একটা কিছু নতুন

উপলক্ষ ঘটে চীৎকার, গালাগালি, মারপিট শুরু হয়ে যায়। এবার কিন্তু শান্তির চেষ্টা সব ব্যর্থ হয়ে যায় এবং মেলাতলা ধরে মারপিট ছড়িয়ে যায়। জমায়েত মানুষ নিরাপত্তার জন্য নিজ নিজ গ্রামে চলে যান। যা মারপিট হয়েছে তার কথাবার্তা উত্তেজনার সঙ্গে আলোচনা হতে থাকে এবং সেইদিনই চতুর্দিক থেকে মানুষ জড়ো করে শক্তি সংগ্রহ করে শত্রুর অর্থাৎ হিন্দু মুসলমানের আর মুসলমান হিন্দুর মোকাবিলা করতে তৈরি হয়। উভয়েই আতঙ্কিত। অথচ উভয়েই এই আতঙ্কের প্রতিকারের উদ্দেশ্যে শক্তি সংগ্রহ করে পরস্পরকে আক্রমণ করতে উদ্যত। উত্তর-পূর্বে ও উত্তর-পশ্চিমে বিভিন্ন মুসলমান গ্রামের অনেকদূর পর্যন্ত চিঠি ও রোকা চলে গেছে। মুসলমান গ্রামকে বাঁচাতে হবে, সেজন্য মণ্ডলগ্রামের হিন্দুদের আক্রমণ করে প্রতিরোধ করতে হবে। হিন্দুরাও অনুরূপ পত্র দিয়েছেন বর্ধমান সদর, মন্তেশ্বর ও ভাতারের কোল পর্যন্ত। এইবার উভয়েই মণ্ডল-গ্রামের চারপাশে জড়ো হচ্ছেন। মুসলমানরা গয়েশপুর ও তার চারপাশে এবং হিন্দুরা মণ্ডলগ্রাম, ভগবানপুরের ভিতরে ও তার আশেপাশে জড়ো হতে থাকেন। সমরে আমাতে আলোচনা হল। ঠিক হল আমাদিগকে হস্তক্ষেপ করতে হবেই। এমন কি প্রাণের ভয় থাকলেও দাঙ্গা যে-কোন-ভাবে ঠেকাতে হবে এবং শান্তি ফিরিয়ে আনতে হবে। উভয় পক্ষে হাজার হাজার লোক সমবেত হচ্ছে বলে সংবাদ পাওয়া গিয়েছিল। (পরে নির্ভরযোগ্য তথ্যে জানা যায় বা বোঝা যায় যে প্রতি পক্ষে আড়াই হাজার থেকে তিন হাজারের মত লোক সমবেত হয়েছিল)। অথচ আমরা তো মাত্র দু'জন। একটি স্কুলের ছেলে, কিশোর মাত্র। আর আমি একজন বছর-তিরিশের যুবক। সমর নিজের গ্রাম-এলাকার লোক ছাড়া বাইরে কাউকে জানেন না। আমি তখন পর্যন্ত যা জানি, সম্পূর্ণ অপরিচিত একজন। কংগ্রেসের কর্মী ছাড়া আমরা তো কোন পরিচয় দিতে পারব পারব না (পার্টি তখনও বে-আইনী)।

অবস্থা বুঝতে হলে তখনকার আবহাওয়াটা বুঝতে হবে। সামান্য সামান্য ঘটনা উপলক্ষ করে এত উত্তেজনা কেন হচ্ছিল? আসলে হিন্দু-মুসলমান বুর্জোয়া-জমিদার শ্রেণী সাম্প্রদায়িক দ্বেষ-বিদ্বেষ গোটা দেশে ছড়িয়ে দিয়েছিল। ইন্ধন জুগিয়ে চলছিল হিন্দু-মুসলমান বুর্জোয়া পার্টিগুলো। সামগ্রিক দেশের এই পরিস্থিতি এখানে বিস্তৃতভাবে আলোচনা সম্ভব নয়, কিন্তু উল্লেখ করা প্রয়োজন। এত প্ররোচনা সত্ত্বেও সাময়িক

বিচলিত হলেও দেশের সাধারণ মেহনতি মানুষ আসলে শান্তিতেই থাকতে চায়। আমার জীবনে বারবার এই উপলব্ধি করেছি।

যাই হোক, আমাদের (আমি, সমর চৌধুরী ও অমল চৌধুরী বা ফড়িং) তখনই চারটি খেয়ে রওনা হতে হল। চললাম মণ্ডলগ্রামের পাশে, মাঝে মাইল তিনেক পর বড়পলাশন। ঠিক করলাম ওখানে আর একজনকে সঙ্গী করব—কংগ্রেসের কর্মী ভক্ত রক্ষিত। মাঝে মাঝে সমরের সঙ্গে কথা কইছিলাম, বেশির ভাগ সময়ই কী করে এই অবস্থাটাকে ট্যাকল্ করা যায়, আয়ত্তে আনা যায়, তাই নিয়ে নানান রকম চিন্তা করছিলাম। কিন্তু সমস্যা যেমন গভীর তাতে থইও পাচ্ছিলাম না এবং ব্যাপক অপরিচয়ের কারণে খেইও ধরতে পারছিলাম না।

এইরূপ অবস্থায় বন্ধুবর ভক্ত রক্ষিতের কাছে পৌঁছালাম। তিনি যা বললেন, ঘাবড়ে যাবার কথা। অবশ্য আমরা ঘাবড়াইনি। ঘটনাস্থলের এদিকটায় গয়েশপুর বা মুসলমান পাড়া। সুতরাং এদিক থেকে মুসলমানরাই জমা হয়েছে। রক্ষিত বললেন "ঘটনাস্থল গয়েশপুর বা মণ্ডলগ্রাম যাওয়া চলবেই না। শান্তির কথা তুলবেন কখন? তার আগেই তো আমাদের উপর লাঠি চলে যাবে। এখনও আমাদের গ্রামের মধ্যে কিছু হয়নি, আমাদের গ্রামের মুসলমানরা সব গিয়েছে। আমাকে একজন বড়পলাশনের হিন্দু দেখলে, ওখানকার দাঙ্গা এখানে ছড়িয়ে পড়বে।" আমি বললাম, "আমাকে তো যেতেই হবে। আমি কী করে এর মধ্যে প্রবেশ না করে শুধু হাতে ফিরে যাই? এদিকটা তো মুসলমান বলছেন, আমি তো মুসলমান, এদিক দিয়েই প্রবেশ করে দেখি।" ভক্ত বললেন, "আপনাকে মুসলমান বলে চিনছেই বা কে (কারণ আমার পরনে ছিল ধুতি পাঞ্জাবী) আর চিনলেই বা কংগ্রেসী মুসলমানকে পাওা দেবে কেন? তার আগেই লাঠি চলে যাবে।" আমি তখন সরলভাবেই বললাম, "আমাকে যেতেই হবে।" কিন্তু মনে মনে ভাবলাম, এরূপ অবস্থায় সমরকে ও ফড়িং-কে নিয়ে যাওয়া ঠিক হবে না। সমর অবশ্য আমার সঙ্গে যেতে প্রস্তুতই ছিলেন। অচেনা জায়গায় অচেনা লোকের মধ্যে আমাকে একা যেতে দিতে অস্বস্তিবোধ করছিলেন। আমি বললাম, "তোমাকে বরং আরও দায়িত্বপূর্ণ কাজ দিচ্ছি।" এই বলে ঠিক করলাম, সমর চিঠি নিয়ে বর্ধমান যাবে। কাজটা আলোচনার পর ভক্তবাবুও সমরের সঙ্গে যেতে রাজি হলেন। আমি বিজয়দা-কে (অর্থাৎ শ্রীবিজয়কুমার ভট্টাচার্যকে) একটি চিঠি লিখলাম এবং শিবশঙ্কর চৌধুরীকে (পরে শহীদ) একটি চিঠি

দিলাম। একজন শ্রদ্ধেয় কংগ্রেস নেতা ও আমাদের গুরুজন, এবং অপরজন জেলা কংগ্রেসের সম্পাদক। পত্রগুলিতে আনুপূর্বিক বর্ণনা দিয়ে উদ্বেগজনক অবস্থা বর্ণনা করে লিখলাম, এক্ষেত্রে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য পুলিশের হস্তক্ষেপ ছাড়া বোধহয় গত্যন্তর নেই। হাজার হাজার মানুষকে বুঝিয়ে ঘরে ফেরানোর সময়ও নেই, সুযোগও নেই। পুলিশকে দিয়ে যদি আশু-দাঙ্গা প্রতিহত করা যায়, তার সঙ্গে সহজেই শান্তির প্রচার চলতে থাকবে এবং শান্তি ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করা যাবে। শতশত লোকের প্রাণহানি, গৃহদাহ প্রভৃতি ঘটলে সুস্থ মন জাগিয়ে তোলা কঠিন হবে। বিজয়দাকে ও কালোকে আরও লিখলাম, "আপনারা যদি হিন্দু মহাসভা, মুসলিম লীগ প্রভৃতির নেতাদের আনতে পারেন ভালো হয়। আর আমাদের সকলের সাহায্যের জন্য উভয় সম্প্রদায়ের মানুষের একান্ত প্রীতিভাজন গোগোদা-কেও যদি আনতে পারেন, তাহলে ভাল হয়।"

বর্ষার সময় ক্যানেলের পিছল পথ ও গো-খুরো বা পাঁনৃজ্ থাকায় বাঁধে চলা দুষ্কর ছিল। লণ্ঠন, ছাতা, লাঠি ইত্যাদি যোগাড় করে তাঁরা ক্যানেলের বাঁধ হয়ে উণ্টে (উণ্টে গ্রাম) হয়ে বর্ধমানের পথে রওনা হলেন। আর আমি নিজের ছাতা ও থলি হাতে করে গয়েশপুর-মণ্ডলগ্রামের দিকে রওনা হলাম। পথে এগোতেই দূরে রাস্তার ডান দিকে গয়েশপুর গ্রামের কোলে বেশ কিছু লোকজন জড়ো হয়েছে মনে হোল। আড়াই মাইল দূর থেকে ভালো দেখা যাচ্ছিল না, শব্দও শোনা যাচ্ছিল না, কিন্তু ভীড়ের মধ্যে একটা চাঞ্চল্য রয়েছে, অস্পষ্ট হলেও, সেটা বোঝা যাচ্ছিল। কাছাকাছি আসতে আসতে কিছু হৈ-হামারি শব্দ পেলাম। এইবার এগোতে হবে, সোজাসুজি ভীড়ের দিকে। পরনে সাধারণ বাঙালী পোশাক, ধুতি-পাঞ্জাবী। মুসলমান পরিচয়ের ইঙ্গিত নেই। সাম্প্রদায়িক উত্তেজনায় মথিত জনতা (এদিকটায় মুসলমান) একজন অজ্ঞাত এরূপ মানুষকে ভাল চোখে দেখবে না, এটা বর্ণিত অবস্থায় স্বাভাবিক। একটা উপায় শট্ করে আমার মনে এল। আমি সুরাহ্ 'ফাতেহা' কোরানের প্রথম পরিচ্ছেদ আর সুরা 'এখ্লাস্' কেরাতের সুরে (অর্থাৎ কোরান পাঠের চর্চিত শিল্পরীতির সঙ্গীতের সুরে) পড়তে শুরু করলাম। একটু উঁচু স্বরেই এবং আগে থেকেই করতে লাগলাম। যাতে আমাকে দেখামাত্রই শব্দটা সেই মানুষের কানে যায়। ইতিমধ্যে দেখলাম ভীড় ভেঙ্গে বেশ কিছু মানুষজন পিছন দিকে (সুতরাং আমার দিকে) দৌড়ে পিছিয়ে আসছে। ক্রমাগত আল্লা-হো-আকবর বলে চিৎকার করছে। ('আল্লাহ্-হো-আকবর' মানে আল্লা

সবচেয়ে বড়। প্রসঙ্গত, উল্লিখিত সুরা বা পরিচ্ছেদ নামাজের কারণে প্রায় প্রত্যেক মুসলমানের জানা।) সবচেয়ে পিছনে যারা ছিল তাদের মধ্যে একজন চমকে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলল, "এই যে চাচাজী এসেছেন।" এমন অপ্রত্যাশিতভাবে আমার সেই মাঝমাঠে উপস্থিতি তাকে মুহূর্তের জন্য স্তম্ভিত করে দিয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে মুহূর্তেই তার মনে জেগেছিল, "একজন নেতা গোছের মানুষ যখন পেয়েছি, আর ভাবনা কি ?" তার দেখাদেখি অন্যেরাও আমার কাছে জড়ো হতে লাগলেন এবং আমার সঙ্গে সঙ্গে এগোতে লাগলেন। ইতিমধ্যে রশিদ আমার পরিচয় দিয়ে যাচ্ছে আর আমাকেও ঘটনা বলে যাচ্ছে। রশিদের পরিচয় কিছু দিয়ে নিই।

আমাদের বাড়িতে বেশ কিছু আশ্রিত ব্যক্তি ও পরিবার থাকতেন। রশিদের বাবা গরীব মধ্যবিত্ত পরিবারের। ওর দাদি (ঠাকুরমা) ছেলের হাত ধরে আশ্রয় নিয়েছিলেন (সে আমার জন্মের পূর্বে)। ছেলে খানিকটা লেখাপড়া করল। আরদালির চাকরি হল। বিয়ে করল। কিছুদিন পর মরে গেল। ইতিমধ্যে রশিদের জন্ম হয়েছে। সে আবার আমাদের বাড়িতেই বড় হল। নিকটস্থ বড়পলাশন গ্রামে ওর ফুফু (পিসী) থাকতেন। রশিদেরও পৈত্রিক গ্রাম সেই একই গ্রাম। রশিদ বেশ বড় জোয়ান হল। তখন ওর বিধবা ফুফু ওকে নিয়ে গেলেন। মাঝে মাঝে যায় আসে, দেখা-সাক্ষাৎ হয়, কিন্তু এই রকম মুহূর্তে হঠাৎ গয়েশপুরে আমি আবির্ভূত হবো এতে তার হতভম্ব হবারই কথা।

যাই হোক, যা বলছিলাম। ওর কাছে সব কথা শুনতে শুনতে একেবারে জমায়েতের মধ্যে এসে উপস্থিত হলাম। কুসুমগ্রাম অঞ্চলের কুলুট-গ্রামের দু-একজনকে ভীড়ের মধ্যে চিনলাম। অনেক পরে জানলাম, আশে-পাশের এবং মন্তেশ্বর থানার বেশ কিছু জানাশুনা লোকও ছিলেন। কিন্তু সেই মুহূর্তে তাঁরা কেউ সামনে আসেন নি। পারিবারিক সূত্র ধরে আমার পরিচয়টা ইতিমধ্যে জমায়েত মানুষের জানা হয়ে গিয়েছিল। কাছাকাছি কোন বাড়ি থেকে একটা ছোট টেবিল ও চেয়ার আনা হল। একটি হ্যাজাক্ লাইটও ছিল, আমাকে বসতে অনুরোধ করা হল। এইবার আমাকে কিছু বলতে হবে।

আমি মৃদুভাবে শুরু করলাম, "আমি তো কিছু জানতাম না। আমি আমার সাধারণ কাজে এখানে এসেছিলাম। এসে দেখি এই দুঃখজনক ব্যাপার। কিন্তু যা হয়েছে হয়েছে, শান্তি তো একটা করতে হবে।"

শান্তির কথা শোনামাত্রই সমস্ত জনতা উত্তেজিত হয়ে চিৎকার করতে লাগল, "না, না, না—শান্তির কথাতেই মার খেয়েছি ; আবার মার খাব। আমরা দূর দূর গ্রাম থেকে এসেছি। আমরা আর শান্তির ধাপ্পায় ভুলে মার খাব না। আপনি জানেন না ওরা ওধারে হাজারে হাজারে জড়ো হয়েছে এখানকার মুসলমানদের শেষ করার জন্য। আমরা এখানকার মুসলমানদের বাঁচাব। আর ওদেরও শিক্ষা দিয়ে যাব যাতে ভবিষ্যতে এরকম না করে।" কথাটা গুছিয়ে-গাছিয়ে একবারে বলেছে তাও না। আর শুধু একজন ব্যক্তি, তাও না। সবাই উত্তেজিত অবস্থায় আছে আর সেই অবস্থায় সবাই বলার চেষ্টা করছে। ওরই মধ্যে সব কথা জুড়ে-মুড়ে আমাকে বুঝে নিতে হচ্ছে। নিকটস্থ গ্রামের দু-একজনের জখম বাঁধা ছিল। তাদের কাছ থেকে সব শোনার জন্য অন্যদের কোন রকমে স্থির রাখলাম। এদের মুখে যা শুনলাম ঘটনাটা এই মতো : সকালবেলা জমিদারদের কাছারিতে মুসলমানরা তাদের গ্রাম থেকে এসেছিল মিটমাট করার জন্য। কথা চলছে এমন সময় বাইরে হাটতলায় (এখন মেলা-তলায়) মুসলমানদের উপর মার শুরু হল। চিৎকারে বৈঠকের মধ্যে যারা বসেছিল তাদেরও বেরোতে হল। বেরিয়ে তারাও আক্রান্ত হল ও মার খেল। শেষে সেখান থেকে পালিয়ে প্রাণ বাঁচাল। (বলা বাহুল্য, পরে এই একই কাহিনীর বিপরীত ছবি পেয়েছিলাম হিন্দুদের কাছ থেকে। তাঁরা বললেন, "বসেছিলাম মিটমাট করতে। বাইরে থেকে চিৎকার হচ্ছে, হিন্দুদের উপর মার হচ্ছে। সুতরাং আমরাও বাইরে বেরিয়ে এলাম।")

পরে বুঝেছিলাম, উভয় পক্ষেরই কিছু মাতব্বর শ্রেণীর মানুষ আন্তরিক-ভাবেই মিটমাটের জন্য বসেছিলেন এবং আলোচনা চলছিল। মেলাতলায় তখন প্রচুর লোক—হিন্দু-মুসলমান উভয়ই। উত্তেজনার পরিস্থিতিও প্রাচীন পূজোর মেলার আনন্দকে স্তব্ধ করতে পারেনি। যাই হোক, হাটতলায় একটা কিছু বেধে পুনরায় গণ্ডগোল লেগে যায় এবং উভয় পক্ষে বেশ কিছু মারপিট হয়। তারপর উভয় পক্ষ গ্রামে গ্রামে ফিরে বিরোধী পক্ষের আক্রমণের আতঙ্কে নিজেরা আক্রমণের প্রস্তুতি নিতে থাকে। পূর্বে বলেছি, এরূপ আতঙ্ক প্রচার ও আহ্বানে উভয় পক্ষের মানুষ জমায়েত হয়।

এরপর দুই দিকে জমায়েত আড়ালে আড়ালে থাকছে। আবার সামনে দু-চারজনকে দেখলে মারপিটের চেষ্টাও হচ্ছে।

আমি এই রকম উত্তেজনার ক্ষেত্রে পৌঁছে মনে মনে খুব ভাবিত আছি। যদি সামলাতে পারি তো ভালোই। আর সামলাতে যদি না পারি তাহলে ?

দেখলাম, দাঙ্গার উত্তেজনায় সকলেই উত্তেজিত। আমি তখন এক মুহূর্তের মধ্যে বাইরের ব্যবহারে ভূমিকা পরিবর্তন করে ওদের উত্তেজনার মোড় ঘোরাব ঠিক করলাম। চতুর্দিক থেকে চিৎকার হচ্ছিল, "আপনি আমাদের নেতা হন।" তখন আমি বলে উঠলাম, "বেশ, তাই হবে। আমিই না হয় নেতা হলাম। কিন্তু নেতার কথা তো শুনতে হবে। এত মানুষ চারিদিকে এলোমেলো করে ছড়িয়ে থাকলে আমি সামলাব কি করে? মাঝে এক বা একাধিক জায়গায় জড়ো হন আর বিশ্রাম নিন। শ'দেড়েক লোক স্বেচ্ছাসেবক হন। তাঁরা চতুর্দিকে পাহারা দেবেন। আমার নির্দেশ ছাড়া কেউ কিছু করবেন না।" তখন আমার উদ্দেশ্য জমায়েত লোকের অস্থিরতা এবং উত্তেজনা প্রশমিত করে থিতিয়ে দেওয়া। ভ্রাম্যমান লোকের সংখ্যা কমিয়ে নিয়ন্ত্রিত স্বেচ্ছাসেবকের দলে আটকাতে পারলে সামলানোর উপায় পাওয়া যেতে পারে। আমি তো অপরপক্ষের কথা কিছু বুঝতে পারছি না। স্থানীয় পথঘাটের ভৌগোলিক স্থিতিও জানি না। রাতের অন্ধকারে জানার বা বোঝার কোন উপায় নেই। ছড়িয়ে পড়া উভয় পক্ষের ছাড়া-ছাড়া মানুষের মধ্যে কোন জায়গায় আচম্বিতে কোন অঘটন ঘটলে উত্তেজিত মানুষ পরস্পরের মধ্যে ঝাঁপিয়ে প.ড় বৃহৎ দাঙ্গায় পরিণত না করে ফেলে এই ভাবনা আমার মনে তখন ছিল। হিন্দুপক্ষে কী ঘটছে কিছুই জানি না। হেলারামবাবু তখনও পৌঁছেছেন কিনা এবং পৌঁছে থাকলে কী করছেন তা-ও জানি না। যাই হোক, আমার দিক থেকে যতটা সম্ভব একপক্ষকে নিয়ন্ত্রণ করবো—এই কৌশলই ধরে থাকলাম। জমায়েতের জায়গা থেকে গয়েশপুর গ্রামের মাতব্বরশ্রেণীর মানুষেরা আমাকে গয়েশপুর মসজিদের মধ্যে নিয়ে এলেন। বেশ কিছু মানুষ আমাদের সঙ্গে মসজিদ পর্যন্ত এল। মসজিদের বারান্দার মেঝেতে কিনারের দিকে কিছুটা ভাঙ্গা। চোট্ দিয়ে ভাঙ্গার চিহ্ন। অবশ্য বড় ধ্বংসের চিহ্ন নয়। কিন্তু মনের ব্যাপার, সেন্টিমেন্টের ব্যাপার আছে। গ্রামে ঢুকে মসজিদ আক্রমণ করেছে—তার সাক্ষ্য-প্রমাণ এইভাবে উপস্থিত করলে তার জবাবে সেই মুহূর্তেই কোন মন্তব্য করা কঠিন। আমি চুপ করে মসজিদের ভিতরে প্রবেশ করলাম। জমায়েতেই বলে এসেছিলাম, দাঙ্গা যদি করতেই হয় তো দিনের আলোয় তা হবে। রাতে তো কিছু দেখা যাবে না। মসজিদের ভিতরে এসে বসে বোঝালাম, রাতটা বিনা হাঙ্গামায় কাটে এটা আমাদেরই স্বার্থ। আমাদের বলতে তখন এখানে জমায়েত মুসলমানদের বোঝাচ্ছে। আমাকে নেতৃত্ব নেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে এবং ঘটনা নিয়ন্ত্রণ করার

স্বার্থে বাধ্য হয়েই আমাকে তা গ্রহণ করতে হয়েছে। এখন মনে সামান্য কিছু ভরসা এসেছে। কারণ মসজিদে আমার সঙ্গে যাঁরা বসলেন, তাঁদের মধ্যে আশপাশ গ্রাম থেকে আসা বেশ কিছু চেনা মানুষ ছিলেন। পূর্বস্থলী থানার হলদি ন'পাড়া গ্রামের বর্ধমান শহরের সুপরিচিত জনাব বেসারত্ চৌধুরী ছিলেন সুরসিক মানুষ। সরস হাসির কবিতা লিখতেন। বর্ধমান শহরে তখন বেশ কিছু বৈঠকখানায় আড্ডার রেওয়াজ ছিল। তার মধ্যে আমাদের বাড়ির বৈঠকখানা অবশ্যই গণ্য। বর্ধমানে এলেই এইসব আড্ডায় ঘোরা ছিল চৌধুরীসাহেবের পেশা। তিনি এখানে কীভাবে? প্রশ্নের উত্তরে জানালেন, পাশের গ্রাম বাম্‌নেতে তাঁর জামাই-এর বাড়ি। শৈশব থেকে চেনা খালেক সাহেব (তাঁকে আমি মামু বলতাম) ছিলেন। তাঁর বাড়ি বর্ধমান শহরের নিকট 'মীরের ডাঙ্গায়'। জানলাম তিনি এখানে শ্বশুরবাড়ি বাম্‌নেতে ঘর করে আছেন। মন্তেশ্বর থানার রাইগাঁয়ের মোল্লা আবুল খয়ের, তিনি এসেছিলেন রাইগাঁর মানুষদের সঙ্গে। তাঁরা ছিলেন কয়েকশ'তে বিরাট দল। কুলুটের দু'একজনকে দেখলাম। কিন্তু অন্যতম প্রধান হানা মোড়ল (তাঁকেও গ্রাম সম্পর্কে মামাই বলতে হবে। কারণ মাসির বাড়ি কুলুট। তাঁর সঙ্গে তাঁদের ঘনিষ্ঠতা)। আরও কিছু লোক চেনা দেখলাম। সব নাম মনে পড়ছে না। যাই হোক, এতগুলি চেনা মুখ দেখে রাশ টানতে পারব বলে মনে হল। যদিচ বাইরের অবস্থা আতঙ্ক-জনক। অনবহিত অবস্থায় অপরিচিত পরিস্থিতির মধ্যে পড়া আতঙ্কের যথেষ্ট কারণ। মনের ভিতর নানান দুর্ভাবনা থাকলেও বাইরে আমি খুব শান্ত সমাহিত ভাব দেখাচ্ছি। ইতিমধ্যে চা এসে পড়ল। চা খাচ্ছি এমন অবস্থায় আরো একটু আশার কারণ ঘটল। আমার প্রথম শান্তির প্রয়াস ব্যর্থ যায়নি। গয়েশপুর গ্রামবাসীরা চারিদিকে রোকা বা চিঠি পাঠিয়েছিল, কিন্তু এখন অবস্থার গুরুত্ব তাদের সামনে এসে পড়েছে। এত লোককে খাওয়ানোর প্রশ্ন এসেছে। ইতিমধ্যে তিনটি প্রাণীও জবাই হয়েছে রাত্রের খাবারের জন্য। কতদিন চলবে? এরপর কী হবে? এসব দুর্ভাবনা গ্রামবাসীর পক্ষে স্বাভাবিক। চা খাচ্ছি সেই সময়ে গ্রামবাসীদের মধ্যে একজন মাতব্বর এসে কানে ফিস্‌ফিস্ করে বললেন, "আপনি শান্তিরই চেষ্টা করুন। আমরা গ্রামের লোকেরা কোনরকমে শান্তিই চাই।"

আমার মনের মধ্যে একটা উদ্বেগ সর্বদাই থাকছিল। শ'দেড়েক লোক তখন পাহারা দিচ্ছে। প্রায় সবই জোয়ান এবং স্বভাবতই উত্তেজনা-প্রবণ। মাতব্বরদের অনভীপ্সিত হলেও এতগুলো লোকের মধ্যে কোথায়

কি ঘটে যায় সেই ভাবনা আছেই। সুতরাং আমি বেশীর ভাগ লোককে বিশ্রামের অবস্থায় আনতে চাচ্ছি। এর মধ্যে খাওয়ানো চলছে। খবর পেলাম ব্যাচ্-ব্যাচ্ খাবার পর অনেকেই ঘুমিয়ে পড়েছে। আমি কথা তুললাম—"এত লোক পাহারার দরকার আছে কি ? আমার তো জায়গাটা আর পথ-ঘাট জানা নেই।" সবাই বললেন, "না এত লোকের দরকার নেই।" আমি আরও বললাম, "তাহলে যাঁরা থাকবেন তাঁদের সংখ্যা, গ্রামবাসী ও নিতান্ত প্রয়োজন হলে আশেপাশের গ্রামবাসীদের মধ্যেই সীমিত রাখা ভাল। তাঁরাই তো এখানকার পথ-ঘাট সরজমীন অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল।" উপস্থিত সকলেই, বিশেষ করে গ্রামবাসীরা, সমর্থন করলেন। আমি তখন বললাম, "তাহলে পাহারা ৪০-৫০ জনের মধ্যেই সীমিত থাকুক, আর আমি তো এখানে জেগে বসে আছি।"

রাত্রের মধ্যে আর কিছু ঘটেনি। ভোরের দিকে তখনও অন্ধকার কাটেনি, পাঁচ-ছ' জনের পাহারার এক গ্রুপ একজন হিন্দুকে নিয়ে এসে উপস্থিত হল। দেখেই বুঝলাম, নিরীহ ব্যক্তি। কিন্তু মুখের ভাব নরম না করে গম্ভীর রাখলাম। ইতিমধ্যে হিন্দু ধরা পড়েছে খবরে এক উত্তেজিত জনতা জড়ো হয়েছে। আমি জেরা করতে লাগলাম। ধৃত-ব্যক্তিটি বোধহয় করন্দা গ্রামের। বড়পলাশন ও গয়েশপুরের কোল দিয়ে নবস্থা যাচ্ছিলেন বাস ধরতে। জানালেন তাঁর মেয়ের ডেলিভারীর কথা। এই আতঙ্কের খবর পেয়ে তাঁর মেয়ের বাড়ি যাচ্ছিলেন। তিনি বললেন, দাঙ্গা-হাঙ্গামার খবরই তিনি রাখেন না—ইত্যাদি ইত্যাদি। আমার জেরাকে ডুবিয়ে দিতে উত্তেজিত জনতার কাছ থেকে আওয়াজ আসছে, "গুপ্তচর, গুপ্তচর, ও'র কথা বিশ্বাস করবেন না।" উত্তেজনায় অবস্থা দেখে আমি তাড়াতাড়ি লোকটিকে নিরাপত্তা অবস্থায় সরাবার চেষ্টা করলাম। পাশে ইমামের ঘর খালি ছিল। গ্রামবাসীদের বললাম, "এখন কোন এ্যাক্‌শন নেওয়া হবে না। যা করার সকালে করব! এখন এই ঘরে তালা দিয়ে আটক রাখ।" তাঁকে খুব গম্ভীর হয়ে বললাম, "আপনি এ রাস্তায় এ সময়ে এলেন কেন ? আপনার কথা এরা কেউ বিশ্বাস করতে পারছে না। সুতরাং আপনি এখন আটক থাকুন।" আস্তে আস্তে সবাই ঘুমিয়ে পড়ল ঘন্টা-দেড়েক পর। গ্রামের মাতব্বররা এবং উপরে উল্লিখিত আমার চেনা-মানুষরা জেগে আছেন। তখন ভোরের আলো মাত্র দেখা দিয়েছে। আমার সঙ্গীদের বললাম, "মানুষটা তো নির্দোষ বলে মনে হচ্ছে। ও'কে আটকে রেখে লাভ কি ? আটক রাখাও তো দায়িত্ব। ও'কে ছেড়ে দেওয়া যাক্।" যাঁরা ছিলেন

তাঁরা সকলেই সোচ্চারে সমর্থন করলেন। গ্রামবাসীদের বললাম, "আপনাদের খুব বিশ্বস্ত কিছু জোয়ান ছেলে ডেকে দিন।" পাঁচ-ছ' জন জোয়ানকে তাঁরা নিয়ে এলেন। লোকটিকে তালা খুলে বের করে আনা হল। তাঁকে বললাম, "আপনি খুব ভুল করেছেন। পথ-ঘাটের খবর নিয়ে বেরোন উচিত ছিল। এ-মুখে না গিয়ে মাঝের-গাঁ দিয়ে যাওয়া উচিত ছিল। এখন এদের সঙ্গে আপনি যান।" জোয়ানদের বললাম, "শান্তির যেমন নিয়ম আছে, যুদ্ধেরও তেমনি নিয়ম-শৃঙ্খলা আছে। যেহেতু আমরা নেতারা বলে দিয়েছি, সেইহেতু তোমাদের কর্তব্য হল এ'কে নিরাপদে আমাদের এলাকা থেকে পার করে দেওয়া। এ'র গায়ে কেউ যেন আঘাত করতে না পারে। নিজের প্রাণ দিয়েও তোমাদের দেখতে হবে।" গ্রামবাসী একজন মাতব্বরকে জমায়েতের মধ্যে পাঠিয়ে দিলাম বিষয়টা ভাল করে বুঝিয়ে দিতে। জোয়ানদেরও ভাল করে বুঝিয়ে দিলাম, আশ্রিতজনকে রক্ষা করা হচ্ছে কর্তব্য। তাঁরা একটা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পেয়েছে এই ভেবে খুব উৎসাহিত হল, একস্বরে বলে উঠল, "আমাদের জান্ থাকতে ও'র গায়ে আঁচড় লাগবে না।" ঘুরে এসে কর্তব্য-পালনের রিপোর্ট করল।

দিনের আলো ফুটেছে মাত্র। এমন সময় দু-তিনজন লোক প্রায় ছুটে এসে খবর দিলেন—সশস্ত্র পুলিশ এসেছে। সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের মাতব্বরও দু-তিনজন এলেন। বললেন, "পুলিশ বলেছে, তদন্ত শুরু করছি। যার যা বলার আছে এসে বলুন।" আমি বললাম, "ঠিকই আছে। নিজের হাতে আইন নেবেন কেন? এখন তো আর ওদের আক্রমণ করার প্রশ্ন নেই। সশস্ত্র পুলিশ যখন এসেছে, তারা বাধা দেবেই। না দেয় পুলিশের মনোভাব দেখলেই বোঝা যাবে। তখন যা হয় করা যাবে। এখন আপনাদের যা অভিযোগ আছে, পুলিশকে বলুন। ও'দের (অর্থাৎ হিন্দু-পক্ষের) যা অভিযোগ আছে, ও'রা বলবেন।" চিৎকার উঠল, "মসজিদ ভেঙ্গেছে।" আমি বললাম, "সেও তো আপনাদের একটা অভিযোগ। নিজেরা খুনোখুনি করে ঘর জ্বালিয়ে ফয়সালা তো হবে না।" সারারাত ধরে ক্লান্তি আর দুর্ভাবনা গ্রামের মুরুব্বি-মাতব্বরদের চিন্তিত করেছিল। যদিও সাধারণ সভায় তখনও খুব উত্তেজনা। তবু সারারাতের অভিজ্ঞতায় আমার তখন কিছু ভরসা এসেছে। ভাবছি দু-পক্ষকেই যদি পুলিশের কাছে বসিয়ে দেওয়া যায়, বিচার একটা হবে এই ভরসায় জড়ো হওয়া মানুষকে যদি বিদেয় করা যায়, পুনরায় দাঙ্গা-হাঙ্গামায় গড়ান ঠেকানো যায়, মামলা-মোকদ্দমা মিটিয়ে নেওয়ার তবু চান্স থাকে। আমি সেই মতোই কথা বলে

যাচ্ছিলাম। ইতিমধ্যে একজন এসে বলল, "পুলিশ তাগাদা দিচ্ছে। জমায়েত মানুষরা সকলে যে খুশী তা নয়। দুর্ভাবনা আছে, উত্তেজনাও আছে। পুলিশইবা ভরসা কোথায়? তারা পক্ষাপক্ষি করে হাঙ্গামা আরও বাড়িয়ে দিতে পারে।"

পুলিশ সম্বন্ধে দুর্ভাবনা আমারও ছিল। তারা ক্ষমতার অপব্যবহার করে যা ইচ্ছা করতে পারে। আবার যে রকম উত্তেজনা দুই-পক্ষে বজায় রয়েছে, আর দুই-পক্ষেই দূর হতে আগত লাঠি হাতে মানুষ এতো জড়ো হয়েছে যে তাদের ঠেকানো পুলিশের ক্ষমতার বাইরেও চলে যেতে পারে। আমার ভয় ছিল কম বয়সের জোয়ানদের সম্বন্ধে। বলা বাহুল্য, উভয়-পক্ষেই এরাই প্রধানত উত্তেজনার খোরাক। সুতরাং আমিও খুব চিন্তিত।

তাছাড়া তখন ইংরেজ আমল। পুলিশকে তখন আমরা ইংরেজের পুলিশ বলেই দেখি। সুতরাং সাধারণের কাজে পুলিশের মুখাপেক্ষী হওয়াটাই এক সঙ্কোচের বিষয় ছিল। তাই কালোকেও বিজয়দা (শ্রদ্ধেয় শ্রীবিজয়কুমার ভট্টাচার্য মহাশয়)-এর সঙ্গে পুলিশের হস্তক্ষেপ ছাড়াও সমস্ত বিষয়টা আলাপ করে নিতে বলেছিলাম। যাই হোক, এটাই এখন সঠিক পথ বলে মনে হল।

গ্রামবাসীরা বললেন, "পুলিশের কাছে কী বলবো না বলবো— আপনার কাছে বসে পরামর্শ করে যাই।" আমি অস্বীকার করলাম। আমি বললাম, "ঘটনা আমি কিছু প্রত্যক্ষ দেখিনি। তাছাড়া মামলা-মোকদ্দমায় তোমরা অভিজ্ঞ বেশী এবং বোঝ বেশী। সুতরাং নিজেরা আলাপ করে যা বলবার বল।" আমি তখন মসজিদেই বসে থাকলাম। ওরা আমার কাছ থেকে চলে গেল। এক জায়গায় বসে মাতব্বররা ব্যাচের পর ব্যাচ সাক্ষী-সাবুত পাঠাতে লাগল। আমি সোজা গ্রামের বাইরে যেখানে গাছতলায় পুলিশ বসেছিল, সেখানে গিয়ে বসলাম। অবশ্য আলাপ-পরিচয় করার পর তাদের নির্বিঘ্নে কাজ করতে দেবার জন্য বেশ খানিকটা ব্যবধান রেখে দূরে সরেই বসলাম। চতুর্দিকে মানুষের ভীড়। অবশ্য তারা দূরে সরেই আছে। সব মানুষ জড়ো হয়েছে, ভীড় তো দেখা যাবেই। তাদের শুধু আমি অনুরোধ করলাম, "শান্ত হয়ে থাকুন, পুলিশের কাজে যেন বিঘ্ন না হয়।" বেলা বাড়তে লাগল। সাক্ষী-সাবুত চলতে লাগল। শুনলাম ঐ পক্ষেও সশস্ত্র পুলিশসহ একজন অফিসার তাঁরা রেখেছেন। ও পক্ষের সাক্ষী-সাবুত নিচ্ছেন। আমি বসে চতুর্দিকে নজর

রাখলাম। ভীড়ের মধ্যে কোথাও চাঞ্চল্য দেখলে উঠে গিয়ে তাদের বুঝিয়ে আবার এসে বসছিলাম।

এখান থেকে কুসুমগ্রাম বেশীদূর নয় মাইল আট-নয়। ওখানে জমিদার বদু মিঞার বাস। একজন গ্রামবাসী ঘোড়া দৌড়ে এসে হাজির। তাকে ঘিরে চাঞ্চল্য দেখে আমি সেখানে গেলাম। ঘোড়ায় চড়ে আসা লোকটি বলল, "বদু মিঞা বললেন, পুলিশ এসেছে তো কী হয়েছে? তোমরা লাগিয়ে দাওগে।" এক মুহূর্তেই বুঝলাম এটা কোন চক্রান্তের অংশ। সত্যাসত্য বিচারের কথা বুঝলাম না। বুঝলাম এখানে মিঞাত্বকে তুচ্ছ না করলে চলবে না। আমি বললাম, "এই হুকুমের জন্য এখানে গ্রামের মাতব্বর নাই? তোমাকে বদু মিঞার কাছে যেতে হবে কেন? আর আস্তাবলে তো ঘোড়া বাঁধা। তোমার সঙ্গে নিয়ে আসতে পারলে না তো? একগ্লাস পানি দিয়েছিল? না তাও দেয়নি? বদু মিঞা কোনদিন এ গ্রামে এসে বসেছিল?" আরও কিছু বললাম, জিনিসটাকে খেলো করে দেবার চেষ্টা করলাম। উত্তেজনা থাকলেও সাধারণ মানুষের শান্তির কামনা লুপ্ত হয়নি। সুতরাং আমার কথা সহজেই জমায়েত মানুষের কাছে সায় পেল।

অনেকক্ষণ সাক্ষী-সাবুত চলছে। স্বভাবতই শোনার জন্য মানুষের আগ্রহ। সেজন্য মাঝে মাঝে ভিড়ের কিছু অংশ এগিয়ে আসছে। আর আমাকেও উঠে গিয়ে বুঝিয়ে সরিয়ে দিতে হচ্ছে। তখনও বুঝিনি, কিছু ভিন্ গাঁয়ের লোক গণ্ডগোল বাধাবার জন্য নিয়ত সক্রিয় ছিল। কিন্তু অশান্তির পক্ষে পদক্ষেপে উত্তেজিত মানুষেরও বিবেকে বাধে এবং সংযম নিয়ে আসে। আমি এই স্বাভাবিক শক্তিকে জাগ্রত রাখার চেষ্টা করছিলাম। যার ফলে মুষ্টিমেয় চক্রান্তকারীদের চক্রান্ত ব্যর্থ হচ্ছিল। অনেকক্ষণ এইভাবে চলেছে। এমন সময় আচম্বিতে একটি ঘটনা ঘটল।

পুলিশ ও আমরা যেখানে গাছতলায় বসেছিলাম, সেটা একটা চতুষ্কোণ দীঘির এক কোণ। এই কোনটা গয়েশপুর গ্রামের কিনারার সংলগ্ন। পাড় ধরে সোজাসুজি পশ্চিমের কোণটা মোড়লগাঁয়ের দিকে। আমি ঐ কোণের দিকেই মুখ করে বসেছিলাম। এই সময় হঠাৎ কিছু আওয়াজ পিছন থেকে পুকুরের ওপারের পাশ থেকে এল। শতশত মানুষের ছুটে চলার পদশব্দ। ঘুরে তাকিয়ে দেখি বিরাট জমায়েতে মানুষ যা ছিল তারা সব জড়ো হয়ে আমাদিগকে এড়িয়ে পুকুরের ওপার দিয়ে মোড়ল-গাঁ অভিমুখে ছুটতে আরম্ভ করেছে। দেখে মনে হচ্ছে জমাট বাহিনী। আমি দেখামাত্রই ছুটে

পাড় ধরে পশ্চিমের কোণ হয়ে পশ্চিম পাড়ে তাদের সম্মুখীন হলাম। আটকালাম। বললাম, "থামতেই হবে।" পিছনে পুলিশ ছুটে এসে বন্দুক উ'চিয়ে শুয়ে পড়ল। উত্তেজিত কিছু ছেলে তখন আমাকে গাল দিচ্ছে 'হিন্দুর গুপ্তচর'। আমার ধমকের স্বরে বিরোধিতায় জমায়েত মানুষ দ্বিধা-গ্রস্ত হয়ে পড়েছে। সঙ্গে সঙ্গে একজন অপরিচিত বয়স্ক মানুষ এসে আমার পাশে দাঁড়ালেন। তাঁর যেমন বিশ্বাস তিনিও চিৎকারে বলতে লাগলেন. "কাকে কী বলছিস্ ? বুঝতে পারছিস্ না মুখে পোকা হবে।" আমি বললাম. "আমার লাশ থাকবে এখানে। লাশের উপর দিয়ে তোমাদিগকে যেতে হবে. কিন্তু আমি নড়ব না।" বয়স্ক ব্যক্তিটিও আমার সঙ্গে সায় দিলেন। ইতিমধ্যে পিছন থেকে আওয়াজ এল ওয়ান···টু···সঙ্গে সঙ্গে ডি. এস পি বঙ্কিমবাবুর জোর গলার আওয়াজ, "শাহেদুল্লাহ্ সাহেব সরে যান, গুলি চালাচ্ছি।" প্রকৃতির নির্দেশে স্বতঃই পা-টা পিছিয়ে যাওয়ার মতো হয়েছিল। কিন্তু সেই মুহূর্তেই সিদ্ধান্ত দৃঢ় হল—যা হবার হবে নড়া চলবে না। আরও একজন মানুষ পাশে এসে দাঁড়ালেন। পূর্বে উল্লিখিত মীরের ডাঙ্গার আব্দুল খালেক মিঞা। আমি সমানে চিৎকার করে বলে যাচ্ছি. "এক পা এগোলে চলবে না।" আর কাঙালী ভাই (যিনি আমার পাশে আগেই এসে দাঁড়িয়ে-ছিলেন) তিনিও অভিশাপ দিয়ে যাচ্ছেন। আর খালেকমামুও (তাঁকে আমি মামুই বলতাম) ওদের বারণ করছেন। বলতে এতক্ষণ লাগল, কিন্তু মুহূর্তকয়েকের ঘটনা। আমি ছুটে এসে দাঁড়ানোতেই দ্বিধাগ্রস্ততা এসে-ছিল। কাঙালী ভাই-এর বিরতিহীন অভিপাশ সেই দ্বিধাগ্রস্ততাকে বাড়িয়ে-ছিল। খালেকমামু এসে দাঁড়ানোতেও সেটা একটু জোর হল। নয়জন সশস্ত্র পুলিশের শুয়ে উ'চিয়ে বন্দুক এবং ডি. এস. পি.-র সজোরে আওয়াজ 'গুলি চালাব'—শুধু এতেই নিরস্ত হতো না এটা সত্য। কারণ উত্তেজনায় মানুষ তখন পাগল। মসজিদ ভেঙ্গেছে তার ব্যবস্থা করতেই হবে। কিন্তু আমি সামনে পড়ে থিতিয়ে দেওয়াতে মানুষ ভাববার অবসর পেল। সবে মিলে জমাট ভিড় শিথিল হয়ে গিয়েছিল। পিছনকার মানুষরা একেবারে সম্পূর্ণ দাঁড়িয়ে গেছে। একেবারে সামনে দু-তিন লাইন বাদ দিলে বড় ফাঁক হয়ে গেছে। আর একেবারে পিছনকার মানুষ তখন পিছন দিকে মুখ ফিরিয়েছে অর্থাৎ ফিরে যাচ্ছে। কিছু ছেলে-পিলে হাঙ্গামাবাজদের দ্বারা উত্তেজিত হয়েছিল, তাদের তপ্তস্বর কমেনি। উচ্চস্বরে কিছু বলতে বলতে, সম্ভবত গাল দিতে দিতে ফিরল (অবশ্য এদের মধ্যে অনেকেই পরে আমার সঙ্গে দেখা করে অনুতাপ প্রকাশ করেছিল)।

ডি. এস. পি.-র সাক্ষী নেওয়ার পালা শেষ। এখন অবস্থা বেশ শান্ত হয়ে এসেছে। মোড়ল-গাঁ থেকে পুলিশের সঙ্গে দু-চারজন এসেছেন। কমরেড হেলারাম চট্টোপাধ্যায়ও এসেছেন। তাঁর কাছে শুনলাম, তিনিও আমার মতো অবস্থায় পড়ে গিয়েছিলেন। তবে তিনি রাত্রে এসে পৌঁছা.ত পারেন নি। ঘণ্টা কয়েক আগে সকালের দিকে পৌঁছেছেন। এমন সময় এস. পি. এবং এস. ডি. ও. এসে পড়ল। অনেকেই সামনে এসে জড়ো হল। এস পি বক্তব্য রাখলেন। বললেন, "পুলিশ তার কর্তব্য করবে। আপনারা যে নিরস্ত হয়েছেন, ভাল কাজ করেছেন…ইত্যাদি ইত্যাদি।" এস. পি. আমাকে একটু সরিয়ে নিয়ে গেলেন। জিজ্ঞেস করলেন, আমার বিশেষ কিছু বলার আছে কিনা। আমি বললাম, "এখন পর্যন্ত আমার কোন অভিযোগ নাই। পুলিশ তাঁর কর্তব্যই করুন। অভি-যোগের সত্যাসত্য বিচার করে ন্যায়ত যা করা উচিত তাই করুন, কিন্তু পুলিশ যাঁরা এখানে থাকবেন তাঁরা যেন এখানে নতুন সঙ্কটের সৃষ্টি না করেন। তাঁরা যেন শান্তি বজায় রাখার দিকে সহায়তা করেন।"

এস পি. যাবার সময় পুলিশ অফিসারদের ডেকে আমার শান্তি বজায় রাখার চেষ্টায় সাহায্য করতে বলে গেলেন। এতে সেই সময় খানিকটা ফল ভাল হয়েছিল। কমরেড হেলারামকে আমি বললাম, আপনি মোড়ল-গাঁ ভগবানপুরে থেকে শান্তির প্রয়াস চালিয়ে যান। আমিও এদিকটার গ্রামগুলোতে তাই করতে থাকি।"

এইবারে হাঙ্গামার ক্ষেত্র থেকে ফিরে গ্রামে এলাম। প্রথমে মির্ধাদের বৈঠকখানায় কিছুক্ষণ বসলাম। পরন্ত বেলায় খাওয়া-দাওয়া ওখানেই হল। এমন সময় কালো (শহীদ শিবশঙ্কর চৌধুরী) সমরকে নিয়ে সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। তিনি খবর দিলেন, "তিনি বিজয়দা, রশিদসাহেব প্রমুখকে সঙ্গে নিয়ে মোড়ল-গাঁ এসেছেন।" শ্রীকুমারদা (হিন্দু মহাসভার সম্পাদক শ্রীকুমার মিত্র) আগেই এসে গেছেন। এখন মোড়ল-গাঁয়ে কথাবার্তা হয়ে ও'রা সব সন্ধ্যার পর গয়েশপুরে আসবেন। আমি কালোকে বললাম, "দু-চারজনের মারামারির ঘটনা হয়েছে। এর দরুণ দুঃখ ও ক্ষোভ কোনরকমে হয়তো মেটানো যাবে, কিন্তু মসজিদ আক্রমণের ব্যাপারটা খুবই শক্ত দাঁড়িয়েছে। ঐ-টার কি করা যায় এখনো ভেবে পাইনি। আপাতত দাঙ্গা তো ঠেকানো গেল। দেখা যাক পরে-পশ্চাতে কি করা যায়।" কালো বললেন, "উভয় গ্রামে দেখে বুঝছি মিটবেই এবং শান্তি প্রতিষ্ঠা হবেই। তবে উত্তেজনার উত্তাপে এখন খৗ ধরা যাচ্ছে না। সমাধান

কিছু সময়সাপেক্ষ। কালো সমরকে নিয়ে মোড়ল-গাঁ ফিরে গেলেন। যাঁরা বর্ধমান থেকে এসেছেন তাঁদের সঙ্গে করে নিয়ে আসবেন বললেন। আমি গ্রামবাসীদের নির্দেশে তখন সেখদের বৈঠকখানায় গেলাম। পরবর্তীকালে দু-এক ক্ষেত্র বাদ দিলে এটাই আমার স্থায়ী থাকার জায়গা ছিল। বৈঠকখানাটায় বসার জন্য খোলা-মেলা অনেকখানি জায়গা ছিল। ওখানে বসে আছি, লোকজনের ভীড়, কথাবার্তা চলছে। এ. এস. আই. করিম সাহেব এলেন। এঁরা ছোট-খাট অফিসার। একটুকুতে কতটা বেশী মনে করে নেয় তার একটি নিদর্শন পেলাম। এস. পি ডেকে নিয়ে আলাদা করে কথা কওয়ায় উনি ধরে নিলেন এস. পি-র সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠতা বেশী। সুতরাং ও'র চাকরির ক্ষেত্রে, ও'র প্রমোশনের দাবীর পক্ষে যদি আমি কিছু বলি তাহলে তাঁর উপকার হবে। কি আর করবো? গণ্ডগোল যাতে আবার না বাধে সেজন্য এদের সবারই সাহায্যের দরকার। বললাম, "কথা তো দিতে পারি না। সুযোগ পেলে চেষ্টা করবো।" কিন্তু ভদ্রলোক আশু-সমস্যায় একটি উপকার করলেন। গ্রামবাসীরা এবং অন্যান্যরা আমার কথা শোনায় কী উপকৃত হয়েছেন তা বুঝিয়ে বললেন। সেদিন গুলি চললে ও দাঙ্গা চললে কিরকম ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা ছিল, তার একটা ভয়াবহ ছবি গ্রামবাসীদের সামনে রাখলেন। তিনি চলে যাবার পর মনোরঞ্জন আই. বি. এসে হাজির। জিজ্ঞেস করল, "আপনার কি মিটিং হবে?" যুদ্ধের সময় এস. পি-র কাছ থেকে মিটিং-এর অনুমতি নিতে হতো। সেই মিটিং-এর চিঠি উল্লেখ করছিল। আমি রগড় করে বললাম, "আমি যদি উত্তর না দিই কী হবে?" বলল, "আপনার কিছু হবে না কিন্তু আমার খাওয়া-দাওয়ার জায়গা ঠিক নেই। থাকার জায়গা নেই। আমার খুব দুর্গতি হবে।" যাই হোক, ওর অনুরোধের পীড়নে, 'অবস্থার পরিবর্তনে মিটিং আর হবে না', এটা লিখে দিলাম।

বিজয়দা-টোগোদাদের আসতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। তাঁরা ময়না চৌধুরী প্রমুখ মোড়ল-গাঁয়ের কয়েকজন মাতব্বরশ্রেণীর ভদ্রলোকদের নিয়ে এসেছিলেন। টোগোদা ঢুকেই বললেন, "ইচ্ছা করেই এঁদের নিয়ে এলাম। এ গ্রাম থেকেও আজ রাত্রেই মোড়ল-গাঁয়ে নিয়ে যাব। এঁদের যাওয়া-আসা আবার শুরু করে যেতে হবে। যাওয়া-আসা চলতে থাকলে আপনিই শান্ত হয়ে যাবে।" ও গ্রামেও ওঁদের যেমন শুনতে হয়েছে, এ গ্রামেও সব কথা শুনতে হল। টোগোদা আমার কানে কানে একটা কথা বললেন, "দেখ, হিন্দুর ছেলে মসজিদে আঘাত করতে পারবে না। আমাদের হিন্দুরা

ঢেলার মধ্যে ভগবান আছে বলে পূজা করে। মুসলমানরা উল্টো। এরা মসজিদকে ইমারত ছাড়া কিছু মনে করে না। মামলাটা জোর করার জন্য এটা মুসলমানেরই করা হতে পারে।" আমি পরে জেনেছিলাম, টোগোদা-র কথাটাই সত্য। ঘটনাচক্রে পরের দিনই শুনলাম, আমি যখন এসে জমায়েতে পৌঁছেছিলাম তখন আমি না চিনলেও জমায়েতের অনেক লোক আমাকে চিনেছিল। তাদের মধ্যে কেউ পরামর্শ দিয়েছিল, "মসজিদে এখনই শাবল চালা। না হলে 'এ' (আমার নাম করে বলেছে) যখন এসেছে এখনই শান্তির কথা বলবে। মসজিদের কথা তুললে এরও মুখ বন্ধ হবে আর এতগুলো মানুষকে যে জমা করা হয়েছে তাদেরও গরম রাখা হবে।" কিন্তু মিটমাট করতে বসে কেন যে এমন গণ্ডগোল হল তার কৈফিয়তটা খুব পরিষ্কার হয়নি। টোগোদা-রা সেদিনই গয়েশপুরের কিছু লোককে মোড়ল-গাঁয়ে নিয়ে গেলেন এবং মেলামেশার ক্ষেত্র প্রস্তুত করে দিয়ে বর্ধমান ফিরে গেলেন। আমাকে কয়েকদিন থাকতে হল।

শান্তির পক্ষে শক্তি বৃদ্ধির জন্য গ্রামে গ্রামে ঘুরছি। এর মধ্যে একদিন পর মূলগাঁয়ের কাঙালীভাই-এর বাড়ি নেমন্তন্নে গেলাম। শান্তি-রক্ষার পক্ষে আলাপ-আলোচনা গ্রামের লোকদের সঙ্গে হল। নাস্তা করা হল, কিন্তু খাওয়া পর্যন্ত আর থাকা গেল না। মনে খুব দুঃখ হল, ঐ গ্রামে প্রথম গেছি অথচ নেমন্তন্ন রক্ষা করতে পারলাম না। তাছাড়া যাঁর আমি অতিথি, তাঁর প্রতি আমার তখন যথেষ্ট শ্রদ্ধা। গুলি-চালনায় যখন পুলিশ প্রস্তুত, আর দাঙ্গাবাজরাও যখন আমার পরোয়া করছে না, তখন তিনি আমার পাশে দাঁড়িয়ে শুধু সদিচ্ছা নয়, সৎসাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন। কিন্তু তাহলে উঠলাম কেন ? গয়েশপুর থেকে একজন লোক আমাকে ডাকতে এসেছিলেন। বললেন, অমরবাবু পুলিশ ইন্সপেক্টরের সাথে বসে সব মিটমাটের কথা হয়ে গেছে। আমাকে এখনই যেতে হবে। আমি গেলেই মিটমাট হয়ে যাবে। আমি বললাম, "বেশ তো, কথা হয়েছে, কাল হবে।" তিনি আবার বললেন, "সকলকে ডাকা হয়েছে, আপনিও যাবেন। একেবারে সব চুকে যাবে।" আশ্চর্য হয়ে গেলাম। বুঝলাম, গণ্ডগোলকে জিইয়ে রাখার জন্য কোন ফাঁদ পাতা হচ্ছে। কিন্তু সে রকম চক্রান্ত কিছু থাকলে তা ঠেকাতে হলেও না গিয়ে উপায় নেই। মুখের ভাত ছেড়ে দিয়ে রওনা হতে হল। প্রথমে ইন্সপেক্টারের কাছেই গেলাম। গিয়ে যা শুনলাম তাতে আমার মেজাজ আরো খারাপ হয়ে

গেল। ইন্সপেক্টরমহাশয়ের শর্ত হচ্ছে, মুসলমান মাতব্বরদের এলাকায় সমস্ত মুসলমানদের হয়ে লিখে দিতে হবে, পূজোর কয়েকটা দিন মুসলমানরা মেলাতলায় যাবে না। অমরবাবুকে জিজ্ঞেস করলাম, "এটা মিটমাটের শর্ত, না ভবিষ্যতে হাঙ্গামা চালিয়ে যাবার শর্ত? এখানকার মুসলমানরা বাইরের মুসলমানের হয়ে গ্যারাণ্টি দেবে কি করে? তাছাড়া মাতব্বর, সে হিন্দু গ্রামের হোক আর মুসলমান গ্রামের হোক, নিজের গ্রামেরই অপর লোকের কি গ্যারাণ্টি দিতে পারে? সুতরাং এটা মিটমাটের শর্তই নয়। মিটমাটের কোন শর্তের প্রয়োজন হয় না। তাছাড়া এ মেলার একটা ঐতিহ্য আছে। জাতি, ধর্ম, সম্প্রদায় নির্বিশেষে আনন্দ ও সম্প্রীতির সমাবেশ। একটা সাময়িক ঘটনা সম্প্রীতির ঐতিহ্যকে উড়িয়ে দেবে কেন? সম্প্রীতির ক্ষেত্র যদি লুপ্ত হয়, এখানকার মানুষের সংবুদ্ধির অভাবের জন্যই হবে। আমরা উপলক্ষ হব কেন? আমার দৃঢ় বিশ্বাস এখানকার মানুষের সংবুদ্ধির অভাব নেই। এখানকার মানুষ মিলেমিশে থাকতে জানে, থাকতে অভ্যস্ত এবং থাকতে পারবে। আপনার কর্তব্য পুলিশের যা কাজ। সুতরাং আপনি নিজের কাজ করে যান। আমি হালে বর্ধমান যাচ্ছি। আপনাকে এই ধরণের কাজে লিপ্ত করে গেছেন কিনা তা ডি. এস. পি বঙ্কিমবাবু এবং এস. পি-কে দেখা করে জিজ্ঞেস করব।" ভদ্রলোক খুব ঘাবড়ে গেলেন। কাচুমাচু করতে লাগলেন এবং এস. পি, ডি. এস. পি-কে না বলতে অনুরোধ করলেন। আমি বললাম, "আপনার যদি কোন প্রয়োজন হয় আপনি আমার সঙ্গে দেখা করবেন। আমাকে ডেকে পাঠাবার আপনার কোন অধিকার নেই। দরকার হলে এ্যারেস্ট করতে পারেন।" মোড়ল-গাঁয়ের বিশিষ্ট মাতব্বর ময়না চৌধুরী বসেছিলেন। তাঁকে বললাম, "আপনি বা এ অঞ্চলের যে-কোন অধিবাসী মিটমাটের জন্যে বা জনস্বার্থে অন্য কোন কাজে যখন ইচ্ছা আমাকে তলব দিতে পারেন--রাত্রি দু'টোয় হোক, চারটেয় হোক, যখন ইচ্ছা। কিন্তু পুলিশের নির্দেশে আমাকে ডাকবেন না।"

আর বেশী ডিটেল্‌স্-এ প্রয়োজন নেই।

চারিদিকে ঘুরে ভগবানপুরে সমর প্রমুখ স্নেহভাজনের সঙ্গে আলাপ করে মোটামুটি সাময়িক নিশ্চিন্ত পেয়ে বর্ধমান ফিরে এলাম। পুলিশ দু'পক্ষকেই আসামী করেছে। চোদ্দদিন অন্তর অন্তর তাদের আসতে হয়। হিন্দু মুসলমান উভয়ের সঙ্গেই দেখা হয়। আমার নিজের মনে বেশ উদ্বেগ হয়। আমিই তো পুলিশের কাছে বলতে বলেছি। দাঙ্গায় যদি খুনোখুনি

করতো সে দায়িত্ব তাদের নিজেরই। কিন্তু উভয় পক্ষের মানুষদের জেল হলে তাদের মনে তারা নিজেদের অপরাধকে দায়ী করবে না, দায়িত্ব চাপাবে আমার ঘাড়ে। তাছাড়া সব মিটমাট করে গুটোতে না পারলে, ব্যর্থতার গ্লানি একটা থেকেই যাবে। বর্ধমানে বিজয়দাকে আমার উদ্বেগের কথা বললাম। উনি বললেন, "ভাবছো কেন? ভাদ্রমাসটা আসতে দাও। দু'মাস ধরে চাষের ব্যাঘাতে ওরা উভয় পক্ষ মামলার ঝঞ্ঝাটে অতিষ্ঠ হয়ে উঠবে। মামলার খরচও তো আছে। সুতরাং উভয় পক্ষই মিটমাট করতে চাইবে। তখন মিটিয়ে দেবে।" শেষে ঘটলোও তাই। তাঁর অব্যর্থ বাণী সফল হল। শ্রীভোলা হাজরা একদিন আমায় বললেন, "আমার যে ডাবল্ দণ্ড হচ্ছে। এ পক্ষে আমাকে আসামী করেছে। এদের কাছে তো দণ্ড দিতেই হচ্ছে। সে উদ্দেশ্যেই তো আমাকে আসামী করানো। ওদিকে ওপক্ষেও আমাকে দিতে হচ্ছে। কারণ আমার ভাগচাষীরা সব আসামী।" সিজ্‌নের গোটু ঘোষাল বললেন, "কোনরকমে মিটিয়ে দেন মশায়, হয়রান হয়ে পড়েছি।" শেষে যোগ দিলেন, "আমাকে কমিউনিস্ট পার্টির মেম্বার করে নিন না।" মুসলমানদের মধ্যে অনেকেই, যেমন বস্তে গ্রামের মকসেদ মিঞা প্রমুখ কয়েকজন, প্রায়ই আমার সঙ্গে দেখা করে মিটমাটের জন্য বলতে শুরু করলেন। অনুকূল অবস্থা বিবেচনা করে আমি ও বিনয়দা ভগবানপুরে গেলাম। মিটমাটের কথাই যখন উদ্দেশ্য তখন আর-একজন কর্মী থাকা ভাল। তাছাড়া সংশ্লিষ্ট অঞ্চলেরই এক গ্রামে, সিহিগ্রামে বিনয়দার বাড়ি এবং মণ্ডলগ্রাম, ভগবানপুরে তাঁর অনেক আত্মীয়-স্বজন। সেখানে শ্রীভোলা হাজরার উদ্যোগে সমরদের বৈঠকখানায় উভয় পক্ষের প্রতিনিধি মিলে শর্তাবহীনভাবে মিটমাটের কথা স্থির হয়ে গেল। কেবল একটি অলিখিত শর্ত হল, যার দায়িত্ব আমার ঘাড়ে। আমাকে কথা দিতে হল, প্রত্যেকবার পূজোর সময় মোড়লগাঁয়ে আমাকে আসতে হবে। তাহলে, তাদের মতে, শান্তিতে কোন বিঘ্ন হবে না। শান্তির স্বার্থে অগত্যা আমাকে কথা দিতে হল। (বৎসর তিনেক আমি কথা রেখেছিলাম। কিন্তু এই তিন বৎসরই প্রত্যেকবার আমি উপস্থিত হলেই পুরনো দাঙ্গার কথাগুলি উঠে পড়ে এবং আলোচনা হতে থাকে। এই অভিজ্ঞতায় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের বুঝিয়ে বললাম, পূজোর সময় আমার আসাটা আর সমীচীন নয়। দাঙ্গার পুরনো অসুখকর কথাগুলো ভুলে যাওয়াই ভাল। আমার পূজোর সময় আসায় বরং তার উল্টোই হচ্ছে। এই বলে আমি অব্যাহতি নিলাম।)

এই মিটমাটের ব্যাপারেও আরো দু-চারটি কথা বলতে হয়। মিটমাট তখনও হয়নি, ইতিমধ্যে আগস্ট আন্দোলন শুরু হল। আগস্ট আন্দোলনের কর্মসূচী অনুযায়ী কিছু কিশোর ও যুবক কংগ্রেসকর্মী, যাঁরা দাঙ্গার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয় বরং তার বিরোধী, মণ্ডলগ্রাম পোস্ট-অফিসে আগুন দিয়ে দেন। যখন আমরা মিটমাটের ঠিক করলাম তখন মামলার স্তর অনেকদূর এগিয়ে গেছে। দু'টি মামলারই- হিন্দুর বিপক্ষে মুসলমানের মামলা, মুসলমানের বিপক্ষে হিন্দুর মামলা চার্জশীট দেওয়া হয়ে গেছে, কিছু শুনানিও হয়ে গেছে। উভয় পক্ষের মোক্তারের নিকট শুনলাম, পুলিশ যেভাবে কেস সাজিয়েছে এবং উভয় পক্ষেরই সাক্ষ্য এমনভাবে হয়েছে যাতে উভয় পক্ষের বেশীর ভাগ আসামীর জেল হবে। এই স্টেজে মিটমাট করে মামলা প্রত্যাহার করতে হলে কোর্টের অনুকূল অর্ডারের জন্য পুলিশেরও সম্মতির প্রয়োজন। গোড়ায় গোড়ায় আমি দেখেছিলাম এস পি-র অভিমত মিটমাটের অনুকূলে। উভয় পক্ষের মোক্তার ও প্রতিনিধিদের নিয়ে আমি এস পি.-র কাছে উপস্থিত। দেখলাম এস. পি.-র মনোভাব সম্পূর্ণ উল্টে গেছে। হেতু হল মোড়ল-গাঁয়ের পোস্ট-অফিস পোড়ানো। যাই হোক, আমি দেখলাম এক্ষেত্রে ঝগড়া বিবাদ করে কোন লাভ হবে না। সুতরাং, দু'টি ঘটনার পরস্পরের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই এটার উপরেই আমরা জোর দিলাম। শেষে অবশ্য সম্মতি পাওয়া গেল। যাই হোক, মিটমাট, মামলার প্রত্যাহার হয়ে গেল।

❑

সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে সাধারণ মানুষ

১৯৪২ সালের পূজো। বিজয়া দশমী কেটে গেল। সব শান্তিতেই কাটলো। মনে করলাম নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। কিন্তু শেষে দেখা গেল একটু ঝঞ্ঝাট ঘটেই পড়ছিল। লিখছি সেই ঝঞ্ঝাট ও তা মেটাবার কাহিনী।

বোধহয় বিজয়ার দিন-দুয়েক বাদ। সকালে ঘুম ভেঙ্গে হাত-মুখ ধুয়েই ডাক পেলাম, বাইরের লোক এসেছে। আমাদের একান্ত বন্ধু সন্তোষ খাঁ র নিকট হতে চিঠি এসেছে। বেরিয়ে দেখলাম, চেহারায় চিনলাম, সন্তোষ খাঁ যে ফার্মের ম্যানেজার তার এক তরুণ কর্মচারী। পত্র পড়লাম। সন্তোষ লিখেছেন, পত্র-বাহকের গ্রামে এক হিন্দু-মুসলমান বিরোধ হয়েছে। এর জন্য পুলিশ বিসর্জন আটক করেছে। মসজিদের সামনে বাজনার প্রশ্ন নিয়ে ঝগড়া। পুলিশকে খবর দেওয়ায় মসজিদের কাছে পুলিশ শোভাযাত্রাকে আটকিয়ে দিয়েছে। সুতরাং সেইখানে সব ঠাকুর যে যেখানে ছিল সেইখানে আটকিয়ে রয়ে গেছে। পুলিশের অনুমতি ও লাইসেন্স না হলে শোভাযাত্রা এখন আর বিসর্জন হতে পারছে না। গ্রামে এবং আশে-পাশে হিন্দু-মুসলমান উভয়ের এ নিয়ে প্রবল উত্তেজনা। সুতরাং আমাকে গিয়ে এর মিটমাট ও সমাধান করে দিয়ে আসতে হবে। গ্রাম হচ্ছে বিল্বগ্রাম। বনপাশ স্টেশনের পাশে। নটা সাড়ে-নটা সময়ের যে গাড়ি তাতেই যেতে হবে। রাজি হয়ে গেলাম। সন্তোষ লিখেছেন, "তুমি যেভাবে মিটিয়ে দেবে পত্র-বাহক এবং তাঁর পক্ষের সকলে তা যেন মেনে নেন।" খুব চিন্তিত হয়ে গেলাম। কারণ এ এলাকায় আমাদের কোন প্রভাব তখনও হয়নি। বাড়িতে আবার চা-টা খাচ্ছি, ইতিমধ্যে আর এক তলব। বেরিয়ে দেখলাম বিল্বগ্রামের একজন মুসলমান। তিনি পরিচয় দিলেন—গ্রামের মুসলমানদের মাতব্বর মাজেদ মিঞার তিনি পুত্র। তিনিও এক চিঠি এনেছেন। চিঠি প্রয়াত স্নেহভাজন কমু ইসরাইলের। তিনি নাট্য-সমাজের একজন কর্মী। ('সেতু' ও সত্যজিৎ রায়ের 'দেবী' ছবিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় তিনি নেমেছেন।) তাঁর বাড়ি পার্শ্ববর্তী গ্রাম 'ভোঁতা'য়। পূজোর ছুটিতে তিনি এসেছেন। তিনি লিখেছেন, "এ'দের ভালো করে বুঝিয়েছি। আপনি একবার ঐ গ্রামে আসুন। আপনি যেভাবে মিটিয়ে দেবেন তা তাঁরা মেনে নিতে রাজি হয়েছেন।" তাঁকে ব্যাপারটা জিজ্ঞেস করলাম। বুঝালাম, সামান্য জিনিস নিয়ে হাঙ্গামা করার কারণ কি? তিনি বললেন, "ইতিপূর্বে

ঠাকুর কখনও এপথে যায়নি। এখন ওনারা জোর করে মসজিদের সামনে দিয়ে নিয়ে যেতে চান।" আমি দেখলাম এখন কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। ঘটনাস্থলে গিয়ে সবারই সঙ্গে কথাবার্তা কয়ে মিটমাটের একটা সূত্র বার করতে হবে। দু'পক্ষই যখন আমার উপর ভার দিচ্ছেন এবং আমার কথায় রাজি হবেন বলে ভরসা দিচ্ছেন তখন সমাধানটা সহজসাধ্য হবে বলে মনে হল। সন্তোষ কিছু কথা লিখেছিলেন, তাতেও কিছু ভরসা পেয়েছিলাম। তাঁর পত্রবাহক সম্বন্ধে তিনি লিখেছিলেন, "পুরুষানুক্রম ধরে চলে আসছে বলে পত্রবাহক পূজা আনতে বাধ্য হন। কিন্তু এখন ব্যয়বহুল অবস্থায় কষ্টদায়ক। তাড়াতাড়ি বিসর্জন না হলে খরচ চলতে থাকবে। সুতরাং তাড়াতাড়ি বিসর্জন হতে পারলেই পত্রবাহকের পক্ষে ভাল।"

ওদের বিদেয় দিতে না দিতেই পুলিশের রেঞ্জ ইন্সপেক্টর অমরবাবু এসে উপস্থিত। তিনি আমার পূর্ব-পরিচিত। বললেন, "এই নিন্, আপনার আর এক কর্তব্য উপস্থিত হয়েছে।" বিল্বগ্রামের ঘটনার বিবরণ দিলেন, বললেন, "এস. পি. আপনাকে গিয়ে একটি মিটমাট করে দিতে অনুরোধ করেছেন। তিনি বলেছেন, আপনি যে শর্তে মিটমাট করে দেবেন সেই শর্তেই শোভাযাত্রার লাইসেন্স দেওয়া হবে।" শেষে তিনি আউশগ্রাম থানার দারোগা জনাব আলির এক চিঠি দিলেন। তিনিও আমার পূর্ব-পরিচিত। চিঠিতে তিনি জানিয়েছেন, তিনি ১০২-১০৩ জ্বর নিয়ে শান্তি বজায় রাখার কর্তব্যে নিযুক্ত আছেন। আমি যাতে শীঘ্র যাই ও বিসর্জনের ব্যবস্থাটা তাড়াতাড়ি করে দিয়ে আসতে পারি, তার জন্য বিশেষ অনুরোধ করেছেন। প্রসঙ্গত অমরবাবু বললেন, মিটমাটের কথাবার্তার সময় মুসলিম লীগের সম্পাদক ও হিন্দু-মহাসভার সম্পাদক উভয়ে উপস্থিত থাকতে চান। আমি বললাম, "আমি এখনই নটা সাড়ে-নটার গাড়িতে যাচ্ছি।"

আমি দেখলাম, মুসলিম লীগ এবং হিন্দু-মহাসভা যখন যাচ্ছে তখন ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদের প্রতিনিধি কংগ্রেসেরও মুখপাত্র থাকা উচিত। আমরাও তখন কংগ্রেসে আছি। কিন্তু আমি এক্ষেত্রে কর্তব্যে আহূত হয়েছি ব্যক্তিগত ভূমিকায়। সুতরাং কংগ্রেসের মুখপাত্রকে নিয়ে যাওয়া নিতান্ত দরকার। ঘটনাচক্রে একজন পার্টি-কর্মী সেই সময় আমার কাছে এসে পড়েন। সদর মহকুমা কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক কম্ অজিত সেনের বাড়ি শ্যামলালে অর্থাৎ পশ্চিমপ্রান্তে—আমার বাড়ি থেকে খানিকটা দূরে। উপরিউক্ত কমরেডের মাধ্যমে আমি তাঁকে পত্র দিলাম। চান-খাওয়া সেরে

নিয়ে তাড়াতাড়ি আমার কাছে আসতে বললাম। আমিও তাড়াতাড়ি চান-খাওয়া সেরে নিলাম। অজিত এলে উভয়ে আমরা রওনা হলাম। ট্রেনে যাবার সময় হিন্দু-মহাসভা ও মুসলিম লীগের সেক্রেটারির সঙ্গেও দেখা হল।

বনপাশ স্টেশন থেকে গ্রাম কাছেই। ঘটনাস্থলে পৌঁছাতে দেরী হল না। পুলিশ অফিসারের সঙ্গে দেখা হল। "কেমন আছেন?" জিজ্ঞেস করলাম। বললেন, "জ্বর এখনও ছাড়েনি তবে কমেছে। আপনি যদি কোনরকমে ফয়সালা করে আমার মুক্তি দিতে পারেন তাহলে ভাল হয়।" দেখলাম ঠাকুর তিনটি। একটি ছোট-আমার কাছে যিনি গিয়েছিলেন তাঁর ঠাকুর। একটি মাঝারি গোছের। এটি যাঁর ঠাকুর তাঁকে বেশ নিরীহ মনে হল। শেষেরটি খুব বড় ঠাকুর, খুব অবস্থাপন্ন ব্রাহ্মণের (অন্য দু'জনও ব্রাহ্মণ)। দেখলাম শেষোক্ত ভদ্রলোকেরই জেদ বেশী। গ্রামবাসীদের খুব উত্তেজিত দেখলাম না। হিন্দু-মুসলমান সকলকে দেখেই মনে হল অশান্তিতে তাঁরা সকলেই বিমর্ষ। কোন মতে শান্তি হলে খুশীই হবেন বলে মনে হল।

আমি প্রথমে হিন্দু-পক্ষের কর্তাকে (বড় ঠাকুরটি যাঁর) তাঁর অভিযোগ বলতে বললাম। তিনি বললেন, "আমাদের অভিযোগ সরল। জটিলতা কিছু নাই। আমাদের গ্রামে হিন্দু-মুসলমান উভয় পরবই বরাবর শান্তিতে হয়। বিসর্জনও নির্বিঘ্নে আনন্দের সঙ্গে সম্পন্ন হয়। এবারেই প্রথম বাধা হল।" মুসলমানদের মধ্যে সবচেয়ে অবস্থাপন্ন ও প্রধান মাজেদ মিঞার নাম উল্লেখ করে তিনি বললেন, "মাজেদই সব গ্রামের মুসলমানদের উত্তেজিত করে বিসর্জনের পথ রোধ করল।" এরপর মাজেদ মিঞা বললেন, "আমাদের মসজিদের সামনে দিয়ে বিসর্জনের শোভাযাত্রা কখনও যায়নি।" তিনি হিন্দুপক্ষের প্রবক্তাকে উল্লেখ করে বললেন, "উনিই গ্রামবাসীদের উত্তেজিত করে হঠাৎ এদিকে শোভাযাত্রা নিয়ে আসার ব্যবস্থা করলেন। ফলে আমরাও প্রতিরোধ করতে বাধ্য হলাম।" উভয় পক্ষের ক্ষেত্রেই আরও লম্বা-চওড়া কথা হয়ে থাকবে, তা মনেও নাই, তার প্রয়োজনও নাই।

আমি বললাম, "এই জায়গাটা সেটেলমেণ্টের ম্যাপের যে শীটে পড়ছে, সেই শীট একজন কারোর বাড়ি থেকে আমাকে এনে দিন। সঙ্গে সঙ্গে এই জায়গাটার পরচা যাঁর কাছে আছে, পরচাটাও এনে দিন।" আমি বিষয়টি মাত্র সামগ্রিকভাবে বোঝার জন্য এসব চেয়েছিলাম। কারণ গোড়া থেকেই আমার কেমন যেন মনে হচ্ছিল ব্যাপারটা ঠাকুরেরও নয়,

মসজিদেরও নয়। অন্য কিছু আছে. যা এলোপাথাড়ি কথা কইতে কইতে বার করতে হবে। কিন্তু দেখলাম ম্যাপ ও পরচা চেয়ে বোধহয় আসল জায়গাতেই ধাক্কা দিয়েছি। বড় ঠাকুরটির কর্তা ম্যাপ ও পরচার কথা উচ্চারণ করতেই উত্তেজিত হয়ে বলতে লাগলেন. "ম্যাপে কি হবে? ম্যাপের তো কোন প্রয়োজন নেই।" তিনি এই সুরে তর্ক করে যেতে লাগলেন। আমার তখন স্ট্রাইক করলো. ম্যাপে বোধহয় পথ থাকার কোন চিহ্ন নেই। আমি বললাম. "যে পথটা দিয়ে আপনারা যাবেন বলছেন. সেটা ম্যাপে একনজর দেখতে চাই।" এবারে মাজেদ মিঞা বলে উঠলেন. "ম্যাপে রাস্তার কোন চিহ্নই নাই। পরচাতেও কোন উল্লেখ নাই। আপনি দেখবেনটা কি? এখানে কখনই পথ ছিল না এবং নাই।" তখন মাঝারি সাইজের ঠাকুর বলে যেটা বর্ণনা করেছি তার মালিক. যিনি এতক্ষণ মুখ খোলেননি হঠাৎ মুখ খুলে বললেন, "এ জমিটা আমার আর মাজেদের। আমার ছয় আনা. মাজেদের দশ আনা। আমরা এখনও ভাগাভাগি করিনি। পড়ে আছে. গোরু-ছাগল চরে।" প্রথম যিনি শোভাযাত্রা যাওয়ার দাবী করছিলেন, তিনি প্রতিবাদ করলেন। বললেন. "গ্রামবাসী সবাই জানে আমাদের বরাবরকার পুরাতন পথ। ম্যাপে দশ ফুটের পথ উল্লেখ নাও থাকতে পারে। দশ ফুটের নীচে আট-ন' ফুটের হলে তো থাকেই না। সুতরাং ম্যাপ দেখে ফয়সালা হবে না।"

আমি বুঝলাম. উল্লিখিত প্রবক্তার আসল উদ্দেশ্য রাস্তার অধিকার অর্জন করা। মাজেদ মিঞারও উদ্দেশ্য তা রোধ করা। কিন্তু প্রথমে তিনি পথের ব্যাপারটা উল্লেখ করলেন না কেন? আন্দাজ করলাম. শুধু মাজেদ মিঞার সম্পত্তির স্বার্থ নিয়ে আপত্তি করলে তিনি সহজে অন্য মুসলমানদের পক্ষ করতে পারবেন না। সেই জন্যে মসজিদের সামনে বাজনা চলবে না এই সহজ পথটা গ্রহণ করলেন। আর অন্য একজন যাঁর ঠাকুরও আছে এবং জমিতে ছ' আনা অংশও আছে. তিনি হয়তো প্রধান কর্তার সঞ্চারিত জনমতের প্রাবল্যে চুপ করে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন। আজকে আমাদের সামনে সাহস পেয়ে উল্লেখ করলেন।

আমি পূর্বে উল্লেখ করতে ভুলেছি. ভোঁতা-র মঞ্জুর মিঞা এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। তাঁর মামলা-মোকদ্দমা নিয়ে টাউটগিরি করার দুর্নাম ছিল। আমি তাঁকে দেখেই গোড়া থেকেই সতর্ক থাকার সম্বন্ধে সজাগ ছিলাম। হঠাৎ মাঝে বলে উঠেছিলেন. "ঠিকই তো, ম্যাপের কি দরকার? এখানকার পথের কথা তো সবাই জানে।" বোঝা গেল, তিনি আগেই

মক্কেল পক্ষ ঠিক করে ফেলেছেন এবং সেই উদ্দেশ্যেই এসে হাজির হয়েছেন। তিনি তাঁর কথা বলতেই, আমি দারোগাকে বললাম, "ইনি এ গ্রামের নয়. ইনি কোন কথা বললে আমি উঠে চলে যাব।" মনে হল, দারোগা জনাব আলি খুশিই হলেন। তিনি মঞ্জুর মিঞাকে বললেন, "এখানকার লোক ও আমরা সবাই আপনাকে চিনি। আপনি গণ্ডগোল নিষ্পত্তির বদলে আরও পাকিয়ে তুলতে চান। আপনি আর একটি কথা বললে শান্তিভঙ্গের অভিযোগে আপনাকে গ্রেপ্তার করে বর্ধমান পাঠিয়ে দেব।" দারোগার এই ধমকে ভদ্রলোক ঠাণ্ডা হয়ে গেলেন।

ম্যাপ ও পরচায় যাঁরা ছ'আনা, দশ আনার মালিক তাঁদের কথাই সমর্থিত হল।

যান্ত্রিকভাবেও শেষ করা যেত। কিন্তু আমরা তো বুঝি, লোকের মনে রাজনৈতিক সমর্থন ও সায় না পেলে শান্তির কাজ সম্পূর্ণ হাসিল করা হল বলে মনে করা চলবে না।

আমি মাজেদ মিঞাকে বললাম, "এই জমিতে যাঁর ছ'আনা অংশ তাঁর ঠাকুর যাবার অধিকার আপনি কিছুতেই রোধ করতে পরতে পারেন না। আপনারা যখন ভাগ করে নিতে পারেননি তখন প্রতি ইঞ্চিতে ওঁর স্বত্ব আছে। বে-আইনী কাজ করা ছাড়া উনি যা ইচ্ছা করতে পারেন। ঠাকুর নিয়ে যাওয়া তো কোন বে-আইনী কাজ নয়। সুতরাং তিনি ঠাকুরকে নিয়ে বিসর্জনের শোভাযাত্রা করতে পারেন। তাতে আপনি বাধা দিতে পারেন না।"

এবার যিনি আমার কাছে সন্তোষের চিঠি নিয়ে গিয়েছিলেন, তাঁর ঠাকুরের সম্বন্ধে বললাম, "আমার একটি ঠাকুর আছে। আমি তার জন্য আপনারা দু'জন যাঁরা ছ'আনা, দশ আনার মালিক তাঁদের কাছে প্রার্থী।" উক্ত ভদ্রলোক (ছোট ঠাকুরটি যাঁর) আমাকে পূর্বেই বলেছিলেন, "অনুমতি পেলে আমি নিকটের পুকুরই বিসর্জন দেব। বেশী যোগাড়-আয়োজন করা আমার আর্থিক সামর্থ্যে নাই।" আমি ছ'আনা, দশ আনা মালিকের উদ্দেশ্য করে বললাম, "এই ঠাকুরটির জন্য আমি আপনাদের কাছে দরখাস্ত করছি। সেই দরখাস্তে আপনারা এবারকার মতো লিখিত অনুমতি দিন এবং এখানে প্রকাশ্যে সেই অনুমতি ঘোষণাও করুন। দরখাস্তে এও উল্লেখ থাকবে, বরাবরকার দাবী থাকছে না।" বোঝা গেল, ছ'আনার মালিক বেশ সন্তুষ্টই হয়েছেন। আমার কানে গেল, তিনিও বলছেন, "আমিও এবারকার মতো নিকটের পুকুরে বিসর্জন দিয়ে দেব।" বড় ঠাকুর যাঁর

তাঁকে এবার বললাম, "আপনি চানও নি এবং আমিও আপনার জন্য কোন দায়িত্ব নিতে পারছি না। সুতরাং আপনি বরাবর যেদিক দিয়ে বিসর্জন হতো সেদিক দিয়ে বিসর্জন দিন।" গ্রামের মানুষদের নীরবতা ও স্বল্প গুঞ্জরনে দেখলাম তাঁদেরও সমর্থন আছে। দুইটি ঠাকুর মসজিদের সামনে দিয়ে যাবে, তাতে দেখলাম মুসলমানদেরও কোন আপত্তি নেই। আশু-শান্তি প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনায় মুখে বলুন আর নাই বলুন, সবাই খুশী। তখন যিনি প্রথম থেকেই শোভাযাত্রার (বড় ঠাকুরটি যাঁর) দাবী করছিলেন তাঁকে বুঝিয়ে বললাম, "পথের অধিকার সাব্যস্ত করার জন্য ঠাকুর বিসর্জন অবলম্বন করাটা ঠিক ন্যায্য মনে হচ্ছে না। আপনি ভাল করে বিবেচনা করে দেখবেন, আপনি আমার সঙ্গে একমত হবেন। যদি পথের অধিকারটা নিতান্তই প্রয়োজন মনে করেন, জজকোর্টে সেটেলমেন্ট রেকর্ড সংশোধনের জন্য প্রার্থনা করে মামলা করুন।

তখন শান্তির আবহাওয়া বেশ এসে গেছে। উক্ত ভদ্রলোক তখন বললেন, "মাজেদকে জিজ্ঞেস করুন, মসজিদ তৈরি করতে তালের কাঁড়ি দিয়েছি আমি। আমাদের পাড়ার অন্যেরাও যে যেমন পারেন সমর্থন ও সাহায্য করেছেন।" মাজেদ মিঞা বললেন, "তোমরাই তো আমাদেরকে মসজিদ করতে উৎসাহ দিলে।" পূর্বোক্ত ভদ্রলোক বললেন, "গ্রামে মসজিদ ছিল না, তোমরা অন্য গাঁয়ে নামাজ পড়তে যেতে, তাতে আমাদের লজ্জা হতো। সেজন্যই তো বলেছিলাম।"

জনাব আলি বললেন, "তবে এই মর্মে শোভাযাত্রার লাইসেন্স লিখে দিই।" সকলেই সম্মত হলেন। ফয়সালা হয়ে গেল।

এবার পড়লো খাবার পালা। মুসলমান-মহল্লাতেও খাবার ব্যবস্থা হয়েছে, হিন্দু-মহল্লাতেও খাবার ব্যবস্থা হয়েছে। মুসলিম লীগের প্রতিনিধি এক মহল্লায় গেলেন ও হিন্দু-মহাসভার প্রতিনিধি অন্য মহল্লায় গেলেন। আমাকে ও অজিতকে উভয় পক্ষ টানাটানি করতে লাগলেন। শান্তি-প্রতিষ্ঠায় তখন সকলেরই খুব আনন্দ। শেষে আমরা দু'জন বলতে বাধ্য হলাম যে, আমরা দু' জায়গাতেই খাব। শেষে দু' জায়গাতেই আমাদের খেতে হল এবং সবারই আনন্দে অংশগ্রহণ করতে হল। তখনই ট্রেন ছিল, আমরা সবারই শুভ ইচ্ছা নিয়ে বিদায় নিলাম।

পরিশিষ্ট ৫ □ ইউনাইটেড বেঙ্গল মুভমেণ্ট, ১৯৪৭ : বর্ধমান পৌরসভায় সৈয়দ শাহেদুল্লাহ্‌র ভারত ও বঙ্গবিভাগ বিরোধী প্রস্তাব, ১৮. ৪. ৪৭.

(বর্ধমান পৌরসভার রেকর্ড থেকে)

OFFICE OF THE BURDWAN MUNICIPALITY

NOTICE

A Special Meeting of the Commissioners of Burdwan Municipal Corporation will be held in the Municipal Office on Friday the 18th April, 1947 at 5-30 P. M. according to requisition signed by eight Municipal Commissioners in accordance with the provisions of Section 78(1) of the B. M. Act, 1932 to consider and adopt the following resolution as proposed by them :

Sd/- P. Sarkar
Chairman,
Burdwan Municipality.

The proposed Resolution :

"The Commissioners of Burdwan Municipality consider that for the protection of life, property, religion and culture of the Hindu minority of Bengal as well as for maintenance of peace and tranquility among the two major communities, it has been essentially necessary that a distinct and separate province should be created in the West Bengal comprising the Burdwan, Rajshahi and Presidency Divisions including the City of Calcutta It is consequently resolved that the Government of India as also the members of the Constituent Assembly be requested to give immediate effect to the proposed scheme of forming a West Bengal province to be affiliated to the Federal Central Government of India.

Meeting of the Commissioners, 18. 4. 1987

Proposed by Mr. Basanta Kr. Maitra :

1. The Commissioners of Burdwan Municipal Corporation consider that for administrative, economic and political reasons a separate province comprising the Burdwan and

Presidency Divisions including the City of Calcutta and also the Districts of Rajshahi, Darjeeling & Jaipaiguri be immediately oreated to form a separate province within the All India Union. It is therefore resolved that the Vice-President, Govt. of India, President, Indian Constituent Assembly, the Govt. of India and the Secretary of State for India be requested to give immediate effect to the proposed scheme of partition of Bengal.

2. It is also resolved that till the proposed scheme of partition is fully effected, two separate legislative assemblies and ministries be formed under the same Governor for peaceful and harmonious administration of the province.

It is further resolved that the copy of this resolution be also sent to the Govt. of India, the Secretary of State for India, the Vice-President, Interim Govt. of India, for giving immediate effect to it.

Seconded by Mr. Jyotilal Mukherjee.

Proposed by Mr. Shahedullah :

This meeting of the Commissioners of Burdwan Municipality is opposed to both Pakistan and partition of Bengal.

(i) As this instead of solving communal problem will make it a permanent feature of our life.

(ii) As this will weaken the united offensive of the Hindus & Muslims against the British.

(iii) As this will perpetuate the British army, navy and airforce, the British Govt, and British Capital in India.

(iv) As this will disrupt the united srruggle of people against foreign and feudal exploiters.

This meeting emphatically demands

(i) a united Bengal in a free Indian Union of States.

(ii) Participation of Bengal in the Indian Union to be decided by free votes of all adult Bengalees.

(iii) Universal adult suffrage on the basis of joint electorate and proportional representation.

(iv) Immediate formation of a united ministry to execute abolition of all feudal exploitation and complete expropriation of British Capital.

This meeting therefore requests the Interim Govt. excluding British representatives

(a) To declare itself immediately as the free provisional Govt. of India.

(b) To force immediate withdrawal of British force and expropriation of British capital so that a sovereign constitution making body can proceed with constitution making basing on the people's will unhindered by any foreign interference or wire pulling.

Seconded by Mr. Ajit Roy

Amendment is put to vote

For the smendment :

1. Syed Sahedullah
2. Ajit Kr. Roy
3. Santosh Kr. Khan
4. Musa Mia

Against the amendment :

1. Amiya Prakash Nandey Vice-Chairman
2. Girindra Kr. Chatterjee
3. Srikumar Mitra
4. Durgaprasad Chatterjee
5. Basanta Kr. Maitra
6. Sankar Das Khanna
7. Dr. Rudranath Ghosh
8. Aswini Hazra
9. Civil Surgeon, Burdwan
10. Jyotilal Mukherjee
11. Santosh Kr. Bose

Pranabeswar Sarkar, Chairman, does not vote.

The amendment is lost.

The proposition is put to vote.

For—all present (including the Charman) except Ajit Kumar Roy, Syed Sahedullah. Santosh Kr. Khan, Musa Mia, who voted against the proposition.

The proposition is therefore carried.

Sd/- P. Sarkar
18. 4. 47

The Calcutta Gazette

Extraordinary
Published by Authority

TUESDAY, APRIL 12, 1949

PART I—Orders and Notifications by the Governor of West Bengal, the High Court, Government Treasury, etc.

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

HOME DEPARTMENT.

Press

ORDER.

No. 290 Pr.—12th April 1949.—Whereas in the opinion of the Governor the leaflet in Bengali entitled "Banchar Mata Majuri Chai—Chasher Janya Jami Chai—Kam Dame Nitya Prayojaniya Jinis Chai—Dabi Adayer Janya Dal Bandho—Sangram Kara", printed at Purnima Press, Burdwan, by Sri Sontosh Mandal and published by him, contains prejudicial report of the nature described in sub-section (4) of section 2 read with sub-clause (ii) of clause (a) of sub-section (7) of section 2 of the West Bengal Security Act, 1948 (Act III of 1948) ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by clause (e) of sub-section (1) of section 8 of the said Act, the Governor hereby declares to be forfeited to His Majesty all copies, wherever found, of the said leaflet and all other documents containing copies, reprints and translations of, or extracts from, the said leaflet.

By order of the Governor,
P. C. ACHARJI
Dy. Secy. to the Govt. of West Bengal

□

THURSDAY, APRIL 28, 1949

ORDER

No. 330 Pr.—28th April 1949.—Whereas in the opinion of the Governor, the leaflet in Bengali entitled "Jami Dakhale Rakha, Langal Jar Jami Tar, 8 Ghanta Poj—Saptahe 1 Din Chhuti O Majuri Briddhir Dabite—Banglar Grame Grame Bhag Chasi, Garib Chasi O Khet Majurer Larai" (Struggle of the poor peasants and agricultural labour in every village in Bengal on the demands of keeping the land in possession, land belongs to one who tills it, 8 hours' work a day, one day's recess in a week and increase in wages) circulated by the Ajay Anchalik Committee—Burdwan Zila Krishak Samity—Burdwan Zila Khet Majur Samity, printed at Ananda Press, Burdwan, and published by Sri Satya De, contains prejudicial report of the nature described in sub-section (4) of section 2 read with sub-clause (ii) of clause 'a) of sub-section (7) of section 2 of the West Bengal Security Act, 1948 (Act III of 1948);

Now, therefore, in exercise of the power conferred by clauses (d) and (e) of sub-section (1) of section 8 of the said Act, the Governor hereby prohibits the further publication, sale or distribution of the said leaflet, of any extract therefrom or of any translation thereof, and declares to be forfeited to His Majesty all copies, wherever found, of the said leaflet and all other documents containing copies, reprints and translations of, or extracts from the said leaflet.

By order of the Governor,
P. C. ACHARJI
Dy. Secy. to the Govt. of West Bengal

পরিশিষ্ট ৭ □ দামোদর ও অজয়ের বন্যা ১৯৫৬-১৯৫৯

সৈয়দ শাহেদুল্লাহ্

(নতুন চিঠি'র ২৬.১২.৮৭ ও ২.১.৮৮ সংখ্যায় প্রকাশিত)

১৯৫৬ সালের সেপ্টেম্বরের শেষে প্রবল বৃষ্টিপাত হয়। সারারাত ধরে ১২ ইঞ্চি জল হয়। বর্ধমান শহরে ভোরে উঠেই শুনি বাঁকা থেকে যে নালাটা শহরের মধ্য দিয়ে বাহির সর্বমঙ্গলা-রসিকপুর হয়ে উত্তর দিকে চলে গেছে, সেই নালায় বাঁকার জলের প্লাবন প্রবেশ করে শহরের নালার ধারের পাড়াগুলিকে প্লাবিত করেছে। প্লাবিত অংশগুলি দেখে তাড়াতাড়ি পার্টি অফিসে এলাম। দেখলাম বিভিন্ন পাড়া থেকে কর্মীরা এবং সাধারণ মানুষ এসেছেন ও আসছেন। আমি তাঁদের সঙ্গে কাজের কথা আরম্ভ করবার আগেই জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে একটা চিঠির খসড়া করলাম। কম্ বিশু সেন সেটা তখনই টাইপ করে ডি. এম.-এর কাছে পৌঁছে দিলেন। ঐ চিঠিতে তাঁকে আমি শহরের অবস্থা জানালাম এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা সতর্কবাণী দিলাম যে, বাঁকার অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে, বাঁকা ও খড়ির সঙ্গম-স্থলের নিকট নাদনঘাটে সন্ধ্যা নাগাদ অবস্থা কঠিন হবে। পূর্বাহ্লেই তার জন্য ব্যবস্থার উদ্যোগ নিতে হবে। বস্তুতঃ সেদিন নাদনঘাটে ঐ অবস্থা ঘটেছিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই খবর এসে পড়ল অজয়, কুনুরের প্রবল বন্যা হয়ে গুসকরা প্লাবিত। অনেক ঘর ডুবেছে ও ডুবছে। অনেক ঘর পড়ে গেছে। কম্ মহবুব জাহেদীর ঘর এর অন্যতম। মানুষকে আশ্রয়ের জন্য ছুটাছুটি করতে হচ্ছে। কাটোয়াতেও অনুরূপ অবস্থা। কম্ সুবোধ চৌধুরী সে সময় কাটোয়াতেই ছিলেন। খবর পেলাম তিনি এবং পার্টির কর্মীরা উদ্ধার কাজে নেমেছেন। দু-একটা নৌকা যা পেয়েছেন কাজে লাগিয়েছেন। তাছাড়া সাঁতার কেটেও মানুষকে রিলিফ পৌঁছে দিতে হচ্ছে।

বর্ধমান শহরে ব্যাপক কিছু ক্ষতি হয়নি কিন্তু বাঁকা ও নালার প্লাবনে কিছু এলাকা বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। সকালেই এইসব এলাকায় সাহায্যের জন্য কার্যক্রম ঠিক করা হয়। কর্মীরা কাজে নেমে পড়েন। এইভাবে সারা দিনটাই সকল কর্মীকেই কর্মব্যস্ততায় কাটাতে হয়। সন্ধ্যার সময় এইভাবে কর্মরত আছি, এমন সময় দু'টি সংবাদ প্রায় একসঙ্গে অফিসে পৌঁছাল। নিজের বাড়ি থেকে খবর পেলাম কম্ আব্দুর রাজ্জাক খাঁ

(তিনি তখন এম. পি.) এবং কম্‌ মনোরঞ্জন রায় আসানসোল এলাকা থেকে কলকাতা মোটরে ফেরার পথে গ্র্যাণ্ড ট্র্যাঙ্ক রোডে বন্যায় প্রতিহত হয়ে আমাদের বাড়ি এসে উঠেছেন। আমি জানিয়ে দিলাম, তাঁরা বিশ্রাম নিন পরে দেখা করবো। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এলেন সাব্‌ডিভিশনাল্‌ পাবলিসিটি অফিসার আব্দুর রহমান—আমার আত্মীয়। তাঁর বাড়ি গুসকরার কাছেই প্লাবিত কাঁটাটিকুড়ি। তিনি খবর দিলেন অজয়, কুনুরের বন্যায় বন্যাগ্রস্ত এলাকার মানুষের প্রাণও বিপন্ন। তাঁদের উদ্ধার করে অপেক্ষাকৃত কম বিপন্ন বা নিরাপদ স্থানে পৌঁছাতে নৌকার একান্ত প্রয়োজন। প্রসঙ্গত, এই আশঙ্কাতেই ১৯৪৩ সালের বন্যা 'রিলিফ কমিটি' যে নৌকাগুলি কিনেছিলেন তা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য জেলা বোর্ডকে দিয়েছিলেন। দুঃখের বিষয়, যত্নের অভাবে সেগুলি নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল দেখে বছর চার-পাঁচের মধ্যেই জেলা বোর্ড সেগুলি বিক্রী করে দেন। এখন এই বিপদে নৌকা কোথায় পাওয়া যায়? উক্ত অফিসার জানালেন, পানাগড়ে অর্ডনান্স ডিপোতে মিলিটারীর প্রয়োজনের জন্য নৌকা সুরক্ষিত আছে। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কিছু নৌকা দিতে মিলিটারী কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করেন, কিন্তু তাঁরা অস্বীকার করেছেন। রহমান সাহেব বললেন "আপনারা চেষ্টা করে দেখুন। যদি এগুলি পাওয়া যায় তাহলে অনেক বিপন্ন মানুষকে উদ্ধার করা সম্ভব হবে।" আমার মাথায় চট করে এক বুদ্ধি খেলল। তখনও টেলিফোনে এত বিভ্রাট হয়নি। টেলিফোনের মাধ্যমে কোনরকমে ফোর্ট উইলিয়ামে যোগাযোগ করলাম। স্বয়ং ইস্টার্ন কমাণ্ডের কর্তাকে চাইলাম। নিজের পরিচয় দিলাম আব্দুর রাজ্জাক খাঁ এম পি.। নিজে কিভাবে কলকাতা ফিরতে বন্যার দ্বারা আটকিয়ে গেছি বললাম। আর বললাম বন্যাগ্রস্ত এলাকায় ভয়াবহ অবস্থার কথা। "বিপন্ন মানুষের প্রাণ বাঁচাবার জন্য নৌকার দরকার এবং আপনাদের নৌকা কোনরকমে দিতেই হবে"। তিনি বললেন, "এসব নৌকা দেশ রক্ষার প্রয়োজনে আচম্বিত দরকার হলে ব্যবহৃত হবে বলে রক্ষিত আছে। এগুলি যদি আপনারা সাধারণ সিভিল পারপাসে ব্যবহারের জন্য টানা-হ্যাঁচড়া করেন তাহলে এগুলি নষ্ট হবে, দেশ রক্ষার কাজে প্রয়োজন মুহূর্তে আর পাওয়া যাবে না।" বললাম, "বন্যাগ্রস্ত এলাকার পাশেই আপনাদের ডিপো। সুতরাং এরকম কণ্টিন্‌জেন্সির জন্য আপনাদের প্রস্তুত থাকতে হয়। আপনি গভর্ণমেণ্টের কাছে এরকম ব্যবস্থার দাবি করবেন।" "আমরাও এ সম্বন্ধে বলবো।" যাই হোক, অনেক কষ্টে তাঁকে বুঝিয়ে-সুজিয়ে রাজি করলাম।

তিনি বললেন, "কাল ভোরে ছ'টার মধ্যে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের বাংলোয় চালকসহ কয়েকটা নৌকো পৌঁছে দেওয়া হবে।" এই নৌকা গুসকরা ও কাটোয়া অঞ্চলে পাঠানো হয়। সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীন হলেও এগুলি শেষ পর্যন্ত ত্রাণকার্যে আমাদের কর্মীদের দ্বারাই ব্যবহৃত হয়। বাড়ি এসে আব্দুর রাজ্জাক খাঁ সাহেবকে বললাম, "একটা পাপ করেছি। আপনার নাম পরিচয় ব্যবহার করে একটা কাজ উদ্ধার করেছি।" উল্লিখিত ক্ষেত্রে এতে কেউ দোষ ধরবেন না। তবুও বলবো পদ্ধতিটা ঠিক নয়।

রিলিফ ইত্যাদির কাজে পার্টির কর্মীরা অকাতর পরিশ্রম করতে থাকেন। কম্‌ মহবুব জাহেদীর মতো অনেকেরই নিজের ঘর পর্যন্ত পড়ে গিয়েছিল। এর জন্য ভবিষ্যতে তাঁরা কি করবেন মুহূর্তের জন্য তা চিন্তা না করে অন্য বিপদগ্রস্ত মানুষদের সাহায্যের জন্য নিরন্তর চেষ্টা করে গেছেন।

এইবার কিভাবে দেশব্যাপী জনমতকে ডি. ভি. সি. পরিকল্পনার ত্রুটির নতুন বিপদ জনগণের ঘাড়ে এসে চেপেছে তা জানানো যায় তার কথা আমরা ভাবতে লাগলাম। নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ না থাকায় আমরা একটি বিষয় জানতেই পারিনি। সরকার 'পাবলিক এনকোয়ারি কমিটি' গঠন করেনি। একটা সরকারী তদন্ত কমিটি করেছিল, তার নিকট আইন সভার সদস্যরা তাঁদের বক্তব্য রাখতে পারেন—এরকম নির্দেশ আইনসভার সদস্যদের জানিয়েছিল। আমরা যাঁরা আইনসভার সদস্য নই তাঁরা জানতে না পারায় ১৯৫৬ সালের সরকারী তদন্ত কমিটির কাছে আমাদের কোন নিবেদন রাখতে পারিনি। আকাশের বৃষ্টি ছাড়া রিজার্ভয়ারে আটকে রাখা জল ছেড়ে দিয়ে এই বিধ্বংসী প্লাবনের সৃষ্টি করা হয়েছিল। এই তথ্যটাকে চাপা দেবার জন্যে কেন্দ্রীয় সরকার এবং পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস গভর্ণমেণ্ট সব রকম চেষ্টা করেছিল, যার ফলে এই সত্যটুকু চাপা পড়ে যায়। ইতিমধ্যে কয়েকমাস বাদে কেন্দ্রীয় সরকার 'হেভিফ্ল্যাড এনকোয়ারি কমিটি' গঠন করেন। সংবাদপত্রে এই ঘোষণা দেখে আমরা উক্ত তদন্ত কমিটির কাছে এক স্মারকলিপি দিই। দামোদরের রিজার্ভয়ার থেকে জল ছাড়ার ফলেই এইরূপ শোচনীয় প্লাবন হয়েছিল, এই বক্তব্য রাখি এবং বন্যাগ্রস্ত এলাকার মানুষের সাধারণ অভিজ্ঞতা থেকে তথ্য সমাবেশ করে এই বক্তব্যের উপর জোর দিয়েছিলাম।

১৯৫৬ সালে একই বিপদের পুনরাবৃত্তি হয়। বন্যার কয়েকদিন পূর্বে আমি কোন কাজে বোলপুরে গিয়েছিলাম। ফেরার পথে ভেদিয়া পার হবার পরই দুর্গাপুর ব্রাঞ্চ ক্যানেলের অবস্থা দেখে শঙ্কিত হই। তখনই জল ক্যানেলের বাঁধের প্রায় কানায় প্রবহমান দেখলাম। এরপর যদি কোন কারণেই জল ছাড়া হয় তাহলে বিরাট বন্যার সৃষ্টি হবে এরকম আশঙ্কা করলাম। বর্ধমান পার্টি অফিস পৌঁছেই কম্ বিনয় চৌধুরীর নামে সেচ মন্ত্রী অজয় মুখার্জীকে এক পত্র দিলাম। তাতে বন্যা আশঙ্কা করে পূর্বাহ্ণে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বললাম। অজয়বাবুর একটি সৎগুণ ছিল, পত্রে নির্দেশিত বা প্রার্থিত কাজের কিছু করুন বা নাই করুন, পত্র পেলেই তার প্রাপ্তি স্বীকার করতেন। বন্যার পর আমাদের ঐ চিঠি ও তার প্রাপ্তি-স্বীকার উভয়ই স্বাধীনতা পত্রিকায় (আমাদের তখনকার দৈনিক পত্রিকা) প্রকাশ করে দিয়েছিলাম।

বন্যায় আমাদের কর্মীদের অকাতর রিলিফের কাজকর্মের কথা এখানে লেখার আর চেষ্টা করছি না। এবারের বন্যাতেও গুসকরা ও আউসগ্রাম এলাকা, কাটোয়া মহকুমার কাটোয়া ও মঙ্গলকোট থানার বিস্তৃত এলাকা, কালনার এক বড় অংশ, সদরের বাঁকার দুই পাশ প্লাবিত হয়। ময়ূরাক্ষীর মোহনা থেকে শুরু করে দক্ষিণে কালনা পর্যন্ত গঙ্গায় চাপ সৃষ্টি হয়ে গঙ্গা পূর্ব দিকে উপচে পড়ে নদীয়ার এক বড় এলাকা ভাসিয়ে দেয়। এইবার আমরা ভালভাবে তদন্তে সরকারকে বাধ্য করার জন্য কোমর বেঁধে লেগে পড়ি। সরকার 'মানসিং এনকোয়ারি কমিটি' গঠন করেন। আমরা এক মুহূর্ত অপব্যয় না করে এই কমিটিকে 'পাবলিক এনকোয়ারি কমিটি' করার দাবি করি। কম্ জ্যোতি বসু এক বিবৃতি দেন। সেই বিবৃতিতে তিনি দাবি করেন যে, এই কমিটিতে জনগণের বক্তব্য উপস্থিত করার অধিকার ও সুযোগ দিতে হবে। তিনি বলেন, ব্যক্তিগতভাবে অনেক লোক বন্যার হেতু সম্বন্ধে পড়াশুনা করেছেন এবং ওয়াকিবহাল হয়েছেন। শুধু গণ-সংগঠন নয়, তাঁদেরও বক্তব্য উপস্থিত করার সুযোগ দিতে হবে। কম্ জ্যোতি বসুর বিবৃতি কলকাতায় সমস্ত সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। অগত্যা সরকার 'মানসিং এনকোয়ারি কমিটি'-কে 'পাবলিক এনকোয়ারি কমিটি' ঘোষণা করে। সংবাদপত্রে এও প্রকাশিত হয় যে, 'মানসিং এনকোয়ারি কমিটি' বন্যাগ্রস্ত জেলাগুলিতে যাবেন এবং জন-প্রতিনিধিদের তাঁদের সঙ্গে দেখা করার সুযোগ দেবেন।

আমি তখন বর্ধমান জেলা কৃষক সমিতির তরফ থেকে স্মারক-লিপি দেওয়ার জন্য খসড়া তৈরি করতে থাকি। একটা সুবিধা ইতিমধ্যে হয়েছিল। আমরা 'কুণ্ডার কমিটি'-র রিপোর্ট গোপনে সংগ্রহ করতে পেরেছিলাম। এই রিপোর্টে জল ছাড়ার ঘটনা পরিষ্কার করে উল্লিখিত হয়। স্মারক-লিপি তৈরি করে ফেলি। স্মারক-লিপি ভাল করে টাইপ করানো হয়।

'মানসিং তদন্ত কমিটি' নির্দিষ্ট তারিখে বর্ধমানে উপস্থিত হন। সরকারী এবং বে-সরকারী প্রতিনিধিগণ নির্ধারিত সময়ে, নির্ধারিত স্থানে উপস্থিত হন এবং একে একে বক্তব্য পেশ করেন। স্বতন্ত্র দু-একজন ছিলেন। বাকী ছিলেন সরকারী কর্মচারীরা, যথা সেচ বিভাগের কর্মচারী ও প্রশাসনের তরফ থেকে কালনা, কাটোয়া ও বর্ধমান সদরের এস ডি. ও.। শ্রীনারায়ণ চৌধুরীর নেতৃত্বে কয়েকজন কংগ্রেস প্রতিনিধি ছিলেন। শ্রীদাশরথি তা-এর দলেরও কিছু প্রতিনিধি ছিলেন। আমাদের তরফ থেকে উপস্থিত ছিলেন বিনয়দা ও আমি। অন্যেরা সাধারণত বলেন শুধু ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের দুর্ভোগ ও দুর্দশার কথা। আমি আমার সমগ্র স্মারক-লিপি পাঠ করি। স্মারকলিপিতে যা ছিল তার সারমর্ম নীচে দিলাম ঃ

সেচ ইত্যাদির উদ্দেশ্য এই বলে লোকের মধ্যে প্রচার থাকলেও ডি. ভি. সি.-র প্রধান লক্ষ্য ঘোষণা করা হয় বন্যা নিয়ন্ত্রণ। যদি বলা যায় তাঁদের বন্যা-নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে, তাহলে সামান্য কিছু বলতে বাকী রয়ে যাবে। ১৯৪৩ সালে বন্যার ফলে রেল লাইন উড়ে গিয়ে উত্তর-পশ্চিম ভারতের সঙ্গে যোগাযোগ নষ্ট হয়ে যায়। সুতরাং যখন বলা হচ্ছিল বন্যা নিয়ন্ত্রণ, তখন সেই নিয়ন্ত্রণ অত্যন্ত সীমিতরূপেই দেখা হচ্ছিল। লক্ষ্য ছিল শুধু রেল লাইনকে বাঁচাতে হবে। তাই নদীর বাঁ দিকে ও ডান-দিকে নতুন ক্যানেল খনন করে বা প্রসারিত করে দামোদরের জলকে রেল লাইন থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে।

প্রথম ত্রিশ দশকের গোড়ায় রণ্ডিয়া থেকে যে ক্যানেল খনন করা হয় তার পরিকল্পনা ছিল অ্যাডম্‌স উইলিয়মস্‌-এর। অ্যাডম্‌স উইলিয়মস্‌ তাঁর পরিকল্পনা রচনায় প্রথমেই দেখিয়ে দেন, সেচের জন্য যে পরিমাণ জল নেবেন তাঁর পরিকল্পনায় তা সহজেই নিষ্কাশিত হওয়ার ব্যবস্থা আছে। সেচ অন্তে যে সামান্য জল থাকবে তা শেষে বাঁকা ও খড়ি দিয়ে খুব সহজেই প্রবাহিত হয়ে যাবে। বন্যার কোন সঙ্কট সৃষ্টি করবে না। ডি. ভি. সি. পরিকল্পনার চরিত্র হচ্ছে এর বিপরীত। এত জল যে দামোদর থেকে নেওয়া

হবে তার নিষ্কাশন-ব্যবস্থার কোন কথাই রচয়িতা সামনে রাখেন নি। এদিকে পরিকল্পনার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ উপরের দিকে মূল কয়েকটি বাঁধ (dam) কার্যকরী করার সময় বাদ দেওয়া হয়। ফলে যে যে স্তরে যতটা জল আটকিয়ে রাখার কথা তা আটক রাখা হয়। শেষে বৃষ্টিপাত সাধারণ মাত্রার বেশী হলেই বিপদের আশঙ্কা হয়। বিপদ কি ? ড্যামের ক্ষমতার সীমার বাইরে জল আটকিয়ে রাখবার চেষ্টা করলে ড্যাম ভেঙ্গে গিয়ে জলপ্রবাহ দু-পাশের ব্যাপক এলাকার জনপদ ধ্বংস করে দিয়ে বেরিয়ে যাবে। সেইজন্য ডি.ভি.সি বিপদের শঙ্কা বুঝলেই ড্যাম খুলে জল ছাড়তে শুরু করে। তাতে আসানসোল, দুর্গাপুর, বর্ধমান শহর ধ্বংস থেকে রক্ষা পায় বটে, যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিন্ন হয় না। কিন্তু রেল লাইন থেকে কিছু দূরে বন্যা গ্রামগুলিতে ধ্বংস-সাধন করে। ১৯৫৬ ও ১৯৫৭ সালে গুসকরা, কাটোয়া ও নদীয়ায় এই কারণেই বন্যা হয়। দক্ষিণ দিকে আমতা পর্যন্ত এই কারণেই বান হয়। উপরের দিকে স্রোতধারার বপু থাকে কম, অর্থাৎ ভর থাকে কম ও গতিও থাকে কম। ফলে ছোট ছোট বাঁধে তাকে আটকানো যায়। নীচের দিকে সমস্ত স্রোতধারা মিলিত হয়ে বিপুলাকার ধারণ করে। গতি হয় বেশী। এই হেতু জল আটকের ড্যাম হতে হয় বড় বড়। উপরের ড্যাম বাদ দিয়ে থাকলে নীচের ড্যাম সহজেই বিপন্ন হয়। রেল লাইন থেকে জল সরিয়ে দেবার স্বার্থে নদীর দু দিকের ক্যানেলের জল ছেড়ে দেওয়া হয়। সেচের পরিবর্তে তাদের নিষ্কাশনের কাজে লাগানো হয়।

গুসকরা, কাটোয়া, মঙ্গলকোট প্রভৃতির বিপদের কারণ বুঝতে হলে নদীর বাঁ-দিকে দুর্গাপুর ব্রাঞ্চ ক্যানেল ও পানাগড় ব্রাঞ্চ ক্যানেলের মানচিত্রের দিকে নজর দিতে হবে। এই এলাকা পূর্বেই অজয় নদীর প্লাবনে ক্ষতিগ্রস্ত হত। সেই বন্যা নিয়ন্ত্রণ হবে কোথায়, উল্টে দামোদরের জলরাশি দুর্গাপুর ব্রাঞ্চ ক্যানেল ও পানাগড় ব্রাঞ্চ ক্যানেলের মাধ্যমে সেই এলাকায় প্রবেশ করানো হল। দুর্গাপুর ব্রাঞ্চ ক্যানেল ১৪ এ বি সি শাখার মাধ্যমে মঙ্গল-কোট ও কাটোয়া এলাকায় জল দেওয়া হয়। সাধারণ সময়ে সেচের ব্যবস্থায় এ জল কাজে লাগে এ কথা সত্য, কিন্তু বৃষ্টিপাতে মাত্রায় কিছু আধিক্য হলে, বিশেষ করে এই ক্যানেলগুলিতে ড্যাম থেকে জল ছাড়লে, বিস্তৃত এলাকায় সমূহ বিপদ ঘটে। উচিত ছিল অজয়ের জলেই অজয়ের পার্শ্ববর্তী এলাকায় সেচ ব্যবস্থা গ্রহণ করা। কিন্তু তার পরিবর্তে বন্যাগ্রস্ত এলাকায় দামোদরের জল দুর্গাপুর ও পানাগড় ব্রাঞ্চ ক্যানেলের মাধ্যমে বিপন্ন এলাকায় নিয়ে আসা হয়। প্রয়োজন ক্ষেত্রে নিষ্কাশনের ব্যবস্থা কি হবে তা দেখা হয়

না। সুতরাং উপরের দিকে ড্যামগ্নলি বাদ দিয়ে এইভাবে নীচের দিকে বিপদ বাড়িয়ে তোলা হয়েছে।

আরও অনেক কিছু বিস্তৃতভাবে স্মারক-লিপিতে বলা হয়। কিভাবে এক একটি এলাকা বন্যাক্রান্ত হয় তার একটা ছবি ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়। সরকারী কর্মচারীরা আমাদের বক্তব্যে সায় দেন। ফলে আমাদের বক্তব্যই সকলের বক্তব্য হিসাবে প্রতিভাত হয়। আমরা দাবী করি ড্যাম খুলে জল ছাড়ার ব্যাপারটা গোপন রাখার চেষ্টা করা চলবে না। বিপদের আশঙ্কা সম্বন্ধে মানুষকে অবহিত করা ডি. ভি. সি.-র নৈতিক কর্তব্য। (আর কিছু না হোক অন্ততঃ এইটুকু সফল হয়েছে ঃ ১৯৫৯ সালের পর থেকে জল ছাড়ার সংবাদ ঘোষণা করা হয়)। পরে কমিউনিস্ট পার্টির তরফ থেকে কম্ বিনয় চৌধুরী 'মানসিং কমিটি'-কে স্মারকলিপি দেন।

পরিশিষ্ট ৮ □ নির্বাচনী তথ্য (১) ঃ

অবিভক্ত বাংলার আইনসভা (১৯৩৭-৪৭) ও পশ্চিমবঙ্গ আইনসভা (১৯৪৭-৫২)-তে বর্ধমান জেলার প্রতিনিধি।

১৯৩৫ সালের ভারতশাসন আইন অনুযায়ী বাংলার আইনসভার মোট আসন ছিল ২৫০। আসনের ভাগ ছিল নিম্নরূপ ঃ

সাধারণ	— ৭৮	বাণিজ্য, শিল্প, খনি ও	
(তপশিলী-৩০)		বাগিচা থেকে	— ১৯
মুসলমান	— ১১৭	জমিদার	— ৫
অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান	— ৩	শ্রমিক	— ৮
ইউরোপীয়ান	— ১১	বিশ্ববিদ্যালয়	— ২
ভারতীয় খৃষ্টান	— ২	মহিলা	— ৫

এর মধ্যে বর্ধমান জেলার সাধারণ আসন সংখ্যা ছিল ৪ ঃ বর্ধমান সেন্ট্রাল ২ ও বর্ধমান উত্তর-পশ্চিম ২। মুসলমান আসন ছিল ১। আর জমিদার আসনও ছিল ১।

বাংলার আইনসভা (১৯৩৭-১৯৪৫)

মোট আসন—২৫০

পার্টিগত অবস্থান

কংগ্রেস	— ৫৪	হিন্দু-মহাসভা	— ২
ন্যাশনালিস্ট	— ৩	স্বতন্ত্র মুসলিম	— ৪২
মুসলিম লীগ	— ৪০	স্বতন্ত্র হিন্দু	— ৩৭
কৃষক-প্রজা পার্টি	— ৩৫	অন্যান্য	— ৩২
ত্রিপুরা কৃষক পার্টি	— ৫		

বর্ধমান জেলা থেকে নির্বাচিত প্রতিনিধি

বর্ধমান সেন্ট্রাল	ঃ উদয়চাঁদ মহতাব □ অদ্বৈতকুমার মাঝি
বর্ধমান উত্তর-পশ্চিম	ঃ প্রমথনাথ ব্যানার্জী □ বঙ্কুবিহারী মণ্ডল
মুসলমান	ঃ মৌলভী আবুল হাসেম
জমিদার	ঃ জ্যোতিষপ্রসাদ সিংহ রায়/পরে, তারক মুখার্জী

বাংলার আইনসভা, ১৯৪৬

মোট আসন—২৫০

পার্টিগত অবস্থান

কংগ্রেস	— ৮৬	স্বতন্ত্র মুসলমান	— ৯
মুসলিম লীগ	— ১১৩	স্বতন্ত্র হিন্দু	— ১৩
সি. পি. আই.	— ৩	অন্যান্য	— ২৫
হিন্দু-মহাসভা	— ১		

বর্ধমান জেলা থেকে নির্বাচিত প্রতিনিধি

বর্ধমান সেন্ট্রাল	ঃ	কানাইলাল দাস ☐ যাদবেন্দ্রনাথ পাঁজা
বর্ধমান উত্তর-পশ্চিম	ঃ	বঙ্কুবিহারী মণ্ডল ☐ আনন্দপ্রসাদ মণ্ডল
মুসলমান	ঃ	আবুল হাসেম
জমিদার	ঃ	উদয়চাঁদ মহতাব

পশ্চিমবঙ্গ আইনসভা (১৯৪৭-১৯৫১)

আসনের ভাগ পরিবর্তিত হয় নিম্নরূপ ঃ

মোট আসন—৯০

সাধারণ	— ৪৪	জমিদার	— ২
(তপশিলী-১৪)		বিশ্ববিদ্যালয়	— ১
মুসলমান	— ২১	শ্রমিক	— ৮
অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান	— ৩	মহিলা	— ৩
ভারতীয় খৃষ্টান	— ১		
বাণিজ্য, শিল্প, খনি ও বাগিচা	— ৭		

বর্ধমান জেলা থেকে নির্বাচিত প্রতিনিধি

বর্ধমান সেন্ট্রাল	ঃ	কানাইলাল দাস ☐ যাদবেন্দ্রনাথ পাঁজা
বর্ধমান উত্তর-পশ্চিম	ঃ	বঙ্কুবিহারী মণ্ডল ☐ আনন্দপ্রসাদ মণ্ডল
মুসলমান	ঃ	আবুল হাসেম, পরে, ডঃ মহম্মদ হোসেন
জমিদার	ঃ	উদয়চাঁদ মহতাব

সূত্র ঃ Election Recorder Dilip Banerjee

পরিশিষ্ট ৯ □ নির্বাচনী তথ্য (২) ঃ

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা (১৯৫২-৬৭) ও বর্ধমান জেলার প্রতিনিধিত্ব।

প্রথম বিধানসভা নির্বাচন, ১৯৫২

মোট আসন ঃ ২৩৮+২ (মনোনীত)=২৪০

বর্ধমান জেলার মোট আসন ঃ ২০ □ কেন্দ্র ঃ ১৪ □

সংরক্ষিত (তপশিলী) ঃ ৬

এক আসনবিশিষ্ট কেন্দ্র ঃ বর্ধমান, খণ্ডঘোষ, কাটোয়া, মন্তেশ্বর, পূর্বস্থলী,
৮টি মঙ্গলকোট, কেতুগ্রাম ও আসানসোল।

দুই আসনবিশিষ্ট কেন্দ্র ঃ রায়না, গলসী, আউসগ্রাম, কালনা, রাণীগঞ্জ ও
(একটি তপশিলী আসন) কুলটি।
৬টি

কংগ্রেসের বিরুদ্ধে দু'টি বামপন্থী জোট লড়াই করে ঃ

১। United Socialist Organisation (USO) Communist Alliance—C. P. I., Forward Block (FB), Socialist Republication Party (SBP), Bolshevik Party (BP), I. N. A. ও কিছু নির্দল নিয়ে গঠিত। প্রাপ্ত আসন—৪১।

২। People's United Socialist Front (PUSF)—Forward Block-Ruikar / Subhasist (FBR), Socialist Party (SP), R. C. P. I. (Tagore) ও R. S. P.। প্রাপ্ত আসন—১।

এছাড়া প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ছিল কৃষক-মজদুর-প্রজা পার্টি (KMPP)—১৯৫৩ সালে Praja Socialist Party (PSP)-র অন্তর্ভুক্ত হয়। (পরে FBR-ও হয়)। প্রাপ্ত আসন—১৫। জনসঙ্ঘ (JS)—৯, হিন্দু-মহাসভা (HM)—৪, SUC—১ ও নির্দল—১৬।

□

দ্বিতীয় বিধানসভা নির্বাচন, ১৯৫৭

মোট আসন : ২৫২+৪ (মনোনীত)=২৫৬

বর্ধমান জেলায় মোট আসন : ২১ □ কেন্দ্র : ১৫ □

সংরক্ষিত (তপশিলী) : ৬

এক আসনবিশিষ্ট কেন্দ্র : বর্ধমান, কাটোয়া, আউসগ্রাম, ভাতাড়, মন্তেশ্বর,
৯টি পূর্বস্থলী, আসানসোল, কুলটি ও হীরাপুর।

দুই আসনবিশিষ্ট কেন্দ্র : রায়না, গলসী, কালনা, কেতুগ্রাম, অণ্ডাল ও
(একটি তপশিলী আসন) জামুড়িয়া।
৬টি

* খণ্ডঘোষ কেন্দ্রটি অবলুপ্ত হয়। রাণীগঞ্জ কেন্দ্রের বদলে অণ্ডাল নামাঙ্কিত কেন্দ্রটি আসে। মঙ্গলকোট কেন্দ্র অবলুপ্ত হয়ে কেতুগ্রাম দুই আসনবিশিষ্ট হয়। দুই আসনের নতুন কেন্দ্র হয় জামুড়িয়া। দুই আসনযুক্ত আউসগ্রাম ভেঙে আউসগ্রাম ও ভাতাড় এবং কুলটি ভেঙে কুলটি ও হীরাপুর—এই চারটি এক আসনের কেন্দ্র তৈরি হয়।

কংগ্রেসের বিরুদ্ধে দু'টি বামজোট লড়াই করে :

১। United Left Election Committee (ULEC)—CPI, RSP, PSP, FB, FB Marxist (FBM) ও কিছু নির্দল নিয়ে গঠিত। প্রাপ্ত আসন—৮৫।

২। United Left Front (ULF)—SUC, BP, Democratic Vanguard ও Republican Party (RP) নিয়ে গঠিত। প্রাপ্ত আসন—২।

এছাড়া RCPI (Tagore), JS ও HM মিলে United Democratic People's Front (UDPF) নামে লড়াই করে। কোন আসন পায় না। পুরুলিয়ার সংযুক্তিকরণের ফলে লোকসেবক সঙ্ঘ (LSS) ৭টি আসন পায়। দার্জিলিং-এ গোর্খা লীগ (GL) পায় ১টি আসন।

□

তৃতীয় বিধানসভা নির্বাচন, ১৯৬২

মোট আসন ঃ ২৫২+৪ (মনোনীত)=২৫৬

(সমস্ত কেন্দ্রকেই এক আসনবিশিষ্ট করা হয়।)

বর্ধমান জেলায় মোট কেন্দ্র/আসন ঃ ২১ ☐ সংরক্ষিত তপশিলী ঃ ৬

হীরাপুর, আসানসোল, কুলটি, বরাবনী, জামুড়িয়া (তপঃ), রাণীগঞ্জ (তপঃ), দুর্গাপুর, আউসগ্রাম, ভাতাড়, গলসী (তপঃ), খণ্ডঘোষ, বর্ধমান, রায়না, জামালপুর (তপঃ), মেমারী (তপঃ), কালনা মন্তেশ্বর, পূর্বস্থলী, কাটোয়া, মঙ্গলকোট (তপঃ) ও কেতুগ্রাম।

* রাণীগঞ্জ, খণ্ডঘোষ ও মঙ্গলকোট কেন্দ্রের প্রত্যাবর্তন ঘটে। নতুন কেন্দ্র আসে ঃ দুর্গাপুর, বরাবনী, মেমারী ও জামালপুর।

কংগ্রেসের বিরুদ্ধে একটিই বামজোট লড়াই করে ঃ United Left Front (ULF) যাতে থাকে CPI, FB, FBM, RSP, RCPI, BP ও কিছু নির্দল। প্রাপ্ত আসন—৭৭।

১৯৬৩ সালে CPI ভেঙে যাওয়ায় ১২ জন সদস্য একটি স্বতন্ত্র CPI ব্লক তৈরি করে।

অন্যান্য অ-কংগ্রেসী সদস্য ঃ PSP—৫, LSS—৪, গোর্খা লীগ—২ ও নির্দল—৪।

☐

চতুর্থ বিধানসভা নির্বাচন, ১৯৬৭

মোট আসন ঃ ২৮০+৪ (মনোনীত)=২৮৪

বর্ধমান জেলায় মোট কেন্দ্র/আসন ঃ ২৫ ☐ সংরক্ষিত (তপঃ) ঃ ৬

হীরাপুর, কুলটি, বরাবনী, আসানসোল, রাণীগঞ্জ, জামুড়িয়া (তপঃ), উখড়া (তপঃ), দুর্গাপুর, ফরিদপুর, আউসগ্রাম (তপঃ), ভাতাড়, গলসী, বর্ধমান উত্তর, বর্ধমান দক্ষিণ, খণ্ডঘোষ (তপঃ), রায়না, জামালপুর (তপঃ), মেমারী, কালনা, নাদনঘাট, মন্তেশ্বর, পূর্বস্থলী, কাটোয়া, মঙ্গলকোট ও কেতুগ্রাম (তপঃ)।

* বর্ধমান নামে দু'টি কেন্দ্র হয়—বর্ধমান উত্তর ও বর্ধমান দক্ষিণ। অন্য নতুন কেন্দ্রগুলি হোল ঃ উখড়া, ফরিদপুর ও নাদনঘাট। রানীগঞ্জ, মেমারী, গলসী ও মঙ্গলকোটকে সংরক্ষণমুক্ত করে উখড়া, আউসগ্রাম, খণ্ডঘোষ ও কেতুগ্রামকে সংরক্ষিত করা হয়।

কংগ্রেসের বিরুদ্ধে লড়াই করে দু'টি ফ্রন্ট :

১। United Leftist Front (ULF)—CPI(M), RSP, SSP, SUC, WPI, FBM, RCPI ও কিছু নির্দল নিয়ে গঠিত। প্রাপ্ত আসন—৬৮।

২। People's United Left Front (PULF)—CPI, Bangla Congress (BC), FB, BP ও নির্দল নিয়ে গঠিত। প্রাপ্ত আসন—৬৫।

অন্যান্য দল : PSP—৭, LSS—৫, GL—২, JS—১, Swatantra—১, IND—৩।

নির্বাচনের পর ULF ও PULF একত্রিত হয়ে United Front গঠন করে ও কয়েকজন নির্দল সহযোগে প্রথম UF সরকার গঠন করে।

□

১৯৭৭ সালে বর্ধমানের কেন্দ্র/আসন সংখ্যা বেড়ে হয় ২৬। দুর্গাপুর-১ ও দুর্গাপুর-২—একটি দুর্গাপুর কেন্দ্রের বদলে দু'টি হয়। ফরিদপুর কেন্দ্র অবলুপ্ত হয়। সংরক্ষিত কেন্দ্র হিসেবে কাঁকসা তৈরি হয়। জামুড়িয়াকে সংরক্ষণমুক্ত করা হয়।

এই ব্যবস্থাই এখন পর্যন্ত চলছে।

বর্ধমান জেলায় কেন্দ্রভিত্তিক বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল, ১৯৫২-৬৭

১ সাল (প্রার্থী সংখ্যা) মোট/প্রদত্ত ভোট [জোড়া আসনে ** চিহ্ন, বন্ধনীতে নির্বাচক সংখ্যা]	২ বিজয়ী প্রার্থী/দল প্রাপ্ত ভোট	৩ উল্লেখযোগ্য পরাজিত প্রার্থী/দল প্রাপ্ত ভোট
বর্ধমান □ বর্ধমান দক্ষিণ-১৯৬৭ থেকে		
১৯৫২ (৪) ৫৩,১৯২/২২,৪৬২	বিনয়কৃষ্ণ চৌধুরী CPI ১১,৪৩৯	উদয়চাঁদ মহতাব Cong ৯,৪৭৭ শ্রীকুমার মিত্র HM ১,২৩০
১৯৫৭ (৩) ৬৭,৬১২/৩১,৯২৫	বিনয়কৃষ্ণ চৌধুরী CPI ১৫,৫২৯	নারায়ণ চৌধুরী Cong ১৫,১৩৬
১৯৬২ (৪) ১,০২,৪৮০/৫২,৭১৯	রাধারাণী মহতাব Cong ৩৪,৫৯০	বিনয়কৃষ্ণ চৌধুরী CPI ১৫,৯৪১
উপনির্বাচন, ২৩. ১২. ৬৩	বিনয়কৃষ্ণ চৌধুরী	অরুণা মুখার্জী Cong
১৯৬৭ (৩) ৮২,২৭৪/৪৬,৫৫৭	শশীভূষণ চৌধুরী Cong ১৯,৯৩৬	বিনয়কৃষ্ণ চৌধুরী CPI(M) ১৮,২২৬ অসীমকুমার ঘোষ IND ৫,৪৫৬
বর্ধমান উত্তর (১৯৬৭ সালে গঠিত)		
১৯৬৭ (৩) ৭১,২৬৮/৪৫,৪১৮	সৈয়দ শাহেদুল্লাহ্ CPI(M) ২০,৬৩১	গুরুগোবিন্দ বসু Cong ১৭,৮১৯ দেবরঞ্জন সেন FB ৪,০৭৩

১	২	৩
	খণ্ডঘোষ	
১৯৫২ (৬) ৫০,৪৯০/১৭,৬১১	মহম্মদ হোসেন Cong ৬,৫১৫	অম্বুজাভূষণ বসু IND ৫,৫৩২ প্রণবেশ্বর সরকার IND ৩,১৮৬

১৯৫৭ সালে কেন্দ্রটির অবলুপ্তি ঘটে। রায়নার জোড়া আসনের কেন্দ্রটিই শুধু থাকে। ১৯৬২-তে রায়নাকে এক আসনবিশিষ্ট করে খণ্ডঘোষ কেন্দ্রটিকে ফিরিয়ে আনা হয়।

১	২	৩
১৯৬২ (৭) ৬৩,২১২/৩০,৪২৫	জহরলাল ব্যানার্জী Cong ১৪,৮৬৭	ফকিরচন্দ্র রায় IND ৫,৩২৬
১৯৬৭ তপঃ (৩) ৬৫,৩৩৮/৩৩,৩৯৬	প্রমথ ধীবর Cong ১৩,৫৪৮	গোবর্ধন পাকড়ে SSP ১২,১৪৯ তারাপদ মল্লিক FB ৪,৩৯০
	রায়না	
১৯৫২ ** (১১) (১,০২,৬৬৬) ২,০৫,৩২২/৭৩,৯৬৬	মৃত্যুঞ্জয় প্রামাণিক KMPP ১৫,৬৫৭ দাশরথি তা KMPP ১৫,০৮০	গোবর্ধন পাকড়ে Cong ১৫,০৬৪ নিত্যানন্দ সিংহরায় Cong ১৪.৮৫০
১৯৫৭ ** (৪) (১,০৮,৯১৭) ২.১৭,৮৩৪/১,১২,৪১৬	দাশরথি তা PSP ৩১,২৪৫ গোবর্ধন পাকড়ে PSP ২৯,৭৪০	কিষণলাল তা Cong ২৬,০৫০ মৃত্যুঞ্জয় প্রামাণিক Cong ২৫,৩৮১
১৯৬২ (৩) ৭২,৫৪৮/৪৩,০৩১	প্রবোধকুমার গুহ Cong ২৭,১৯১	দাশরথি তা PSP ১২,৫৮৪
১৯৬৭ (৪ ৭০,৮৯১/৪৪,৭৭৪	দাশরথি তা PSP ১৫.৩২৪	প্রবোধ গুহ Cong ১৪,৫৫৬ গোকুলানন্দ রায় CPI(M) ৯.৪৮১
	জামালপুর ১৯৬২ সালে প্রথম গঠিত	
১৯৬২ তপঃ (২) ৬০,৭৩৯/৩০.৪১২	মৃত্যুঞ্জয় প্রামাণিক Cong ২২,৫১৩	রাধাকান্ত মালিক PSP ৬,৬৭৬
উপনির্বাচন, ৮.৪ ৬৩	পুরঞ্জয় প্রামাণিক	

১	২	৩
	কাটোয়া	
১৯৫২ (৭) ৫৭,৪৪৯/২৮,৫৮৮	সুবোধ চৌধুরী CPI ১০,০৩৫	বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় Cong ৭,৯৬৫
১৯৫৭ (৩) ৬৫,২১৪/৩৭,০২২	তারাপদ চৌধুরী Cong ২০,১০২	সুবোধ চৌধুরী CPI ১৫,৭৯৯
১৯৬২ (২) ৭৬,৬২৭/৪৪,৭৩৫	সুবোধ চৌধুরী CPI ২৪,৪৭৭	নিত্যানন্দ ঠাকুর Cong ১৮,৬১২
১৯৬৭ (৪) ৭৪,৪৪৫/৪৪,৯০১	সুবোধ চৌধুরী CPI(M) ২০,৮৭০	তারাপদ ব্যানার্জী Cong ২০,২৬৩
	কালনা	
১৯৫২ ** (১০) (১,০৬,৫০৪) ২,১৩,০০৮/৯৩,৯১৩	বৈদ্যনাথ সাঁওতাল Cong ২০,১২০ রাসবিহারী সেন ১৮,৩৯০	জমাদার মাঝি CPI ১৮,০৭০ আনন্দগোপাল কুমার KMPP ১৭,৪৫৩
১৯৫৭ ** (৭) (১,২৭,৭১৬) ২,৫৫,৪৩২/১,২৭,১৪৫	হরেকৃষ্ণ কোঙার CPI ৩২,৯৯৬ জমাদার মাঝি CPI ৩২,০৪৩	রাসবিহারী সেন Cong ২২,০৮৪ বৈদ্যনাথ মাঝি Cong ২৬,৯০০
১৯৬২ (৩) ৭৭,৯১৮/৪৭,১৮৮	হরেকৃষ্ণ কোঙার CPI ২৩,৯২৪	দেবেন্দ্রবিজয় ঘোষ Cong ২০,২২২
১৯৬৭ (৪) ৬৯,৪৭১/৪৮,৭৫৪	হরেকৃষ্ণ কোঙার CPI(M) ২২,১২৬	দেবেন্দ্রবিজয় ঘোষ Cong ২০,৮৭৭
	মেমারী	
১৯৬২ তপঃ (২) ৭৪,৫০৩/৩৫,৯৯০	সুচাঁদ সোরেন CPI ১৭,১২৯	বৈদ্যনাথ মাঝি Cong ১৭,০০৪
১৯৬৭ (৪) ৭৩,৩১৩/৫০,১২৬	পরমানন্দ বিষয়ী Cong ২৩,১০১	বিনয়কৃষ্ণ কোঙার CPI(M) ২২,২১৭

১	২	৩
	আউসগ্রাম	
১৯৫২ ** (১৪) (১,০৭,৪৮১) ২,১৪,৯৬২/৬৮,০৫৫	কানাইলাল দাস Cong ১৭,৬৯৩ আনন্দগোপাল মুখার্জী Cong ১৬,৩৩৫	পারুলবালা দেবী KMPP ৪,০৪৫ অতুলচন্দ্র সাহা KMPP ৩,৩৩২ ধীরেন্দ্রনাথ রায় FBS ৬,৫৬৮ অনুজাকুমার চ্যাটার্জী IND ৫,২০৩
১৯৫৭ (৪) ৬০,২০৬ ২৩,০৩৫	কানাইলাল দাস Cong ১০,৪০৩	ধীরেন্দ্রনাথ রায় FBM ৪,৮৪০
১৯৬২ (৫) ৭১,৭৪৬/৩০,৮১৮	মনোরঞ্জন বক্সী IND ৮,৭০০	লাবণ্যগোপাল ঘটক Cong ৮,১৩১ দেবরঞ্জন সেন FB ৪,৩২৪ অনুজা চ্যাটার্জী IND ৬,৩৩৭
১৯৬৭ তপঃ (৩) ৭৪,৭৬৮/৩৭,১০৩	কৃষ্ণচন্দ্র হালদার CPI(M) ১৭,৯৩৪	কানাইলাল দাস Cong ১৩,৪০১
	গলসী	
১৯৫২ ** (৭) (১,০২,৬১৭) ২,০৫,২৩৪/৭৩,৯৫৯	যাদবেন্দ্রনাথ পাঁজা Cong ১৭,৭৯৯ মহীতোষ সাহা Cong ১৬,৯১১	কৃষ্ণচন্দ্র হালদার CPI ১৪,১১২ ফকিরচন্দ্র রায় IND ১৪,১৮৩
১৯৫৭ ** (৬) (১,২৩,৭২৭) ২,৪৭,৪৫৪/৯৯,৮২৬	ফকিরচন্দ্র রায় IND ২৮,৩৮০ প্রমথনাথ ধীবর FBM ২০,৪৪৫	মহম্মদ হোসেন Cong ১১,৭৭০ মহীতোষ সাহা Cong ২০,৪৪৪
১৯৬২ তপঃ (২) ৭০,২০৪/২৯,৯১৭	কানাইলাল দাস Cong ১৫,৫৯১	প্রমথনাথ ধীবর FB ১২,৭৮৩
১৯৬৭ (৩) ৬৮,০৫৯,৪১,৯৫১	ফকিরচন্দ্র রায় IND ২১,৭৪৯	লোকমান মল্লিক Cong ১৩,১৪৩

১	২	৩
	ভাতাড় ১৯৫৭ সালে প্রথম গঠিত।	
১৯৫৭ (৪) ৬৮,৯৮৩/৩০,৯৮০	আভালতা কুণ্ডু Cong ১৪,৯২২	সুন্দরগোপাল মিত্র PSP ১০,২৭৪
১৯৬২ (৩) ৮২,৫৪৫/৪০,৯৫০	অশ্বিনী রায় CPI ২১,৩০১	শরদিন্দুশেখর গুপ্ত Cong ১৫,৪০৭ সুন্দরগোপাল মিত্র SBP ১,৭৬৬
১৯৬৭ (৩) ৬৫,৩৮৫/৩৫,৫৭৫	শান্তিময় হাজরা Cong ১২,২৯১	অশ্বিনী রায় CPI ১১,৬৩৮ রাধাগোবিন্দ দত্ত IND ৮,২৮১
	মন্তেশ্বর	
১৯৫২ (২) ৫২,৮৯৭/২৯,৫৭৬	আনন্দপ্রসাদ মণ্ডল Cong ১৫,৫২৬	সিদ্ধেশ্বর চৌধুরী KMPP ১৪,০৫০
১৯৫৭ (৩) ৬০,৭০৮/২৮,৬২৮	ভক্তচন্দ্র রায় IND ১২,৯০০	কালীপদ হাজরাচৌধুরী FBM ৩,১৬৬ আনন্দপ্রসাদ মণ্ডল Cong ১২,৫৬২
১৯৬২ (২) ৭৩,৫২৬/৪১,৭৫০	মনসুর হবিবুল্লাহ্ CPI ২০,০৩৩	নারায়ণচন্দ্র চৌধুরী Cong ১৯,৫৬১
১৯৬৭ (৩) ৭০,৯৫২/৪৭,৫৮১	নারায়ণচন্দ্র চৌধুরী Cong ২৫,৬৩১	মনসুর হবিবুল্লাহ্ CPI(M) ১৬,৮৬৭
	নাদনঘাট ১৯৬৭ সালে প্রথম গঠিত	
১৯৬৭ (৩) ৭০,২২৩/৫২,৭৭০	পরেশচন্দ্র গোস্বামী Cong ২৬,০২৫	সুবোধচন্দ্র ভাওয়াল CPI(M) ২১,০৭০
	কেতুগ্রাম	
১৯৫২ (৬) ৫৪,৭১১/৩১,০২৩	তারাপদ ব্যানার্জী HM ১১,৬০৬	এ. কাশিম Cong ১১,৫০৭ বৈদ্যনাথ মণ্ডল KMPP ১,৮৬৪ শ্যামরঞ্জন চ্যাটার্জী FBM ১,৭৫৮

১	২	৩
১৯৫৭ ** (৭) (১,২৩,৯৭০) ২,৪৭,৯৪০/১,১৬,৬৭২	আবদুস সাত্তার Cong ৩১,৮৪৫ শংকর দাস Cong ৩৫,৬৯৯	জ্যোতিষচন্দ্র সিংহ CPI ১৩,৩৫০ রাধাশ্যাম সাহা CPI ১৫,৪৫৬ তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় HM ১০,৭৫৬ নগেন্দ্রনাথ হালদার HM ৬,৫০২
১৯৬২ (৪) ৬৭,৭৯৬/৩৮,৩১৮	শ্রীমোহন ঠাকুর CPI ১৩,৪৩১	আবদুস সাত্তার Cong ৮,২২২
১৯৬৭ তপঃ (২) ৭৬,৩২৪/৪১, ২৩৯	প্রভাকর মণ্ডল Cong ২০,৬১১	নারায়ণদাস দাস CPI(M) ১৮,৬১৪

মঙ্গলকোট

১৯৫২ (৬) ৫৪,৯৯৯/২২,৩৩৮	ভক্তচন্দ্র রায় Cong ৮,৯০৭	শৈলেশচন্দ্র ব্যানার্জী IND ৭,২৮৭

১৯৫৭ সালে কেন্দ্রটির অবলুপ্তি ঘটিয়ে কেতুগ্রামকে দুই আসনবিশিষ্ট করা হয়। ১৯৬২ সালে আবার কেতুগ্রামকে এক আসনবিশিষ্ট করে কেন্দ্রটিকে ফিরিয়ে আনা হয়।

১৯৬২ তপঃ (২) ৭৩,৫৯৯/৩৫,০১৬	নারায়ণদাস দাস CPI ১৮,২৪৪	শংকর দাস Cong ১৫,৫৩৩
১৯৬৭ (২) ৭০,০৫৯/৩৭,৯৩৫	নূরুন্নেসা সাত্তার Cong ১৮,৯৯৬	শিবশংকর চৌধুরী CPI(M) ১৭,২৪১

পূর্বস্থলী

১৯৫২ (৪) ৫০,৬৫৯/২৪,৬০৭	বিমলানন্দ তর্কতীর্থ Cong ১৪,০১০	গোপেনকৃষ্ণ কুণ্ডু FBM ২,০৪৯ মনোরঞ্জন সেন JS ৬,৬৪৭
১৯৫৭ (২) ৫৮,৯৪২/৩৩,১৯৪	বিমলানন্দ তর্কতীর্থ Cong ১৮,৭০৪	সুবোধচন্দ্র ভাওয়াল CPI ১৪,৪৯০
১৯৬২ (৩) ৭৪,৯৫১/৪৪,৩৫৩	বিমলানন্দ তর্কতীর্থ Cong ২১.৯২৫	সুবোধচন্দ্র ভাওয়াল CPI ১৯,৩০৯
১৯৬৭ (৫) ৭০,৫৯৭ ৪৭,৭ :১	ললিত হাজরা CPI(M) ২১.১০৮	রমা দেবী Cong ১৯.৪১৮

১	২	৩
	আসানসোল	
১৯৫২ (৬) ৫৩,৮৯৬/১৯,৭৬৪	অতীন্দ্রনাথ বসু FBR ৭,৯২৪	যোগেন্দ্রনাথ রায় Cong ৫,০৩৯
১৯৫৭ (৫) ৫৯,৯৬৯/২৩,৩০২	শিবদাস ঘটক Cong ১০,৫৭০	বিজয় পাল CPI ৯,১৯১
১৯৬২ (৪) ৭০,৭৭৫/৩১,১০৬	বিজয় পাল CPI ১৩,১৪১	শিবদাস ঘটক Cong ৮,৩২৬
১৯৬৭ (৫) ৬৯,৩২০/৩৯,৪১৩	গোপীকারঞ্জন মিত্র Cong ১৭,০৬৫	বামাপদ মুখার্জী CPI(M) ১২,৮৭১
	বরাবণী ১৯৬২ সালে প্রথম গঠিত	
১৯৬২ (৩) ৬৫.৬৩৪/২৩,৬১৮	হরিদাস চক্রবর্তী CPI ৯,৪৮৩	রামকৃষ্ণ রায় Cong ৮ ২২২ নলিনাক্ষ রায় PSP ৪,৬২১
	হীরাপুর ১৯৬২ সালে প্রথম গঠিত	
১৯৬২ (৪) ৬১,১৯৬/২৮,৬৯২	গোপিকারঞ্জন মিত্র Cong ১৩,৭৯৩	চন্দ্রশেখর মুখার্জী CPI ৯,৮৬৮ বেনারসীপ্রসাদ ঝা PSP ৩,৪৬৪
	কুলটি	
১৯৫২ ** (১৫) (১,০২,২০২) ২,০৪,৪০৪/৬২,২০৩	বৈদ্যনাথ মণ্ডল Cong ১৩,৭৩২ জয়নারায়ণ শর্মা Cong ৯,৭৮৬	দেবেন সেন KMPP ৫,২২৪
১৯৫৭ (৬) ৪০.১২৭/১৭.৮৮৬	বেনারসীপ্রসাদ ঝা PSP ৮,৭৫৪	জয়নারায়ণ শর্মা Cong ৫,০৮৩
১৯৬২ ৫) ৪১,৫০৬/২১.৪৫৪	জয়নারায়ণ শর্মা Cong ৮,০৫৫	তাহের হোসেন CPI ৬,০২৫

১	২	৩

জামুড়িয়া

১৯৫৭ সালে জোড়া আসনবিশিষ্ট কেন্দ্র হিসেবে প্রথম গঠিত

১৯৫৭ ** (১০) (৯৮.৭৩৫) ১.৯৭.৪৭০/৫৯.১০০	অমরেন্দ্র মণ্ডল PSP ১২.৬৮১ বৈদ্যনাথ মণ্ডল Cong ১২.৭০১	উমাপদ চট্টোপাধ্যায় PSP ৯.৮৪৯ বিমানবিহারীলাল সিংহ Cong ১০.১৫৭
১৯৬২ তপঃ (৩) ৬২.৬০০/২১.১৫৩	অমরেন্দ্র মণ্ডল Cong ১১.৪০৩	রজনীকান্ত দাস FB ১.৭৭৬ তিনকড়ি মণ্ডল PSP ৬.৬০৭
১৯৬৭ তপঃ (৩) ৪৮.৬৫৭/২৫,৪২২	তিনকড়ি মণ্ডল SSP ১২.৮৬১	অমরেন্দ্র মণ্ডল Cong ১০,৩০৬

উখড়া

১৯৬৭ সালে প্রথম গঠিত

১৯৬৭ তপঃ (৩) ৬৬.১২৬/৩৭.২৫৯	হারাধন মণ্ডল Cong ১৬.২৪৭	লক্ষ্মণ বাগ্দী CPI(M) ১৩.৯৫৫ দেবদত্ত মণ্ডল B Cong ৪.৪২২

রাণীগঞ্জ

১৯৫২ ** (১১) (৯৯.২৬৮) ১.৯৯.২৫৬/৭২.৫৮১	বঙ্কুবিহারী মণ্ডল Cong ১১,৮৫৫ পশুপতিনাথ মালিয়া IND ১৯,৮৭৭	ভূতরঞ্জন চৌধুরী KMPP ৩,৭৪৯

১৯৫৭ সালে জোড়া আসনের রাণীগঞ্জ নামের কেন্দ্রটি অবলুপ্ত হয়। অণ্ডাল কেন্দ্রটি তৈরি হয়। ১৯৬২ সালে আবার রাণীগঞ্জ এক আসনবিশিষ্ট (তপঃ) কেন্দ্র হয়ে ফিরে আসে।

১৯৬২ তপঃ (৩) ৭১.৩৩৬/২৫,৮৬৯	লক্ষ্মণ বাগ্দী CPI ১২,৭২৮	ধ্বজাধারী মণ্ডল Cong ৯,৬১৮
১৯৬৭ (৩) ৬৪.১৪৯/৩৭.৬৯৪	হারাধন রায় CPI(M) ১৭,০১৩	সমরেশচন্দ্র ঘোষ Cong ১৬,০৩০

১	২	৩

অণ্ডাল

১৯৫৭ সালে রাণীগঞ্জের জায়গায় প্রথম ও একবারের জন্যই গঠিত।

১৯৫৭ ** (৭)	আনন্দগোপাল মুখার্জী Cong	রবীন সেন CPI
(১,০৪,৩৫০)	২২,১২৯	১৫,২৬৫
২,০৮,৭০০/৭৭,২২২	ধ্বজাধারী মণ্ডল Cong	ভগবানপিরীত সুরথ CPI
	২১,৪৭০	১২,১২৭

দুর্গাপুর

১৯৬২ সালে প্রথম গঠিত

১৯৬২ (৪)	আনন্দগোপাল মুখার্জী Cong	অজিত সেন FB
৮১,৬৫৩/৩৭,২২২	২০,০১০	৭,৩৮৮
		কমলাকান্ত চ্যাটার্জী PSP
		৬,৩৬৯
		বিশ্বনাথ চ্যাটার্জী WPI
		১,৩৮৭
১৯৬৭ (৩)	দিলীপ মজুমদার CPI(M)	আনন্দগোপাল মুখার্জী Cong
৮৯,৯৮৯/৫৯,৪৭৮	২৮,৭৫২	২৭,০৪৩

ফরিদপুর

১৯৬৭ সালে প্রথম গঠিত

১৯৬৭ (৩)	মনোরঞ্জন বক্সী B Cong	লাবণ্যগোপাল ঘটক Cong
৬৪,৩৯১/৩৪,২৪৬	১৫,৮৬৫	১৫,০৩৪

মূল সূত্র : Election Recorder : Dilip Banerjee

পরিশিষ্ট ১০ □ নির্বাচনী তথ্য (৩)

বর্ধমান পৌরসভা ১৯৩৮-১৯৬৭

পৌর বোর্ড ১৯৩৩-৩৮

ওয়ার্ড : ৫ □ সদস্য : নির্বাচিত ১৭+নিযুক্ত=২২

সদস্য :

১। নরেশচন্দ্র মিত্র, বি এল
২। সত্যচরণ মৈত্র
৩। মহম্মদ ইয়াসিন, বি. এল
৪। দেবপ্রসন্ন মুখার্জী, বি. এল
৫। গিরীন্দ্রকুমার চ্যাটার্জী, বি এল
৬। জগদীশ্বর হাটি
৭। আজিজুল আলম, বি এল
৮। প্রণবেশ্বর সরকার, বি এল
৯। দীনবন্ধু তেওয়ারী
১০। সৈয়দ আবদুল গণি, বি এল
১১। দুর্গাদাস তেওয়ারী
১২। চারুচন্দ্র দে
১৩। অনিলচন্দ্র দাস
১৪। রাজকৃষ্ণ দত্ত
১৫। মহম্মদ ইয়াকুব, বি এল
১৬। বিজয়গোবিন্দ কুণ্ডু
১৭। সজনীকান্ত হালদার

১৮। সিভিল সার্জন, বর্ধমান
১৯। সন্তোষকুমার বোস
২০। নাজিবুদ্দিন আহমদ, বি এল
২১। অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ম্যানেজার, বর্ধমান রাজ এস্টেট
২২। অ্যাসিস্ট্যাণ্ট সুপারিনটেণ্ডেণ্ট ওয়েজ অ্যাণ্ড ওয়ার্কস্ ই আই আর, বর্ধমান

চেয়ারম্যান : নরেশচন্দ্র মিত্র □ ভাইস্-চেয়ারম্যান : সত্যচরণ মৈত্র

পৌর নির্বাচন, ১. ২. ১৯৩৮

ওয়ার্ড ঃ ৫ ☐ নির্বাচিত ঃ ১৭

পৌর বোর্ড

সদস্য ঃ নির্বাচিত ১৭+নিযুক্ত ৫=২২

গঠিত ঃ ৯. ৪. ১৯৩৮

সদস্য ঃ

১। মহম্মদ ইয়াসিন, বি. এল
২। গিরীন্দ্রকুমার চ্যাটার্জী, বি. এল
৩। বলাইচাঁদ মুখার্জী, বি. এল
৪। উমাশঙ্কর চৌধুরী
৫। মহম্মদ আজম, বি. এল
৬। প্রণবেশ্বর সরকার, বি. এল
৭। সুশীলরঞ্জন সেন, বি. এল
৮। বিনোদীলাল ঘোষ, বি. এল
৯। ডাঃ রুদ্রনাথ ঘোষ
১০। দুর্গাদাস তেওয়ারী
১১। সৈয়দ আবদুল গনি, বি. এল
১২। রাজকৃষ্ণ দত্ত
১৩। চারুচন্দ্র দে
১৪। ডাঃ নীহারকুমার ঘোষ
১৫। মহম্মদ ইয়াকুব, বি. এল
১৬। ডাঃ শক্তিপদ পাল
১৭। সজনীকান্ত হালদার

১৮। সিভিল সার্জন, বর্ধমান
১৯। নীরেন্দ্রনাথ দাস
২০। সন্তোষকুমার বোস
২১। গোলাম মর্তুজা
২২। অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারিনটেণ্ডেন্ট, ওয়েজ অ্যাণ্ড ওয়ার্কস্, ই. আই. আর., বর্ধমান

চেয়ারম্যান ঃ গিরীন্দ্রকুমার চ্যাটার্জী

বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত

প্রস্তাবক ঃ প্রণবেশ্বর সরকার ☐ সমর্থক ঃ নীহারকুমার ঘোষ

ভাইস্-চেয়ারম্যান ঃ মহম্মদ আজম

বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত

প্রস্তাবক ঃ রাজকৃষ্ণ দত্ত ☐ সমর্থক ঃ চারুচন্দ্র দে

পৌর নির্বাচন, ১৯৪২

ওয়ার্ড ঃ ৫ ☐ নির্বাচিত ঃ ১৭

পৌর বোর্ড

সদস্য ঃ নির্বাচিত ১৭+নিযুক্ত ৫=২২

গঠিত ঃ ১৩. ৫. ১৯৪২

রহিত ঃ ১. ৫. ৪৩—১১. ২. ৪৪

পুনরধিষ্ঠিত ঃ ১২. ২. ৪৪

সদস্য ঃ

১। গিরীন্দ্রকুমার চ্যাটার্জী, বি. এল
২। দুর্গাপ্রসাদ চ্যাটার্জী, বি. এল
৩। অনিলচন্দ্র দাস
৪। সৈয়দ আব্দুল মনসুর হবিবুল্লাহ্
৫। শংকরদাস খান্না
৬। প্রণবেশ্বর সরকার, বি. এল
৭। দীনবন্ধু তেওয়ারী
৮। মহম্মদ আজম, বি. এল
৯। ডাঃ রুদ্রনাথ ঘোষ
১০। সত্যচরণ মৈত্র
১১। মীর মোনাজাত আলি
১২। চারুচন্দ্র দে
১৩। ডাঃ নীহারকুমার ঘোষ
১৪। সন্তোষকুমার খান
১৫। ডাঃ শক্তিপদ পাল
১৬। অমেয়প্রকাশ নন্দে
১৭। আব্দুল আহাদ

১৮। সিভিল সার্জন, বর্ধমান
১৯। জ্যোতিলাল মুখার্জী
২০। সন্তোষকুমার বোস
২১। সৈয়দ আবদুল গণি
২২। অ্যাসিস্ট্যাণ্ট সুপারিনৃটেণ্ডেণ্ট, ওয়েজ অ্যাণ্ড ওয়ার্কস্, ই. আই. আর, বর্ধমান

চেয়ারম্যান ঃ (১৩. ৫. ৪২—৩০. ৪. ৪৩) — সন্তোষকুমার বোস

প্রণবেশ্বর সরকারের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ১১-১১ ভোট পেয়ে সভাপতির নির্ণায়ক ভোটে নির্বাচিত। প্রস্তাবক ঃ সত্যচরণ মিত্র ☐ সমর্থক ঃ শঙ্করদাস খান্না। প্রণবেশ্বর সরকারের নাম প্রস্তাব করেন ডাঃ রুদ্রনাথ ঘোষ। সমর্থক ঃ আবদুল আহাদ। সভাপতি ঃ সিভিল সার্জন (টসে নির্বাচিত)

প্রশাসক (১.৫.৪৩—১১. ২. ৪৪)

চেয়ারম্যান (১২. ২. ৪৪—১২. ৫. ৪৬)

ভাইস্-চেয়ারম্যান ঃ মহম্মদ আজম

(১৩. ৫. ৪২—
৩০. ৪. ৪৩ এবং
১২. ২. ৪৪—
১২. ৫. ৪৬)

১৩-৯ ভোটে নির্বাচিত। প্রস্তাবক ঃ প্রণবেশ্বর সরকার □ সমর্থক ঃ ডাঃ রুদ্রনাথ ঘোষ। পরাজিত প্রার্থী অনিলচন্দ্র দাস। প্রস্তাবক ঃ দুর্গাপ্রসাদ চ্যাটার্জী। সমর্থক ঃ নীহারকুমার ঘোষ।

সহ-প্রশাসক ঃ
(১.৫.৪৩ ১১.২.৪৪)

সৈয়দ আবদুল গণি (সরকার কর্তৃক নিযুক্ত)

** ১. ৫. ৪৩-এ ডিফেন্স অব ইণ্ডিয়া রুলে বোর্ড রহিত হয়। ঐ তারিখ থেকে রহিতাদেশ প্রত্যাহার (১২. ২. ৪৪) পর্যন্ত সন্তোষকুমার বোস ও সৈয়দ আবদুল গণি যথাক্রমে প্রশাসক ও সহ-প্রশাসক নিযুক্ত হন।

পৌর নির্বাচন, ১৩. ২. ১৯৪৬

ওয়ার্ড ঃ ৫ □ নির্বাচিত ঃ ১৭

পৌর বোর্ড

সদস্য ঃ নির্বাচিত ১৭+নিযুক্ত ৫=২২

গঠিত ঃ ১৩. ৫. ১৯৪৬

শুধুমাত্র নির্বাচিত সদস্যদের নিয়ে পুনর্গঠিত ঃ ১৮. ২. ১৯৪৮

সদস্য ঃ

১। গিরীন্দ্রকুমার চ্যাটার্জী, বি. এল
২। শ্রীকুমার মিত্র*
৩। দুর্গাপ্রসাদ চ্যাটার্জী*
৪। সৈয়দ শাহেদুল্লাহ্ **
৫। ডাঃ নন্দদুলাল গাঙ্গুলী*
৬। অজিতকুমার রায়
৭। প্রণবেশ্বর সরকার, বি. এল
৮। বসন্তকুমার মৈত্র
৯। শঙ্করদাস খান্না
১০। ডাঃ শৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য
১১। মহম্মদ আজম, বি. এল
১২। ডাঃ রুদ্রনাথ ঘোষ
১৩। অশ্বিনী হাজরা*
১৪। সৈয়দ আবদুল গণি, বি. এল
১৫। সন্তোষকুমার খান
১৬। অমেয়প্রকাশ নন্দ
১৭। মুসা মিঞা

১৮। সিভিল সার্জন, বর্ধমান
১৯। জ্যোতিলাল মুখার্জী
২০। সন্তোষকুমার বোস
২১। গোলাম মহীউদ্দিন, বি. এল
২২। অ্যাসিস্ট্যাণ্ট সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, ওয়েজ অ্যাণ্ড ওয়ার্কস্, ই. আই. আর., বর্ধমান

*   পদত্যাগ, ১১. ৭. ১৯৪৯ ।

**   আণ্ডারগ্রাউণ্ডে থাকাকালীন দীর্ঘ অনুপস্থিতির কারণে ৪. ৮. ৪৯-এর গেজেট নোটিফিকেশনের মাধ্যমে (LSG IM-47/49 of 27. 7. 49) সদস্যপদ খারিজ হয়।

চেয়ারম্যান ঃ	প্রণবেশ্বর সরকার
(১৩. ৫. ৪৬—	১৫-৭ ভোটে নির্বাচিত।
১৭. ২. ৪৮)	প্রস্তাবক ঃ অমেয়প্রকাশ নন্দে ☐ সমর্থক ঃ শঙ্কর-দাস খান্না।
	পরাজিত প্রার্থী সৈয়দ আবদুল গণি।
	প্রস্তাবক ঃ ডাঃ রুদ্রনাথ ঘোষ ☐ সমর্থক ঃ অজিত-কুমার রায়।
ভাইস্-চেয়ারম্যান ঃ	অমেয়প্রকাশ নন্দে
(১৩. ৫. ৪৬—	১৫-৭ ভোটে নির্বাচিত।
৫. ১. ৪৮)	প্রস্তাবক ঃ বসন্তকুমার মৈত্র ☐ সমর্থক ঃ সন্তোষ
পদত্যাগ করেন।	কুমার খান।
	পরাজিত প্রার্থী অজিতকুমার রায়।
	প্রস্তাবক ঃ সৈয়দ আবদুল গণি ☐ সমর্থক ঃ অশ্বিনী হাজরা।

**   স্বাধীনতালাভের পর মনোনীত সদস্যপদ অবলুপ্ত হয়। শুধুমাত্র ১৭ জন মনোনীত সদস্য নিয়ে বোর্ড পুনর্গঠিত হয় ১৮ ২. ৪৮। ঐদিন চেয়ারম্যান ও ২৭. ৪. ৫১ তারিখে ভাইস্-চেয়ারম্যান নির্বাচন হয়।

চেয়ারম্যান ঃ	প্রণবেশ্বর সরকার
(১৮. ২. ৪৮—	বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত।
২৯. ১২. ৫০)	প্রস্তাবক ঃ অমেয়প্রকাশ নন্দে ☐ সমর্থক ঃ মুসা মিঞা।
ভাইস্-চেয়ারম্যান ঃ	সন্তোষকুমার খান
(২৬. ২. ৪৮—	বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত।
২৯. ১২. ৫০)	প্রস্তাবক ঃ অমেয়প্রকাশ নন্দে ☐ সমর্থক ঃ অজিত কুমার রায়।

পৌর নির্বাচন, ২৭. ১১. ১৯৫০

ওয়ার্ড ঃ ৬ ☐ নির্বাচিত ঃ ২০

পৌর বোর্ড গঠিত ঃ ৩০. ১২. ১৯৫০

সদস্য ঃ

১। ডাঃ কিরীটেশ্বর দত্ত
২। ফণীভূষণ সামন্ত
৩। গৌরহরি চৌধুরী
৪। ডাঃ বিরজাপতি ভট্টাচার্য
৫। তারাপদ পাল, বি. এল
৬। ডাঃ চন্দ্রশেখর চ্যাটার্জী
৭। গিরীন্দ্রকুমার চ্যাটার্জী, বি এল
৮। শ্রীকুমার মিত্র
৯। প্রণবেশ্বর সরকার, বি. এল
১০। শৈলেশচন্দ্র ব্যানার্জী
১১। ডাঃ শৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য
১২। বসন্তকুমার মৈত্র
১৩। সর্বদানন্দ কবিরাজ
১৪। লালমোহন ব্যানার্জী
১৫। ডাঃ বুদ্রনাথ ঘোষ
১৬। তারাকুমার মিশ্র
১৭। ডাঃ নবঘন মৈত্র
১৮। সন্তোষকুমার খান
১৯। ডাঃ শক্তিপদ পাল
২০। অমেয়প্রকাশ নন্দে

চেয়ারম্যান ঃ (৩০. ১২. ৫০— ২৭. ১১. ৫৩) পদত্যাগ করেন।

প্রণবেশ্বর সরকার

১৬-৪ ভোটে নির্বাচিত।
প্রস্তাবক ঃ ডাঃ বুদ্রনাথ ঘোষ ☐ সমর্থক ঃ সন্তোষকুমার খান।
পরাজিত প্রার্থী তারাপদ পাল।
প্রস্তাবক ঃ ফণীভূষণ সামন্ত ☐ সমর্থক ঃ শ্রীকুমার মিত্র।

ভাইস্-চেয়ারম্যান ঃ (৩০. ১২. ৫০— ১৬. ৪. ৫১) পদত্যাগ করেন।

বসন্তকুমার মৈত্র

১৪-৬ ভোটে নির্বাচিত।
প্রস্তাবক ঃ কিরীটেশ্বর দত্ত ☐ সমর্থক ঃ নবঘন মৈত্র।
পরাজিত প্রার্থী শৈলেশচন্দ্র ব্যানার্জী।
প্রস্তাবক ঃ ডাঃ শৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ☐ সমর্থক ঃ অমেয়প্রকাশ নন্দে।

ভাইস্-চেয়ারম্যান ঃ	সন্তোষকুমার খান
দ্বিতীয় নির্বাচন (২৭. ৪. ৫১—৭. ৪ ৫৫)	সংখ্যাগরিষ্ঠতায় (কেবল বসন্তকুমার মৈত্র আপত্তি জানান) নির্বাচিত। প্রস্তাবক ঃ ডাঃ বুদ্রনাথ ঘোষ ☐ সমর্থক ঃ ডাঃ নবঘন মৈত্র।
চেয়ারম্যান ঃ	তারাকুমার মিশ্র
দ্বিতীয় নির্বাচন (২৩. ১২. ৫৩—৭ ৪. ৫৫)	১০-৯ ভোটে নির্বাচিত হন। বাতিল ভোট—১। প্রস্তাবক ঃ তারাপদ পাল ☐ সমর্থক ঃ ফণীভূষণ সামন্ত। পরাজিত প্রার্থী সর্বদানন্দ কবিরাজ। প্রস্তাবক ঃ বসন্তকুমার মৈত্র ☐ সমর্থক ঃ অমেয়-প্রকাশ নন্দে। আরো ৯ জনের নাম প্রস্তাবিত হয়, কিন্তু প্রত্যেকেই নিজ নাম প্রত্যাহার করে নেন।

পৌর নির্বাচন, ১৩. ২. ১৯৫৫

ওয়ার্ড ঃ ৬ ☐ নির্বাচিত ঃ ২৫

পৌর বোর্ড গঠিত ঃ ৮. ৪. ১৯৫৫

বাতিল ঃ ১. ৭. ১৯৫৭

সদস্য ঃ

১। গৌরহরি চৌধুরী
২। কিরীটেশ্বর দত্ত
৩। ফণীভূষণ সামন্ত
৪। ভোলানাথ দাস
৫। খগেন্দ্রনাথ মণ্ডল †
※৬। ডাঃ চন্দ্রশেখর চ্যাটার্জী †
※৭। মথুরানাথ ঘোষ †
৮। শ্রীকুমার মিত্র †
※৯। অসীম ঘোষ †
১০। ডাঃ বিরজাপতি ভট্টাচার্য †
১১। অরবিন্দ সেন
১২। প্রণবেশ্বর সরকার
১৩। শৈলেশচন্দ্র ব্যানার্জী
*১৪। দেবরঞ্জন সেন
※১৫। অমরেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী
১৬। বসন্তকুমার মৈত্র
*১৭। কৃষ্ণচন্দ্র হালদার
১৮। ডাঃ বুদ্রনাথ ঘোষ
*১৯। অশ্বিনী হাজরা
২০। তারাকুমার মিশ্র
২১। বৈদ্যনাথ দে
*২২। সন্তোষকুমার খান
*২৩। মৃত্যুঞ্জয় কুণ্ডু
২৪। মুসা মিঞা
২৫। শিশিরকুমার ঘোষ

※ গণতান্ত্রিক নাগরিক সমিতির টিকিটে নির্বাচিত।

† ৯. ৫. ৫৫—৯. ৬. ৫৫ কোর্টের আদেশে সদস্যপদ বাতিল থাকে।

চেয়ারম্যান ঃ	ডাঃ বুদ্রনাথ ঘোষ
৮. ৪. ৫৫—	১৩-১২ ভোটে নির্বাচিত।
১২. ৬. ৫৬	প্রস্তাবক ঃ গৌরহরি চৌধুরী ☐ সমর্থক ঃ বৈদ্যনাথ
(পদত্যাগ করেন)	দে।
	পরাজিত প্রার্থী শৈলেশচন্দ্র ব্যানার্জী।
	প্রস্তাবক ঃ মথুরানাথ ঘোষ ☐ সমর্থক ঃ অশ্বিনী
	হাজরা।
ভাইস্-চেয়ারম্যান ঃ	বিরজাপতি ভট্টাচার্য
৮. ৪. ৫৫—	১৩-১২ ভোটে নির্বাচিত।
১০. ৫. ৫৫	প্রস্তাবক ঃ কিরীটেশ্বর দত্ত ☐ সমর্থক ঃ অরবিন্দ
	সেন।
	পরাজিত প্রার্থী ডাঃ চন্দ্রশেখর চ্যাটার্জী
	প্রস্তাবক ঃ দেবরঞ্জন সেন ☐ সমর্থক ঃ অসীম ঘোষ।
	কোর্টের আদেশে সদস্যপদ খারিজ হওয়ায় ভাইস্-চেয়ারম্যান তাঁর পদটিও হারান ঃ ১১. ৫. ৫৫ থেকে।
ভাইস্-চেয়ারম্যান ঃ	গৌরহরি চৌধুরী
(দ্বিতীয় নির্বাচন)	১১-৭ ভোটে নির্বাচিত।
২১. ৫. ৫৫—	প্রস্তাবক ঃ বসন্তকুমার মৈত্র ☐ সমর্থক বৈদনাথ দে।
৩০. ১১. ৫৫	পরাজিত প্রার্থী দেবরঞ্জন সেন
	প্রস্তাবক ঃ অমরেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী ☐ সমর্থক ঃ কৃষ্ণ-চন্দ্র হালদার।
ভাইস্-চেয়ারম্যান ঃ	বিরজাপতি ভট্টাচার্য
১ ১২. ৫৫—	(কোর্টের আদেশে পুনরধিষ্ঠিত হন।)
৩০. ৬. ৫৭	
চেয়ারম্যান ঃ	কিরীটেশ্বর দত্ত
(দ্বিতীয় নির্বাচন)	ডাঃ বুদ্রনাথ ঘোষের পদত্যাগ (১২. ৬. ৫৬)-এর
৪. ৭. ৫৬—	পর দ্বিতীয় নির্বাচনের জন্য প্রথম সভা বসে ৪.৭.৫৬
২৭. ৮. ৫৬	বেলা ২টায়। তারাকুমার মিশ্রের পয়েন্ট অব্

অর্ডার গ্রহণ করে ভাইস্-চেয়ারম্যান আনুষ্ঠানিক ত্রুটির কারণে মিটিং বাতিল করেন। শ্রীকুমার মিত্র বসন্তকুমার মৈত্র ও অশ্বিনী হাজরার রিকুইজিশন-ক্রমে ঐদিনই দ্বিতীয় মিটিং বসে বেলা ৪টায়। সদস্যদের, বিশেষত অসীম ঘোষের, অসদাচরণের অভিযোগে এই মিটিংটিও ভাইস-চেয়ারম্যান বাতিল করেন। গণতান্ত্রিক নাগরিক সমিতির ১০ জন এবং শ্রীকুমার মিত্র, কিরীটেশ্বর দত্ত ও বসন্তকুমার মৈত্রের স্বাক্ষরে ঐদিনই বেলা ৫টায় ডাকা তৃতীয় সভায় কিরীটেশ্বর দত্ত সর্বসম্মতিক্রমে (ঐ ১৩ জনই উপস্থিত ছিলেন) চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন।

(২৮. ৮. ৫৬-এর সরকারী আদেশে চেয়ারম্যান নির্বাচন বাতিল)

প্রস্তাবক ঃ অসীম ঘোষ □ সমর্থক ঃ শ্রীকুমার মিত্র।

চেয়ারম্যানের কাজ চালান ঃ ২৮. ৮. ৫৬— ২. ১১. ৫৬

বিরজাপতি ভট্টাচার্য
[কিরীটেশ্বর দত্তের নির্বাচন বাতিল হওয়ার কারণে—সরকারী আদেশে।]

চেয়ারম্যান ঃ (সরকার-মনোনীত) ৩. ১১. ৫৬— ৩০. ৬ ৫৭

ফণীভূষণ সামন্ত

[২১. ২. ৫৭ তারিখে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত ১৩ জনের স্বাক্ষরিত অনাস্থা প্রস্তাব তিনি বিধি-বহির্ভূত বলে বাতিল করেন। কিন্তু সংখ্যা-গরিষ্ঠের সমর্থন নেই, তা প্রমাণ হয়।]

সরকারী আদেশে বোর্ড বাতিল, ১. ৭. ৫৭

প্রশাসক ঃ ১.৭.৫৭—১৫.৯.৫৮

এস. এস. নাগ, এস সি. সেন, এ. মজুমদার

পৌর নির্বাচন ১৬. ৩. ১৯৫৮/১৭. ৮. ১৯৫৮

ওয়ার্ড ঃ ২৫ ☐ নির্বাচিত ঃ ২৫

(সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে)

পৌর বোর্ড গঠিত ঃ ১৬. ১. ১৯৫৮

বাতিল ঃ ২০. ৬. ৬৩

সদস্য ঃ

১। গৌরহরি চৌধুরী
২। উমাশঙ্কর চৌধুরী/
শ্রীকান্ত শাস্ত্রী †
৩। ইউনুস লায়েক
*৪। কিরীটেশ্বর দত্ত
৫। জিতনারায়ণ দত্ত
*৬। ডাঃ চন্দ্রশেখর চ্যাটার্জী
*৭। অসীম ঘোষ/
আমোদবিহারী বসু ††
৮। শ্রীকুমার মিত্র
*৯। শিবেশকুমার তা
১০। কুঞ্জবিহারী বসু রায়
*১১। শক্তিপদ চ্যাটার্জী
*১২। অনিল নন্দী
*১৩। কৃষ্ণচন্দ্র হালদার
*১৪। শৈলেশচন্দ্র ব্যানার্জী
*১৫। আমানুল্লাহ্ আকবর
*১৬। দেবরঞ্জন সেন
*১৭। অশ্বিনী হাজরা
১৮। ডাঃ রুদ্রনাথ ঘোষ
*১৯। মঙ্গলাপ্রসাদ মুখার্জী
*২০। সৈয়দ মোজাম্মেল হোসেন
২১। ধনপতি দত্ত
*২২। সন্তোষকুমার খান/
মথুরানাথ ঘোষ †††
*২৩। মৃত্যুঞ্জয় কুণ্ডু
*২৪। অজিতকুমার ঘোষ
*২৫। পরিমলচন্দ্র মিত্র

* গণতান্ত্রিক নাগরিক সমিতি মনোনীত।

† ৮. ১১. ৬০ থেকে (উপনির্বাচনে নির্বাচিত)।

†† ৩. ৫. ৬০ থেকে (উপনির্বাচনে নির্বাচিত)।

††† ৮. ১১. ৬০ থেকে (উপনির্বাচনে নির্বাচিত)।

চেয়ারম্যান ঃ	শৈলেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
১৬. ৯. ৫৮—	সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত।
২৩. ১১. ৬২ পদত্যাগ করেন।	প্রস্তাবক ঃ শক্তিপদ চ্যাটার্জী ☐ সমর্থক ঃ শিবেশ-কুমার তা।
	[পদত্যাগ বিবেচনার সভা (২৩. ১১. ৬২)-য় উপস্থিত ছিলেন সভাপতি ডাঃ চন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায় (ভাইস্-চেয়ারম্যান) সহ ১৩ জন। গণতান্ত্রিক নাগরিক সমিতি মনোনীতদের মধ্যে অনিল নন্দী, দেবরঞ্জন সেন, মঙ্গলাপ্রসাদ মুখার্জী, মোজাম্মেল হোসেন ও অজিতকুমার ঘোষ ও ভাইস্-চেয়ারম্যান ছাড়া অন্যরা অনুপস্থিত ছিলেন। শ্রীকান্ত শাস্ত্রীও অনুপস্থিত ছিলেন। পদত্যাগপত্র সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।]
ভাইস্-চেয়ারম্যান ঃ	ডাঃ চন্দ্রশেখর চ্যাটার্জী
১৬. ৯. ৫৮—	সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত।
২০. ৬. ৬৩	প্রস্তাবক ঃ অজিতকুমার ঘোষ ☐ সমর্থক ঃ আমানুল্লাহ্ আকবর।
চেয়ারম্যান ঃ	ডাঃ কিরীটেশ্বর দত্ত
দ্বিতীয় নির্বাচন	১২-৭ ভোটে নির্বাচিত। বাতিল ভোট—১
৬. ১২. ৬২— ২০. ৬. ৬৩	প্রস্তাবক ঃ অজিতকুমার ঘোষ ☐ সমর্থক ঃ শিবেশ-কুমার তা।
	পরাজিত প্রার্থী বৃন্দ্রনাথ ঘোষ।
	প্রস্তাবক ঃ জিতনারায়ণ দত্ত ☐ সমর্থক ঃ ধনপতি দত্ত।
	[অনুপস্থিত ঃ শৈলেশ ব্যানার্জী, আমোদবিহারী বসু, কৃষ্ণচন্দ্র হালদার, আমানুল্লাহ্ আকবর, অশ্বিনী হাজরা। একজন কমিশনার গ্রেপ্তার, কয়েকজন শহর-ছাড়া—এই মর্মে শ্রীকুমার মিত্রের পয়েন্ট অব্ অর্ডার সভাপতি ডাঃ চন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায় (ভাইস্-চেয়ারম্যান) অগ্রাহ্য করেন।]
বোর্ড বাতিল	
প্রশাসক ঃ ২০.৬.৬৩-২৯.৬.৬৭	এস. মুখার্জী, এ. দাশগুপ্ত, এস. কে. চন্দ, এস. সি. চক্রবর্তী।

পৌর নির্বাচন, ২১. ৫. ১৯৬৭

ওয়ার্ড ঃ ২৫ ☐ নির্বাচিত ঃ ২৫

পৌর বোর্ড গঠিত ঃ ৩০. ৬. ৬৭

সদস্য ঃ

১। গৌরহরি চৌধুরী
২। মহম্মদ শরিফ
৩। রফিক আহ্‌মদ মল্লিক
৪। ওমপ্রকাশ যশ
৫। মথুরানাথ ঘোষ
৬। ডাঃ চন্দ্রশেখর চ্যাটার্জী
৭। গুরুশঙ্কর মুখার্জী
৮। শৈলকুমার মিত্র
৯। শিবেশকুমার তা
১০। ত্রিবিক্রম সান্যাল
১১। শক্তিপদ চ্যাটার্জী
১২। তারাপদ প্রামাণিক
১৩। সুরেশচন্দ্র সরকার
১৪। শৈলেশচন্দ্র ব্যানার্জী
১৫। আমানুল্লাহ্‌ আকবর
১৬। সুনীলকুমার দাস
১৭। অশ্বিনীকুমার হাজরা
১৮। বদ্রী চৌধুরী
১৯। মঙ্গলাপ্রসাদ মুখার্জী
২০। সৈয়দ মোজাম্মেল হোসেন
২১। বীরেন্দ্রনাথ দত্ত
২২। প্রশান্তকুমার কুণ্ডু
২৩। মৃত্যুঞ্জয় কুণ্ডু
২৪। ক্ষেত্রনাথ অধিকারী
২৫। পরিমল মিত্র

চেয়ারম্যান ঃ শৈলেশচন্দ্র ব্যানার্জী

(৩০. ৬ ৬৭— ৩১. ১২. ৭১ প্রস্তাবক ঃ অশ্বিনীকুমার হাজরা ☐ সমর্থক ঃ আমানুল্লাহ্‌ আকবর।

ভাইস্‌-চেয়ারম্যান ঃ ডাঃ চন্দ্রশেখর চ্যাটার্জী

(৩০. ৬. ৬৭— ৩১. ১২. ৭১) প্রস্তাবক ঃ পরিমল মিত্র ☐ সমর্থক ঃ শিবেশকুমার তা।

* উভয়েই সংখ্যা-গরিষ্ঠতায় নির্বাচিত। সুনীলকুমার দাস ও ওমপ্রকাশ যশ নির্বাচন প্রক্রিয়ায় অংশ নেন না।

পৌরসভার রেকর্ড থেকে সম্পাদক কর্তৃক সংকলিত

পরিশিষ্ট ১১ □ নির্বাচনী তথ্য (৪)

লোকাল বোর্ড ও জেলা বোর্ড নির্বাচন, ১৯৪০/১৯৫১

১৮৮৫ সালের Bengal Local Self-government Act (Bengal Act III of 1885) অনুযায়ী লোকাল বোর্ড ও জেলা বোর্ড গঠিত হয়। ১৯৩৬ সালের আইনে (Bengal Act XIV) লোকাল বোর্ড ও জেলা বোর্ডের কার্যকাল ৫ বছর করা হয়। সেই হিসাবে জেলার তৎকালীন ৪টি লোকাল বোর্ড (আসানসোল, বর্ধমান সদর, কালনা ও কাটোয়া)-এর মেয়াদ শেষ হবার কথা মার্চ ১৯৩৯-এ, এবং জেলা বোর্ডের মেয়াদ শেষ হবার কথা ডিসেম্বর ১৯৩৯-এ। একমাত্র আসানসোল লোকাল বোর্ডের নির্বাচন যথাসময়ে হয়। বর্ধমান সদর, কালনা ও কাটোয়ার নির্বাচন জেলা শাসকের আদেশে স্থগিত থেকে ১৯৪০-এর মার্চে হয়। সদর লোকাল বোর্ডের নির্বাচন নিয়ে মামলার কারণে বোর্ড গঠনের কাজ বিলম্বিত হয়। অবশেষে ১৬. ৬. ৪১-এ আসানসোল, কালনা ও কাটোয়া লোকাল বোর্ড এবং ২২. ১২. ৪১-এ সদর লোকাল বোর্ড গঠিত হয়। ৮. ১. ৪০-এর সরকারী নোটিফিকেশন (No. 12 LSG) অনুসারে বর্ধমান সদর ও আসানসোল লোকাল বোর্ডের দ্বারা নির্বাচিত ৫+৫=১০, এবং কালনা ও কাটোয়া লোকাল বোর্ডের দ্বারা নির্বাচিত ৩+৩=৬—এই মোট ১৬ জন নির্বাচিত সদস্য এবং ৮ জন নিযুক্ত সদস্য নিয়ে ২৪ জনের জেলা বোর্ড গঠিত হয় ২৪. ৬. ৪২।

২৪. ৬. ৪২ পর্যন্ত পূর্বতন জেলা বোর্ডই ক্ষমতাসীন থাকে। এর সদস্য সংখ্যাও ছিল নির্বাচিত ১৬+নিযুক্ত ৮=২৪। তবে বর্ধমান সদর লোকাল বোর্ডের প্রতিনিধিত্ব ছিল ৬, এবং আসানসোলের ৪।

□

২৪. ৬. ১৯৪২-পূর্ব জেলা বোর্ড

১। রাজাবাহাদুর মণিলাল সিংহ রায়, সি. আই. ই., চকদীঘি—চেয়ারম্যান
২। রায় হরকালী পান বাহাদুর, এম. এ., বি. এল—ভাইস্-চেয়ারম্যান
৩। রাধাগোবিন্দ হাটী, অ্যাডভোকেট—ভাইস্-চেয়ারম্যান
৪। সি. আই. এম. আর্নল্ড, আই. সি. এস., এস. ডি. ও., আসানসোল
৫। প্রবোধচন্দ্র মজুমদার, এস. ডি. ও., কাটোয়া
৬। জে. এ. পাওয়েল
৭। বিমানবিহারীলাল সিংহ
৮। বগলাপ্রসাদ চক্রবর্তী, বি. এল
৯। রায়সাহেব শান্তিমোহন ঘোষ
১০। খানসাহেব মহম্মদ আব্দুস সালাম
১১। রায়সাহেব গোপেন্দ্রকৃষ্ণ দে, বি. এল
১২। কাজী নওয়াজ খোদা
১৩। হরিপদ চৌধুরী
১৪। তেজেন্দ্রনাথ ঘোষাল
১৫। খানসাহেব মৌলভী আব্দুল গণি
১৬। ডাঃ আব্দুল খালেক
১৭। শিবনাথ ব্যানার্জী, বি. এল
১৮। মহারাজকুমার অভয়চাঁদ মহাতাব, বর্ধমান
১৯। ডাঃ সত্যরঞ্জন সেন, সিভিল সার্জন, বর্ধমান
২০। সৈয়দ হাজী বদরোদ্দজা, কুসুমগ্রাম
২১। লেফটেনান্ট শৈলেশ্বর সিংহ রায়
২২। রায়সাহেব নকুলচন্দ্র রায়, বি. এল
২৩। শ্রীমোহন সিংহ, বি. এল
২৪। অনুজাকুমার চ্যাটার্জী

□

বর্ধমান জেলার লোকাল বোর্ড, ১৯৪১

কালনা

সদস্য ঃ নির্বাচিত ১২+নিযুক্ত ৬=১৮

গঠিত ঃ ১৬. ৬. ৪১

নির্বাচিত সদস্য ঃ

স্পেশ্যাল কনস্‌টিটুয়েন্সি ঃ

১। আব্দুস সাত্তার
২। শেখ আব্দুল বাসেত
৩। সৈয়দ মহম্মদ মহসীন

জেনারেল কনস্‌টিটুয়েন্সি ঃ

কালনা থানা ঃ

৪। হরগোবিন্দ রেজ
৫। বিজয়গোপাল দে, দুর্গাদাস নন্দী*
৬। অনাথনাথ বন্দোপাধ্যায়
৭। দ্বিজপদ ঘোষাল

পূর্বস্থলী থানা ঃ

৮। অনাথনাথ বসু
৯। রামেন্দুকুমার ভট্টাচার্য
১০। কুমারীশচন্দ্র সিংহরায়

মন্তেশ্বর থানা ঃ

১১। ভক্তচন্দ্র রায়
১২। অন্নদাপ্রসাদ মণ্ডল

নিযুক্ত সদস্য ঃ

১৩। হেমচন্দ্র চ্যাটার্জী
১৪। বিশ্বরূপ গণ
১৫। বীরেশ্বর চ্যাটার্জী
১৬। ষষ্ঠীচরণ সাহা
১৭। আব্দুল জব্বার মণ্ডল
১৮। চৌধুরী মহম্মদ বসরতুল্লা

* বিজয়গোপাল দে-র মৃত্যুতে নির্বাচিত, ৭. ৬. ৪১

চেয়ারম্যান ঃ হরগোবিন্দ রেজ

বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত।
প্রস্তাবক ঃ অন্নদাপ্রসাদ মণ্ডল ☐ **সমর্থক ঃ** সৈয়দ মহম্মদ মহসীন।
* হেমচন্দ্র চ্যাটার্জীর তোলা একটি পয়েন্ট অব অর্ডার সভাপতি নাকচ করায় বিশ্বরুপ গণ, ষষ্ঠীচরণ সাহা, আব্দুল জব্বার মণ্ডল ও চৌধুরী মহম্মদ বেসারতুল্লা নির্বাচনের আগে সভা ত্যাগ করেন। সভাপতিত্ব করেন অনাথনাথ বসু।

ভাইস্-চেয়ারম্যান ঃ কুমারীশচন্দ্র সিংহরায়

বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত।
প্রস্তাবক ঃ রামেন্দুকুমার ভট্টাচার্য ☐ **সমর্থক ঃ** শেখ আব্দুল বাসেদ।

কাটোয়া

সদস্য ঃ নির্বাচিত ১২+নিযুক্ত ৬=১৮

গঠিত ঃ ১৬. ৬. ৪১

নির্বাচিত সদস্য ঃ

স্পেশ্যাল কনস্‌টিটুয়েন্সি ঃ

১। বজলে হোসেন

২। নবুয়াত আলি

৩। আবুল হায়াত

জেনারেল কনস্‌টিটুয়েন্সি ঃ

কাটোয়া থানা ঃ

৪। কামাখ্যাচরণ মজুমদার

৫। কমলাপতি চৌধুরী

৬। জ্যোতিষচন্দ্র সিংহ

কেতুগ্রাম থানা ঃ

৭। খানসাহেব আব্দুল গণি

৮। খানসাহেব নুরুল আবসার

৯। শিবনাথ ব্যানার্জী

মঙ্গলকোট থানা ঃ

১০। মহম্মদ আব্দুল আহাদ

১১। হরিপদ চৌধুরী

১২। জ্ঞানেন্দ্রনাথ চৌধুরী

নিযুক্ত সদস্য ঃ

১৩। গোপীনাথ ঘোষ

১৪। সত্যহরি রজক

১৫। মহম্মদ আব্দুর রহিম

১৬। ডাঃ ধীরেন্দ্রনাথ সাধু

১৭। ডাঃ খালিল হোসেন

১৮। চৌধুরী আবু মুসা

চেয়ারম্যান — জ্যোতিষচন্দ্র সিংহ

বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত।

প্রস্তাবক ঃ মহম্মদ আব্দুর রহিম □ সমর্থক ঃ আবদুল গণি।

ভাইস্-চেয়ারম্যান — চৌধুরী আবু মুসা

বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত।

প্রস্তাবক ঃ ধীরেন্দ্রনাথ সাধু □ সমর্থক ঃ গোপীনাথ ঘোষ।

আসানসোল

সদস্য ঃ নির্বাচিত ১৪+নিযুক্ত ৭=২১
গঠিত ঃ ১৬. ৬. ৪১

নির্বাচিত সদস্য ঃ

কুলটি থানা ঃ

১। অপরাপ্রসাদ মুখার্জী
২। দুর্গাদত্ত পোদ্দার

সালানপুর থানা ঃ

৩। সুরেন্দ্রনাথ রায়

রাণীগঞ্জ থানা ঃ

৪। নিমাইচন্দ্র রায়

বরাবণী থানা ঃ

৫। বগলানন্দ ব্যানার্জী

জামুড়িয়া থানা ঃ

৬। গোবর্ধন চট্টোপাধ্যায়
৭। বগলাচরণ কাঞ্জিলাল

কাঁকসা থানা ঃ

৮। গোপালচন্দ্র মিশ্র

আসানসোল থানা ঃ

৯। কৃষ্ণবিলাস চক্রবর্তী
১০। হেমেন্দ্রলাল মুখার্জী

অণ্ডাল থানা ঃ

১১। বিমানবিহারীলাল সিংহ
১২। রামগতি হাজরা

ফরিদপুর ঃ

১৩। সত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়

বিশেষ আসন ঃ

১৪। সৈয়দ মহম্মদ হোসেন

নিযুক্ত সদস্য ঃ

১৫। এস. ডি. ও., আসানসোল (সি. আই এম. আর্নল্ড, আই. সি এস)
১৬। বগলাপ্রসাদ চক্রবর্তী
১৭। রায়সাহেব উপেন্দ্রনাথ মণ্ডল
১৮। রায়সাহেব নকুলচন্দ্র রায়
১৯। রায়সাহেব শান্তিমোহন ঘোষ
২০। মহম্মদ আমজাদ হোসেন
২১। খানবাহাদুর মহম্মদ ওয়ালেত খান

চেয়ারম্যান ঃ সি. আই. এম. আর্নল্ড, আই সি এস, এস ডি ও, আসানসোল।
৮-৫ ভোটে নির্বাচিত (বাতিল ভোট—৪)।
প্রস্তাবক ঃ নিমাইচন্দ্র রায় ☐ সমর্থক ঃ রায়সাহেব উপেন্দ্রনাথ মণ্ডল।
পরাজিত প্রার্থী ঃ হেমেন্দ্রলাল মুখার্জী।
প্রস্তাবক ঃ অপরাপ্রসাদ মুখার্জী ☐ সমর্থক ঃ গোবর্ধন চ্যাটার্জী।

ভাইস্-চেয়ারম্যান ঃ বিমানবিহারীলাল সিংহ
বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত।
প্রস্তাবক ঃ বগলানন্দ চ্যাটার্জী ☐ সমর্থক ঃ খান-বাহাদুর ওয়ালেত খান।

বর্ধমান সদর

সদস্য ঃ নির্বাচিত ১৬+নিযুক্ত ৮=২৪

গঠিত ঃ ২২. ১২. ১৯৪১

নির্বাচিত সদস্য ঃ

স্পেশ্যাল কন্‌স্‌টিটুয়েন্সি ঃ

১। মহম্মদ আবদুল্লা রসুল
২। জাহেদ আলি মোল্লা
৩। আবদুস সাত্তার

জেনারেল কন্‌স্‌টিটুয়েন্সি ঃ

রায়না থানা ঃ

৪। লক্ষ্মীনারায়ণ হাজরা
৫। দাশরথি তা

খণ্ডঘোষ থানা ঃ

৬। অমিয়কুমার বোস

বর্ধমান থানা ঃ

৭। হেলারাম চ্যাটার্জী

মেমারী থানা ঃ

৮। মহাপ্রসাদ কোঙার
৯। ভূপেন্দ্রনাথ নায়েক

জামালপুর থানা ঃ

১০। শৈলেশ্বর সিংহরায়
১১। বিজয়কুমার ভট্টাচার্য

ভাতাড় থানা ঃ

১২। করুণাসিন্ধু রায়

আউসগ্রাম থানা ঃ

১৩। ভুজঙ্গভূষণ সেন
১৪। চারুচন্দ্র চ্যাটার্জী

গলসী থানা ঃ

১৫। ফকিরচন্দ্র রায়
১৬। যাদবেন্দ্রনাথ পাঁজা

নিযুক্ত সদস্য ঃ

১৭। রায় হরকালী পান বাহাদুর
১৮। রাধাগোবিন্দ হাটি
১৯। কুমারীশচন্দ্র চ্যাটার্জী
২০। রায়সাহেব গোপেন্দ্রকৃষ্ণ দে
২১। পশুপতি পাণ্ডিত
২২। মহম্মদ গোলাম আহিয়া
২৩। মুজফ্‌ফর হোসেন চৌধুরী
২৪। অনাথশরণ দে

চেয়ারম্যান — **অমিয়কুমার বোস**

বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত।

প্রস্তাবক ঃ হেলারাম চ্যাটার্জী ☐ **সমর্থক ঃ** করুণাসিন্ধু রায়।

ভাইস্‌-চেয়ারম্যান ঃ **ভুজঙ্গভূষণ সেন**

বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত।

প্রস্তাবক ঃ ফকিরচন্দ্র রায় ☐ সমর্থক ঃ মহাপ্রসাদ কোঙার।

বর্ধমান জেলা বোর্ড, ১৯৪২

সদস্য ঃ নির্বাচিত ১৬+নিযুক্ত ৮=২৪

। বর্ধমান সদর ও কালনা লোকাল বোর্ডের প্রতিনিধি নির্বাচিত হয় সর্বসম্মতিক্রমে। কাটোয়ায় চতুর্থ প্রার্থী জ্যোতিষচন্দ্র সিংহরায় ভোটে পরাজিত হন। আসানসোলে ১১ জন প্রার্থী ছিলেন। * চিহ্ন ঃ বিশেষ সংখ্যালঘিষ্ঠ আসন।।

গঠিত ঃ ২. ৪. ১৯৪২

বর্ধমান সদর ঃ

১। জিতেন্দ্রনাথ মিত্র
২। আবুল হায়াত*
৩। যাদবেন্দ্রনাথ পাঁজা
৪। বিজয়কুমার ভট্টাচার্য
৫। ফকিরচন্দ্র রায়

কালনা ঃ

৬। আবদুস সাত্তার*
৭। অনাথনাথ বসু
৮। তারাপদ পাল

কাটোয়া ঃ

৯। খানসাহেব নুরুল আবসার*
১০। খানসাহেব আব্দুল গণি
১১। শিবনাথ ব্যানার্জী

আসানসোল

১২। রায়সাহেব শান্তিমোহন ঘোষ
১৩। বগলানন্দ ব্যানার্জী
১৪। বিমানবিহারীলাল সিংহ
১৫। রায়সাহেব নকুলচন্দ্র রায়
১৬। আমজাদ হোসেন*

১৭। সি আই. এম. আর্নল্ড
এস ডি ও. আসানসোল
১৮। খানবাহাদুর নাজিরুদ্দিন আহ্‌মদ
এম এল. সি
১৯। অদ্বৈতকুমার মাজি. এম এল এ
২০। ডাঃ গুণেন্দ্রনাথ মুখার্জী
২১। ভবানীদাস মজুমদার
২২। জে এ পাওয়েল
২৩। মহম্মদ আজম
২৪। সুরেন্দ্রকুমার বোস

চেয়ারম্যান ঃ জিতেন্দ্রলাল মিত্র

১৫-৯ ভোটে নির্বাচিত।
প্রস্তাবক ঃ অদ্বৈতকুমার মাজি ☐ সমর্থক ঃ আবদুল গণি।
পরাজিত প্রার্থী বিমানবিহারীলাল সিংহ
প্রস্তাবক ঃ নাজিরুদ্দিন আহ্‌মদ ☐ সমর্থক ঃ নকুলচন্দ্র রায়।

ভাইস্-চেয়ারম্যান-১ ঃ আবুল হায়াত

বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত।
প্রস্তাবক ঃ যাদবেন্দ্রনাথ পাঁজা ☐ সমর্থক ঃ আব্দুস সাত্তার।

ভাইস্-চেয়ারম্যান-২ ঃ শুধু একজন ভাইস্-চেয়ারম্যান নির্বাচিত হবেন—ফকিরচন্দ্র রায়ের সমর্থনে অনাথনাথ বসুর এই প্রস্তাব ১৩-১০ ভোটে গৃহীত হওয়ায় দ্বিতীয় ভাইস-চেয়ারম্যানের নির্বাচন হয় না।

সভাপতিত্ব করেন বিজয়কুমার ভট্টাচার্য (১৩-৯ ভোটে নির্বাচিত)।

□

স্বাধীনতা লাভ পর্যন্ত এই বোর্ডই ক্ষমতাসীন থাকে। তারপরেই ১৫ ১০ ১৯৪৭-এর সরকারী আদেশ (No. LSG 578/47 IB)-বলে ১ ১২ ৪৭ থেকে সমস্ত লোকাল বোর্ডের অবলুপ্তি ঘটানো হয়। ৭. ১ ১৯৪৮-এর আর এক আদেশে (No. LSG 18-3/48(12)) নিযুক্ত তথা মনোনীত পদের অবসান ঘটিয়ে কেবলমাত্র ১৬ জন নির্বাচিত সদস্য নিয়ে বোর্ডকে পুনর্গঠিত করা হয়। চেয়ারম্যান ও ভাইস-চেয়ারম্যান অপরিবর্তিত থাকেন।

□

পরবর্তী বোর্ডের নির্বাচন হয় ১৯৫১ সালে। ফলাফল প্রকাশিত হয় ৬ ৯. ৫১ তারিখের গেজেট নোটিফেকেশনে (No. LSG IB-22/51 dt 31 8. 51)।

□

জেলা বোর্ড, ১৯৫১

২৬টি কেন্দ্র থেকে সরাসরি নির্বাচিত সদস্য : ২৬

সদস্য	কেন্দ্র
১। হেলারাম চ্যাটার্জী	বর্ধমান
২। কিষণলাল তা	রায়না
৩। সুবিমান ঘোষ	খণ্ডঘোষ-রায়না
৪। অতুলচন্দ্র সামন্ত	গলসী
৫। বিজয়কুমার গড়াই	আউসগ্রাম
৬। নীরদশ্যাম ব্যানার্জী	গলসী-আউসগ্রাম
৭। রাধাগোবিন্দ দত্ত	ভাতাড়
৮। ব্রজগোপাল বিষয়ী	মেমারী (দক্ষিণ)
৯। চন্দ্রশেখর কোঙার	মেমারী (উত্তর)
১০। শুভেন্দু সিংহরায়	জামালপুর
১১। নুরুল আবসার	কেতুগ্রাম

সদস্য	কেন্দ্র
১২। শাহ্‌নওয়াজ কাজী	মঙ্গলকোট
১৩। অনঙ্গমোহন রুদ্র	কেতুগ্রাম-মঙ্গলকোট
১৪। ললিতমোহন হাজরা	কাটোয়া (পূর্ব)
১৫। সৌরেন্দ্রমোহন বক্সী	কাটোয়া (পশ্চিম)
১৬। সুবোধকুমার মল্লিক	পূর্বস্থলী
১৭। নবকুমার রায়	কালনা
১৮। তারাপদ পাল	কালনা-পূর্বস্থলী
১৯। শক্তিপদ মল্লিক	মন্তেশ্বর
২০। নলিনাক্ষ রায়	আসানসোল-হীরাপুর
২১। বগলানন্দ ব্যানার্জী	বরাবনী-জামুড়িয়া
২২। পশুপতিনাথ মালিয়া	জামুড়িয়া-রাণীগঞ্জ
২৩। অতুলচন্দ্র আচার্য	কুলটি
২৪। অমূল্যরতন আচার্য	সালানপুর-কুলটি
২৫। কমলাবিহারীলাল সিংহ	অণ্ডাল-ফরিদপুর
২৬। নির্মলেন্দু মুখার্জী	ফরিদপুর-কাঁকসা

চেয়ারম্যান : সুবিমান ঘোষ

ভাইস্-চেয়ারম্যান : (১) হেলারাম চ্যাটার্জী, (২) নির্মলেন্দু মুখার্জী

☐ ১৯৫৬-এর শেষভাগে সংখ্যা-গরিষ্ঠতা হারিয়ে চেয়ারম্যান-ভাইস্-চেয়ারম্যানদের পদত্যাগ করতে হয়। নতুন নির্বাচন হয় ☐

চেয়ারম্যান : পশুপতিনাথ মালিয়া

ভাইস্-চেয়ারম্যান : (১) ডাঃ বিজয় গড়াই, (২) নির্মলেন্দু মুখার্জী

☐ জেলা বোর্ড পর্যায়ের এখানেই পরিসমাপ্তি। এর পরেই নতুন পঞ্চায়েতী ব্যবস্থার শীর্ষ স্তর হিসেবে গঠিত হয় জেলা পরিষদ ১৯৬৪ সালে। তার প্রথম সভাধিপতি ও সহ-সভাধিপতি হন যথাক্রমে নারায়ণ চৌধুরী ও বামনদাস মুখার্জী।

রেকর্ড থেকে সম্পাদক কর্তৃক সংকলিত

পরিশিষ্ট ১২ □ ১৯৫৫ সালের বর্ধমান পৌর নির্বাচনে প্রচারিত গণতান্ত্রিক নাগরিক সমিতির প্রথম ইস্তেহার

পৌরসভা নির্ব্বাচন উপলক্ষে

বর্ধমানের নাগরিকদের নিকট আবেদন

পশ্চিম বাংলার অন্যতম প্রধান সহর বর্দ্ধমানে পৌরসভার নির্বাচন আসন্ন। সীমাবদ্ধ ভোটাধিকার ও ক্ষমতা সত্বেও এই নির্বাচনের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশী। কারণ ইহার উপর শুধু নাগরিক জীবনের ভালমন্দই নির্ভর করিতেছে না। পৌরসভায় জনগণের সীমাবদ্ধ অধিকার রক্ষার প্রশ্নও ইহার সহিত জড়িত রহিয়াছে। জনসাধারণের নাগরিক অধিকার হরণ করিবার উদ্দেশ্য লইয়া কংগ্রেস নির্বাচনে নামিয়াছে। তাই বর্দ্ধমানের নাগরিক নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারে না।

* যে নাগরিকদের কাছ হইতে বিক্রয় কর, আয়কর, বিভিন্ন জিনিষের উপর কর চাপাইবার মাধ্যমে সরকারী রাজস্ব ফাঁপিয়া ওঠে, তাহাদেরই কর্মজীবন চালু রাখার জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় নাগরিক সুখ সুবিধার জন্য পৌরসভা ইত্যাদিকে সরকারী রাজস্ব হইতে অর্থ দেওয়ার নীতি সর্বত্র স্বীকৃত। কোন কোন সভ্যদেশে পুরা দেওয়া হয় ইংলণ্ডে পৌর খরচের শতকরা ৫৩ ভাগ দেওয়া হয়। কিন্তু আমাদের হতভাগ্য দেশে ইংরেজ শোষকেরা এবং এখন তাহাদের স্থলাভিষিক্ত কংগ্রেস শাসকেরা উল্টা পথে চলিয়া পৌরসভাকে নাগরিকদের উপর অতিরিক্ত ট্যাক্স ধার্য্যের উপরই নির্ভরশীল রাখিয়াছে। ফলে একদিকে দরিদ্র নাগরিকদের উপর করভার অত্যন্ত বাড়িতেছে, অন্যদিকে নাগরিকদের একান্ত প্রয়োজনীয় সুখ সুবিধার ন্যূনতম ব্যবস্থাও উপেক্ষিত হইতেছে। কংগ্রেস শাসকেরা নূতন মিউনিসি-প্যাল সংশোধন আইনে আরো কর বৃদ্ধির উদ্দেশ্য ঘোষণা করিয়াছেন। এই জনবিরোধী নীতির বাহক হিসাবেই কংগ্রেস নির্বাচনে নামিয়াছে। বর্দ্ধমানের নাগরিক ইহার প্রতিবাদ না-করিয়া পারে না।

* দীর্ঘ আন্দোলনের ফলে পৌর সভায় নাগরিকদের সীমাবদ্ধ যেটুকু অধিকার ইংরাজ আমলেও স্বীকৃত হইয়াছে কংগ্রেস আগামী আইনসভায় প্রস্তাবিত মিউনিসিপ্যাল সংশোধনী আইন পাশ করাইয়া তাহাও কাড়িয়া লইতে যাইতেছে।

* এই আইনে সার্ব্বজনীন ভোটাধিকারের কথা নাই। অথচ সহরের সমস্ত মানুষেরই অবদানে নাগরিক জীবন গঠিত এবং পৌরসভাকে উন্নত করিতে হইলে জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকাব শক্তিশালী করা প্রয়োজন। তাহার জন্য সর্বনিম্ন প্রয়োজন সার্ব্বজনীন ভোটাধিকার এবং ইহার পূর্ণতা লাভের জন্য প্রয়োজন ভোটদাতাদের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিকে ফিরাইয়া আনার অধিকার।

* এই আইনে করদাতাদের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের ক্ষমতা কাড়িয়া লইয়া সরকার নিযুক্ত এক্সিকিউটিভ অফিসারকে সর্ব্বেসর্ব্বা করার মারাত্মক ব্যবস্থা আছে। মাত্র এক ভোটের ব্যবধান হইলেই সরকার নিজের খেয়ালমত চেয়ারম্যান-ভাইস্ চেয়ারম্যানকে অপসারণ করিতে, আর মনোমত লোক হইলে রাখিতেও পারিবেন। কমিশনারদের পরিবর্ত্তে সরকারই কর রিভিউ কমিটি গঠন করিতে পারিবেন। এক কথায় নাগরিকদের ভোটকে উপহাস করিয়া কংগ্রেস সরকার পৌরসভাকে বশংবদ প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিতে চায়।

জনগণের অধিকার হরণের এই প্রস্তাব সম্মুখে লইয়াই কংগ্রেস স্পর্দ্ধার সহিত নাগরিকদের ভোট চাহিতেছে। বর্দ্ধমানের নাগরিকগণ এই প্রস্তাবিত আইনের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই প্রতিবাদ দরখাস্ত পাঠাইয়াছে এবং তাহা আইন-সভায় বিবেচনাধীন আছে। এই অবস্থায় বর্দ্ধমানের নাগরিকগণ কি ভোটের মাধ্যমে কংগ্রেসকে এই কথা বলার অধিকার দিতে পারেন যে বর্দ্ধমানের মানুষ উক্ত ঘৃণ্য আইন সমর্থন করে? নিশ্চয়ই নয়।

* রাস্তা-ঘাট, ড্রেন, আলো, জল, ময়লা পরিষ্কার, প্রাথমিক শিক্ষা, রোগ প্রতিষেধক ব্যবস্থা, খেলাধূলার স্থান, লাইব্রেরী প্রভৃতি বিষয় পৌরসভার কাজ সম্বন্ধে বর্দ্ধমানের সাধারণ মানুষের অনেক অভিযোগ আছে। উন্নত পরিচালনার ব্যবস্থা হইলে বর্ত্তমান সঙ্গতির মধ্যেও বেশ কিছু উন্নতির সুযোগ নিশ্চয়ই আছে।

কিন্তু সেই সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিতে হইলে পৌর প্রতিষ্ঠানকে দুর্নীতি মুক্ত করিতে হইবে। বর্দ্ধমান পৌরসভার যে সব দুর্নীতির কথা সর্বজনবিদিত সেই সব দুর্নীতির সহিত যাহাদের নাম ওতোপ্রতোভাবে জড়িত

তাহাদের লইয়া দল গঠন করিয়া পৌরসভাকে দুর্নীতি মুক্ত করার কথা বলা ও পৌরসভাকে উন্নত করার কল্পনা করা হাস্যকর প্রলাপ ছাড়া আর কিছু নহে। যাহারা গণতান্ত্রিক আদর্শে বিশ্বাসী একমাত্র তাহারাই জাগ্রত ভোট-দাতাদের নিয়মিত পরামর্শ লইয়া তাহা করিতে পারে। দুর্নীতি ও প্রতিক্রিয়ার সহচর হিসাবেই কংগ্রেস পৌরসভা দখল করিতে চাহে। বর্দ্ধমানের জনগণ তাহা হইতে দিতে পারে না।

※ এই নির্বাচনে জনসাধারণের অভিমত যাহাতে সংগঠিত ও প্রতিফলিত হইবার সুযোগ পায় তাহারই জন্য গণতান্ত্রিক আদর্শে বিশ্বাসী (বিভিন্ন বর্দ্ধমানের নাগরিকদের) লইয়া **"গণতান্ত্রিক নাগরিক সমিতি"** গঠিত হইয়াছে এবং নাগরিক অধিকার রক্ষা ও সম্প্রসারণ কল্পে নির্বাচনে এই সমিতি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে।

গণতান্ত্রিক নাগরিক সমিতি চায় ঃ

- **সরকারী রাজস্ব হইতে পৌরসভা প্রভৃতিকে প্রয়োজনীয় অর্থ দিতে হইবে।**
- **মিউনিসিপ্যাল সংশোধনী বিল প্রত্যাহার করিতে হইবে।**
- **নাগরিকদের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করা চলিবে না।**
- **সার্ব্বজনীন ভোটাধিকার (ফিরাইয়া আনার অধিকার সহ) দিতে হইবে।**
- **পৌরসভার দোষ ত্রুটি দুর্নীতি দূর করিয়া নাগরিক সুখ সুবিধার ব্যবস্থা উন্নত করিতে হইবে।**
- **প্রতি মহল্লায় ও ওয়ার্ডে নাগরিকদের গণতান্ত্রিক কমিটির সহযোগিতায় পৌরসভার কাজ পরিচালনা করিতে হইবে।**

* বর্দ্ধমানের নাগরিকদের কাছে আবেদন—বন্ধুগণ! যাহাদের কোনরূপ সুষ্ঠু ও সুচিন্তিত পরিকল্পনা নাই এবং যাহারা ইংরেজের স্বীকৃত গণতান্ত্রিক অধিকারও হরণ করিতে উদ্যত হইয়াছে তাহারা যাহাতে নির্বাচনের মধ্য দিয়া বর্দ্ধমানের নাম কালিমালিপ্ত না করিত পারে, তাহার জন্য আগাইয়া আসুন। কোন গণতান্ত্রিক নাগরিক কংগ্রেসের দোসর হইতে পারে না।

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার জন্য—
পৌরসভাকে দুর্নীতি মুক্ত করার জন্য—

গণতান্ত্রিক নাগরিক সমিতির প্রার্থীদের জয়যুক্ত করুন। বর্দ্ধমানের জনগণ বারে বারে যে প্রগতিশীল আদর্শকে তুলিয়া ধরিয়াছে সেই ঐতিহ্য আজ ক্ষুন্ন হইতে পারে না।

গণতান্ত্রিক নাগরিক সমিতির পক্ষ হইতে শ্রীনীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায়, বি এল. কর্ত্তৃক প্রচারিত ও বর্দ্ধমান প্রেস হইতে মুদ্রিত।

মধুসূদন ব্যানার্জীর সৌজন্যে প্রাপ্ত।

নাম-নির্দেশিকা